শ্রীশ্রীদুর্গা

পাবলিসিটি স্টুডিও কর্তৃক মুদ্রিত।

ভারতের যুদ্ধোত্তর
পরিকল্পনার
গোড়ার কথা —
অর্থ-নৈতিক ভিত্তিতে
জাতিকে গড়ে তোলা।
তার জন্য প্রয়োজন
পরিকল্পনানুযায়ী দেশের
কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের
সম্প্রসারণ
এবং
দেশের বিপুল খনিজ সম্পদকে
ব্যবহারিক শিল্পে পরিণত করা।
এই পরিকল্পনার পেছনে চাই
জাতীয় ব্যাঙ্ক

উদগ্র যৌবন তব নেশায় কি হলো ঢুলোঢুল!
তোমার মোহিনীরূপে দেবতারও হতে পারে ভুল!
রণে আর কিবা লাভ, নয়নেই করিয়াছ জয়,
শত্রুর শিবিরে দেবী, ঢুকিয়াছে কি অজানা ভয়
হয়তো সন্ধির লাগি এতক্ষণে পাঠাইলো দূত!
অমৃত করিয়া চুরি দেবতারা হয়েছে অমর!
স্বর্গের সাম্রাজ্যে আজ সেই কথা হলো বিস্মরণ
লক্ষ লক্ষ জীবরক্তে তাই আজ পৃথ্বী থর্ থর্!
হে অস্ত্রধারিণি, তুমি দেখিবে না চেয়ে একবার
সূর্য্যের আলোয় কাঁপে নীলপক্ষ প্রজাপতি কত!
ডানা তার কেটে নিয়ে তরবারে দাও তীক্ষ্ণ ধার
অস্ত্রের দাপটে তুমি পৃথিবীরে করিয়াছ নত!
দৈত্যেরা মরিল বটে, ইন্দ্রের তো মিটিল না ক্ষুধা
স্বর্গের লাগিয়া হায়, বারে বারে মরিল বসুধা।
শারদীয়া
যুগান্তর
আশ্বিন ১৩৫১

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করিয়া বাঙ্গালীর শারদোৎসব। সকল দেশেই বড় বড় উৎসব ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত জড়িত। ভারতেও বিভিন্ন প্রদেশে 'দশহরা' উৎসব হয়, কোথাও রামলীলা, কোথাও অস্ত্রপূজা, কোথাও বা ভিন্ন মূর্ত্তি বা প্রতীকে শক্তিপূজা। দুর্গা-পূজা বাঙ্গালীর সৃষ্টি এবং বাঙ্গালী সভ্যতার বৈশিষ্ট্যে অন্তর্নিহিত। আজ আমরা যে মূর্ত্তিতে ও পদ্ধতিতে দুর্গাপূজা করি, তাহা বেশী দিনের নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালী জমীদার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং নবদ্বীপের স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণ ইহার প্রবর্ত্তক। কয়েকশত বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালীর শারদোৎসবের যে বর্ণনা চণ্ডীমঙ্গলে পাওয়া যায়, তাহাতে দেখি চণ্ডীমূর্ত্তি গড়া হইত, তিনি অষ্টভুজা, জটাজুটধারিণী, কিরীটশোভিতা, সিংহবাহিনী, অষ্টনায়িকা পরিবৃতা হইয়া মহিষাসুর বধ করিতেছেন। বলি-হোম-ধূপ-দীপে অষ্ট দিবানিশি তাঁহার পূজা হইত, রাশি রাশি অন্নবস্ত্র বিতরিত হইত, গীত-বাদ্য-নৃত্যে চণ্ডীমণ্ডপ মুখরিত হইত। পরে অষ্টভুজা দশভুজা হইলেন, অষ্টনায়িকার পরিবর্ত্তে কার্ত্তিক-গণেশ, লক্ষ্মী-সরস্বতী আসিলেন। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরা দনুজ-দলনীর ভীমা ভৈরবী মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে [illegible]নিনা মধুরহাসিনী মাতৃমূর্ত্তি গড়িলেন। জননীর মুখ দেখিলে মনে হয়, অসুর-বিনাশের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই, তিনি যেন করজোড়ে দণ্ডায়মান দুঃখী বঙ্গ-সন্তান-দিগকে কারুণ্যরসে অভিষিক্ত করিবার প্রতীক্ষা করিতেছেন। একটা যুদ্ধক্ষেত্রে সরস্বতী বীণা বাজাইতেছেন, লক্ষ্মী পদ্ম হাতে করিয়া উদাসিনী, সিমলাই ধুতি ও জরিদার পাঞ্জাবী, পাকান চাদর পরিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্য বাবুরূপে বাঁকা টেরী কাটা কার্ত্তিক ময়ূরের উপর বসিয়া। লম্বোদর গণেশ যেন জমীদারের দেওয়ানজী। চালচিত্রের উপর ক্ষীতোদর শিব মধ্যবয়সী বাঙ্গালী জমীদারের প্রতিচ্ছবি। অধঃপতিত পরাধীন বাঙ্গালীর শিল্পরুচির বিকৃতি ও অধঃপতনের নিদর্শন। যখন এই জাতি জীবন্ত ছিল, তখন তাহার মৃৎশিল্প, তক্ষণ-শিল্প এবং পাষাণে খোদিত মূর্ত্তিগুলিও জীবন্ত ছিল। ধীমান ও বীত-পালের নাম আমরা ভুলিয়া গিয়াছি— তাহাদের সৃষ্টিও প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। কিছু কিছু দেবমূর্ত্তি ভূগর্ভ হইতে পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর অষ্টম হইতে দশম শতাব্দীর সেই দেবমূর্ত্তিগুলির দিকে চাহিয়া দেখ, প্রতি অঙ্গে যৌবনের সুষমার সহিত শক্তির কি অপূর্ব্ব সমাবেশ। মূর্ত্তিগুলির দাঁড়াইবার ভঙ্গী দেখিলে মনে হয়, কেমন করিয়া দৃঢ়পদে দাঁড়াইতে হয়, তাহা বাঙ্গালী জানিত। সেদিন বাঙ্গালী একটা সাম্রাজ্য শাসন করিত, তাহার যুদ্ধ ছিল, দিগ্বিজয় ছিল। কাজেই সেদিনের শিল্পীর দনুজদলনীর রূপ ছিল স্বতন্ত্র। আজ বাঙ্গালীর মা স্নেহ-দুর্ব্বলা, সন্তানের অকল্যাণ ভয়ে সতত ভীতা। পুত্রের দুঃসাধ্য উদ্যমের নিরুৎসাহদাত্রী। সঞ্চিত বিত্তের বলে পুত্র পায়ের উপর পা তুলিয়া বসিয়া খাইবে—ইহাই আজ বঙ্গ-জননীদের সর্ব্বোচ্চ কামনা। এই স্নেহময়ী জননীকেই আমরা দুর্গারূপে দেখি।

বিগত শতাব্দীতে স্বচ্ছল জমীদারেরা দুর্গাপূজার ঘটা ও উৎসবকে দেশব্যাপী করিয়া তুলিয়াছিলেন। সে সমারোহের কিছুটা আমরাও দেখিয়াছি। এই দুর্গোৎসব বাঙ্গলার সমাজ-জীবনে এক অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই কয়টি দিনের আশায় বাঙ্গালী দিন গণে। দয়া, দাক্ষিণ্য, ঔদার্য্য, স্নেহ-প্রীতির একটা উচ্ছল ভাবাবেগ সমগ্র সমাজকে পূজার দিনে আলোড়িত করে। মা মা বলিতে বাঙ্গালীর চক্ষু অশ্রুতে আর্দ্র হইয়া উঠে। বিসর্জ্জনের পর গৃহে ও মনে উদাসীন শূন্যতা লইয়া বাঙ্গালী বিষাদের দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে। বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভা এই জগজ্জননীকেই দেশজননীরূপে রূপান্তরিত করিয়া "বন্দে মাতরম্" গাহিলেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

বঙ্কিমের সেই আদর্শবাদ স্বদেশীযুগের শিক্ষিত এবং রাজনীতি-ঘেঁসা বাঙ্গালীকে মাতৃপূজায় উদ্বুদ্ধ করিল। দুর্গাপূজা দেশ-জননীর পূজার সহিত অনেকের দৃষ্টিতে অভিন্ন হইয়া গেল। স্বদেশী নেতারা ভবানী পূজার আয়োজন করিলেন দেবীর হস্তে আধুনিক পিস্তল দেওয়া হইল। বঙ্কিমের অনুকরণে সম্পাদকেরা মায়ের আবাহনে পৌরাণিক ভাষার আবরণে এ যুগের দানব ইংরাজের হাত হইতে আমাদের উদ্ধারের জন্য মিনতি জানাইতে লাগিলেন। দুর্গাস্তুতিতে পলিটিক্যাল চাতুরী ইংরাজের বাঙ্গালী দালালেরা ধরিয়া ফেলিল, অনেক সম্পাদক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার দোহাই দিয়াও সিডিসান হইতে রেহাই পাইলেন না। দুর্গাপত্রিকার তত্ত্ব ব্যাখ্যায় দেশের দুর্ভিক্ষ অন্নাভাব, ম্যালেরিয়া, অভাব অভিযোগ দেখা দিল। সেই বঙ্কিমী ধারা এখনও চলিতেছে।

স্বদেশী যুগের পর জাতীয়তাবাদী বাঙ্গালী বয়কট নীতি অনুসারে বিদেশী ডাকের গহনার পরিবর্ত্তে মাটির রং করা সাজ দিল। সকলে তাহা করিল না। আমরা বাল্যকালে বিদেশী ডাকের গহনায় সজ্জিত কোন ধনীর বাড়ীর পূজা বয়কট করিয়াছিলাম। পরাধীন জাতির দীনা হীনা জননীর অঙ্গে বিদেশীয় ভিক্ষাভূষণ 'স্বদেশী' যুবকদের অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ছিল। তারপর অসহযোগ যুগে সর্ব্বজনীন দেবী-গণের আবির্ভাব হইল। বিশেষভাবে দুর্গা ও সরস্বতীর মূর্ত্তি বদলাইল। ওরিয়েণ্টাল আর্টের প্রতিমা পূজার দিনে হাজার হাজার নরনারী সর্ব্বজনীন পূজাপ্রাঙ্গণে মুগ্ধ হইয়া দেখে। প্রাচীনেরা শাস্ত্রোক্ত মূর্ত্তির বিকৃতি দেখিয়া ক্ষুব্ধ হন।

তন্ত্রের মাতৃভাব আর বৈষ্ণবের বাৎসল্যরস, বাঙ্গালী হিন্দুর এই দুই সাধন ধারার সমন্বয়ে বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব আপামর সাধারণের মনে এক অপূর্ব্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করে। উৎসবের আনন্দের অনেক সমারোহ আজ স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত। মহাযুদ্ধের দুর্যোগে বাঙ্গালী আজ নিঃস্ব। এত বড় একটা মহোৎসবের ধারা যাহারা সেদিন পর্য্যন্ত কায়ক্লেশে বজায় রাখিয়াছিল, আজ তাহাদের অধিকাংশ অন্নবস্ত্রহীন পথের ভিখারী। এবার সুরঞ্জিত বসন-ভূষণে সজ্জিত বালক-বালিকারা হাসি কলরবে পূজামণ্ডপ মুখরিত করিবে না, ঢাকের সুগম্ভীর বাদ্য গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে মহাপূজার বার্ত্তা ঘোষণা করিবে না। অনেক শূন্য চণ্ডী-মণ্ডপে মৃত্তভাতি মৃৎদীপ অক্ষম গৃহস্থের অন্তর্দাহের ক্ষীণ বেদনা ব্যক্ত করিবে। প্রাচীনেরা পূর্ব্বস্মৃতি স্মরণ করিয়া বিলাপ করিবেন, নবীনেরা উপহার না পাইয়া বিষণ্ণ হইবে।

ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী দুর্গাদেবীর পূজার্চ্চনার মত উপকরণ ও আয়োজন যদি না থাকে, তবুও বাঙ্গালী মনের মানসে মাকে আবাহন করিবে। এত বড় একটা পারম্পর্য্য ও ঐতিহ্য কোন জাতিই ভুলিতে পারে না। সে জানে বিশ্বের মূলীভূতা আদ্যাশক্তি যুগে যুগে রূপে রূপে অপরূপ হইয়া প্রকাশিতা হইয়া-ছেন। যিনি প্রলয়কর্ত্রী, তিনিই স্নেহময়ী জননীর মত সৃষ্টিকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আছেন। আজ মহাকালীর প্রলয়লাস্যে পুরাতন জগৎ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—বেদনায় বেপথুমানা ধরিত্রীর সর্ব্বাঙ্গে শ্মশানের চিতাচুল্লী। বহু মানবের বহু যুগের সঞ্চিত সম্পদ বুঝি রসাতলে গেল। একদিন প্রভাসে সমুদ্রতীরে বক্ষে হস্ত স্থাপন করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন প্রশান্ত দৃষ্টিতে পরস্পরকে হননরত যদুকুলের ধ্বংস দেখিয়াছিলেন, শক্তিসাধকও আজ তেমনিভাবে হিংসায় উন্মত্ত দানবীয় শক্তির আত্মহত্যা দেখিতে-ছেন। উন্মাদিনী শঙ্করীর প্রসারিত খর্পর নরশোণিতে ভরিয়া উঠিয়াছে—লোল-রসনার রুধির পিপাসা পরিতৃপ্ত হইতে আর বিলম্ব নাই। ভীমা ভয়ঙ্করী আবার স্মেরাননা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তিতে দেখা দিবেন। নূতন জগতের নব নির্ম্মাণশালায় নবীন সাধকেরা নূতন মন্ত্রে শক্তিপূজার আয়োজন করিবেন। বিশ্বজননীর চরণে সেই শুভদিনকে নিকটতর করার প্রার্থনা অপেক্ষা আজ বড় প্রার্থনা আর কিছু নাই।

জীব উদ্ধার

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণবাড়ী, প্রাঙ্গণের কোণে জরাজীর্ণ কূপ :
নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নবেলা শরতের শেষ,—শব্দ হ'ল—ঝুপ্ !
ব্রাহ্মণ ছুটিয়া গিয়া দেখে উঁকি মারি'—কি একটা প্রাণী
আবছায়া কূপজলে ভাসিছে ডুবিছে খাইছে চোবানি।
সহসা মিলিল সাড়া,—দুর্গা দুর্গা বল, নহে শিশু নারী,
প'ড়েছে কূপের মাঝে অসতর্ক ছাগ, শব্দ উঠে তারি।
সন্নিকটে বাগ্দিপাড়া, ব্রাহ্মণ তখনি পাঠান সংবাদ,
উঁকি মারি' কহে সবে-- নহে মোর পাঁঠা ; একি পরমাদ !
জীর্ণ কূপে কেবা নামে ? ভাবিল ব্রাহ্মণ, ছাগ যদি মরে
মরিয়া পচিবে ক্রমে, তারপর যাহা ভাবিতে শিহরে।
একমাত্র পুত্রে তার করিল আদেশ—নেমে যাও কূপে,
এখনও জীবিত আছে, উঠাইয়া ছাগে আন কোনরূপে।
পিতার আদেশ মাত্র ধীরে গেল নামি ব্রাহ্মণতনয়,
পাঁঠা কাঁধে উঠে এল মৃত্যুমুখ হ'তে যম মৃত্যুঞ্জয়।
নধর নিষিক্ত পাঁঠা পাইয়া উদ্ধার উঠিল দাঁড়ায়ে,
পলাইতে চাহে ক্রমে ব্রাহ্মণপুত্রের দু'হাত ছাড়ায়ে।
পাঁঠার মালিক নাই, প্রতিবেশিগণ দিল উপদেশ
মালিকে করিতে জব্দ ছাগের নন্দনে কেটে কর শেষ।
জীবন-সংশয় কার্য্যে নামায়ে তনয়ে সংকষ্ট ব্রাহ্মণ
ছিল মত্ত, বাঁধি পাঁঠা রাখিল খুঁটায় হৃষ্ট মন
হেনকালে ছুটে এসে জনৈকা বাগ্দিনী ধরে দ্বিজ পায়,
হে ঠাকুর রক্ষা কর, ও পাঁঠা আমার ছেড়ে দাও হায়।
আশুতোষ দ্বিজ কহে, বাগ্দিনীকে কিছু করি তিরস্কার,—
মালিক মিলেছে যবে ছেড়ে দাও ছাগ ; শুনে মুখভার
পাড়ার মাংসাশী সব ; উঠিল গুঞ্জন—এ-ছাগ মোদের,
কূপে নামিবার কালে ছিল না সন্ধান কোন মালিকের।
শুনিয়া বাগ্দিনী কাঁদি ব্রাহ্মণে আবার করিল প্রণাম,
হাসিয়া ব্রাহ্মণ কহে—পাঁঠাটির তোর কত হবে দাম ?
পাঁঠাটা নিকালী দেখি, সামনে পূজায় হবে প্রয়োজন
কিছু ন্যায্য মূল্য নিয়ে ঘরে ফিরে যাও, কোরোনা ক্রন্দন ;
বাগ্দিনী হইল হৃষ্ট পেয়ে ন্যায্য দাম গেল ফিরি ঘরে,
সস্তায় নিকালী পাঁঠা পাইয়া ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট অন্তরে,
নধর ছাগের মাংস রহিল পাড়ার হৃষ্ট প্রতিবেশী'
মৃত্যু হ'তে মুক্তি পেয়ে পাঁঠাটির খুশি সবচেয়ে বেশী,
দেখিয়া পূজার ঘটা ব্রাহ্মণের বাড়ী নাচে শিং নেড়ে,
নিতুই মোটায়ে উঠে যত বাঁধা খায় কাঁঠালের পাতা।

শিল্পী : রমেন চক্রবর্ত্তী

জ্বর
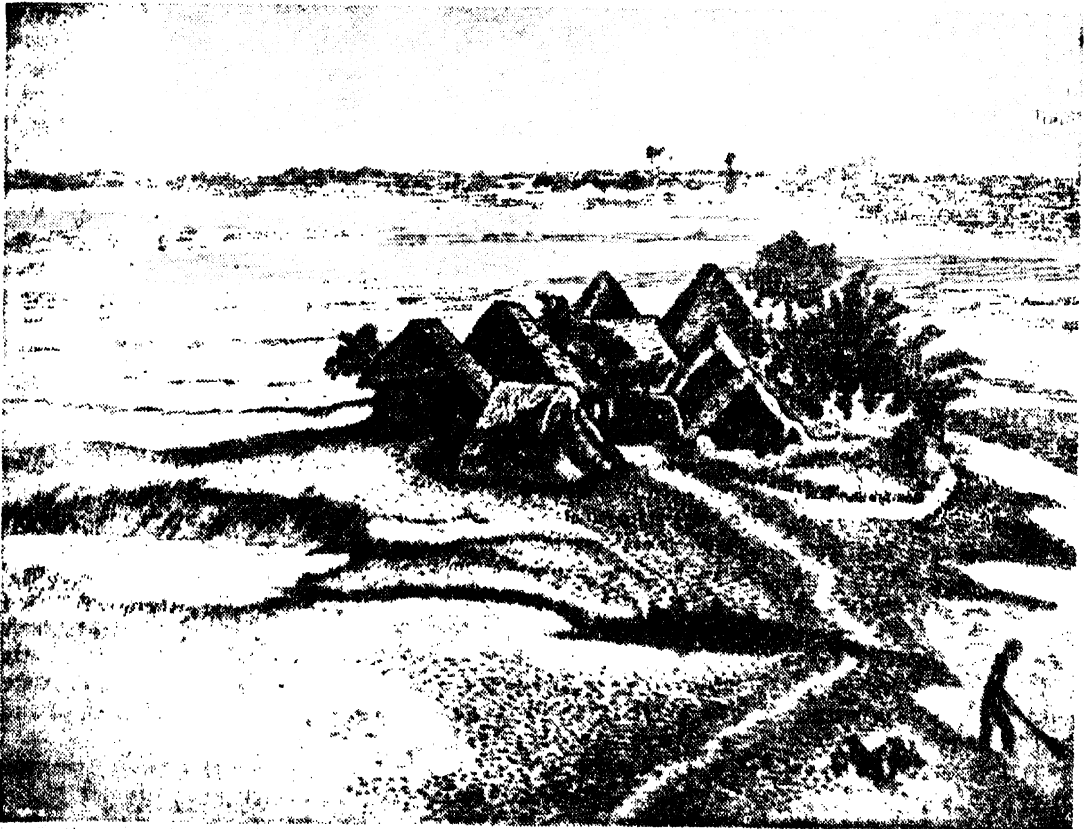
সন্ধ্যে সাতটায় কম্প দিয়ে জ্বর এল। লেপ কাঁথা যেখানে যা ছিল চাপা দিয়েও সে কাঁপুনি থামান যায় না। একটা প্রচণ্ড উন্মত্ত আলোড়ন— শুধু যেন শরীর নয়, সমগ্র সত্তার অন্তঃস্থল থেকে উদ্দাম হিমশীতল তরঙ্গের পর তরঙ্গ সমস্ত চেতনা ক্ষণে ক্ষণে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত প্লাবিত করে দিয়ে যাচ্ছে।

এক মুহূর্তে সব কিছু গেল বদলে। কোন ধারাবাহিকতা আর নেই চেতনার।

জীবনের একটি নিটোল চমৎকার দিন যেন টুকরো টুকরো হয়ে, ভেঙে, ছড়িয়ে, এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে মিশে।

শেড-দেওয়া আলোয় প্রায়ান্ধকার একটি ঘর ক্রমশঃ যেন সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। নমিতার একটা ঠাণ্ডা হাত মাথার ওপর থেকে বয়ে যাচ্ছে সরে। দেওয়ালে অদ্ভুত সব ছায়ার নক্সা যেন জীবন্ত হয়ে চলাফেরা করছে। উড়ে যাওয়া মেঘের মত একটা মশারীর চাল হঠাৎ মুখের উপর এল নেমে। পাশের বাড়ির কর্কশ রেডিও-নিনাদ ওধারে বারান্দায় কাদের আলাপ হয়ে উঠল।

তারি মধ্যে বয়ে যাচ্ছে আশ্চর্য ঠাণ্ডা এক নদী, ষ্টিমারের একটু মৃদু কম্পন, নেপথ্যে প্রপেলারের একটা একঘেয়ে আওয়াজ, রেলিংএর ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়া একটি মুখ, স্নিগ্ধ, পরিচ্ছন্ন তবু কেমন যেন একটু কঠিন।

বারান্দায় ওরা আমারই কথা আলাপ করছে মনে হয়।

"আর দুদিন সবুর করলে কি এমন রাজ্যনাশ হত! এই শরীরে আজকালকার পথের এত ধকল সহ্য হয়।"

পথের ধকল? হাঁা ধকল কম নয় বটে। ষ্টিমার-ঘাটে সেই জনসমুদ্রের দিকে চেয়ে সত্যি আতঙ্ক হয়েছিল। মনে হয়েছিল ষ্টিমারে সাতদিন অপেক্ষা করেও পৌছোতে পারব না। এত মানুষ কখন একটা ষ্টিমারে ধরতে পারে! গ্যাং-ওয়েটা যেন মানুষের ভারে ভেঙে পড়বে। হরেক রকম মানুষের একটা জমাট জটলা,—কুলি, ভদ্রলোক, ফৌজ, তারি সঙ্গে বিচিত্র বিপুল মালপত্রের লট-বহর।

... মাথার ভেতর একটা ঠাণ্ডা স্রোত যেন ধীরে ধীরে নামছে। নমিতাই বুঝি আইস ব্যাগটা ধরে আছে। কোথায় কারা বাজার-দর নিয়ে আলাপ করছে।—

"আগুন! আগুন! যা কিছু ছুঁতে যাও সব আগুন"

"আর বাড়ে গেছে চাষী মজুর, এবার আমাদের পালা।"

"সুস্থ লোকের খাবার নেই তা রোগীর ওষুধ।"

"তবু কলকাতায় কিরকম ভীড় দেখেছ— বেড়েই চলেছে।"

...ওপরের ডেকে ওঠবার সিঁড়িটার কাছে কেমন করে পৌছেছিলাম নিজেই জানি না—নিজের ইচ্ছায় অনিচ্ছায় নয়, সমবেত জনতার একটা নিরবচ্ছিন্ন চাপে শুধু এগিয়ে চলেছি।

সিঁড়ির ওপরের ডেকের-ফোকরটা যেন একটা হাঁ-করা বিভীষিকা। কুলিদের মাথার মালগুলো বিপজ্জনকভাবে কাৎ হয়ে আছে। ওপরে মানুষের নিরেট দেওয়াল ভেদ করে কোন দিন উঠতে পারব মনে হয় না। দুঃসহ দমবন্ধ করা গরম, তারি মধ্যে হঠাৎ চারিধারের কোলাহলটা যেন আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

অর্দ্ধ সচেতনভাবে বুঝতে পারলাম সমূহ বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। সিঁড়ির ওপরের ধাপের একটা কুলির মাথার ওপরকার মালের পাহাড় টলে গিয়ে ধ্বসে পড়বার উপক্রম।

সরে যাবার জায়গা নেই, দুর্ব্বল হাতে সেই বিশাল সুটকেশ ট্রাঙ্কের পাহাড়ের পতন নিবারণ করা অসম্ভব। অভিভূতের মত নিশ্চেষ্টভাবে শুধু সেটি ঘাড়ের ওপর পড়বার প্রতীক্ষায় আছি, আচ্ছন্নভাবে পেছনে অনেকের কলরবের মধ্যে নারী কণ্ঠের একটা চীৎকার শুনলাম। আপনা হতে একবার চকিতে মুখটা পিছন দিকে ঘুরে গেল। একটি অদ্ভুত কম্পিত মুহূর্ত আতঙ্ক, বিস্ময় কেমন একটু অস্বস্তি।

পর মুহূর্তে কোলাহলের তীক্ষ্ণতা আবার স্বাভাবিক খাদে নেমে এল মালের পাহাড় কেমন করে যেন আপনা থেকেই দৈববলে সামলে গেছে, মানুষের নিরেট দেওয়ালে একটা ফাঁক যেন দেখা দিয়েছে।

সুটকেশটা কোন রকমে টেনে নিয়ে ওপরে গিয়ে উঠলাম।

ওপরেও সেই জনসমুদ্র। তিলধারণের জায়গা নেই। সুটকেশটা কোনরকমে পেতে বসবার একটা ফাঁক খোঁজবার জন্যে হতাশ ভাবে চারিধারে তাকাচ্ছি। পেছন থেকে আবার শুনলাম, "ওখানে দাঁড়িয়ে কেন, সেকেণ্ড ক্লাশ কেবিন ত এদিকে।"

যিনি এ সম্ভাষণ করলেন তাঁর মুখের দিকে ফিরে তাকালাম। মুখ থেকে তাঁর পোষাক, পোষাক থেকে তাঁর সঙ্গের মালপত্র, মালপত্র থেকে দাসীর কোলে ঘুমন্ত শিশু, ঘুমন্ত শিশু থেকে উর্দ্দি-পরা চাপরাশীর চেহারা পর্য্যন্ত সব কিছুর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে হঠাৎ হেসে বল্লাম—'চল'—।

...হিম-শীতল তরঙ্গের সে প্রচণ্ড আলোড়ন থেমে গিয়ে—একটা গাঢ় আচ্ছন্নতা নেমে এসেছে নিশ্ছিদ্র মেঘপুঞ্জে ঢাকা আকাশের মত।

নমিতা কোথায় ছেলেদের গোলমাল করবার জন্যে শাসন করছে শুনতে পাচ্ছি। সঙ্কীর্ণ এই দু'খানি মাত্র ঘর, ছেলেরা কোথায় বা যায়! ছেলেদের গোলমালের চেয়ে পাশের বাড়ির রেডিওটা যদি কেউ থামিয়ে দিতে পারত। আর বারান্দায় ওই অবিশ্রান্ত আলাপ।

"রাস্তায় ঘাটে সত্যিই-ত পয়সা ছড়ান, কিন্তু কুড়িয়ে নেবারও তাকৎ চাই"

"নেহাৎ হতভাগা না হ'লে আজকের দিনে কেউ আর বেকার নেই।"

"মানুষ হলে কেউ স্কুল-মাষ্টারি করে আজকের দিনে, তার চেয়ে রিক্সা টানলেও অনেক বেশী লাভ।"

কাকে উদ্দেশ করে যে আলাপ চলছে তা বোঝা কঠিন নয়।

কোথা থেকে বিরামহীন একটা জল পড়ার আওয়াজ আসছে।

পাশের বাড়ির ট্যাঙ্ক ছাপিয়ে জল পড়ছে বোধহয়। শুধু এই জলের নিরবচ্ছিন্ন স্নিগ্ধ শব্দটি যদি শুনতে পেতাম……।

ষ্টীমারে কেবিন একটিও খালি নেই। রিজার্ভ করার প্রমাণ স্বরূপ কাগজখানা মূল্যহীন। সে কাগজ দেখিয়ে ঝগড়া করবার মতও কাউকে পাওয়া যায় না। সময় বুঝে কেবিন ক্লার্ক গা ঢাকা দিয়েছে। এই ষ্টীমারের জনসমুদ্রে কোথায় তাকে খুঁজে বার করা যাবে।

কেবিনগুলোর সামনে রেলিং-এর ধারে একটু জায়গা করে মালপত্রগুলো জমা করে রাখা হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে একটা বেঞ্চি পাওয়া গেছে বসবার মত।

"কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে তোমার বলত!"

"খুব খারাপ হয়েছে নাকি!"

"চেনাই যায় না।"

হেসে বল্লাম,—"চেনা নিশ্চয় যায় নইলে চিনলে কি করে!"

"তুমি ত চিনেও এড়িয়ে যাবার মতলবে ছিলে।"

বেঞ্চিরই একধারে শায়িত ঘুমন্ত শিশুটির ওপর থেকে চাপরাশী পর্য্যন্ত সব কিছুর ওপর আর একবার চোখ বুলিয়ে বল্লাম, "সেটা কি খুব অন্যায়?"

বেশ কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতার পর উত্তর এল, "হ্যাঁ সত্যি-ই অন্যায়!"

একটু বিস্মিত হয়েই তার মুখের দিকে তাকালাম। দু'জনের পরিচয়ের ইতিহাসে যেখানে ছেদ পড়েছিল তার পরের কোন কথাই কেউ এ পর্য্যন্ত তুলিনি। শুধু এইটুকু জেনেছি যে, শর্ম্মিষ্ঠার স্বামী বেশ বড় দরের একজন সরকারী কর্ম্মচারী; সম্প্রতি বদলি হয়ে যেখানে গিয়েছেন শর্ম্মিষ্ঠা পিত্রালয় থেকে শিশু কন্যাকে নিয়ে সেখানেই রওনা হয়েছে। এতক্ষণ যে ধরণের অবান্তর আলাপ চলেছে তার মাঝখানে শুধু এই মন্তব্যটুকু নয় তা বলবার ভঙ্গিটি পর্য্যন্ত কেমন যেন বিসদৃশ লাগল তাই।

আমার বিস্মিত দৃষ্টিটুকু লক্ষ্য করেই বোধহয় শর্ম্মিষ্ঠা খানিকটা মাথা নীচু করে রইল একটু যেন অপ্রস্তুত ভাবে। তারপর মৃদু স্বরে বল্লে—"আমার কথা তুমি বুঝতে পারলে না?"

সরল ভাবে বল্লাম—"না।"

আরো বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শর্ম্মিষ্ঠা ধীরে ধীরে বল্লে—"জীবনটা ঠিক নিপুণ লেখকের বানানো গল্প'ত নয়—একটি মাত্র ছুংসই সমাপ্তি যার লক্ষ্য, সুখ বা দুঃখের একটি বিশেষ রস-সৃষ্টি করেই যার ধারা যায় ফুরিয়ে।"

একটু হেসে বল্লাম,—"নিপুণ লেখকের মতই বড্ড বড় কথা বলার চেষ্টা করছ নাকি!"

"সত্যিই বড় কথা ভাগ্য যখন ভাবিয়েছে, তখন বল্লে দোষ কি?"

মনে পড়ল শর্ম্মিষ্ঠা চিরদিনই একটু বেশী বড় কথা ভাবত। নিজের মাপের চেয়েও বড়। ভাগ্য তাকে বড় কথা যদি ভাবিয়ে থাকে তার মাপের চেয়ে বড় জায়গায় টেনেও তুলেছে। এবার নিজের অনিচ্ছাতেই একটু খোঁচা না দিয়ে পারলাম না।

বল্লাম,—"প্রচুর অবসর আর স্বাচ্ছন্দ্য থাকলে এসব বিলাস সাজে।"

শর্ম্মিষ্ঠা কিন্তু অবিচলিত ভাবেই নিজের কথার জের টেনে বল্লে—"যা হারাই তা মনে করে রাখার অনির্ব্বাণ বেদনা হ'ল বই-এর গল্পের, জীবনে তার পরেও কিছু থাকে।"

"কি থাকে?"

"যা পেয়েছিলাম তাই মনে রাখার প্রশান্তি।"

শর্ম্মিষ্ঠার দিকে আর একবার সবিস্ময়ে তাকালাম। তার পোষাক থেকে প্রসাধনের পরিচ্ছন্ন বিশেষত্বে, তার সহজ আত্মস্থ ভঙ্গিতে বোধ হয় প্রশান্তিরই পরিচয়।

…বারান্দার আলাপের সুর এখন চড়া। নমিতার সঙ্কুচিত স্বর এই আচ্ছন্নতার ভেতর ভাল করে কানে পৌঁছোচ্ছে না, কিন্তু তার মর্ম্মটা অস্পষ্ট নয়।

"বরফ! আর বরফ পাওয়া যাবে কোথায়! আড়াই টাকা সের বরফ দশ বিশ সের কিনতে কত টাকা লাগে হিসাব আছে! আর টাকা থাকলেই কি বরফ পাওয়া যায়।"

কণ্ঠস্বরটা আমার শ্বশুর মশাই-এর, অকর্ম্মণ্য অক্ষম এক জামাই-এর হাতে কন্যাদান করার ভুলের জন্য নিজেকে তিনি এখনো ক্ষমা করতে পারেন নি। তাঁর অনুশোচনা নানাভাবে নানাভঙ্গিতে তাই প্রকাশ পায়।

নমিতার মৃদু কণ্ঠের একটা মিনতির ভাষাটা পাশের বাড়ির রেডিও-নিনাদে হারিয়ে গেল। শ্বশুর মশাই-এর কণ্ঠ আবার রেডিও ছাপিয়ে উঠল—"কাজও হল অষ্টরম্ভা। লাভের মধ্যে বাস কংলী ম্যালেরিয়াটি

(১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কেবল কেশবের নয়, এরকম অবস্থা আরও অনেকের হইয়াছে। অন্ন নাই কিন্তু অন্ন পাওয়ার একটা উপায় পাওয়া গিয়াছে, মেয়ের বিনিময়ে। কয়েক বস্তা অন্ন, মেয়েটির দেহের ওজনের দুগুণ তিনগুণ! সেই সঙ্গে কিছু নগদ টাকাও, যা দিয়া খানকয়েক বস্ত্র কেনা যাইতে পারে।

বছরখানেক আগেও কেশব ভাল ছেলে খুঁজিয়াছে, নগদ গয়না জামা-কাপড় আর তৈজসপত্র সমেত শৈলকে দান করার জন্য। মেয়েকে যথাশাস্ত্র, যথাধর্ম, যথারীতি দান করিতে সে সর্বস্বান্ত হইতেও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তার সর্বস্ব খুব বেশী না হওয়ায় যেমন তেমন চলনসই গ্রহীতাও জোটে নাই। শৈলর রূপও আবার এদিকে চলনসই। অথচ বেশ সে বাড়ন্ত মেয়ে।

খুঁজিতে খুঁজিতে কখন নিজের, স্ত্রীর, অন্য কয়েকটি ছেলে-মেয়ের এবং ওই শৈলর পেটের অন্ন—এক পেটা, আধপেটা, সিকিপেটা অন্ন—যোগাইতে সর্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছে, ভাল করিয়া বুঝিবার অবকাশও কেশব পায় নাই। বড়ছেলেটার বিবাহ দিয়াছিল, ছেলেটা চাকরী করিত, স্কুলে তেত্রিশ টাকার মাষ্টারি। ছেলেটা মরিয়াছে এক বিশেষ ধরণের বিস্ময়কর ম্যালেরিয়ায়। ম্যালে- [illegible] শক্তি, এর অন্ন বটীনিনের সঙ্গেও তার পরিচয় অনেক-দিনের। হরি হরি, মেয়েটার যখন এমনি বটীনিন গেলার ক্ষমতা ছিল না, জলে গলিয়া বটীনিন দিতে গিয়া ময়দার আটা তৈরী হইয়া গেল!

হৃদয় ডাক্তার বলিল, 'পাগল, ও খুব ভাল বটীনিন। নতুন ধরণের বটীনিন—খুব এফেক্টিভ। নইলে দাম এত বেশী নিই কখনো আপনার কাছে?'

মেয়েটা মরিয়া যাওয়ার পর হৃদয় ডাক্তার রাগ করিয়াছিল। হাকিমের রায় দেওয়ার মত শাসনভরা নিন্দার সুরে বলিয়াছিল, 'আপনারাই মারলেন ওকে। বটীনিন? শুধু বটীনিনে কখনো জ্বর সারে? পথ্য চাই না? পথ্য না দিয়ে মারলেন মেয়েটাকে, শুধু পথ্য না দিয়ে।'

শৈলর চেয়ে সে মেয়েটি ছোট ছিল মোটে বছর দেড়েকের। তার মুখখানাও ছিল শৈলর চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর। আজ তার বিনিময়েও অন্ন মিলিতে পারিত। কয়েক বস্তা অন্ন। নগদ টাকা ফাউ।

কিন্তু সেজন্য কেশবের মনে কোন আপশোষ নাই। সে বরং ভাবে সে মেয়েটা মরিয়া বাঁচিয়াছে। সেও বাঁচিয়াছে।

শৈলকে কিনিল কালাচাঁদ।

কালাচাঁদের মুখ বড় মিষ্টি। বড়ই মধুর [illegible]

তার পাশের বাড়ীটিও কালাচাঁদ কিছুদিন আগে ভাড়া নিয়াছে। দু'বাড়ীতে এখন মেয়ের সংখ্যা সতের আঠার। কালাচাঁদের মন্দোদরী এখন দুটি বাড়ীরই কর্ত্রী। মহিলাটি কয়েক বছরের মধ্যেই আকারে একটু স্থূল হইয়া পড়িয়াছেন। উদর রীতিমত মোটা। ধপ ধপে আধহাতা সেমিজের উপর ধপ ধপে থান পরিলে তাকে সম্ভ্রান্তবংশীয়া দেবীর মত দেখায়।

দুর্ভিক্ষে সহরে মেয়ের চাহিদা বাড়ায় এবং মফঃস্বলে মেয়ে সস্তা ও সুলভ হওয়ায় কালাচাঁদ এদিক ওদিক ঘুরিতেছিল। দেশের গাঁয়ে আসিয়া তার শৈলকে পছন্দ হইয়া গেল। শৈল অবশ্য তখন কঙ্কালসার, কিন্তু এ অবস্থায় আসিয়া না পড়িলে কি আর এসব ঘরের মেয়ে বাগানো যায়? তাছাড়া, উপোস দিয়া কঙ্কাল হইয়াছে, কিছুদিন ভাল খাইতে দিলেই গায়ে মাংস উথলিয়া উঠিবে। শৈলকে সে আগেও

নমুনা

দেখিয়াছে। রূপ তার চলনসই বলিয়াও কালাচাঁদের কিছু আসিয়া যায় না। প্রতি সন্ধ্যায় রূপ সৃষ্টি করিয়া দিলেই চলিবে। প্রথম কিছুদিন অন্যে তৈরী করিয়া দিবার পর শৈল নিজেই শিখিয়া ফেলিবে পথিকের চোখভুলান রূপ সৃষ্টির স্থূল রঙীন ফুলেল কায়দা।

প্রায় কীর্তনীয়ার মোহন করুণ সুরে আপশোষ করিয়া কালাচাঁদ বলে, 'আহা, চুক্ চুক! আপনার অদেষ্টে এত কষ্ট ছিল চক্কোত্তি মশায়!'

কেশব স্তিমিত নিস্তেজ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। দরদের স্পর্শে চোখে তার জল নামিয়া আসিবে কালাচাঁদ তা আশা করে নাই, কিন্তু চোখ দু'টি একটু ছল ছল পর্যান্ত করিল না। দেখিয়া সে একটু আশ্চর্য্য ও ক্ষুব্ধ হয়। অথচ এ অভিজ্ঞতা তার নতুন নয়। কি যেন হইয়াছে দেশ শুদ্ধ লোকের। সহানুভূতির বন্যা ক্ষীণ একটু সাড়াও জাগায় না। আগে হইলে সমবেদনার ভূমিকা করা মাত্র এই কেশব চক্রবর্ত্তী ছেলেমেয়েদের শোকে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিত, চোখ মুছিতে মুছিতে নাক ঝাড়িতে ঝাড়িতে দুর্ভাগ্যের দীর্ঘ বর্ণনা দিত, ব্যাকুল আগ্রহে চেষ্টা করিত সমবেদনাকে ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া তুলিতে। আজ ওসব যেন তার চুলোয় গিয়াছে।

সহরের আস্তানা হইতে অনেক গাঁয়ে কালাচাঁদ আসা যাওয়া করিয়াছে। অনেক উজাড় গাঁ দেখিয়াছে। কিন্তু গাঁয়ে বসিয়া দিনের পর দিন গাঁ উজাড় হইয়া যাইতে দেখে নাই, নিজে ঘা খায় নাই। সে কেন কেশবের নির্ব্বিকার ভাবের মানে বুঝিতে পারিবে!

কালাচাঁদ কিছু চাল ডাল মাছ তরকারী আনিয়াছিল,—একবেলার মত। এরা অবশ্য দু'বেলা তিন বেলা চালাইয়া দিবে। তা দিক। সে শুধু জিভে একটু স্বাদ দিয়া, পেট একটু শান্ত করিয়া এদের লোভ বাড়াইয়া দিতে চায়, পাগল করিয়া দিতে চায়। শৈলর জন্য সে একখানি শাড়ীও আনিয়াছে। কাপড়খানা পরিয়া তার সামনে আসিয়াছে শৈলের মা। শৈলের সেমিজটি প্রায় আস্ত আছে, ছেঁড়া কাপড় পরিলেও তার লজ্জা ঢাকা থাকে।

কালাচাঁদ নানা কথা বলে। আসল কথাও পাড়ে এক সময়।

'শৈলিকে নিয়ে যাবে? চিকিচ্ছে করাবে?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। বড় কষ্ট হয় মেয়েটার কষ্ট দেখে।'

কালাচাঁদের নারীমেধ আশ্রমিক ব্যবসা সম্পর্কে কাণাঘুষা কেশবের কানেও আসিয়াছিল। সে চাপা আর্ত্ত কণ্ঠে বলে, 'তোমার বাড়ীতে রাখবে? শৈলিকে বাড়ীতে রাখবে তোমার?'

'বাড়ীতে নয় তো কোথা রাখবো চক্কোত্তি মশায়?'

কেশব রাজী হইয়া বলে, 'একটু ভেবে দেখি। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন বাবা, একটু ভেবে দেখি।' কালাচাঁদ খুসী হইয়া বলে, 'বুধবার আসব; একটু বেশী রাতেই আসব, গাড়ীতে সব নিয়ে আসব। কার মনে কি আছে বলা তো যায় না চক্কোত্তি মশায়, আপনি বরং বলবেন যে, শৈল মামাবাড়ী গেছে।' কেশব চোখ বুজিয়া বলে, 'কেউ জানতে চাইবে না বাবা। কারো অত জানবার গরজ আর নেই। যদি বা জানে শৈলি নেই, ধরে নেবে মরে গেছে।'

শৈলকে দেখা যাইতেছিল। এত রোগা যে একটু কুঁজো হইয়া গিয়াছে। মনের গহন অন্ধকারে শৈশবের ভয় নড়াচড়া করিয়া ওঠায় কালাচাঁদ একটু শিহরিয়া ওঠে। সারা দেশটাতে বড় সস্তা আর সহজ হইয়া গিয়াছে মানুষের মরণ।

নিরুপায়, তবু ভাবিতে হয়। ভাবিবার ক্ষমতা নাই, তবু ভাবিতে হয়। উদরের ভোঁতা বেদনা কুয়াশার মত কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিয়া মাথার মধ্যে সব ঝাপসা করিয়া রাখিয়াছে, কি করা উচিত তার জবাব কোথায়, কে জানে! ভাবিতে গেলে মাথার বদলে কেশবের শরীরটাই যেন ঝিম ঝিম করে। এ গাঁয়ের রাখালের বোন আর দীনেশের মেয়ে এভাবে বিক্রী হইয়াছিল। কালাচাঁদের কাছে নয়, অন্য দু'জন ভিন্ন লোকের কাছে। তবু তো শেষপর্য্যন্ত রাখাল বাঁচিতে পারে নাই। ঘরে মরিয়া পচিয়া সে চারিদিকে দুর্গন্ধ ছড়াইয়াছে। দীনেশও তার পরিবারের বাড়তি পড়তি মানুষ ক'টাকে নিয়া কোথায় যেন পাড়ি দিয়াছে ঠিকানা নাই।

তাছাড়া, ওরা কেউ বামুন নয়। ঠিক কেশবের মত ভদ্রও নয়। শূদ্রজাতীয় সাধারণ গেরস্থ মানুষ। ওরা যা পারিয়াছে কেশবের কি তা পারা উচিত? বুকটা ধড়্ফড় করে কেশবের। তার মুহূর্দেকের নাড়ী সচল হয়। তালাধরা কানে শঙ্খঘণ্টা সংস্কৃত শব্দের গুঞ্জন শোনে, চুলকানি ভরা ত্বকে স্নান ও তসরের স্পর্শ পায়, পচা মড়ার স্মৃতিভরা নাকে যুক্ত-চন্দনের গন্ধ লাগে। বন্ধ করা চোখের সামনে এলো-মেলো উল্টাপাল্টাভাবে ভাসিয়া আসে

ছাতনাতলা, যজ্ঞাগ্নি, দানসামগ্রী, চেলিপরা শৈল, সারি সারি মানুষের সামনে সারি সারি কলাপাতা। মনে যেন পড়িতে থাকে সে শৈলর বাপ।

কচুশাক দিয়া ফ্যানভাত দু'টি খাওয়ার সময় সারি সারি লোকের সম্মুখের সারি সারি কলাপাতায় দেওয়ার জন্য আলগা উনানে চাপানো বড় বড় হাঁড়ি ও কড়াইভরা অন্ন-ব্যঞ্জনের গন্ধ ও সান্নিধ্য যেন কেশবের নিশ্বাসকে চিরকালের মত টানিয়া লইয়া দ্রুত উপিয়া যায়। কে কার বাপ সেটা অগ্রাহ্য করার পক্ষে তাই আবার হয় যথেষ্ট।

শৈলর মা বিনায়, কাঁদে না। বিমায় আর গুণগুণানো গানের সুরে বিমায়। শুনিলে মনে হয় ঘরে বুঝি ভ্রমর আসিতেছে। শৈলর শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ণ বলিয়া সে মাঝে মাঝে কথাগুলি শুনিতে পায়: তোর মরণ হয় না! সবাই মরে, তোর মরণ নেই! ভাইকে খেলি, বোনকে খেলি, নিজেকে খেতে পারলিনে পোড়ারমুখী! মর তুই মর! কলকাতা যাবার আগে মর!

শৈলর রসকস শুকাইয়া গিয়াছে। মনে তার দুঃখবেদনা মান অভিমান কিছুই জাগে না। খিদের বালাইও যেন তার নাই। কালাচাঁদের সঙ্গে যেখানে হোক গিয়া দু'বেলা পেট ভরিয়া খাওয়ার কথা ভাবিলে তার শুধু খন খন রোমাঞ্চ হয়। তার নারীদেহের সহজ ধর্ম রক্তমাংসের আশ্রয় ছাড়িয়া শিরায় গিয়া ঠেকিয়াছে। পাঁচড়া চুলকাইয়া সুখ হয় না; রক্ত বাহির হইলে ব্যথা লাগে না। অথচ পেটমোটা ছোট ভাইটার কাঁচা পেয়ারা চিবানো পর্যন্ত তার কাছে রোমাঞ্চকর ঠেকে।

বুধবার সকালে পরিষ্কার রোদ উঠিয়া দুপুরে মেঘলা করিয়া, বিকালে আবার আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। মধ্যাহ্নে সদয় ডাক্তারের নাতির মুখে ভাতে কেশব চক্রবর্তীর বাড়ীশুদ্ধ সকলের নিমন্ত্রণ ছিল। কুঞ্জ শানাইওলা তার সঙ্গী আর ছেলে লইয়া আশেপাশের কয়েকটা গ্রামের বিয়ে পৈতে মুখেভাতে চিরকাল শানাই বাজাইয়া আসিয়াছে। তার অবর্তমানে সদয়কে শানাইওলা আনিতে হইয়াছে সদর হইতে। সপরিবারে নিমন্ত্রণ রাখিয়া কোনমতে বাড়ী আসিয়া কেশব সপরিবারে মাদুরের বিছানায় এলাইয়া পড়িল। পেট ভরিয়া খাইলে যে মানুষের এরকম দম আটকাইয়া মরণদশা হয় এটা তারা জীবনে আজ টের পাইল প্রথম। সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা এমনিভাবে অর্দ্ধচেতন অবস্থায় পড়িয়া রহিল যেন জ্ঞানহারা মাতালেরা ঘুমাইতেছে। পথে একবার এবং বাড়ীতে কয়েকবার বমি করায় শৈলর ঘুমটাই কেবল হইল অনেকটা স্বাভাবিক। কেশবের পেটে যন্ত্রণা আরম্ভ হওয়ায় সে-ই কাছে বসিয়া তার পেটে খালি হাত মালিশ করিয়া দিতে লাগিল। বাড়ীতে তেল ছিল না।

পেটের ব্যথা কমিতে রাত হইয়া গেল, কেশবের তখন মানসিক সংস্কারগুলি ব্যথায় টনটন করিতেছে। কালাচাঁদ আসিল অনেক পরে, রাত্রি তখন গভীর। পাড়ার খানিক তফাতে নির্জনে গাড়ী রাখিয়া সে একজন লোক সঙ্গে করিয়া আসিয়াছে। শুধু এ পাড়া নয়, সমস্ত গ্রাম ঘুমে নিঝুম। কেবল কেশবের মনে হইতেছিল অনেক দূরে সদয় ডাক্তারের বাড়ীতে যেন তখনো অস্পষ্ট সুরে শানাই বাজিতেছে।

কেশব কাঁদিয়া বলিল, 'ও বাবা কালাচাঁদ।'

'আজ্ঞে?'

'এমনিভাবে মেয়েকে আমার কেমন করে যেতে দেব আমার বিয়ের যুগ্যি মেয়ে?'

'এই তো দোষ আপনাদের। আমাকে বিশ্বাস হয় না? বলুন তবে কি করব। মালপত্র গাড়ীতে আছে। তিন বস্তা চাল—'

কেশব চুপ করিয়া থাকে। টর্চের আলোয় কালাচাঁদ একবার তার মুখ দেখিয়া নেয়। চোখ ঝলসানো আলোয় বুনো পশুর চোখের মত কেশবের জলভরা চোখ জ্বলজ্বল করিতে থাকে, পলক পড়ে না।

খানিক অপেক্ষা করিয়া কালাচাঁদ বলে, 'চটপট করাই ভাল। এই কাপড় জামা এনেছি, শৈলকে পরে নিতে বলুন। মালপত্র আনতে পাঠাই চক্কোত্তি মশায়?'

কেশব অস্ফুটস্বরে সায় দেয় না বারণ করে স্পষ্ট বুঝা যায় না। শৈলর মা আরেকটু স্পষ্টভাবে বিনায়।

কালাচাঁদ সঙ্গের লোকটিকে হুকুম দেয়, 'মালগুলো সব আনগে যা বঙ্কি ওদের নিয়ে। ড্রাইভারকে বলিস যেন গাড়ীতে বসে থাকে।'

মেঝে লক্ষ্য করিয়া কালাচাঁদ টর্চটা জ্বালিয়া রাখে। অন্ধকারে তার গা ছমছম করিতেছিল। বিচ্ছুরিত আলোয় ঘরে রঙ্গমঞ্চের নাটকীয় স্তব্ধতার থমথমে বিকার সৃষ্টি হয়। কেশব উবু হইয়া বসিয়াছে, তার হাতে শৈলর জন্য আনা রঙীন শাড়ী, সায়া ও ব্লাউজ। ঠিক পিছনে দাঁড়াইয়া আছে শৈল।

'একটা তবে অনুমতি কর বাবা।'

কেশবের গলা অনেকটা শান্ত মনে হয়।

'বলুন।'

'শৈলিকে তুমি বিয়ে করে নিয়ে যাও।'

'বিয়ে? আপনি পাগল নাকি?'

শৈলর হাতে জামাকাপড় দিয়া কেশব গিয়া কালাচাঁদের হাত ধরে। মিনতি করিয়া বলে এ বিয়ে সে বিয়ে নয়। দশজনের সামনে পুরুত যে বিয়ে দেয়, সাক্ষীসাবুদ থাকে, বরের দায়িত্ব আইনে সিদ্ধ হয়, সে বিয়ে নয়। এ কেবল কেশবের মনের শান্তির জন্য। 'আমি শুধু নারায়ণ সাক্ষী করে শৈলকে তোমার হাতে সঁপে দেব। তারপর ওকে নিয়ে তুমি যা খুশী কোরো, সে তোমার ধম্মো। আমার ধম্মো রাখো। এটুকু করতে দাও।'

দু'জন জোয়ান লোকের মাথায় শৈলর মূল্য আসিয়া পড়িয়াছিল। পা উজাড় হইয়া যাক, বেশী লোক সঙ্গে না করিয়া মাঝরাত্রে গাঁয়ের একটা মেয়েকে লইতে আসিবার মত বোকা কালাচাঁদ নয়। একা পাইয়া তাকে কাটিয়া যদি পুঁতিয়া ফেলে!

কেশবের ন্যাকামিতে বিরক্ত হইয়া সে বলিল, 'যা করবার করুন চটপট।'

কালাচাঁদের কাছ হইতেই দেশলাই চাহিয়া লইয়া কেশব ঘরের এক কোণে শিলারূপী নারায়ণের আসনের কাছে প্রদীপটি জ্বালিল। ঘরের বাহিরে জ্যোৎস্নায় গিয়া শৈল নতুন ও রঙীন সায়া ব্লাউজ শাড়ী পরিয়া আসিল। প্রদীপে সামান্য তেল ছিল। কেশবের নারায়ণ সাক্ষী করিয়া কন্যাদানের প্রক্রিয়ার সমস্তক্ষণ শৈলর বারবার মনে হইতে লাগিল, প্রদীপের তেলটুকু মালিশ করিলে বাপের পেট ব্যথা হয়তো তাড়াতাড়ি কমিয়া যাইত, অতক্ষণ বাপ তার কষ্ট পাইত না পেটের ব্যথায়।

নিবু নিবু প্রদীপের আলোয় কালাচাঁদ আর শৈলের হাত একত্র করিয়া কেশব বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র পড়ে। কালাচাঁদ দারুণ অস্বস্তি বোধ করিতে করিতে তাগিদ দেয় 'শীগগির করুন।' ঘরে যে ঠাকুর আছেন সে জানিত না। ঠাকুরদেবতার সঙ্গে এসব ইয়ার্কি ফাজলামি তার ভাল লাগে না। একটু ভয় করে। মনটা অভিভূত হইয়া পড়িতে চায়। গৃহস্থের শান্ত পবিত্র অন্তঃপুরে জলচৌকিতে শুকনো ফুলপাতায় অধিষ্ঠিত দেবতা, সদব্রাহ্মণের মন্ত্রোচ্চারণ, নির্জন মাঠঘাট প্রান্তরের মফঃস্বলে পুঞ্জীকৃত মধ্যরাত্রির নিজস্ব ভীতিকর রহস্য তাকে কাবু করিতে চায়। মনে মনে নিজেকে গাল দিতে দিতে সে ভাবে যে বুড়ার এ পাগলামিতে রাজী না হওয়াই তার উচিত ছিল।

প্রদীপটা নিবিয়া যাওয়ামাত্র কালাচাঁদ হাত টানিয়া নিল। তার হাতে শৈলর হাত ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল।

কালাচাঁদের গাও ঘামিয়া গিয়াছিল। রুমালে মুখ মুছিয়া শক্ত করিয়া শৈলর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে সে বাহির হইয়া গেল। নিজেও বিদায় নিল না, শৈলকেও বিদায় নিতে দিল না। দোকানীর কাছে ক্রেতা বা পণ্য কোন পক্ষই বিদায় নেয় না বলিয়া অবশ্য নয়; কালাচাঁদের ভাল লাগিতেছিল না। শৈলও থ' বনিয়া গিয়াছিল।

শিউলি জবা গাছের মাঝ দিয়া বাড়ীর সামনে কাঁচা রাস্তায় পা দিতে দিতে এ-ভাবটা শৈলর কাটিয়া গেল। সেইখানে প্রথম হাত টানিয়া প্রথমবার সে বলিল, 'আমি যাব না।'

আরও কয়েকবার হাত টানা ও যাব না বলার পর জোরে কাঁদিয়া উঠিবার উপক্রম করায় তারই শাড়ীর আঁচলটা তার মুখে গুঁজিয়া দিয়া কালাচাঁদ তাকে পাঁজা কোলে তুলিয়া নিল। তখন কয়েক মুহূর্তের জন্য তার হাল্কা রোগা শরীরে জোর আসিল অদ্ভুত রকমের। পরপর কয়েকবার রোমাঞ্চ আসার সঙ্গে হাত পা ছুঁড়িয়া সে ধনুকের মত বাঁকা হইয়া যাইতে লাগিল। মুখে গোঁজা আঁচল খসিয়া পড়িলেও দাঁতে দাঁত টিপিয়া গোঁ-গোঁ আওয়াজ করিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ শিথিল নিস্পন্দ হইয়া গেল।

সব শুনিয়া কালাচাঁদের মনোবিজ্ঞানী

গোণা করিয়া বলিল, 'কি দরকার ছিল বাবা অত হাঙ্গামায় ? আর কি মেয়ে নেই পিথিমীতে ?'

'কেমন একটা ঝোঁক চেপে গেল।'

'ঝোঁক চেপে গেল! মাইরি? ওই একটা বোঁচানাকী কালো হাড়গিলেকে দেখে ঝোঁক চেপে গেল!'

'ছুত্তোরি, সে ঝোঁক নাকি ?'

কিন্তু মন্দোদরীর সন্দেহ গেল না। পুরুষের পছন্দকে সে অনেককাল নমস্কার করিয়াছে, আগামাথাহীন উদ্ভট সে জিনিষ। শৈলর জন্ম কালাচাঁদের মাথা ব্যথা, আদর-যত্ন ও বিশেষ ব্যবস্থার বাড়াবাড়িতে সন্দেহটা দিন দিন ঘন হইয়া আসিতে লাগিল। সাদা থান ও সেমিজ পরা ভদ্রঘরের দেবীর মত যে মন্দোদরী তার চোখে দেখা দিল কুটীল কালো চাউনি।

শৈলকে দেখিতে ডাক্তার আসে। তার জন্ম হাল্কা দামী ও পুষ্টিকর পথ্য আসে। অন্য মেয়েগুলিকে তার কাছে ঘেঁষিতে দেওয়া হয় না। কালাচাঁদ তার সঙ্গে অনেক সময় কাটায়।

একদিন ব্যাপারটা অনেকখানি স্পষ্ট হইয়া গেল।

শৈলর চেহারা তখন অনেকটা ফিরিয়াছে।

'ওকে বাড়ী নিয়ে যাব ভাবছিলাম।'

'কেন ?'

'মনটা খুঁতখুঁত করছে। ধরতে গেলে ও আমার বিয়ে করা বৌ। ঠাকুরের সামনে ওর বাবা মন্ত্র পড়ে ওকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। আমি বলি কি, বাড়ী নিয়ে যাই এক কোণে পড়ে থাকবে দাসীচাকরাণীর মত।'

দু'জনে প্রচণ্ড কলহ হইয়া গেল। বাস্তব, অশ্লীল, কুৎসিত কলহ। কালাচাঁদ রাগ করিয়া একটা মদের বোতল হাতে করিয়া শৈলর ঘরে গিয়া ভিতর হইতে খিল বন্ধ করিয়া দিল।

পরদিন দুপুরে সে গেল বাড়ী। স্ত্রীর সঙ্গে বাকী দিনটা বোঝাপড়া করিয়া সন্ধ্যার পর গাড়ী নিয়া শৈলকে আনিতে গেল।

বাড়ীতে ঢুকিতেই মন্দোদরী তাকে নিজের ঘরে টানিয়া নিয়া গেল।

'শৈলির ঘরে লোক আছে।'

কালাচাঁদের মাথায় যেন আগুন ধরিয়া গেল। মনে হইল, মন্দোদরীকে সে বুঝি খুন করিয়া ফেলিবে।

'লোক আছে! আমার বিয়ে করা স্ত্রীর ঘরে—'

মন্দোদরী নিঃশব্দে মোটা একতাড়া নোট বাহির করিয়া কালাচাঁদের সামনে ধরিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া নোটগুলি হাতে নিয়া কালাচাঁদ সন্তর্পণে গুণিতে আরম্ভ করিল। গোণা শেষ হইবার পর মনে হইল সে যেন মন্ত্রবলে ঠাণ্ডা কৃতজ্ঞ ও কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে।

'লোকটা কে ?'

'সেই গজেন। চাল বেচে লাল হয়ে গেছে।'

নোটের মোটা তাড়াটা নাড়াচাড়ার সঙ্গে কালাচাঁদের চোখমুখের নিঃশব্দ বিস্ময় ও প্রশ্ন অনুমান করিয়া সে আবার বলিল, 'খেয়াল চেপেছে, ও আর বেশী টাকা কি ? গেঁয়ো কুমারী খুঁজছিল।'

জ্বর

(১৫ পৃষ্ঠার পর)

বাগিয়ে নিয়ে এলেন। এমন কাজের ঝোঁকে সাত তাড়াতাড়ি যাবার দরকার কি ছিল। বরাতে'ত সেই স্কুল-মাষ্টারি।"

পাশের বাড়ির রেডিওটা সত্যিই বুঝি পাল্লা দিতে না পেরে হঠাৎ থেমে গেছে। শুধু ছাপিয়ে ওঠা ট্যাঙ্ক থেকে ঝির ঝির করে জল পড়ার একটা আওয়াজ। সে জলের ঠাণ্ডা শব্দ যেন কানের ভেতর দিয়ে শরীরের সমস্ত শিরায় শিরায় পেতে চাই।

নমিতা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে টের পাচ্ছি। আইস-ব্যাগটা একবার মাথার ওপর ধরে নামিয়ে নিলে। আইস ব্যাগে বরফ আর নেই সব জল হয়ে গেছে।

চোখ না খুলেই নমিতার মুখ আমি যেন দেখতে পাচ্ছি। লেপের ভেতর থেকে হাতটা বার করে তার হাতটা ধরে ফেল্লাম। ভিজে ঠাণ্ডা স্পঞ্জের মত নিষ্প্রাণ হাত—অনেকক্ষণ আইস-ব্যাগ ধরে থাকার দরুণই বোধ হয়।

আস্তে আস্তে বল্লাম,—"আমার কোটটার ভেতরের পকেটটা খুঁজে দেখো নমিতা, টাকা আছে।"

"টাকা আছে!"—নমিতার কণ্ঠস্বরে গভীর বিস্ময়। জ্বরের ঘোরে প্রলাপ না সত্যি বলছি সে বুঝতে পারছে না।

*

...অনেক কষ্টে শেষ পর্য্যন্ত কেবিন-ক্লার্কের সন্ধান পাওয়া গেল। একটা কেবিনের ব্যবস্থা হ'তে পারে—তবে কিঞ্চিৎ উপরি লাগবে।

আমাকে ইতস্ততঃ করবার অবসর পর্য্যন্ত না দিয়ে শর্ম্মিষ্ঠা মণিব্যাগটা বার করে আমার হাতে তুলে দিলে।

স্বাভাবিক সঙ্কোচে বল্লাম,—তুমি গুণে দাও না।"

"না, না তোমার কাছেই থাক না এখন, যাও যাও হাঙ্গাম চুকিয়ে দিয়ে এস।"

হাঙ্গাম চুকিয়ে দিয়ে এসে দেখলাম শর্ম্মিষ্ঠা কেবিনটি দখল করে ইতিমধ্যেই চাপরাশীর সাহায্যে মালপত্র তুলে সব গোছগাছ করে নিয়েছে।

গোছগাছ একটু বেশী রকম। হেসে বল্লাম—"তুমিত একেবারে সংসার পেতে বসেছ দেখছি, অথচ এক ঘণ্টা বাদেই ত নেমে যাবে।"

টিফিন কেরিয়ার থেকে দুটি প্লেটে খাবার সাজাতে সাজাতে শর্ম্মিষ্ঠা বল্লে—"এক ঘণ্টার সংসারই কি তুচ্ছ,—ঘন্টা ধরে ত সব কিছুর দাম কষা যায় না।"

খাবারের প্লেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে আমায় বল্লে—"নাও, এবার একটু নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার সব কথা শুনব।"

ভাবলাম বলি—আমার কথা শোনার ধৈর্য্য কি তোমার আছে শর্ম্মিষ্ঠা। যেখানে আমাদের পরিচয় হয়েছিল সেখান থেকে আমি অনেক ধাপ নেমে এসেছি আর তুমি গেছ উঠে। আমি দরিদ্র স্কুল-মাষ্টার, ব্রত বড়, নিষ্ঠা নেই। যুদ্ধের বাজারে আগুন যেখানেই লাগুক, ছাই হল আমাদের সংসার সবার আগে। তাই আজকের দিনে আলাদীনের প্রদীপ যাদের হাতে তাদের একজনের দরজায় লোভে, দুরাশায় ধন্না দিতে গেছলাম। কিন্তু তাও ভাগ্যে সইল না। জ্বরে পড়ে রুগ্নদেহ নিয়ে পুনর্মূষিক হয়ে ঘরে ফিরছি। তুমি আমার জীবনে কবে কি ছিলে তা মনে রাখবার উৎসাহটুকুও আমার নেই।

কিছুই কিন্তু বল্লাম না,—বলবার দরকার হল না। শর্ম্মিষ্ঠার নিজেরই দেখা গেল এত কথা বলবার আছে যে, সময়ে কুলোয় না,—তার জীবনের গভীর, সূক্ষ্ম সব দুঃখ, আঘাত, দ্বন্দ্ব সমস্যার কথা! সেই সঙ্গে তাদের পারিবারিক প্রসঙ্গও বুঝি না এসে পারে না,—তার স্বামীর পদমর্য্যাদা, দায়িত্ব, তাদের সাংসারিক, সামাজিক প্রতিষ্ঠার পটভূমিকায় শর্ম্মিষ্ঠা নিজের হৃদয়কে যেন সবিস্তারে বিশ্লেষণ করে চলল।

অবহিত হয়ে তার কথাই শুনছিলাম। প্লেট খালি দেখে শর্ম্মিষ্ঠা আবার অনেকগুলো খাবার চাপিয়ে দিলে। বল্লাম, "করছ কি! কত আর দেবে।"

শর্ম্মিষ্ঠা গাঢ় গভীর স্বরে বল্লে,—"আমার কাছে কতবড় পাওনা তোমার ছিল, তার কি-ই বা দিতে পারলাম।"

...বারান্দায় শ্বশুরমহাশয়ের গলার স্বরটা হঠাৎ কেমন নতুন শোনাচ্ছে।

"এ-ত একশ টাকার নোট, এখন ভাঙাব কোথায় ?"

নমিতার কণ্ঠস্বর এবার আর তত মৃদু নয়, "সব কটাইত ওই।"

"সব কটাই! ওঃ এতক্ষণে বুঝেছি, কিছু কাজ সেখানে নিশ্চয় বাগিয়েছে!"

মাঝখানের একটা ষ্টেশনে শর্ম্মিষ্ঠা নেমে গেল। যথাসম্ভব সাহায্য করলাম—কুলি ডেকে মালপত্র নামাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে।

ষ্টিমার ছাড়বার আগে পর্য্যন্ত শর্ম্মিষ্ঠা পণ্টুনে রইল দাঁড়িয়ে। শেষমুহূর্ত্তে গভীর গাঢ় স্বরে বল্লে,—"আমি কি ভাবছি জান ?"

"কি ?"

"আর যেন দেখা না হয়।"

একটু চুপ করে থেকে পকেট থেকে তাড়াতাড়ি তার মণিব্যাগটা বার করে ছুঁড়ে দিলাম।

"দেখদিকি আর একটু হলে ভুলে যাচ্ছিলাম।"

"শেষকালে শুধু কি ওইটুকুই মনে পড়ল।"

একটু হাসলাম, ওপরে ঘণ্টা বাজছে ষ্টিমার চালাবার। প্যাডলের আলোড়নে ষ্টিমার কাঁপছে।

শর্ম্মিষ্ঠা কখন ব্যাগ খুলবে জানি না, খুল্লে আমার চিঠির টুকরোটুকু পাবে নিশ্চয়। লিখেছি,—"তোমার কাছে অনেক বড় পাওনা আমার ছিল, তার সামান্ত কিছু শোধ নিলাম।"

হাতনাতলা, বর্জাপি, দানসামগ্রী, চৌদিপরা শৈল, সারি সারি মানুষের সামনে সারি সারি কলাপাতা। মনে যেন পড়িতে থাকে সে শৈলর বাপ।

কচুশাক দিয়া ফ্যানভাত দু'টি খাওয়ার সময় সারি সারি লোকের সম্মুখের সারি সারি কলাপাতায় দেওয়ার জন্য আলগা উনানে চাপানো বড় বড় হাঁড়ি ও কড়াইভরা অন্ন-ব্যঞ্জনের গন্ধ ও সান্নিধ্য যেন কেশবের নিশ্বাসকে চিরকালের মত টানিয়া লইয়া দ্রুত উপিয়া যায়। কে কার বাপ সেটা অগ্রাহ্য করার পক্ষে তাই আবার হয় যথেষ্ট।

শৈলর মা বিনায়, কাঁদে না। বিনায় আর গুণগুণানো গানের সুরে বিনায়। শুনিলে মনে হয় ঘরে বুঝি ভ্রমর আসিতেছে। শৈলর শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ণ বলিয়া সে মাঝে মাঝে কথাগুলি শুনিতে পায়: তোর মরণ হয় না। সবাই মরে, তোর মরণ নেই। ভাইকে খেলি, বোনকে খেলি, নিজেকে খেতে পারলিনে পোড়ারমুখী। মর তুই মর। কলকাতা যাবার আগে মর।

শৈলর রসকস শুকাইয়া গিয়াছে। মনে তার দুঃখবেদনা মান অভিমান কিছুই জাগে না। খিদের বালাইও যেন তার নাই। কালাচাঁদের সঙ্গে যেখানে হোক গিয়া দু'বেলা পেট ভরিয়া খাওয়ার কথা ভাবিলে তার শুধু খন খন রোমাঞ্চ হয়। তার নারীদেহের সহজ ধর্ম রক্তমাংসের আশ্রয় ছাড়িয়া শিরায় গিয়া ঠেকিয়াছে। পাঁচড়া চুলকাইয়া সুখ হয় না, রক্ত বাহির হইলে ব্যথা লাগে না। অথচ পেটমোটা ছোট ভাইটার কাঁচা পেয়ারা চিবানো পর্যন্ত তার কাছে রোমাঞ্চকর ঠেকে।

বুধবার সকালে পরিষ্কার রোদ উঠিয়া দুপুরে মেঘলা করিয়া, বিকালে আবার আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। মধ্যাহ্নে সদয় ডাক্তারের নাতির মুখে ভাতে কেশব চক্রবর্তীর বাড়ীশুদ্ধ সকলের নিমন্ত্রণ ছিল। কুঞ্জ সানাইওলা তার সঙ্গী আর ছেলে লইয়া আশেপাশের কয়েকটা গ্রামের বিয়ে পৈতে মুখেভাতে চিরকাল সানাই বাজাইয়া আসিয়াছে। তার অবর্তমানে সদয়কে সানাইওলা আনিতে হইয়াছে সদর হইতে। সপরিবারে নিমন্ত্রণ রাখিয়া কোনমতে বাড়ী আসিয়া কেশব সপরিবারে মাদুরের বিছানায় এলাইয়া পড়িল। পেট ভরিয়া খাইলে যে মানুষের এরকম দম আটকাইয়া মরণদশা হয় এটা তারা জীবনে আজ টের পাইল প্রথম। সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা এমনিভাবে অর্দ্ধচেতন অবস্থায় পড়িয়া রহিল যেন জ্ঞানহারা মাতালেরা ঘুমাইতেছে। পথে একবার এবং বাড়ীতে কয়েকবার বমি করায় শৈলর ঘুমটাই কেবল হইল অনেকটা স্বাভাবিক। কেশবের পেটে যন্ত্রণা আরম্ভ হওয়ায় সে-ই কাছে বসিয়া তার পেটে খালি হাত মালিশ করিয়া দিতে লাগিল। বাড়ীতে তেল ছিল না।

পেটের ব্যথা কমিতে রাত হইয়া গেল, কেশবের তখন মানসিক সংস্কারগুলি ব্যথায় টনটন করিতেছে। কালাচাঁদ আসিল অনেক পরে, রাত্রি তখন গভীর। পাড়ার খানিক তফাতে নির্জনে গাড়ী রাখিয়া সে একজন লোক সঙ্গে করিয়া আসিয়াছে। শুধু এ পাড়া নয়, সমস্ত গ্রাম ঘুমে নিঝুম। কেবল কেশবের মনে হইতেছিল অনেক দূরে সদয় ডাক্তারের বাড়ীতে যেন তখনো অস্পষ্ট সুরে সানাই বাজিতেছে।

কেশব কাঁদিয়া বলিল, 'ও বাবা কালাচাঁদ।'

'আজ্ঞে ?'

'এমনিভাবে মেয়েকে আমার কেমন করে যেতে দেব আমার বিয়ের যুগ্যি মেয়ে ?'

'এই তো দোষ আপনাদের। আমাকে বিশ্বাস হয় না ? বলুন তবে কি করব। মালপত্র গাড়ীতে আছে। তিন বস্তা চাল—'

কেশব চুপ করিয়া থাকে। টর্চের আলোয় কালাচাঁদ একবার তার মুখ দেখিয়া নেয়। চোখ ঝলসানো আলোয় বুনো পশুর চোখের মত কেশবের জলভরা চোখ জ্বলজ্বল করিতে থাকে, পলক পড়ে না।

খানিক অপেক্ষা করিয়া কালাচাঁদ বলে, 'চটপট করাই ভাল। এই কাপড় জামা এনেছি, শৈলকে পরে নিতে বলুন। মালপত্র আনতে পাঠাই চক্কোত্তি মশায় ?'

কেশব অস্ফুটস্বরে সায় দেয় না বারণ করে স্পষ্ট বুঝা যায় না। শৈলর মা আরেকটু স্পষ্টভাবে বিনায়।

কালাচাঁদ সঙ্গের লোকটিকে হুকুম দেয়, 'মালগুলো সব আনগে যা বস্তি ওদের নিয়ে। ড্রাইভারকে বলিস যেন গাড়ীতে বসে থাকে।'

মেঝে লক্ষ্য করিয়া কালাচাঁদ টর্চটা জ্বালিয়া রাখে। অন্ধকারে তার গা ছমছম করিতেছিল। বিচ্ছুরিত আলোয় ঘরে রঙ্গমঞ্চের নাটকীয় গুরুতার থমথমে বিকার সৃষ্টি হয়। কেশব উবু হইয়া বসিয়াছে, তার হাতে শৈলর জন্য আনা রঙীন শাড়ী, সায়া ও ব্লাউজ। ঠিক পিছনে দাঁড়াইয়া আছে শৈল।

'একটা তবে অনুমতি কর বাবা।'

কেশবের গলা অনেকটা শান্ত মনে হয়।

'বলুন।'

'শৈলিকে তুমি বিয়ে করে নিয়ে যাও।'

'বিয়ে ? আপনি পাগল নাকি ?'

শৈলর হাতে জামাকাপড় দিয়া কেশব গিয়া কালাচাঁদের হাত ধরে। মিনতি করিয়া বলে এ বিয়ে সে বিয়ে নয়। দশজনের সামনে পুরুত যে বিয়ে দেয়, সাক্ষীসাবুদ থাকে, বরের দায়িত্ব আইনে সিদ্ধ হয়, সে বিয়ে নয়। এ কেবল কেশবের মনের শান্তির জন্য। 'আমি শুধু নারায়ণ সাক্ষী করে শৈলকে তোমার হাতে সঁপে দেব। তারপর ওকে নিয়ে তুমি যা খুশী কোরো, সে তোমার ধম্মো। আমার ধম্মো রাখো। এটুকু করতে দাও।'

দু'জন জোয়ান লোকের মাথায় শৈলর মূল্য আসিয়া পড়িয়াছিল। গাঁ উজাড় হইয়া যাক, বেশী লোক সঙ্গে না করিয়া মাঝরাত্রে গাঁয়ের একটা মেয়েকে লইতে আসিবার মত বোকা কালাচাঁদ নয়। একা পাইয়া তাকে কাটিয়া যদি পুঁতিয়া ফেলে!

কেশবের ন্যাকামিতে বিরক্ত হইয়া সে বলিল, 'যা করবার করুন চটপট।'

কালাচাঁদের কাছ হইতেই দেশলাই চাহিয়া লইয়া কেশব ঘরের এক কোণে শিলারূপী নারায়ণের আসনের কাছে প্রদীপটি জ্বালিল। ঘরের বাহিরে জ্যোৎস্নায় গিয়া শৈল নতুন ও রঙীন সায়া ব্লাউজ শাড়ী পরিয়া আসিল। প্রদীপে সামান্য তেল ছিল। কেশবের নারায়ণ সাক্ষী করিয়া কন্যাদানের প্রক্রিয়ার সমস্তক্ষণ শৈলর বারবার মনে হইতে লাগিল, প্রদীপের তেলটুকু মালিশ করিলে বাপের পেট ব্যথা হয়তো তাড়াতাড়ি কমিয়া যাইত, অতক্ষণ বাপ তার কষ্ট পাইত না পেটের ব্যথায়।

নিবু নিবু প্রদীপের আলোয় কালাচাঁদ আর শৈলের হাত একত্র করিয়া কেশব বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র পড়ে। কালাচাঁদ দারুণ অস্বস্তি বোধ করিতে করিতে তাগিদ দেয় 'শীগ্‌গির করুন।' ঘরে যে ঠাকুর আছেন সে জানিত না। ঠাকুরদেবতার সঙ্গে এসব ইয়ার্কি ফাজলামি তার ভাল লাগে না। একটু ভয় করে। মনটা অভিভূত হইয়া পড়িতে চায়। গৃহস্থের শান্ত পবিত্র অন্তঃপুরে জলচৌকিতে শুকনো ফুলপাতায় অধিষ্ঠিত দেবতা, সদ্‌ব্রাহ্মণের মন্ত্রোচ্চারণ, নির্জন মাঠঘাট প্রান্তরের মফঃস্বলে পুঞ্জীকৃত মধ্যরাত্রির নিজস্ব ভৌতিকের রহস্য তাকে কাবু করিতে চায়। মনে মনে নিজেকে গাল দিতে দিতে সে ভাবে যে বুড়ার এ পাগলামিতে রাজী না হওয়াই তার উচিত ছিল।

প্রদীপটা নিবিয়া যাওয়ামাত্র কালাচাঁদ হাত টানিয়া নিল। তার হাতে শৈলর হাত ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল।

কালাচাঁদের গাও ঘামিয়া গিয়াছিল। রুমালে মুখ মুছিয়া শক্ত করিয়া শৈলর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে সে বাহির হইয়া গেল। নিজেও বিদায় নিল না, শৈলকেও বিদায় নিতে দিল না। দোকানীর কাছে ক্রেতা বা পণ্য কোন পক্ষই বিদায় নেয় না বলিয়া অবশ্য নয়, কালাচাঁদের ভাল লাগিতেছিল না। শৈলও থ' বনিয়া গিয়াছিল।

শিউলি জবা গাছের মাঝ দিয়া বাড়ীর সামনে কাঁচা রাস্তায় পা দিতে দিতে এ-ভাবটা শৈলর কাটিয়া গেল। সেইখানে প্রথম হাত টানিয়া প্রথমবার সে বলিল, 'আমি যাব না।'

আরও কয়েকবার হাত টানা ও যাব না বলার পর জোরে কাঁদিয়া উঠিবার উপক্রম করায় তারই শাড়ীর আঁচলটা তার মুখে গুঁজিয়া দিয়া কালাচাঁদ তাকে পাঁজা কোলে তুলিয়া নিল। তখন কয়েক মুহূর্তের জন্য তার হাল্কা রোগা শরীরে জোর আসিল অদ্ভুত রকমের। পরপর কয়েকবার রোমাঞ্চ আসার সঙ্গে হাত পা ছুঁড়িয়া সে ধনুকের মত বাঁকা হইয়া যাইতে লাগিল। মুখে গোঁজা আঁচল খসিয়া পড়িলেও দাঁতে দাঁত টিপিয়া গোঁ-গোঁ আওয়াজ করিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ শিথিল নিস্পন্দ হইয়া গেল।

সব শুনিয়া কালাচাঁদের মনোহারী

গোসা করিয়া বলিল, 'কি দরকার ছিল বাবা অত হাঙ্গামায় ? আর কি মেয়ে নেই পিথিমীতে ?'

'কেমন একটা ঝোঁক চেপে গেল।'

'ঝোঁক চেপে গেল! মাইরি ? ওই একটা বোঁচানাকী কালো ছাড়গিলেকে দেখে ঝোঁক চেপে গেল!'

'দুত্তেরি, সে ঝোঁক নাকি ?'

কিন্তু মন্দোদরীর সন্দেহ গেল না। পুরুষের পছন্দকে সে অনেককাল নমস্কার করিয়াছে, আগামাথাহীন উদ্ভট সে জিনিষ। শৈলর জন্য কালাচাঁদের মাথা ব্যথা, আদর-যত্ন ও বিশেষ ব্যবস্থার বাড়াবাড়িতে সন্দেহটা দিন দিন ঘন হইয়া আসিতে লাগিল। সাদা থান ও সেমিজ পরা তন্দ্রধরের দেবীর মত যে মন্দোদরী তার চোখে দেখা দিল কুটীল কালো চাউনি।

শৈলকে দেখিতে ডাক্তার আসে। তার জন্য হাল্কা দামী ও পুষ্টিকর পথ্য আসে। অন্য মেয়েগুলিকে তার কাছে ঘেঁষিতে দেওয়া হয় না। কালাচাঁদ তার সঙ্গে অনেক সময় কাটায়।

একদিন ব্যাপারটা অনেকখানি স্পষ্ট হইয়া গেল।

শৈলর চেহারা তখন অনেকটা ফিরিয়াছে।

'ওকে বাড়ী নিয়ে যাব ভাবছিলাম।'

'কেন ?'

'মনটা খুঁতখুঁত করছে। ধরতে গেলে ও আমার বিয়ে করা বৌ। ঠাকুরের সামনে ওর বাবা মন্ত্র পড়ে ওকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। আমি বলি কি, বাড়ী নিয়ে যাই এক কোণে পড়ে থাকবে দাসীচাকরাণীর মত।'

দু'জনে প্রচণ্ড কলহ হইয়া গেল। বাস্তব, অশ্লীল, কুৎসিত কলহ। কালাচাঁদ রাগ করিয়া একটা মদের বোতল হাতে করিয়া শৈলর ঘরে গিয়া ভিতর হইতে খিল বন্ধ করিয়া দিল।

পরদিন দুপুরে সে গেল বাড়ী। স্ত্রীর সঙ্গে বাকী দিনটা বোঝাপড়া করিয়া সন্ধ্যার পর গাড়ী নিয়া শৈলকে আনিতে গেল।

বাড়ীতে ঢুকিতেই মন্দোদরী তাকে নিজের ঘরে টানিয়া নিয়া গেল।

'শৈলির ঘরে লোক আছে।'

কালাচাঁদের মাথায় যেন আগুন ধরিয়া গেল। মনে হইল, মন্দোদরীকে সে বুঝি খুন করিয়া ফেলিবে।

'লোক আছে! আমার বিয়ে করা স্ত্রীর ঘরে—'

মন্দোদরী নিঃশব্দে মোটা একতাড়া নোট বাহির করিয়া কালাচাঁদের সামনে ধরিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া নোটগুলি হাতে নিয়া কালাচাঁদ সন্তর্পণে গুণিতে আরম্ভ করিল। গোণা শেষ হইবার পর মনে হইল সে যেন মন্ত্রবলে ঠাণ্ডা কৃতজ্ঞ ও কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে।

'লোকটা কে ?'

'সেই গজেন। চাল বেচে লাল হয়ে গেছে।'

নোটের মোটা তাড়াটা নাড়াচাড়ার সঙ্গে কালাচাঁদের চোখমুখের নিঃশব্দ বিস্ময় ও প্রশ্ন অনুমান করিয়া সে আবার বলিল, 'খেয়াল চেপেছে, ও আর বেশী টাকা কি ? গেঁয়ো কুমারী খুঁজছিল।'

১৩৫২

জ্বর

(১৫ পৃষ্ঠার পর)

বাগিয়ে নিয়ে এলেন। এমন কাজের খোঁজে সাত তাড়াতাড়ি যাবার দরকার কি ছিল। বরাতে'ত সেই স্কুল-মাষ্টারি।"

পাশের বাড়ির রেডিওটা সত্যিই বুঝি পাল্লা দিতে না পেরে হঠাৎ থেমে গেছে। শুধু ছাপিয়ে ওঠা ট্যাঙ্ক থেকে ঝির ঝির করে জল পড়ার একটা আওয়াজ। সে জলের ঠাণ্ডা শব্দ যেন কানের ভেতর দিয়ে শরীরের সমস্ত শিরায় শিরায় পেতে চাই।

নমিতা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে টের পাচ্ছি। আইস-ব্যাগটা একবার মাথার ওপর ধরে নামিয়ে নিলে। আইস ব্যাগে বরফ আর নেই সব জল হয়ে গেছে।

চোখ না খুলেই নমিতার মুখ আমি যেন দেখতে পাচ্ছি। লেপের ভেতর থেকে হাতটা বার করে তার হাতটা ধরে ফেল্লাম। ভিজে ঠাণ্ডা স্পঞ্জের মত নিষ্প্রাণ হাত—অনেকক্ষণ আইস-ব্যাগ ধরে থাকার দরুণই বোধ হয়।

আস্তে আস্তে বল্লাম,—"আমার কোটটার ভেতরের পকেটটা খুঁজে দেখো নমিতা, টাকা আছে।"

"টাকা আছে!"—নমিতার কণ্ঠস্বরে গভীর বিস্ময়। জ্বরের ঘোরে প্রলাপ না সত্যি বলছি সে বুঝতে পারছে না।

...অনেক কষ্টে শেষ পর্য্যন্ত কেবিন-ক্লার্কের সন্ধান পাওয়া গেল। একটা কেবিনের ব্যবস্থা হ'তে পারে—তবে কিঞ্চিৎ উপরি লাগবে।

আমাকে ইতস্ততঃ করবার অবসর পর্য্যন্ত না দিয়ে শর্মিষ্ঠা মণিব্যাগটা বার করে আমার হাতে তুলে দিলে।

স্বাভাবিক সঙ্কোচে বল্লাম,—তুমি গুণে দাও না।"

"না, না তোমার কাছেই থাক না এখন, যাও যাও হাঙ্গাম চুকিয়ে দিয়ে এস।"

হাঙ্গাম চুকিয়ে দিয়ে এসে দেখলাম শর্মিষ্ঠা কেবিনটি দখল করে ইতিমধ্যেই চাপরাশীর সাহায্যে মালপত্র তুলে সব গোছগাছ করে নিয়েছে।

গোছগাছ একটু বেশী রকম। হেসে বল্লম—"তুমিত একেবারে সংসার পেতে বসেছ দেখছি, অথচ এক ঘণ্টা বাদেই ত নেমে যাবে।"

টিফিন কেরিয়ার থেকে দুটি প্লেটে খাবার সাজাতে সাজাতে শর্মিষ্ঠা বল্লে—"এক ঘণ্টার সংসারই কি তুচ্ছ,—ঘণ্টা ধরে ত সব কিছুর দাম কষা যায় না।"

খাবারের প্লেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে আমায় বল্লে—"নাও, এবার একটু নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার সব কথা শুনব।"

ভাবলাম বলি—আমার কথা শোনার ধৈর্য্য কি তোমার আছে শর্মিষ্ঠা। যেখানে আমাদের পরিচয় হয়েছিল সেখান থেকে আমি অনেক ধাপ নেমে এসেছি আর তুমি গেছ উঠে। আমি দরিদ্র স্কুল-মাষ্টার, ব্রত বড়, নিষ্ঠা নেই। যুদ্ধের বাজারে আগুন যেখানেই লাগুক, ছাই হল আমাদের সংসার সবার আগে। তাই আজকের দিনে আলাদীনের প্রদীপ যাদের হাতে তাদের একজনের দরজায় লোভে, দুরাশায় ধন্না দিতে গেছলাম। কিন্তু তাও ভাগ্যে সইল না। জ্বরে পড়ে রুগ্নদেহ নিয়ে পুনর্মূষিক হয়ে ঘরে ফিরছি। তুমি আমার জীবনে কবে কি ছিলে তা মনে রাখবার উৎসাহটুকুও আমার নেই।

কিছুই কিন্তু বল্লাম না,—বলবার দরকার হল না। শর্মিষ্ঠার নিজেরই দেখা গেল এত কথা বলবার আছে যে, সময়ে কুলোয় না,—তার জীবনের গভীর, সূক্ষ্ম সব দুঃখ, আঘাত, দ্বন্দ্ব সমস্যার কথা। সেই সঙ্গে তাদের পারিবারিক প্রসঙ্গও বুঝি না এসে পারে না,—তার স্বামীর পদমর্য্যাদা, দায়িত্ব, তাদের সাংসারিক, সামাজিক প্রতিষ্ঠার পটভূমিকায় শর্মিষ্ঠা নিজের হৃদয়কে যেন সবিস্তারে বিশ্লেষণ করে চলল।

অবহিত হয়ে তার কথাই শুনছিলাম। প্লেট খালি দেখে শর্মিষ্ঠা আবার অনেকগুলো খাবার চাপিয়ে দিলে। বল্লাম, "করছ কি! কত আর দেবে।"

শর্মিষ্ঠা গাঢ় গভীর স্বরে বল্লে,—"আমার কাছে কতবড় পাওনা তোমার ছিল, তার কি-ই বা দিতে পারলাম।"

...বারান্দায় শ্বশুরমহাশয়ের গলার স্বরটা হঠাৎ কেমন নতুন শোনাচ্ছে।

"এ-ত একশ টাকার নোট, এখন ভাঙাব কোথায় ?"

নমিতার কণ্ঠস্বর এবার আর তত মৃদু নয়, "সব কটাইত ওই।"

"সব কটাই! ওঃ এতক্ষণে বুঝেছি, কিছু কাজ সেখানে নিশ্চয় বাগিয়েছে!"

মাঝখানের একটা ষ্টেশনে শর্মিষ্ঠা নেমে গেল। যথাসম্ভব সাহায্য করলাম—কুলি ডেকে মালপত্র নামাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে।

ষ্টিমার ছাড়বার আগে পর্য্যন্ত শর্মিষ্ঠা পন্টুনে রইল দাঁড়িয়ে। শেষমুহূর্ত্তে গভীর গাঢ় স্বরে বল্লে,—"আমি কি ভাবছি জান ?"

"কি ?"

"আর যেন দেখা না হয়।"

একটু চুপ করে থেকে পকেট থেকে তাড়াতাড়ি তার মণিব্যাগটা বার করে ছুঁড়ে দিলাম।

"দেখছ দিকি আর একটু হলে ভুলে যাচ্ছিলাম।"

"শেষকালে শুধু কি ওইটুকুই মনে পড়ল।"

একটু হাসলাম, ওপরে ঘণ্টা বাজছে ষ্টিমার চালাবার। প্যাডলের আলোড়নে ষ্টিমার কাঁপছে।

শর্মিষ্ঠা কখন ব্যাগ খুলবে জানি না, খুল্লে আমার চিঠির টুকরোটুকু পাবে নিশ্চয়। লিখেছি,—"তোমার কাছে অনেক বড় পাওনা আমার ছিল, তার সামান্য কিছু শোধ নিলাম।"

লাইন-বাবু

আস্তে। পদের নাম শুনেই অনেকে ভাববেন না লাইন বাবু হচ্ছেন পাঁচশো লাইনের দারোগা, আর মাল দিদি হচ্ছেন মাল বাবু বা গুডস ক্লার্কের স্ত্রী। মফস্বলে এই ওঁদের ডাক-নাম।

কিন্তু লাইন যখন পাতা হয়নি ও আসেনি যখন মালগাড়ি, তখনকার একটা ইতিহাস আছে।

সকল, মেয়েটির নাম মালতী, ছেলেটির নাম লালগোপাল।

ইংরিজি এল অক্ষরের মত তেতলা ব্যারাক। এল-এর খাড়া লাইনের দিকে তেতলায় থাকে লালগোপাল, আর শোয়া-লাইনের দিকে দোতলায় থাকে মালতী। ওদের দু'টো জানলার বিন্দুকে যদি একটি সরল রেখা দিয়ে সংযুক্ত করা যায় তবে দু'দিকে দু'টো সূক্ষ্মকোণ তৈরি হবে—যার নাম হচ্ছে, আঁখিকোণ।

কিন্তু আগেই বলেছি রেখাটা সরল। আর যা সরল তাই স্পষ্ট নির্লজ্জ, বেগ-গামী। তাই চক্ষুর চক্ষুলজ্জা কাটিয়ে উঠতে তাদের দেরি হল না। এল-এর দু'বাহুতেই দু'টো সিঁড়ি ছিল, কিন্তু ওরা একই সময়ে একই সিঁড়ি দিয়ে চড়াই উৎরাই করতে লাগল। তারপর বারান্দা দিয়ে সুরু হল

তিনি পেয়েছেন—যার ফলে একদিন মালতী লালগোপালদের বাড়িতে ও লাল-গোপাল মালতীর ঘরে ঢুকতে পারল অনায়াসে এবং ক্রমশ একাদিক্রমে, গা ঢাকা না দিয়েই। অভিভাবকেরা প্রথমে ভীত, পরে সন্দিগ্ধ ও সর্বশেষে আহ্লা-দিত হয়ে উঠলেন। আর, ওরা প্রথমে আহ্লাদিত, পরে সন্দিগ্ধ ও ইদানিং নিদারুণ ভীত হয়ে উঠেছে।

পাড়াতেই উগ্রকালীর মঠ। সম্প্রতি এক সন্ন্যাসী এসেছেন সেখানে, মূর্তিমান মহাদেব, ভীষণ জাগ্রত। সবাই বলছে, সেই ত্রিলোচন ত্রিশূলী, ত্রিপুরারি ফিরে এসেছেন। কিছুই অসম্ভব নয়। সম্ভবামি যুগে যুগে।

নাম প্রেমানন্দ পরমানিক। এম এ পাশ, সোনার ফ্রেমে চশমা আঁটা। এখনো কার্ল মার্কস ফ্যাশান হয়নি, ফ্রয়েডই নাড়েন চাড়েন। দেখতে কেউকেটা, কিন্তু আসলে নাকি কেষ্টবিষ্টু। ঝাড়ফুঁক করে অসুখ সারান, ফুঁ দিয়ে দুঃসময় উড়িয়ে দেন। তাঁর দেয়া কি একটা ফুল শুঁকলে নাকি নাড়ীজ্বালাও নরম পড়ে। তার উপর সম্প্রতি তিনি একটি ক্লাশ খুলেছেন—মনের কথার ক্লাশ এবং এতেই বেশি জমকে উঠেছেন। অর্থাৎ যে কেউ এসে তাঁকে তার মনের ব্যথা নিবেদন করে প্রতিকার প্রতিষেধের উপায় জেনে নিতে পারে। বলা বাহুল্য, সে নিবেদনটা নির্জনে, অন্তরালে। কথা যেমন ডাক্তারের গোপন কক্ষে। দক্ষিণা কিছু? পুরুষ হলে একটি আর মেয়ে হলে দ্বিগুণ কাজ।

'আমি যাই মা, বাবাজীর কাছে।' আঁচলটা কোমরে আঁট করে জড়িয়ে নিয়ে মালতী রুখে দাঁড়াল। 'এর একটা এস-পার ওসপার করতেই হবে। এই লজ্জা আর লাঞ্ছনা আমি আর সইতে পারছি না।'

'হ্যাঁ মা, আমি কাল ওঁকে বলে এসেছি তোর কথা। সন্ধের দিকে ফাঁকা থাকবেন বলে দিয়েছেন।' বললেন মালতীর মা। মেয়ের যা সমস্যা তা মায়েরও। পাত্র-মিত্রের সমস্যা।

পরমানিক মানে শ্রেষ্ঠ মাণিক্য, দুই-

মানী যেমন গুণীময়, সেই কথাই সন্ন্যাসী সাদরে বোঝাচ্ছিলেন এক প্রৌঢ়াকে, হঠাৎ মালতীর ছায়া পড়ল।

'কে?' প্রেমানন্দ চমকে উঠলেন।

'আমি—আমি মালতী।' দৃঢ় দীপ্ত কণ্ঠস্বর।

অসহিষ্ণু হস্তাড়নায় প্রৌঢ়াকে সন্ন্যাসী বিতাড়িত করে দিলেন। দীর্ঘ আর্দ্র চোখে তিনি দেখলেন কতক্ষণ মালতীকে। দেখলেন জবরদার মেয়ে, রসে ভিজে জব-জব করছে না এতটুকুও। কাঠ কাঠ কাঠ-কাঠ। ভঙ্গিটা এমন, যেন প্রতিজ্ঞার জ্যা টেনে আছে।

'তার নাম কি মালতী?' লোল চোখে তাকালেন প্রেমানন্দ। বলেই গদগদ হয়ে কবিতা আওড়ে নিলেন: 'বকুলি পিউলি মালতি জাতি, কুন্দ, কুরুবক রঙ্গন ভাতি। বোস মা, বোস।'

মালতী পান্তাভাতের জল হয়ে গেল নিমেষে। বাবাজী বসেছিলেন চটের হেলা চেয়ারে মালতী তাঁর পায়ের কাছে মাটিতে বসে পড়ল। যেন বিগলিত নিবেদনের ভঙ্গিতে। প্রেমানন্দের পিছনের দেয়ালে ব্র্যাকেটে আলো জ্বলছে, বিস্তীর্ণ একটা ছায়া পড়ল মালতীর শরীরে। সেই ছায়ায় তাকে এখন কেমন যেন বিষণ্ণ ও বিশীর্ণ মনে হল

'আর, বাবার নাম কি?'

মালতী মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল।

'বাবাকে চেন না তুমি? আমার বাবা-জীবনকে? না, তার নামটা বলতে তোমার লজ্জা হচ্ছে?'

আহা যা না নাম. বলতে মুখে থুতু আসবে একগাদা। গদাই লস্কর নাম না হয়ে নাম হয়েছে লালগোপাল। সংক্ষেপে সবাই

যাকে বলে, লালু।' মালতী চিড়বিড় করে উঠল।

'অর্থাৎ যার মুখ দিয়ে খুব লাল পড়ে। সে তো খুব ভালো কথা, না! তবে আর ভয় কি, আসবে সে লালপোশ খাশবরদার।' প্রেমানন্দ চোখ বুজে চিন্ময় হয়ে বললেন।

'কিন্তু এখন সে নীল হয়ে গেছে। রাগে নীল হয়ে গেছে।'

'যা রাগ তাই অনুরাগ।' মৃদু-গম্ভীর হাসলেন সন্নেসী।

'কিন্তু যা আপনার অনুমান, হনুমান ঠিক তাই নন। ও আমার সঙ্গে আজকাল কথা কয় না, দেখা করে না, দৈবাৎ দেখা হয়ে গেলেও মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। আর ভুলেও যদি কখনো চোখোচোখি হয়, মনে হয় চোখে যেন তুরপুন চালাচ্ছে। কেন এমন হল বলতে পারেন, বাবাজী?'

প্রেমানন্দ ধ্যানে বসলেন।

'কেমন সুন্দর ছিলাম দু টিতে। রাতের জোয়ার ঠেলে চলে আসছিলাম দিনের মোহানায়, সুদিনের মোহানায়। যে জানলার পাল্লা ধরে নাড়লে ও ছুটে আসত সিঁড়িতে, সে জানলার কপাটে মাথা খুঁড়লেও ওর আর জানলা খোলে না। কেন হঠাৎ ও এমনি বিগড়ে গেল, বলতে পারেন, সন্নেসী ঠাকুর?'

চোখ খুলে স্বামীজী বললেন, 'তুই তো জানিস, বেটি। তুই-ই বল।'

যেন অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে পেয়েছেন। মালতী শিউরে উঠল। বললে, 'সে তো সামান্য কথা। আমি ওকে গাধা বলেছিলাম। যে সারা জীবন গাধাবোট হয়ে থাকবে, তাকে গাধা বললে যে কী দোষ হয় তা জানি না। তা গাধা পিটে ঘোড়াও তো করা যেতে পারত।'

'ভেবে দ্যাখ্। আর কিছু বলিস নি?'

তবু মালতী জিব কাটল না। বললে, 'বলেছিলাম। বদ্ বলেছিলাম।'

'ঐ হসন্তটাই সর্বনাশ করেছে। হসন্ত না থাকলে কি হত আজ? 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' হত। কিংবা 'নিরখি নিরখি বদন ইন্দু, পুলকে উথলে প্রেমসিন্ধু' হত। হসন্ত লাগাতে গিয়ে যিনি আসলে সুবদনা, তিনি ভালো একটি বদনা হয়ে দাঁড়ালেন।'

'কিন্তু আমাকে কথাটা ও শেষ করতে দিল কই? আমি বলতে চেয়েছিলাম সে বদমেজাজ, নিশ্চয়ই তার এখন বদ-হজম হচ্ছে। নইলে, চারদিকে যখন বদনাম, তখন কি কেউ বদ্ধ বোকার মত বদরাগী হয়? আপনি দেখুন তো দেখি চোখ বুজে, ওকে কোথাও দেখতে পান কি না আদাড়ে-পাদাড়ে?'

প্রেমানন্দ আবার চোখ বুজলেন।

'নিশ্চয়ই ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে ও। নইলে হঠাৎ ওর হাল চাল অমন বদলে গেল কেন? সে যে কী একটা হুলো বেড়ালের মত মুখ করে আছে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। আমাকে যেন কোনো দিন দেখেনি, নাম শোনেনি আমার, আমি যেন অশরীরী হয়ে গেছি, এমনি ওর ব্যবহার। তোলোহাঁড়ির মত এ মুখের মানে কি? আপনি দেখুন, পাতালের দিকে তাকিয়ে, নিশ্চয়ই ও ডুবেছে।'

'ডুব দে রে মন কালী বলে, হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।' প্রেমানন্দ গান গেয়ে উঠলেন।

'কিন্তু আমি কি কালী?' মালতী বিজলীর আলোতে তার ফিটফিটে ফর্সা একখানা হাত প্রসারিত করে ধরল।

'কালী নস বলেই তো কালাচাঁদকে পাচ্ছিস না। একবার কালী হ, ভদ্রকালী নয়, গুহ্যকালী, দেখবি তোর সেই কালিয়া ফিরে এসে তোর হাতে ফের আদরের কালিয়া-কাবাব খাবে।' প্রেমানন্দ এক টিপ নস্য নিলেন।

'সত্যি?' মালতী মহারাজের পা জড়িয়ে ধরল।

'নিশ্চয়। তোর চিকণকালাকে আমি ফিরিয়ে আনব।'

'একটু শিগ্‌গির-শিগ্‌গির ফিরিয়ে আনুন মহারাজ। আপনি জানেন না, কী রেট ওর দাড়ি বেড়ে যাচ্ছে আর ক'ভাঁজ কালচে মেরে গেছে ও এরি মধ্যে।'

'গরবে যে তোর পা ধরে না, বেটি। বলি, সাধন করতে হবে না?'

'সাধনের আর বাকি কি, সাধু? আমি কি এণ্টিম ফিরিঙ্গি যে সাধন ভজন জানি না বলে ভড়ং করব? কত চোখোচোখি, ডাকাডাকি, লেখালেখি, মাথামাখির সাধন হয়ে গেল, এখনো সিদ্ধি মিলবে না? এর পরে আরো সাধাসাধনা করতে হবে?' মালতী হাঁপাতে লাগল।

'তেরো নদীই শুধু পেরিয়ে এসেছিস, এখনো সাত সমুদ্র বাকি। লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, ক্ষীর, জল—এই সাত সমুদ্র। এখনতো শুধু লবণে নেমেছিস। তারপর যখন ইক্ষু থেকে সুরায় আসবি—'

'রক্ষে করুন, বাবা! শরীরে আর দিচ্ছে না। দিন রাত সাঁতার কেটে কেটে দম বেরিয়ে পড়েছে। দেখছেন না চেহারা, চিন্তায় চিন্তায় কেমন কালি হয়ে গেছি।' মালতী করুণ করে নিশ্বাস ফেলল।

'উপায় নেই। আগুনে প্রবেশ করলে দগ্ধকাষ্ঠই হতে হবে। কোয়লাকা ময়লা ছুটে যব আগ করে পরবেশ। কিন্তু, তোর ভয় নেই বেটি, এই আগুন আমি নিবিয়ে দিচ্ছি।'

'তাই তো আপনার কাছে আসা।' মালতী আরো কাছে সরে এল। 'ওর অত তেজ আর আমি সইতে পারি না, ওর এই বিজাতীয় বিতৃষ্ণা। আপনি

ইক্ষু-সুরা দধি-ক্ষীর বাদ দিয়ে একেবারে আমাদের জলে নিয়ে আসুন।'

'হ্যাঁ। তাই তোকে ফের সেই আগুনই হতে হবে।'

'আগুন ?'

'হ্যাঁ, উলটো-আগুন। আকাঙ্ক্ষার আগুন নয়। ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। তাই হবিঃমৌবত কৃষ্ণবর্ত্মা হলে চলবে না। তোকে হতে হবে অনাহার আগুন।'

'অধমাকে কৃপা করুন, বাবাজী। কথাগুলি বড্ড শক্ত হয়ে যাচ্ছে।'

'বলি, বাজ চিনিস, বজ্র ?' সন্ন্যেসী ধমকে উঠলেন। 'দেখিসনি কখনো ?'

'শুনলুম এখন।' মালতীর মুখ পাংশু হয়ে গেল।

'হ্যাঁ, অষ্টবজ্র ছিল এত দিন। বিষ্ণুর চক্র, শিবের ত্রিশূল, বরুণের পাশ, ব্রহ্মার অক্ষ, যমের দণ্ড, ইন্দ্রের কুলিশ, কার্তিকের শক্তি, আর কালীর খড়্গ। কিন্তু আজ নববজ্র সৃষ্টি করতে হবে। তুই নবকালী, তোকে আজ আর কিছুতেই নিরস্ত্র থাকলে চলবে না।'

'আমার আবার অস্ত্র কোথায় ?' মালতী ফাঁপরে পড়ল। 'আমি তো আজকালকার মেয়েদের মত নোখগুলিও চোখা করি না।'

'ঘর ঝাঁট দিস তো ? সেই ঝাঁটাই হবে তোর অস্ত্র, তোর অশনি। যমের যেমন দণ্ড, কালীর যেমন খড়্গ, তেমনি তোর ঝাঁটা, মুড়ো ঝাঁটা। ও যদি তোকে একমুখ দাড়ি দেখায়, তুই ওকে খেংরা দেখাবি।'

খেংরার বদলে এক পাটি স্যাণ্ডেল দেখালে চলে কিনা তাই গালে আঙুল ঠেকিয়ে ভাবতে বসল মালতী।

'আয় আয় তু তু বললে যখন আসছে না, তখন যেমন কুকুর তেমনি মুগুর হতে হবে। যেমন আদাড়ে কচু, তেমনি বাগাটে তেঁতুল। যেমন দেবতা তেমনি নৈবেদ্য। শঠে শাঠ্যং, কণ্টকেনেব কণ্টকং, বিষস্য বিষমৌষধং। ও যদি কথা না কয়, তুইও কইবি না। ও যদি তাকায় মাটির দিকে, তুই তাকাবি আকাশের দিকে। ও যদি ঘাড় ফেরায় র‍্যাকিউট র‍্যাঙ্গেলে, তুই অবটিউস র‍্যাঙ্গেলে। ওর মুখ যদি হয় ভাত রান্না করবার হাঁড়ি, তোর মুখ হবে তবে ধান সেদ্ধ করার গামলা।'

'তারপর ?'. মালতী উৎসাহে উথলে উঠল।

'ও যদি কলা দেখায়, তুই কচু দেখাবি। ও যদি নাক কোঁচকায়, তুই তবে মুখ কোঁচকাবি। ও যদি হয় ছুঁচ, তুই হবি চালুনি। যেমন ও হাঁড়ি, তেমনি তুই সরা। কুকুরকে নাই দিলেই মাথায় ওঠে। মার দু'ঘা কষে, দেখবি মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। ঠেকায় পড়ে যেমন তুই বাবাজীকে ডাকছিস, তেমনি ও ও ঠেলার নাম বাবাজী রাখবে।'

'তাতে কী হবে বাবা ?'

'কী হবে! তোর পায়ে এসে পড়বে। গলায় কাঁটা ফুটলে যেমন এসে বেড়ালের পায়ে পড়ে! তখন তুই তার বুকে বসে দাড়ি ওপড়াবি।'

'সত্যি ?'

'যতই হবি নিষ্ঠুর, ততই হবি মোহিনী। আদিরসের সেই আদি কথাই তোরা জানিস না। যোগে যেমন ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না; প্রাণায়ামে যেমন পূরক, কুম্ভক, রেচক; তন্ত্রে যেমন মন্ত্র, যাদু বশীকরণ; রাজনীতিতে যেমন সন্ধি, বিগ্রহ, দ্বৈধ আয়ুর্বেদে যেমন কফ, পিত্ত, বায়ু; প্রেমেও তেমনি তিনগুণ—ধৈর্য, বীর্য, গাম্ভীর্য। কোনো দিন ধার ধারিস তোরা ? ছোট মাথায় আর ছুঁচলো মুখে আছিস যেন ডালকুত্তার মত। শম দম ত্যাগ তিতিক্ষা আছে তোদের কিছু ?'

'এবার নিবৃত্তির পথই নেব, বাবাজি।'

'তা হলে ওঠসার কিস্তিতেই মাত। যত অনুসরণ করবি, ততই অপসরণ ঘটবে, আর যতই সরে যাবি ততই হবি অনুসৃত। কপাটি খেলেছিস ছেলেবেলা ? পিছিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়া গলা ধরে ? এও সেই কপাটি খেলা।'

'খেলব তাই কপাল ঠুকে। ওর ঠিক দাঁত কপাটি লাগিয়ে দেব।'

'তোর জয় তবে অবধারিত।' আশীর্বাদের ভঙ্গিতে সন্ন্যেসী তাকে স্পর্শ করলেন।

দাওয়াই পেয়ে মালতী হাওয়াই জাহাজের মত উড়ে চলল। ব্যারাকে ফিরে এসে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যেতেই লালগোপালের সঙ্গে দেখা। লালগোপাল তার দাড়িওলা হাঁদা মুখটা আরো বোদা করে ঘাড় ফিরিয়ে নেমে গেল আস্তে আস্তে। আর মালতী নিমেষে গলাটা লম্বা, কোমরটা তেরছা ও কনুইটা ঢোলা করে খাঁট খাঁট করে উঠে গেল উপরে। উপরে উঠে এসে তার মনে হল, সন্ন্যেসীর কাছে না গিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলেই ভাল হত। লাল-গোপাল নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছে। পাগল না হলে বোকা পাঁঠার মত এমন কি কেউ চেহারা করে ?

না, সাধনমার্গ থেকে এত সহজেই ভ্রষ্ট হলে চলবে না। কাঠিন্য দিয়ে কঠিনকে দ্রব করতে হবে। তাই মালতী তার জানলার শিকে ক্ষয়খর্ব একটা ঝাঁটা ঝুলিয়ে রাখল, প্রত্যাখ্যানের প্রদীপ্ত প্রতীক। যদি দৈবাৎ সে

"কালী নস বলেই ত কালাচাঁদকে পাচ্ছিস না। একবার কালী হ......"

শিল্পী : চিত্তরঞ্জন ঘোষ

লালবিহারীর নজরে পড়ে, তবে তাকে চমকে দেবার জন্যে সে অতি অদ্ভুত পোষাক পরতে লাগল, কখনো ঘাগরাটা, কখনো বা ওড়না পেশোয়াজে। কিন্তু চোখ একটুও আড় ফিরল না। হতভাগা একবার তাকে দেখল কিনা। সমস্তটা ভঙ্গি, গোটা অস্তিত্বটাই সে বিতৃষ্ণ-নিস্পৃহায় হবার দিকে বসে বসে সাদা করে ফেলল। নাম শুনলে, যেন আগে কোথাও শুনেছে বলেও মৃদু দোলা লাগে না কৌতূহলে। সমস্তটাই বিস্মৃতি ও শূন্যতার অগাধ খিচুড়ি যদি সিঁড়িতে কখনও দেখা হয়, কেউ কাকে দেখেছে বা দেখছে বা একদা দেখতে পারে এমন মনে হয় না।

মালতী অনুভব করল, লালগোপাল সম্বন্ধে সে বাইরে না হলেও মনে মনে খুব সজ্ঞান ও সচেতন আছে। এটা অভিপ্রেত নয়। হাত বাড়িয়ে না খুঁজলেও লালগোপালকেই সে হাতড়াচ্ছে মনের মধ্যে। এখনো সে দুস্তর সমুদ্র পার হতে পারে নি, এখনো নেশার আমেজ আছে তার মেজাজে। তাই সে

(৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

১৩৫০ সালের পৌষমাস। পঞ্চাশ হ'ল শ'য়ের অর্দ্ধেক। শ'য়ে শূন্য; শ'য়ের অর্দ্ধেক পঞ্চাশেও—গাঁয়ের অর্দ্ধেক লোক ঝেড়ে মুছে নিয়ে গেছে, বাকী অর্দ্ধেক যারা আছে, তারাও আধমরা। হিসেব ঠিক আছে। গাঁয়ের প্রবীণেরা এবং বিচক্ষণেরা পাল পাড়ায় কালীঘরের সামনে অশথতলায় বসে তামাক খেতে খেতে সেই কথারই আলোচনা করে। এক ছিলিম তামাকেই গোটা মজলিসের এখন পরিতৃপ্তি হয়, কল্কে আজকাল আর দুটো লাগে না; যে তামাক এক একজনে পুরো এক ছিলিম খেয়েও তৃপ্তি পেতো না, সেই তামাক দু'টান টেনেই লোকে এখন কাশতে সুরু করে, বুকে শ্লেষ্মা ঘড়ঘড় ক'রে ওঠে। এবারের বানের ঠাণ্ডা শ্লেষ্মা হয়ে ম্যালেরিয়াজীর্ণ বুকে বসে আছে গাঁয়ের খিড়কী ডোবার পচা জলে থকথকে দলাশের মত।

সবচেয়ে বয়স বেশী মুকুন্দ পালের। ষাট পঁয়ষট্টি হবে। ভারিক্কী লোক। কালো কষকষে রঙ পালের, এককালে জোয়ানও ছিল খুব ভারী, তখন নাকি মাথায় ছিল বাবরী চুলের বাহার। এখন পাল বুড়ো হয়েছে—তারপর এবারকার ম্যালেরিয়ায় বার-কয়েকই ধোপার পাটায় পুরনো কাপড়ের মত আছাড় খেয়ে এতবড় দেহখানা তার 'জ্যাল-জ্যাল' করছে। মাথার চুলগুলি একেবারে কদমফুলি ছাঁটে ছাঁটা, এখন পেকে সাদা ধপধপ করছে; পাল প্রায়ই এখন মাথায় হাত বুলোয়, খুঁটিয়ে ছাঁটা চুলগুলির কড়া ডগার উজানের টানে হাতের তালুতে বেশ সুড়সুড়ি লাগে।

পাল হুঁকোটা ঘোষের হাতে দিয়ে বলে, একবারে যদি কেউ পুরো এক ছিলিম তামাক খেতে পারে ঘোষ;—বলেই সে কাশতে আরম্ভ করে, কেশে—কাশীর ধমক সামলে কথাটা শেষ করে—তবে আর বুকে মালিশ লাগে না। বেবাক শ্লেষ্মা, বুঝেছ—আবার একধমক কাশি আসে, এবার মোটা একচাকা শ্লেষ্মাও উঠে যায়, পাল আরাম পায়। ঘোষ তখন কাশতে সুরু করেছে। তারপর আরম্ভ হয় শ'য়ের অর্দ্ধেক পঞ্চাশের আলোচনা। হিসেব নিকেশ ঠিক আছে। "চিত্রগুপ্তের কলম! ভুল কি হয়?"

ঘোষ কয়েকবার ঘাড় নেড়ে বললে—তা হয়। মুনি ঋষিদেরই মতি বেভ্রম হয়, তা চিত্রগুপ্ত। হাজার হলেও চিত্রগুপ্ত তো বামুন নয়, 'কায়েস্ত'। এবারেই ভুল হয়েছে।

সকলে আশ্চর্য্য হয়ে যায়। কি ভুল হ'ল? এ ওর মুখের দিকে তাকায়।

নদীর ধার পর্য্যন্ত খোলা পুব দিকের পানে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে ঘোষ বলে—হান!

পুব দিকে নদীর ধার পর্য্যন্ত গাঁয়ের মাঠ—তিন ভাগে ভাগ করা, 'ষাঁড়া জোল', 'মাঝের জোল', 'বেনো কুল'। নামেই তিন ভাগে ভাগ করা, নইলে মাঠ একটাই। গ্রামের কোল থেকে নদীর ধার পর্য্যন্ত—সুবিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্র। গোটা মাঠখানি এবার ধানে থৈ থৈ করছে, সোনার বরণ রঙ ধরে এসেছে,

পালিশ করা সোনার পাতের মত নয়, আগুনে পোড়ানো খসখসে সোনার পাতের মত মনে হচ্ছে, সকালের রৌদ্রের আভায় শীষের ভারে হেলে শুয়ে পড়েছে—তবুও ক্ষেতে মানুষ নামলে হাঁটুর ওপরেও আধহাত পর্যান্ত ডুবে যায়। গাঁয়ের মেয়েরা বলে—এবার পুজোয় মা-দুর্গার সঙ্গে লক্ষ্মীদেবী এসে আর ফিরে যান-নি মায়ের সঙ্গে। পুজোর মণ্ডপ থেকে মাঠে এসেছিলেন খেলতে; মাঠের পথ ধরে যাচ্ছিল হাড় পাজরা সার ছেলে-মেয়ে-বুড়ো-যুবার দল—ধুঁকতে ধুঁকতে দক্ষিণ মুখে। তাদের ওই দশা দেখে শিউরে উঠে লক্ষ্মী ঠাকরুণ জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁ-গো বাছা, তোমাদের এমন দশা কেন? চোখে তাঁর জল এল। মানুষেরা বললে—অন্ন বিনে ছন্নছাড়া মা, মা লক্ষ্মী আমাদের ছেড়েছেন, তাই এই দশা। না খেয়ে আর পারছি না। তাই চলেছি দক্ষিণ মুখে। ওই দিকে নাকি যমের বাড়ী। যমের বাড়ীতে কি আছে, কি নাই তা জানি না, তবে সেখানে নাকি খিদে পায় না; তাই চলেছি।

মা লক্ষ্মী করুণায় বিভোর হয়ে মাঠের বুকেই এলিয়ে পড়লেন। তাই এবার এত ধান। একটি অপুষ্ট থাকে নি, দলমলে শক্ত-সমর্থ ভাগ্যমানী সধবার দশমাস দশদিনের

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রাঙা খোকার মত প্রতিটি ধান পুষ্টালো, এক-একটি যেন নিটোল সোনার দানা।

সবই সত্য। এবারের মত ধান অনেক কয় বৎসর হয় নাই। কিন্তু এবার ওইটাই হয়েছে সবচেয়ে বড় ভাবনার কথা। বাড়ীর দোরে মাঠের মধ্যে রাজরাণী। কিন্তু সে রাজরাণীকে চৌদোলে চাপিয়ে শাঁখ ঘণ্টা বাজিয়ে জলধারা দিয়ে ঘরে তুলবে কে? অর্দ্ধেক মানুষ মরে গেছে, বাকী অর্দ্ধেক আধমরা, গরুও তাই, হাড়-পাঁজরা সার গরু যে ক'টা আছে, তার জন্যেও মোটা মোটা নোটের গোছা বেঁধে ফিরছে পাইকারের দল; তারা নাকি এক টাকা সের দরে গরু ওজন ক'রে দাম দিচ্ছে। যুদ্ধের বাজার, লাখে লাখে পল্টন এসে জমেছে, তারাই খাচ্ছে। মানুষ নাই, গরু নাই—এ ধান কাটবে কে? তুলবে কে? অশথ-তলার মজলিসে এখন ওই কথাটাই একমাত্র কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তামাক টানতে টানতে কাশির সঙ্গে প্রসঙ্গ ওঠে ম্যালেরিয়ার কথা, তার ফাঁকে আসে পঞ্চাশের হিসেবের কথা, পঞ্চাশের হিসেবের ভুলে এবারে এত ধান—সেই ধানের কথায় এই কথাটা এসে পড়ে। এই কথাটাই এখন লোকের জীবন-

কাঠি, মরণকাঠি—এবারের ধান ঘরে উঠলে জীবন থাকবে, নইলে মরণ, অবধারিত মরণ, তাতে আর কারও কোন সন্দেহ নাই। অয়সায় মধ্যে বাগ্দী-কাহার মুচিরা যারা ঘর ছেড়ে পালিয়েছে তারা যদি ফিরে আসে। আর যদি আসে দুমকা হতে সাঁওতালের দল।

গাঁয়ের বাগ্দী কাহার মুচি এদের যারা দিনমজুরী খাটে, চাষ করে না, তারা প্রতি বছরই বর্ষার সময় গাঁ ছেড়ে চলে যায়। বিশেষ করে অজন্মা আকাড়া হলে সেবার দল বেঁধে চলে যায়—অজন্মা না হ'লেও দু'ঘর একঘর যায়—আবার ফেরে এই ধান কাটার সময়। কেউ কেউ সেই বছরই ফেরে, কেউ কেউ ফেরে পাঁচ বছর পর—কেউ বা ফেরে একপুরুষ পর। দল বেঁধে ফেরে ফেরে এমনি যারা বাহান্ন পঁচাত্তর'র বছর, ধানে ধানে জয়লাপের পেষে। ওরা এমনি যারা সুখের পায়রা চিরকাল—দুখের ঘরে থাকা ওদের স্বভাবের বাইরে। সকল সুখের মূল যখন লক্ষী—তখন এবার ওরা আসবে এই ভরসা নিয়ে খানিকটা শান্তি পায় পাল মশায়েরা। সকালে বিকালে ঠুক ঠুক করে যায় ওদের পরিত্যক্ত পাড়াটার দিকে। পড়ো ভাঙা বাড়ীগুলো খোঁজ করে পাড়ার বাইরে বট বাগানের বটগাছগুলার তলার দিকে চায়। এখানে খোঁজ করে—নতুন আগন্তুক কেউ এল কি না। এ গ্রাম থেকে পালিয়ে যেমন এখানকার ওরা অন্য গ্রামে যায়, তেমনি অন্য গ্রামের তারাও তো এ গ্রামে আসতে পারে। তেমন যারা আসে, তারা প্রথম বাসা পত্তন করে এই বট বাগানে কোন গাছের তলায়। কিন্তু কেউ আসেনি আজও পর্যন্ত। পাল মশায়দের উৎকণ্ঠার সীমা নাই। থৈ থৈ করা মাঠভরা ধান, এ তারা তুলবে কি করে? রাত্রে ঘুম পর্যন্ত হয় না।

* * *

তবুও মাঠে ধান কাটা চলছে। রুগ্ন দুর্বল শরীর নিয়েও মানুষ ভোরবেলায় কাঁথা গায়ে দিয়ে কাস্তে হাতে মাঠে যায়। মাথায় গামছা বাঁধে কন্ফার্টারের মত। নাক দিয়ে টপ টপ করে জল ঝরে, পৌষের ভোরের শীতে হাতের আঙুল বেঁকে যায়, তবুও সেই আড়ষ্ট হাতের মুঠোয়—কোনমতে ধানের ঝাড়ের গোড়া মুঠোয় কাস্তে টানে।

মুকুন্দ পালের কৃষাণ কাল থেকে জ্বরে পড়েছে। পালকে আজ নিজেই আসতে হয়েছে মাঠে। কিন্তু কাস্তে যেন চলছে না। হেঁট হয়ে কাস্তে টানতে কোমরে টান ধরে অসহ্য বেদনায় টন টন করে উঠছে। যেন কোমরের দড়ির মত শিরাগুলো কাঠির মত শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেছে; হাড়ের গাঁটে গাঁটে জমে গেছে বালিতে মাটিতে জমাট-বাঁধা পাথরের চাঁইয়ের মত। পাল কোমরে হাত দু'টি রেখে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। হেঁট হয়ে থাকা যত কঠিন, হেঁট হয়ে কিছুক্ষণ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানও তেমনি কঠিন। শাঁখের করাত যেতেও কাটে, আসতেও কাটে—কোমরের ভেতরে যেন শাঁখের করাত চলছে মনে হচ্ছে।

হায় ভগবান! পাল উঠে দাঁড়িয়ে নিজের কাজটুকুর দিকে চেয়ে দেখে, আপনার মনেই বললে, হায় ভগবান! শুধু আক্ষেপই নয়, নিদারুণ লজ্জায় তার মাথাও হেঁট হয়ে আসছে। আপনার কাছেই মাথা হেঁট হচ্ছে। কতটুকু কেটেছে সে! তাল-পাতায় বোনা চাটাই, লম্বায় পাঁচ হাত চওড়ায় আড়াই হাত, এখানে বলে তালাই; এক 'তালাই'-ভোর জমির ধানও কাটা হয় নি।

হঠাৎ তার চোখ ফেটে জল এল। তার পুরনো কথা মনে পড়ে গেল। ছেলে-বেলায় তার সঙ্গীরা তাকে বলত 'গাঁদা'। যৌবনে মুরুব্বীরা তার নাম দিয়েছিল ভীম। প্রৌঢ়ত্বে লোকে বলত, 'মোটা মোড়ল'—এখনও বলে। মনে পড়ে গেল পুরনো আমলের ধান কাটার কথা। সে সব আজ কাহিনী মনে হচ্ছে। এমন মাঠ থৈ থৈ করা ধান এবারেই নতুন নয়। কতবার হয়েছে। ভোরের আকাশে শুক-তারা তখন জল জল করত, আঁধার ঘরের মাণিকের মত উত্তুরে বাতাস শির-শির করে বয়ে যেত, হাড় কনকনানি ঠাণ্ডা বাতাস। গাছপালার পাতা থেকে গাছতলার শুকনো পাতার উপর সাঁতা সাঁতা টপ টপ শব্দে শিশির ঝরত; ঘাসের উপর পা দিলে গোড়ালী পর্যন্ত ভিজে যেত। পথের ধুলোর উপর পাটালীর মত এক পুরু ধুলো শিশির ভিজে জমে থাকত, পা দিলে ভেঙে যেত। ধানের মাঠে এলে শিশিরে-ভেজা নরম ধানের গাছে সে গন্ধ বেলায় এসে আজ আর পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু সে গন্ধ মনে আছে তার। সেই ভোর থেকে আরম্ভ হ'ত ধান কাটা।

পাল তার হাতখানা মেলে ধরলে চোখের সামনে; এ হাতের গ্রাসে লোকে বলে একপো চালের ভাত ওঠে। একপো কি আর ওঠে? লোকে বাড়িয়ে বলে। তবে তার হাতখানা প্রকাণ্ড। এই হাতের এক মুঠোয় সে খপ খপ করে ধরত ধানের গোড়া আর ডান হাতের কাস্তের একটানে কেটে চলত ঘাস কাটার মত; তার এই মুঠোর তিন মুঠো ধানে বাঁধা ধানের আঁটি অন্য লোকের বাঁধা আঁটির দ্বিগুণ না হোক দেড়া মোটা হ'ত। বেলা এক প্রহর যেতে না যেতে রোদের আঁচে ধানগাছ শুকিয়ে খড়খড়ে হবার আগেই ক্ষেতের এ মাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত শেষ করে ফেলত।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে শক্তি কমে আসারই কথা। তবুও গত বছর পর্যন্ত সে এক পহর বেলা পর্যন্ত আধখানা ক্ষেতের ধানও কেটেছে। কিন্তু এই ক'টা মাসে এ কি হ'ল তার?

—কি কত্তা, ডাঁড়িয়ে রৈছ যে? কি হ'ল?

আপনার ভাবনার মধ্যেই ডুবে গিয়েছিল পাল, তার মন উদাস হয়ে সেকালের সেই আমলে চলে গিয়েছিল, মধ্যে মধ্যে এই জমি-খানাই যেন দেখাচ্ছিল সমস্তটা কাটা হয়ে গেছে, এ-ধার থেকে ও-ধার পর্যন্ত আঁটি আঁটি করে সাজানো রয়েছে কাটা ধান, ক্ষেতের লালচে মাটি দেখা যাচ্ছে—লালচে মাটির ওপর কাটা ধানের গোড়া জেগে রয়েছে লাল রঙের দাবার ছকের ওপর সাদা রঙের ঘুঁটির মত।

পেছন থেকে কে ডেকে কথা বললে। পাল ঘুরে দাঁড়াল। দৃষ্টিও কমে এসেছে। গেল বছর পর্যন্তও পাল বিনা চশমায় চট সেলাই করা সুচে শণের সুতলী থুড়ি পরিয়েছে, বস্তার মুখ সেলাই করেছে। কিন্তু এই বছরের এক ধাক্কাতেই বেলা আঁধার করে দিলে—চারিদিক ঝাপসা। তুলসী-তলায় পিদীম জ্বালার সময় হয়ে এল আর! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাল লোকটির দিকে তাকিয়ে বললে—কে?

—আমি গো। চিনতে পারছ না কি?

পালের এবার খেয়াল হ'ল ছোকরা মানুষের গলা; মুহূর্তে সে চিনতে পারলে ছোকরাকে। মন তার বিষিয়ে উঠল।

—নজর গেল তা' হ'লে কত্তা। আমি গো—চি-কেষ্ট।

—চেকা?

—হাঁ গো। বলি ডাঁরিয়ে রৈছ যে?

—তুই কোথা যাবি? মাঠ থেকে পালিয়ে এলি না কি? জ্বর এল?

—জ্বর? চি-কেষ্ট হি হি করে হাসতে লাগল। জ্বর ফর আমার কাছে ঘেঁসে না। সেই তোমার আশ্বিন মাসে একবার। তার পরে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি।

পালের বুক থেকে একটা নিশ্বাস বেরিয়ে এল—সাপের গরজানির মত—নিশ্বাসের সঙ্গেই সে বললে—হুঁ।

—মদ আর মাস ও হ'ল জ্বরের যম। বুয়েছ? হি হি ক'রে আবার হাসতে লাগল চেকা।

—তা যাবি কোথা—যা না কেন? ক্যাক ক্যাক ক'রে হাসতে বুঝি মজা লাগছে আমার ছামনে ডাঁরিয়ে?

চেকা আবার হাসতে আরম্ভ ক'রে দিলে। বললে—যাচ্ছি তোমার ওই মাঝের জোলে পাঁচকিত্তে তিন বিঘের ছকে। তোমার দরুণ গো। এখান সারা হয়ে গেল।

পাল হঠাৎ হেঁট হয়ে খস খস শব্দে আবার ধান কাটতে আরম্ভ করে দিলে। চেকার কথায় ওই 'পাঁচ কিত্তে তিন বিঘে তোমার দরুণ' কথাটা তপ্ত লোহার শলার মত পালের বুকে যেন বিঁধে গিয়েছে। ওই জমিটা চেকা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ—পালের কাছ থেকে কিনেছে এই বৎসরই বর্ষার ঠিক আগে। ধানের দর আঠারো টাকা—চাল তিরিশ, পালকে বাধ্য হয়ে বেচতে হয়েছে। চেকা বোধ হয় খোঁচা মারবার জন্যেই কথাটা বলেছে। খোঁচাটা লেগেছেও পালের বুকে।

চেকা তবু গেল না। দাঁড়িয়ে হাসিতে লাগল। বললে—সেই সকাল থেকে এই এক তালাই কাটলে না কি?

পাল একথারও কোন উত্তর দিলে না। সে ধান কেটেই চলল। চেকার এ কথার মধ্যেও হুল আছে।

—কত্তা !

পালের কোমর আবার কনকন্ করে উঠেছে; মনের জ্বালার ওপর শরীরের যন্ত্রণায় পাল এবার আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না। সে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াল দেহের উপর একটা হ্যাঁচকা টান মেরে, মট্ করে শব্দ হল হাড়ে। পাল রাগে অধীর হয়ে বলে উঠল—কেনে রে শালা, কেনে? কি, বল্‌ছিস কি?

চেকার হাসি বেড়ে গেল—সে চটপট শব্দে বারকয়েক বাই ঠুকে বললে, হবে না কি—একহাত হবে নাকি এই ধানের গদির ওপর?

বলেই সে আর দাঁড়াল না, নিতান্ত অকস্মাৎ উচ্চকণ্ঠে একটা গান ধরে সে চলে গেল। পাল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কোমরে হাত দিয়ে। চোখ দিয়ে এবার তার জল গড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করলে।

মুকুন্দ পাল এককালের ভীম—প্রৌঢ় বয়সের মোটা মোড়ল—তাকে ঠাট্টা ক'রে গেল ওই শ্রীকৃষ্ণ—চেকা। সম্বন্ধে সে অবশ্য মুকুন্দের নাতি—সম্বন্ধটা ঠাট্টারই বটে; কিন্তু এ ঠাট্টা মুকুন্দের পক্ষে মর্মান্তিক।

শ্রীকৃষ্ণ এখন গ্রামের মধ্যে সকলের চেয়ে অবস্থাপন্ন চাষী। উঠোনে গোলায় গোলায় ধান আছে—ঘরে টাকা আছে। মহামহিম শ্রীশ্রীকৃষ্ণ পাল বরাবরেষু বয়ানে লেখা এ গাঁয়ের লোকের সই করা খত আছে ওর ঘরে। 'পাঁচ কিত্তে তিন বিঘের চক' বলে সেই কথাটা চেকা ঠাট্টা ক'রে বলে গেল। ওতে পাল ব্যথা পেয়েছে, দুঃখ পেয়েছে; কিন্তু ওর ওপর হাত নাই। ও দুঃখ মনে মনেই চেপে রেখেছে মুকুন্দ। কিন্তু ও যে ওই বাই ঠুকে বলে গেল 'হবে নাকি এক হাত?' ওর অর্থ হ'ল মুকুন্দের শরীরের এই অবস্থা দেখে সে তার সঙ্গে একদফা কুস্তী লড়তে চেয়ে গেল।

এ কালের ছোকরাদের মধ্যে চেকাই হ'ল সকলের চেয়ে বড় জোয়ান। পালের মুখে বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল। মনে পড়ল বছর আষ্টেক আগে 'আন্‌তি'র লড়াইয়ের আখড়ায় যখন শ্রীকৃষ্ণ সকলকে আছাড় দিয়ে আখড়ায় মাটির উপর বাই ঠুকে পড়েছিল, তখন হাসতে হাসতে মুকুন্দ গিয়ে বলেছিল—কই আয় দেখি, আমার সঙ্গে আয় একহাত।

অন্ত পাঁচজনে বিশেষ ক'রে 'যগন্দ' (যোগেন্দ্র) ঘোষ তার হাত ধরে টেনে বলেছিল—ছি ছি ছি। তোমাকে নাকি লড়তে হয় ওই বালকের সঙ্গে। ছি!

শঙ্কিত হয়ে বারণ করেছিল সবাই, পালের শরীরের যা ওজন, তাতে সে যদি চেকার উপর কোনমতে চেপে পড়ে, তা হ'লেই ছোঁড়াটা ঘায়েল হয়ে যাবে। শঙ্কিত হয় নাই শুধু শ্রীকেষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, এ-ই হট্ যাও সব—লড়ব আমি। চেকার স্পর্দ্ধা চিরকালের। পাঁয়তাড়ায় ঘুরতে ঘুরতে আবার সে বলেছিল—মোটাকে সাথ আঁটা লড়েগা—হট্ যাও। পালের দেহখানা প্রকাণ্ড বলে এবং লোকে তাকে মোটা মোড়ল বলে ব'লে সেই দলের সামনেই সে নিজের নামকরণ করেছিল 'আঁটা' অর্থাৎ আঁটসাঁট দেহ তরুণ। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সে গরম জল হয়ে গিয়েছিল। মুকুন্দ তাকে পাঁজাকোলা ক'রে কোলে তুলে ধরে গোটা আখড়াটার চারিধার ঘুরে আখড়ার উপর ফেলে দিয়েছিল। বেশ একটু জোরেই ফেলে দিয়েছিল।

তাই আজ চেকা মোড়ল তাকে ঠাট্টা ক'রে গেল। বাই ঠুকে আস্ফালন ক'রে লড়াই করবার জন্যে প্রায় হাঁক মেরে ডাক দিয়ে গেল।

হায় ভগবান! কি কাল জ্বর তুমি দুনিয়ায় পাঠালে! রক্ত জল করে দিলে—মাংস সব যেন চিবিয়ে চিবিয়ে লোল করে দিলে, হাড়ে পর্য্যন্ত ঘুণ ধরিয়ে দিলে। চোখের দৃষ্টি গেল। উঠে দাঁড়ালে মাথা ঘোরে। দু পা জোরে হাঁটলে হাঁপাতে হয়। নইলে সেতো বুড়ো নয়। ষাট বছর বয়স কি এমন বয়স? তার বাপ পঁয়ষট্টি বছর বয়সে পাঁচসেরি কোদাল চালিয়েছে জোয়ান কৃষাণের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে। সে নিজে? নিজেই তো সে এই বর্ষাতেও কোদাল চালিয়েছে, লাঙলের মুঠো ধরেছে। হঠাৎ একি হল? হায় ভগবান! বুড়ো করে দিলে?!

—কি? চলছে না হাত? দাঁড়িয়ে আছো?

—কে?

—আমি। সকরুণ কণ্ঠে বললে 'যগন্দ' ঘোষ—আমিও পারলাম না। ফিরে এলাম।

—যগন্দ! এ কি হল ভাই যগন্দ?

যগন্দ বললে—লা এসে ঘাটে লেগেছে। আর দেরী নাই। যগন্দর গলা কাঁপছে স্পষ্ট বুঝতে পারলে মুকুন্দ। সঙ্গে সঙ্গে তারও চোয়ালের নীচের সমস্ত মাংসটা থর থর করে কাঁপতে লাগল।

যগন্দ এগিয়ে এসে বললে—তামাক খাও।

আলের উপর দু'জনে বসল। মুকুন্দের হাতে হুঁকো ধরাই রইল। সে যেন বড় ভাবছে।

যগন্দ তাকে হুঁকোর কথা মনে পড়িয়ে দিলে—খাও।

—হু। হুঁকোয় সে শুধু মুখই দিলে, টানলে না। তারপর হঠাৎ বললে—লায়ে পার হতে তো ভয় নাই যগন্দ, হরি বলে না পেয়ে লায়ে চড়তে পারতাম তবে তো! কিন্তু এ কি পাপের ভোগ বল তো? হাঁ—হে, তিন চার মাসে কটা জ্বরে এ কি হল বল তো?

—বুড়ো হয়ে গেলাম ভাই।

মুকুন্দ অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—চেকা আমাকে বাই ঠুকে বলে গেল, যগন্দ, এক হাত হবে নাকি? আমাকে ঠাট্টা করে গেল?

রোদ উঠেছে। শীত কেটে এসেছে। হাত পা কোমরের আড়ষ্ট ভাবটা কেটে গিয়েছে অনেকটা। হঠাৎ মুকুন্দ গায়ের র‍্যাপারখানা খুলে ফেললে।

যগন্দ বললে, করছ কি? ঠাণ্ডা লাগবে।

—উহুঁ। আমার আর সহ্য হচ্ছে না। গা ঘামছে। দেখ তুমি।

যগন্দের কিন্তু ততখানি উৎসাহ হল না। সে বললে, মাঠে বসে আর কি করবে? চল বাড়ী যাই।

তুমি যাও যগন্দ। আমার ভাই দুই-খানা না সারলে চলবে না। কৃষেণ ছোঁড়ার জ্বর।

যগন্দ অবাক হয়ে গেল। বললে, সকাল থেকে তো দেখলে—আবারও সাধ হচ্ছে তোমার?

—যাও—যাও হে—তুমি যাও।

মুকুন্দ আবার নেমে পড়ল মাঠে। যগন্দ চলে গেল। রোদ্রে তাপ এসেছে—বেদনা-ভরা সর্ব্বাঙ্গে যেন মিঠা মিঠা সেক লাগছে। আরাম পাচ্ছে মুকুন্দ। আ-হা-হা হে দেবতা, তোমার মত এমন মহিমা আর কারুর নাই! তোমার রোদে পাংশুটে ধান গাছে সবুজ রঙ ধরে, তোমার যত রোদ তত জল, তোমার তাপে আড়ষ্ট দেহে জোর ফিরে আসছে, গাঁঠে গাঁঠে বুড়ো বয়সের পুরু চর্ব্বি গলছে। মুকুন্দ হাত দুটো উপরে তুলে বার কয়েক ভাঁজলে, কজী থেকে হাতের মুঠোটা ভাঁজলে, বার কয়েক বসলো-উঠলো। কিন্তু হাঁপ ধরেছে। ধরুক। তবু তার মনে হল সে যেন অনেকখানি সক্ষমতা ফিরে পেয়েছে। হাঁ অনেকখানি।

হেঁট হয়ে সে আবার ধানের গোড়া মুঠোয় চেপে ধরলে। কাস্তে চলতে আরম্ভ করল।

* * *

—ওরে বাসরে! এ যে ভীমের মত ধান কাটতে লাগছে। বছর বাইশের একটি মেয়ে—এক হাতে জলখাবার অন্য হাতে জলের ঘটি নিয়ে এসে দাঁড়াল। মুকুন্দ ধান কেটে চলেছিলো প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে। কিন্তু তাতে ধান কাটার চেয়ে তার দেহ-পানাই যেন বেশী চলছিল। জোরা কল চলে—তাতে যেমন কাজের চেয়ে কতটা ঝাঁকুনি খেয়ে নড়ে বেশী—শব্দ হয় জোর, তেমনিধারা ধান কাটার বেগের চেয়ে মুকুন্দের মনের আবেগটা শরীরে প্রকাশ পাচ্ছিল বেশী। সে কিন্তু মুকুন্দ বুঝতে পারছিল না। সে কাজ ক'রেই চলেছিল। হঠাৎ মেয়ের গলায় ঐ কথাটা শুনে, সে সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে হা হা করে হেসে উঠল। সমস্ত মাঠখানায় ওই নদীর ধার পর্য্যন্ত তবকে তবকে যেন সে হাসির প্রতিধ্বনি বিছিয়ে গেল। মোটা গলায় সে ছড়া কাটলে—

"সিঁদুর-মুখী ধানে ধানে
ভরিবে গোলা
আমার সোনামুখীর হবে
সোনার কাঁটির মালা।"

—ওই তোমার হ'ল কি আজ বুড়ো বয়সে? মেয়েটি বললে। সে সত্যিই বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল।

মুকুন্দ চমকে উঠল। মুহূর্ত্তে তার হাসি থেমে গেল। মুখখানা হয়ে গেল পাথরের মত। তার অকস্মাৎ ভুল হয়ে গিয়েছিল। বহুকাল আগে তখন তার বয়স ত্রিশ। উনত্রিশ বছর বয়সে তার তৃতীয়পক্ষের স্ত্রী মারা যায়। একুশ বছরে গিয়েছিল প্রথম স্ত্রী, পঁচিশ বছরে দ্বিতীয়জনা একটি দু'বছরের মেয়ে রেখে গিয়েছিল ; উনত্রিশ বছর বয়সে তৃতীয়জনা। লোকে বলত, মুকুন্দ পাল অজগর পুরুষ ; বিয়ে হলেই নির্ঘাৎ খাবে। মুকুন্দও এটা বিশ্বাস করেছিল। গণৎকারেও তাই বলেছিল—রাক্ষসগণ, পত্নী স্থানে শনি মঙ্গল রাহু ; শিবের সাধ্যি নাই তোমার পরিবার রক্ষা করতে। মুকুন্দ নিজের হাতের তালুর কড়ে আঙুলটার নীচে স্পষ্ট দেখেছে অসংখ্য কাটাকুটির দাগ। তাই সে আর বিয়ে না করে ঘরে এনেছিল পাশের গ্রাম চণ্ডীপুরের বাবুদের বাড়ীর একটি বিধবা তরুণী ঝিকে। ব্রাহ্মণবাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করত—জলচল জাতের মেয়ে তাতে ভুল নাই, তবুও 'অধিকন্তু নো দোষায়'—মুকুন্দ তাকে বৈরাগীদের আখড়ায় কণ্ঠী পরিয়ে বৈষ্ণবী ক'রে পেড়ে সাড়ী হাতে চুড়ি পরিয়ে ঘরে এনেছিল। ত্রিশ বছর আগে এমনি করে সে আসত তার জলখাবার নিয়ে। তেরশো বিশ সালও ছিল একটা সুখের বছর, সেবারও হয়েছিল এমনি ধান, এমনি ধান। হয় নি শুধু চালের মণ তিরিশ টাকা আর হয় নি এমন কাল জ্বর। সেবার সে ধান কাটছিল মাঠে। সে এসে বলেছিল ঠিক ওই কথাটি, ঠিক ওই কটি কথা। মুকুন্দ এমনি করে হেসেছিল আর ওই ছড়াটি কেটেছিল। আজও সেই রকম মাঠভরা ধান। আজও সে যেন ঠিক তেমনি হুস হুস করে ধান কেটে চলেছে—এমন সময় তেমনিভাবে এসে দাঁড়িয়ে সেই কথা কয়টি বলায় মুকুন্দের ভুল হয়ে গেছে। বৈষ্ণবীও অনেককাল আগে মরে গেছে। মুকুন্দ বলে গত হয়েছে।

এ মেয়েটি মুকুন্দের নাতনী। মেয়ের মেয়ে। সম্বন্ধ ঠাট্টার। কিন্তু মুকুন্দ কখনও ঠাট্টা করে না। একটি ছেলে কোলে নিয়ে মেয়েটি পনেরো বছরে বিধবা হয়েছে। মেয়ে বিধবা হয়েছিল ওই মেয়েকে কোলে নিয়ে। মুকুন্দ জীবনে দু'টি শিশুকে কোলে ক'রে মানুষ করেছে—প্রথম তার নিজের মেয়ে, তারপর এই নাতনীকে। নাতনীর ছেলেকে সে কোলে করে না। না, কাজ নাই।

(দুই)

মুকুন্দ বাড়ী এসে বসে হাঁপাচ্ছিল। কিন্তু তাতে তার মেজাজ খারাপ হয় নি। শরীর এলে মেরে গিয়েছে, কিন্তু তাতে কোন অসুখ বোধ করছে না। কাজ সে অনেকটা করেছে, অনেকটা। সে খুসী হয়েছে। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে সে—সে বুড়ো হয় নাই। আসল দরকার ওষুদ আর খাওয়া-দাওয়ার, আর দরকার কাজের অভ্যাসের।

মেয়ে লক্ষ্মী এসে বাপকে দেখে কিন্তু শিউরে উঠল—বললে—বাবা ! তোমার কি শরীলের ওপর এতটুকুন মায়া মমতা নাই ? মুখের চেহারা কি হয়েছে দেখ দেখি ? সরস্বতী বলছিল—

—কি বলছিল সরস্বতী ?

লক্ষ্মীর মেয়ে সরস্বতী পাল মশায়ের সেই নাতনীটি। লক্ষ্মী বললে, বলছিল কত্তাদাদা ধান কাটছে, বাবারে বাবা, একটা জোয়ানের সাধ্যি নাই এমন হাঁই হাঁই করে কাটতে।

পাল হা হা করে হেসে উঠল। মাঠে আজ যে হাসি হেসেছিল, সে হাসি সে জোয়ান বয়সে হাসত ; যে হাসি সে সরস্বতী বিধবা হবার পর আজকের আগে আর হাসেনি, সেই হাসি। হাসির আওয়াজের ধাক্কায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা কাঁসার বড় থোরাটায় মৃদু প্রতিধ্বনির রেশ বেজে উঠল।

লক্ষ্মী চমকে উঠল। বাবার হ'ল কি ?

—তোর বেটী বলে কি লক্ষ্মী, আমাকে বলে বুড়ো ! তাই। সে আবার হা-হা করে হেসে উঠে বললে—তাই তোর বেটীকে শুনিয়ে দিলাম সেই ছড়াটা, যে ছড়া বলতাম তোর মাকে।

লক্ষ্মী হাসলে।

পাল বললে—জানিস মা, এবার ধান যা' হয়েছে ! আ হা-হা। ধান নয় মা, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। এবার খামারে বোধ হয় ধান বাঁধতে জায়গাই হবে না। তা-ছাড়া গরু দুটোর যা হাল হয়ে আছে, তাতে—।

পাল অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ল।

—কেলের জন্যে ভাবি না। ও আমার ঠিক আছে। ও আমার ক্ষণজন্মা। ভাবনা বাছুরটার জন্যে। হাজার হলেও কাঁচা হাড়।

কেলে পাল মশায়ের প্রিয়তম ছেলে বলদ। একেবারে শৈশব থেকে তাকে পাল পালন করেছে। এখন বুড়ো হয়েছে, কিন্তু ভরা বয়সে কেলে ছিল এখানকার বিখ্যাত ছেলে। পাল একা নয়, এখানকার সকল চাষীতেই একবাক্যে বলে, কেলে ক্ষণজন্মা গরু। একা কেলের সঙ্গে কাঁধ দিয়ে একে একে চারটে বলদ অকালে ঘায়েল হয়ে গিয়েছে। গতবার আবার একটা বাছুর অর্থাৎ সদ্য জোয়ান বলদ কেনা হয়েছে। কিন্তু আজও সে কেলের ডাইনে বইতে পারে না। এবার দুটো বলদেরই 'খুঁড়িয়া' হয়েছিল গো-মড়কের সময়। দুটোই ভাগ্যক্রমে বেঁচেছে, কিন্তু অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে গিয়েছে। পাল 'কেলের' জন্যে ভাবে না। ভাবনা তার ওই নতুন সদ্য জোয়ান ছেলেটার জন্যে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে পাল বললে—চেকা আমাকে আজ বাই ঠুকে ঠাট্টা করলে মা।

কেউ উত্তর দিল না। পাল পিছনে তাকিয়ে দেখলে—লক্ষ্মী নাই, সে চলে গিয়েছে।

পাল উঠে গিয়ে দাঁড়াল কেলের কাছে। কেলে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে পালের দিকে চাইলে, তার পা শুঁকলে, তারপর ঘাড়টা লম্বা টান করে মুখটা এগিয়ে দিলে মুকুন্দের বুকের কাছে। এর অর্থ হল গল-কম্বলে সুড়সুড়ি দিয়ে দাও। পাল হেসে তার গলায় হাত বুলিয়ে পিঠে দুটো চাপড় মেরে বললে, দেখব বেটা এবার, কেমন ক্ষ্যামতা তোমার ! হাঁ।

তারপর আবার বললে, দাঁড়া মা, তাজা করে দিচ্ছি। রশির মেয়ার ব্যবস্থা করছি আজ থেকে। রশি হল মেদো মদের সব চেয়ে কড়া তেজী অংশ। মেয়া হল তারই পচানো জিনিষের ছিবড়ে। ভারী উপকারী আর পোষ্টাই গরুর পক্ষে। চেকা মোড়ল নিজে খায় 'গৃহজাত' অর্থাৎ ঘরে চোলাই করা মদ। গরুদের খাওয়ায় রশি মেয়া। একেবারে তাগড়া হয়ে আছে চেকার গরুগুলো ; চেকা খায় মদের সঙ্গে মাংস। হাঁস আছে একপাল, হাঁসের বাচ্চা খায়।

কি করছ কত্তা ? সরস্বতী দাঁড়াল এসে দাওয়ার ওপর। খেতে দিয়েছি তোমার কেলেকে, উপোস করিয়ে রাখি নাই।

—কি ?

—এস, ত্যাল মাখো। চান কর। খেতে দেতে হবে না ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ।

—পাল এসে বসল। তেলের বাটিটা এগিয়ে দিলে নাতনী। পাল বললে, এক কাজ কর দিকি-নি ! ত্যালটা গরম করে নিয়ে আয় দিকি-নি !

গরম তেল সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করতে বসে সে আবার ডাকলে—সরস্বতী।

—কি ?

—এই পিঠে খানিক ত্যাল মালিশ করে দে তো বুন। খুব করে আচ্ছা করে ! উঁ হু। উঁ তোর হচ্ছে না। আর জোরে !

—আর আমার জোর নাই বাপু ?

পাল হা হা করে হেসে উঠল। বললে—আচ্ছা তবে গোটাকতক কিল মার দিকি নি। যত জোর আছে তোর। আচ্ছা ! আচ্ছা ! আচ্ছা !

—আমার হাতে লাগছে বাপু, আর আমি পারব না। সরস্বতী সত্যই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

পাল আবার হা হা করে হেসে উঠল। বললে, আমার কিন্তু তোর নরম হাতের কিল ভারী মিষ্টি লাগছে।

সরস্বতী সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল কত্তার মুখে এই ধারার কথাবার্ত্তা কখনও শোনে নি ! হল কি কত্তার ? !

* * *

মাকে বললে সরস্বতী।—কত্তার গতিক ভাল নয় মা।

লক্ষ্মী চমকে উঠল। কথাটা তারও মনে হয়েছে বাপের সেই হাসি শুনে এ হাসি সে শুনেছে ছেলেবেলায় বাপকে তখন লোকে বলত' ভীম সন্ধ্যায় পর বাইরের দাওয়ায় পাঁচজনের সঙ্গে বসে তার বাবা এমনিভাবে হাসত, সে তখন ছোট মেয়ে, বাড়ীর ভিতরের দাওয়ায় শুয়ে ঘুমুতো, বাবার হাসিতে তার ঘুম ভেঙে যেত।

বৈষ্ণবী মা বকত বাবাকে—কি এমন ক'রে হাস, মেয়েটার ঘুম ভেঙে যায়, চমকিয়ে ওঠে।

বাবা আবার হাসত—হা হা করে। কাঁসায় বাসনে খন্‌খনে আওয়াজের রেশ থেকে উঠত, দরজায় কি জানালায় হাত দিয়ে থাকলে মনে হ'ত, কি যেন একটা শিউরে উঠছে তার ভেতরে। সে হাসির প্রথম পর্দা ছিড়েছিল বৈষ্ণবী মা যাবার পর। তারপর খাদে নেমেছিল লক্ষ্মী নিজে বিধবা হবার পর, সরস্বতী বিধবা হবার পর সে হাসি আর হাসে নাই তার বাবা। আজ সেই হাসি হাসতে শুনে কথাটা তারও মনে হয়েছে।

সরস্বতী বললে—কত্তা হয়তো আর বাঁচবে না, নয়তো কত্তার মাথা খারাপ হয়েছে।

লক্ষ্মী শিউরে উঠে বললে—ওকথা বলিস নে সরস্বতী। তা'হলে আমাদের দশা কি হবে তাব দেখি?

সরস্বতী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেই চলে গেল সেখান থেকে।

লক্ষ্মী চুপ ক'রে বসে ভাবছিল। যতই অশুভ হোক, সরস্বতী কথাটা মিথ্যে বলে নাই। আজ সন্ধ্যে বেলায় বলদ দুটোকে রাশি আর মেয়া খাওয়াবার ঝোঁক উঠেছে। নিজে বৈষ্ণব মানুষ—মদকে যার এত ঘেন্না, সেই লোক নিজে হাতে ওই সব জিনিষ ঘেঁটেছে। বলদকে মেয়া রাশি অনেকবারই খাওয়ানো হয়েছে, কিন্তু সে সব করত রাখালে। বাবা নাকে কাপড় দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত দূরে। সেই লোক নিজে হাতে এই বুড়ো বয়সে—! চোখে জল এল লক্ষ্মীর। রাখাল নাই কিন্তু কাহার পাড়ার কাউকে ডাকলেই হ'ত। একি মতিভ্রম!

একটু বসে থেকে সে উঠল। উৎকণ্ঠা এবং কৌতূহলও হল বাবা কি করছে দেখবার জন্ত। সে চুপি চুপি বাবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। আশ্চর্য্য হয়ে গেল কোঠার উপরে ধুপ-ধাপ শব্দ শুনে। যেন দুরমুস দিয়ে কাঠের তক্তার উপর মাটি বিছান মেঝেটা পিটছে। সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে আড়াল থেকে উঁকি মেরে সে অবাক হয়ে গেল। তার বাবা কুস্তিগীরের মত কাপড় সেঁটে রীতিমত বৈঠক দিচ্ছে, হাঁপাচ্ছে। ধীরে ধীরে লক্ষ্মী নেমে এল। হায়রে! এই বয়সে বাবা শেষে পাগল হয়ে গেল!

(তিন)

শুধু মেয়ে আর নাতনীই নয়, গোটা গাঁয়ের লোকেরই কেমন যেন একটু খট্‌কা লেগেছে। পালের হ'ল কি? তার ওই হা-হা করে হাসি শুনে তারা পরস্পরের মুখের দিকে চায়। ভোর থেকে আরম্ভ করে জলখাবার বেলা পর্য্যন্ত পাল মাঠে ধান কাটে। তাতে অবশ্য কেউ কিছু মনে করে না। পালের কৃষাণটার জ্বরের সঙ্গে বুকের দোষ হয়েছে, আধা ডাক্তার আধা কবরেজ ভাগবতচরণ বলেছে, 'যারে হরি রাখে কে?' লোকটা মরবে। আজও পর্য্যন্ত বাগ্দী-কাহার যারা বর্ষার সময় চলে গিয়েছে, তারা কেউ ফেরে নাই। দুমকার ওদিক থেকে একটি দল সাঁওতালও আজ পর্য্যন্ত এ অঞ্চলে আসে নাই। বর্ত্তমানে দামোদরের বাঁধ তৈরী হচ্ছে, রেলের সাঁকো তৈরী হচ্ছে, সারি সারি ক্রোশ বরাবর লম্বা এক একটা সাঁকো; উড়ো জাহাজের আস্তানা তৈরী হচ্ছে এখানে ওখানে সেখানে—কোনটা দু' ক্রোশ, কোনটা পাঁচ ক্রোশ লম্বা; লাখে লাখে মজুর খাটছে, টাকাটার কমে মজুরী নাই, পাকা মেঝে ঘর দিচ্ছে নাকি থাকতে, ডাক্তার ওষুধের পয়সা লাগে না, এই ঢাউস বড় বড় মোটরে চড়িয়ে নিয়ে যায়—খাবার মোটরে করে দিয়ে যায়। সায়েবেরা সেখানে সন্ধ্যার পর নাচ গান হল্লা করে। মোটা মোটা বকশিস দেয়। ভাল ভাল বিলাতী মদের বোতল নাকি গড়াগড়ি যাচ্ছে, টিনে বন্ধ খাবার, এসবেরও প্রসাদ কি আর কিছু কিছু না পায় তারা? সব—সব মজুর গিয়ে সেখানে জুটেছে। কিসের জন্যে এখানে আসবে?

নিজের নিজের ধান নিজে না কেটে উপায় কি? কাটেও তো তারা চিরকাল। এবার না হয় রোগ ধরেছে; কাল রোগ। তবু তো ধান তুলতে হবে! মাঠভরা ধান, গোটা বছর রত্নাকর মুনির মত উইকে একপিঠ ভুঁইকে একপিঠ দিয়ে তপস্যার ফসল, লক্ষ্মীর আটনের দেবতা, গোটা বছরের মুখের ভাত, চালের খড়, গরুর আহার—এ ত তুলতেই হবে! ঘরের খামার খাঁ খাঁ করছে, লক্ষ্মীর আটন খালি পড়ে আছে; গোলার মধ্যে চাম-চিকেতে বাসা বেঁধেছে, মাকড়সায় জাল বুনেছে; সব পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। তুলবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেও সবাই। কিন্তু পালের ধানকাটা দেখে লোকে অবাক হয়েছে। পাল ধান কাটে আর আপন মনেই বলে হেঁই-হেঁই হেঁই; পা ফেলে যেন রোখা মাতালের মত। পাল কিছুদিন আগেও উঠত, ধীরে ধীরে, বলত—"আর কি সেদিন আছে? তাড়াহুড়ো ক'রে উঠতে গেলে মাথা ঘোরে।" বলে হাসত। সেই পালের হঠাৎ যেন নবযৌবন হয়েছে। এ তো ভাল নয়। এমন করে খাটতে গেলে কোন দিন বুক ধড়ফড় করে মাঠেই মুখ গুঁজে পড়বে, আর উঠবে না। না-হয় তো খাটুনীর ধমকে পাল্টে পড়বে জ্বরে। এর ওপর জ্বর হলে মেয়ে দিয়ে যাবে, নাও যদি মরে তবুও উঠে আর হেঁটে বেড়াতে দেবে না সহজে।

তারওপর এসব কথা বললে ওই হাসি।

যোগেন্দ্র বললে—কি, হ'ল কি তোমার বল দেখি?

পাল সেই হাসি হাসতে আরম্ভ করলে। তারপর হাসি থামিয়ে বললে—সন্ধ্যেবেলায় বলব।

—ওরে বাপরে! এত হাসি কিসের গো কত্তা?

গলার আওয়াজেই চিনতে পেরেছিল পাল চেকা মোড়লকে। পিছন ফিরে দেখলে চেকা পালই বটে। পাল ভুরু নাচিয়ে মাথা দুলিয়ে বললে—পারিস? বলি তুই পারিস?

—কি?

—এমনি হাসতে? মরদ তো বটিস। জোয়ান বয়সও বটে, পয়সাও ঢের আছে! পারিস? কয়েক মুহূর্ত্ত সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেকার দিকে চেয়ে থেকে আবার বললে, ফুসফুসি ফেটে যাবে কোলা ব্যাঙের পেটের মত। বলেই সে আবার হাসতে আরম্ভ করলে সেই হাসি।

যোগেন্দ্র অবাক হয়ে গেল। তার আর কোন রকম সংশয় রইল না। পালের মাথায় সত্যিই গোলমাল হয়েছে। চেকাও প্রথমটা চুপ করে ছিল। একটু পর সে বললে—পালকে কোন কথা না ব'লে যোগেন্দ্রকে বললে—ঘোষ কত্তা! পাল কত্তার নাকটা দেখেছ?

যোগেন্দ্র একটু বিরক্ত হয়েই তার মুখের দিকে চাইলে। পালের ভুরুও কুঁচকে উঠল। চেকা যে এবার বাঁকা বঁড়শীর মত কথা বলবে তাতে তাদের সন্দেহ ছিল না। চেকাকে তারা চেনে। টাকার গরমে মাটিতে ওর পা পড়তে চায় না। ওর কথায় জলের মাছ গায়ের জ্বালায় ডাঙ্গায় মাথা ঠুকে আছাড় খেয়ে পড়ে।

চেকা বললে—দেখ, ভাল ক'রে দেখ। হুঁ। হুঁ! ঠিক!

—কি?

—বেঁকেছে। কত্তার নাকটা বেঁকে গিয়েছে।

নাক বেঁকে গেলে মানুষের ছ'মাসের মধ্যে অবধারিত মৃত্যু। নীল তারা দেখতে পায় না চোখ টিপে, আকাশের অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখতে পায় না। এমনি নাকি অনেক কিছু হয়। চেকার কথা শুনে যোগেন্দ্র শিউরে উঠল। সে তার ঘোলাটে চোখের নিস্তেজ দৃষ্টি যথাসাধ্য তীক্ষ্ণ ক'রে চাইলে পালের মুখের দিকে। পালও চমকে উঠল, তার ডান হাতে ছিল কাস্তে, বাঁ হাতটা আপনি যেন উঠে গিয়ে পড়ল নাকের উপর।

চেকা হি হি করে হেসে উঠল। শুধু হাসি নয় তার সঙ্গে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি। হাসির ধমকে তার মাথাটা যেন মাটিতে ঠেকে গেল—প্রথমটা হাসির ধমকেই আবার যেন সোজা হয়ে উঠে পিছনের দিকে উল্টে পড়ে যাবার উপক্রম করলে।

চেকা বললে—ছ-মাস! আর ছ-মাস। বলেই সে চলতে আরম্ভ করলে। কিছুদূর গিয়েই সে আবার দাঁড়াল, বললে—মরণের ছ-মাস আগে বুঝলে কত্তা মানুষের এমনি নব যৌবন হয়। বুঝলে?

পাল আবার উৎকটভাবে হেসে উঠল, নিজের বাই দুটোতে চাপড় মেরে বললে—হবে না কি?

চেকা কিন্তু আর দাঁড়াল না। চলে গেল। পাল তার দিকেই চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে—যগন্দ!

কেউ সাড়া দিলে না। যোগেন্দ্র চলে গিয়েছে।

পাল কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে আপনার নাকে হাত দিলে।

—কত্তা আজ যে দাঁড়িয়ে রইছ?

সরস্বতী। সরস্বতী এসেছে জল খাবার নিয়ে।

—হুঁ।

—হুঁ কি? শরীর ভাল আছে তো?

—দেখ তো সরস্বতী, নাকটায় কি হ'ল?

—কি হ'ল? কৈ কিছুই তো হয় নাই।

—যেমন ছিল তেমনি আছে?

সরস্বতী খুব কাছে এসে খুব ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলে—হ্যাঁ কই কিছুই তো। উঃ—কত্তা কি খেয়েছ তুমি কত্তা? সরস্বতী শিউরে উঠে পিছিয়ে গেল।

* * *

লক্ষ্মী বললে মেয়েকে—চুপ কর, একথা কাউকে যেন বলিস না।

পাল কিন্তু নিজেই জানালে যোগেন্দ্রকে। সন্ধ্যাবেলায় তাকে ডাকলে - শোন। এস।

— কোথা?

—এস না আমার সঙ্গে।

গাঁয়ের বাইরে বট বাগানে একটা গাছতলায় বসল পাল, যোগেন্দ্রকে বললে বস।

যোগেন্দ্র অবাক হয়ে গিয়েছিলই, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও করছিল। মাথা খারাপ লোক, কখন কি ক'রে বসবে হয়তো।

পাল তার গায়ের আলোয়ানের ভেতর থেকে বের করলে একটি বোতল, তার মুখেই পরানো ছিল কাচের ছোট ওষুধ খাওয়া গেলাস একটি।

—কি? যোগেন্দ্রের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল।

পাল কিন্তু অত্যন্ত সহজভাবে বললে—গৃহজাত। খাও।

—সে কি?

'গৃহজাত' মানে লুকিয়ে ঘরে চোলাই করা 'মদ'। সাওতাপুরের ভল্লা বাগ্দীরা তৈরী করে নদীর ধারে। এখানকার অনেকে গোপনে কিনে খায়। এ গাঁয়েরও দু'চারজন খায়; চেকা মোড়লই খায়। কিন্তু তা' ব'লে যোগেন্দ্র খাবে কি ব'লে? পালই বা খায় কি বলে? বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা তাদের, বয়স হয়েছে, যাকে বলে এক পা ডোঙায় এক পা ডাঙায়, আজ পালের এ কি আচরণ?

ততক্ষণে ছোট গেলাসে খানিকটা ঢেলে চুক ক'রে ওষুদ খাওয়ার মত খেয়ে ফেলে পাল বললে জ্বর পালাতে পথ পাবে না, তিন দিনে গায়ে তাগদ পাবে; আমার মতন খাটতে পারবে।

গেলাসটায় যোগেন্দ্রের জন্যেই খানিকটা ঢালতে ঢালতে সেই বললে ওই শালা চেকা, চেকা শালা একদিন আমাকে বলেছিল। বুঝলে—আমার খানিক আশ্চর্যও লাগত সবাই ঘরে ওলোট পালোট খেলে—ওই শালার একবার বই জ্বর হ'ল না কেনে? তা' শালাই আমাকে বললে—সেই হে, যে দিন বাইট্টেকে আমাকে ঠাট্টা করেছিল, সেই দিন। বলেছিল মদ খাস খাই, জ্বর আমার কাছে ঘেঁষতে পারে না। তা, দেখলাম। হ্যাঁ দবিটা উপকারী বটে। তাগদ আমি পেয়েছি। নাও, খাও।

যোগেন্দ্র সভয়ে সরে বসল। না।

—না, লয়, খাও।

- ছি, ছি, ছি পাল, ছি। এই বুড়ো বয়সে -

—ধোৎ তেরি! পাল ধমক দিয়ে উঠল। কিসের বুড়ো বয়স হে? বুড়ো বয়স কিসের? বুড়ো বয়স! কই ডেকে আন তোমার কে ছোকরা আছে, ডেকে আন আমার কাছে! বুড়ো বয়স?

যোগেন্দ্রের জন্যে ঢালা গেলাসটি নিজেই সে খেয়ে নিলে।

আশী বছর। আশী বছর তো সোজা হয়ে বেড়াব রে যগন্দ!

যোগেন্দ্র বললে কিন্তু ধর্ম্ম আছে তো!

- হ্যাঁ আছে বই কি। আলবৎ আছে। এ তো ওষুদ। ধম্মতে ওষুদ খেতে বারণ করে না কি? ধম্মতে বলে না কি ওষুদ না খেয়ে রোগে ভুগে খক-খক ক'রে কেশে কুঁজো হয়ে মর তুমি? যদি বলে তো বলে। ধম্ম আমার ধান তুলে দেবে? ধম্ম? হঠাৎ সে নিজের হাতখানা শক্ত ক'রে যোগেন্দ্রের দিকে বাড়িয়ে দিলে। দেখ শরীরটা কদিনেই কেমন বেঁধেছে দেখ। বুড়ো, বুড়ো বয়স!

যোগেন্দ্র হাতখানা নেড়ে দেখতে বাধ্য হল, কারণ, পাল একরকম হাতখানা তার ঘাড়েই চাপিয়ে দিয়েছিল। অবাক হয়ে গেল যোগেন্দ্র। সত্যই, আর সে রকম তলতলে ঝলঝলে নয় চামড়া। অনেকটা শক্ত হয়েছে। সে স্বীকার করতে বাধ্য হল।

হু। তা হয়েছে।

পাল আবার খানিকটা গেলাসে ঢেলে বললে, তবে খা। খারে খা। যেবন ফিরে আসবে। বলে হা-হা করে হেসে উঠল।

যোগেন্দ্র এবার হাত বাড়িয়েছিল কিন্তু হাসিতে চমকে উঠে বললে—না মাইরী, কি যে হাসছ? এখুনি কে এসে পড়বে। তা হলে আমি খাব না ভাই। পালের হাসি যেন শাঁখের আওয়াজ। কাছাকাছি শাঁখ বাজালে তার শব্দ যেমন কানের ভেতর থেকে মাথার ভেতরে—বুকের ভেতরে কাঁধ থেকে হাতের শিরায় ধ্বনির রেশ তুলে টান হয়ে ওঠে, পালের হাসির গমকগুলো তেমনি ভাবে যোগেন্দ্রের দেহের মধ্যে সুর তুললে। ভয়ও লাগল আবার চঞ্চলও হল মন; কত কথা মনে পড়ে গেল। যোগেন্দ্র মুখের কাছে নিয়ে গিয়েও ভাবছিল। এঃ কি গন্ধ?

—নাক টিপে ধর বাঁ হাতে। হ্যাঁ—হ্যাঁ। বাস, দে ঢেলে মুখে! বাস্! বলেই সে আবার হেসে উঠল হা হা করে।

-এই এই। না এমন করে হাসলে হবে না। না। না।

তবু থামল না পালের হাসি।

কিছুক্ষণ পর যোগেন্দ্রও হাসছিল পালের সঙ্গে প্রায় পাল্লা দিয়ে। কথাটা অবশ্য হাসির কথা'। পাল বলছে এবার পৌষ লক্ষ্মীর দিনে ভাসান গান করতে হবে। আগে যেমন হত। আমাদের যে দল ছিল সেই দলের ভাসান গান। সে-কালে পাল চন্দ্রচূড় সাজতো আবার পায়ে কালীমাখা ন্যাকড়া জড়িয়ে 'গোদা মালোও' সাজতো। পাল এখনও সেই দুটোই সাজতে চায়। আর যোগেন্দ্রকে বলছে—তুইই বেউলো সাজতিস, তুইই বেউলো সাজবি। এই বুড়ো বয়স ভাঙা মুখ ফোকলা দাঁত—এই চেহারায় বেউলো—? যোগেন্দ্র হাসতে আরম্ভ করে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে পাল।

হাসিটা থেমে এল ধীরে ধীরে। দুজনেই চুপ করে বসে রইল, ক্লান্ত হয়েছে দু'জনেই; যোগেন্দ্রের বুকে তো কিক্ ব্যথার মত ধরে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এই নীরবতার অবসরে তাদের মনের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছে পুরানো দিনের কথাগুলি। নিজেদের সেই যৌবন কালের চেহারা মনে পড়ছে। সে কালের সঙ্গীদের যারা আজ নাই তাদের মনে পড়ছে। শূর বীরের মত চেহারা সব, কত হৈ হৈ সে! ভাবনা চিন্তা ছিল না। হবে না কেন? খামারে সব গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা দুধালো গাই, কেঁড়ে ভর্ত্তি দুধ, জালায় জালায় গুড়, পুকুর-ভরা মাছ—পৌষ লক্ষ্মীতে সে কত সমারোহ—গামলা-ভর্ত্তি করে সরুচাকলি—আঁসকে পিঠে, ক্ষীরের পিঠে, গুড়তিলের পিঠে! কুড়িগণ্ডায় এক পণ—সেই পণ দরুণে পিঠে খেত এক এক পণ। মাঘ মাসে মুলো খেতে নাই, লক্ষ্মীর রাত্রে 'মুলোমচ্ছি'—মুলোতে মাছে অম্বল হ'ত। তারপর পড়ত ভাসানের আসর।

পাল চন্দ্রচূড় সাজত, রঙীন পাটের কাপড় পরে পাটের চাদরখানা পৈতের মত বেঁধে আসরে ঢুকত। আসরে জ্বলত' সরকারী চল্লিশ বাতীর আলো। শিব শম্ভো! শিব শম্ভো! শঙ্কর! শঙ্কর! আসরখানা গম গম করে উঠত। উঠবার কথা যে। কালো কষ্টিপাথরে খোদাই করা ভৈরব মূর্ত্তির মত দশাশয়ী চেহারা, সেই বাঘাগলার আওয়াজ লোকের বুকের ভিতর যেন গুর-গুর ক'রে উঠত। মেয়েরা বসত একদিকে, পুরুষেরা বসত তিন দিকে—সব হাঁ ক'রে চেয়ে থাকত চন্দ্রচুড়ের মুখের দিকে। মেয়েদের মাথার ঘোমটা খসে যেত। পুরুষদের হুকোর টান বন্ধ হত। ধীরে ধীরে তাজা কল্কে নিভে আসত।

যোগেন্দ্রের ছিল ছিপ ছিপে মিষ্টি চেহারা, চোখ দুটি ছিল ডাগর; সে সাজতো বেহুলা। গোঁফ দাড়ি কোন কালেই যোগেন্দ্রের বেশী নয় তাও কামিয়ে পরচুলো পরে স্ত্রীর বিয়ের বেগুনী রঙের পাটের শাড়ীখানা প'রে আসরে এসে নামত সঙ্গে সখি থাকত। মেয়েরা পরস্পরের গা টিপে মুচকে হাসত। পুরুষদের চোখে পলক পড়ত না। লখীন্দরের দেহ নিয়ে কলার মান্দাসে সে নদীর জলে ভাসত, বেহুলা বলত শাশুড়ীকে, বাসরে আমার রান্না করা ভাত আছে সে ভাত আমার মাটিতে পুঁতে রেখো। কাককে ডেকে বলত, কাক তুমি আমার বাপের বাড়ী

পিয়ে রাকে বলো বেউলা জলে ভেসে যাচ্ছে। গান ধরত' "জলে ভেসে যাইরে সোনার কমলা।" গোটা আসর হাপুস নয়নে কাঁদত।

এমন সময় ঠোঁটের কোণে চুণ মেখে গালে কপালে চুণের দাগ এঁকে, পায়ে ঝাকড়া জড়িয়ে, মাথায় পাগড়ী বেঁধে ঝুঁটি দুলিয়ে খুঁড়িয়ে খেচে আসরে ঢুকত 'গোদা মালো।' পোষাক পাল্টে পালই সাজতো 'গোদা মালো', দেখে কার সাধ্য যে বলে এই লোকই সেই পাথরের মত মানুষ চাঁদ সদাগর। পালের ঝুঁটি নাচানোর কায়দাটি ছিল অদ্ভুত। সত্যিই যেন নাচত' ঝুঁটিটি, দেখে আসর শুদ্ধ লোক হেসে গড়িয়ে পড়ত। মেয়েরা ধাকা দুটি হেসে মুচকি হেসে বলত' মরণ। পৌষ মাস চলে যেত, মাঘ মাসের অন্ততঃ পনেরোটা দিন ছেলে-মেয়েরা তাকে দেখলেই বলত, ওরে গোদা মালো আসছে। তরুণীর দল পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ফিক ফিক ক'রে হাসত।

সে দিন আর এ দিন। আজকের দিন-কালগুলো যেন ভাসান গানের তাহার পর শেষ রাত্রের আসর। চল্লিশ বাতীর চিমনীটা কালো হয়ে যেত কালী পড়ে। পৌষের শেষ রাত্রিতে হিম ঝরত চারিদিকে, চট টালাইগুলো ধুলোয় ধুলাকীর্ণ হয়ে বিশৃঙ্খলভাবে পড়ে থাকত; আসর জাগলে তারা জনকয়েক শুধু প্রায় কুণ্ডলী পাকিয়ে বেঁকে চুরে শুয়ে থাকত; দু'চারটে কুকুরও এসে গা ঘেঁষে শুয়ে থাকত, খাঁ খাঁ করত চারিদিক। ঠিক তাই। ঠিক তাই। তারাই ক'জন ভাঙা আসর আগলে বেঁকে চুরে কোনমতে পড়ে আছে। চারিদিক খাঁ-খাঁ করছে।

যোগেন্দ্র একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললে—চল। বাড়ী চল।

—চল। পালও উঠল।

বাগান থেকে বেরিয়ে এসে কিন্তু দু-জনেই দাঁড়িয়ে গেল থমকে। চাঁদের আলোয় আর কুয়াসায় যেন একখানা বকের পাখার মত ধব ধবে সাদা মলমলের চাদরে মা বসুমতীকে কে ঢেকে দিয়েছে। মদ অতি সামান্যই খেয়েছে তারা। তবু অনভ্যস্ত মস্তিষ্কে তাই চন-চন করছে। পাল বললে, চল মাঠের ধার দিয়ে ঘুরে আসি একটু।

দুজনে এসে দাঁড়াল মাঠের ধারে। দুধ-বরণ জ্যোৎস্নায় মধ্যে সোনার বরণ মেয়ে গা এলিয়ে ঘুমুচ্ছে। দু'চোখ ভরে দেখেও আশ মেটে না।

পাল বললে— যগন্দ।

—আ-হা-হা পাল, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী শুয়ে আছেন—তুমি দেখ!

—তাই বলছি যগন্দ। এইবার দিন ফিরল। তুমি দেখো।

যোগেন্দ্র কথাটার ঠিক কি মানে তা বুঝতে পারলে না। পালের মুখের দিকে সে তাকিয়ে রইল।

পাল বললে—এটা পঞ্চাশ সাল। গেল পঞ্চাশ বছর দুঃখের কাল গিয়েছে যগন্দ, আসিছে পঞ্চাশ বছর দেখো তুমি সুখের কাল হবে। দেখো। আমি বলছি। এই তিরিশ টাকা মণ চাল এই মড়ক এই গেল দুর্ভোগের শেষ। এইবার—দেখ তুমি মাঠের দিকে তাকিয়ে, মা লক্ষ্মী আবার এসেছেন।

যোগেন্দ্র অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল।

পাল বললে—দেখো তুমি আবার আগেকার মত কাল আসবে। বছর বছর জল হবে। মাঠ ভরে ধান হবে। আবার সব তেমনি হবে। বস।

দু'জনে বসে সেই শিশিরে ভেজা মাঠের আলের ঘাসের ওপর।

পাল বললে—সাধে বলছিলাম যগন্দ—লক্ষ্মীর মেড়ে এবার ভাসানের গান করব। এবার মা লক্ষ্মী পায়ে হেঁটে এসেছেন। অনেকদিন পরে এবার সত্যি পৌষ লক্ষ্মী হবে।

—তা বটে।

—আর একটুকুন লেবে নাকি? পাল আবার বের করলে বোতলটা, আর গেলাসটা মুখে লাগানোই আছে।

—দাও। কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—মা লক্ষ্মী আবার এ গন্ধ সইতে পারেন না। হাজার হলেও নারায়ণের লক্ষ্মী—বড় মেয় ঘরের বউ।

—হুঁ। একটু ভেবে পাল বললে—তা বটে। তা—

যোগেন্দ্র বললে—বুঝে দেখ তুমি।

—ধান কাটা হয়ে যাক, তারপর আর ছোঁব না। বুঝলে? দেখছ তো ধান? এর জোর তো বুঝতে পারছ। নইলে তুলব কি করে? দাও। নিজে খেয়ে পাল গেলাস বাড়িয়ে দিলে যোগেন্দ্রের দিকে।

—তা বটে। যোগেন্দ্র হাত বাড়িয়ে নিলে গেলাসটি। জোর অনুভব করছে সে; পাল মিছে বলে নি। ভোরে একটু খেয়ে মাঠে বের হলে সেও পালের মত ধান কাটতে পারবে। গোটা মাঠখানা ধানে থৈ থৈ করছে। এ ধান নইলে তুলবে কি করে?

—আর একটি মনের কথা বলি তোমাকে।

এ গেলাসটা খেয়ে যোগেন্দ্রের গায়ের জোর আর একটু বেড়েছে মনে হল। সে গলাটা সশব্দে বেশ সবল জোয়ানের মত খেকে নিয়ে মদের থাকরা থুথু মাটিতে ফেলে বললে—কি?

—ওই চেকা।

যোগেন্দ্র তার মুখের দিকে তাকালে।

ওই চেকার ধান কেটে ঘরে তোলার আগে আমাকে কেটে ঘরে তুলতে হবে। আমাকে খাই ঢুকে যায় হে। ওঃ।

—তা বটে।

—দাঁড়াও না। সবারই সুসময় আসছে—এই পঞ্চাশ সাল থেকে। ওর তিরকুটি টাকার গরম—ধানের গরম এইবার ভাঙবে। মা এসেছেন, তুমি দেখো যগন্দ। এই বারেই দেখো দেনা ছানি শোধ করব আমি। খাজনা দেনা এক পয়সা বাকী রাখব না। যা থাকবে—থাকবে তোমার অনেক। বিঘে দুই চার বিশ তো ফলবেই, কি বল?

—তা খুব।

—তা হলেই আমি হিসেব করেছি সব দিয়ে থুয়ে পোটি তিনেক থাকবে। তিন ভাগ করব। বুঝলে। তিনটি গোলা। একটি সরস্বতীর, একটি লক্ষ্মীর—একটি আমার। এই আমার বরাবর চলবে। এখনও বছর বিশেক বাঁচব আমি—খুব বাঁচব। দুটো গোলা নির্দিষ্ট রেখে দোব আমার কন্যের জন্যে। বাকী যা থাকবে ওরা যা খুসী তাই করবে।

যোগেন্দ্র বললে—ভাল যুক্তি। ভাল যুক্তি। আমাকেও এমনি বন্দোবস্ত করতে হবে।

—করতে হবে নয়'। 'করে ফেলাও।

—কাল ভোরে যখন যাবে মাঠে ডেকো আমাকে। আর বোতলটা বরং নিয়ে এস—এক ঢোক না খেয়ে তো যেতে পারবো না মাঠে।

পাল বললে—আনব। তারপর হঠাৎ যেন তার কথাটা মনে পড়ল—বললে, হাঁ একটা কথা বলতে ভুলেছি।

—কি?

—এর উপর দুধ ভাল নয়। দুধ খাও তো বিকেলে খেয়ো। এরপর ভাল হল মাংস। তা তাই সে তো উপায় নাই। মাছটা বেশী খেয়ো।

—মাছ? যোগেন্দ্র হাসলে। পাব কোথা?

—আঃ! জাল টাল সব গিয়েছে হে। নইলে। নইলে বাবুদের সায়র পুকুরে সে কালের কিষ্টির রাত্রের মত জাল ফেলে ধরা কিছু বিচিত্র ছিল না মুকুন্দের পক্ষে। শরীরে তার যথেষ্ট জোর আছে। ওই চেকার চেয়ে জোরে ঘুরিয়ে জাল সে ফেলতে পারে—এ কথা সে বাজী রেখে বলতে পারে। বাবুদের পুকুর কেন? জাল থাকলে আজ চেকার পুকুরেই ফেলত জাল। সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে।

যোগেন্দ্র বললে—ভোরে ডেকো যেন।

(চার)

মাঠ থৈ থৈ করা ধান মুকুন্দ কেটে চলে জোয়ানের মত। হা হা করে হাসছে। যোগেন্দ্রও কাটছে। সেও যেন তাগদ অনেকটা ফিরে পেয়েছে। অন্য সকলেও কাটছে। মুকুন্দ-যোগেন্দ্রের মৃতসঞ্জীবনীর নেশার জোর তাদের নাই কিন্তু ধানের নেশা তাদের পেয়েছে।

মাঠে মাঠে থাকবন্দী ধান ছোট ছোট ঘরের মত আকারে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। যেন মেলা বসে গেছে বলে মনে হচ্ছে দূর থেকে। গাড়ীতে গাড়ীতে সেই ধান ক্রমে ক্রমে ঘরে নিয়ে চলেছে সব। মুকুন্দের ছেলে—সত্যই 'সাবাস জোয়ান'—মুকুন্দ এবার তার ওই নাম দিয়েছে। সমানে টেনে চলেছে জোয়ান বলদটার ডাইনে থেকে। মুকুন্দ গাড়ীতে ধান বোঝাই করছিল। ও'খানা জমির ওপারের খামার ওপর দিয়েই পেরোতে হ'য় বরাবর গাড়ীর

রাস্তা। একখানা গাড়ী চলেছে—হৈ হৈ করে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে গাড়ী। কোঠা ঘরের মত ধান বোঝাই করেছে গাড়ীতে। ধুলো উড়ছে। চেকার গাড়ী চলেছে। নইলে এমন গরু আর কার হবে। হ্যাঁ চেকাই বটে। ওই যে গাড়ীতে বোঝাই ধানের মাথায় ব'সে আছে—চালের মটকায় হনুমানের মত।

—হৈ কত্তা!

মুকুন্দ দাঁতে দাঁত টিপে ধরে—তার দিকে চাইলে শুধু।

—হবে নাকি? খাই টুকছে চেকা! হি-হি করে হাসছে।

পাল একটা মাটির ঢেলা নিয়ে ছুড়লে—অবশ্য অন্যদিকে ছুড়লে, ছুড়ে বলে উঠল—উ-লে-লে-লে! অর্থাৎ হনুমান তাড়াচ্ছে সে। সঙ্গে সঙ্গে হা হা করে হেসে উঠল। সেই হাসি। তারপর সে দুই হাতের মুঠোতে ধরে টেনে তুলতে লাগল ধানের আঁটি। এবারকার ধানে তার আড়াই মুঠোয় বাঁধা আঁটি। আড়াই হাত তিন হাত লম্বা খড়। ধান তুলছিল আর হাসছিল।

—যাঃ শালা! পাল হাতের আঁটিগুলো ফেলে দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। হাঁপ ধরে গেছে হেসে। শালাঃ! শালা চেকা! শালা আবার লক্ষ্মীতে অন্নপূর্ণা পূজো করবে এবার। হিংসুটে বদমাস। রক্তের তেজ, জোয়ানীর দেমাক, আর টাকার গরমে ধরাকে সরার মত দেখছে। এবার লক্ষ্মী পূজোয় বারোয়ারী থেকে ভাসান গান হবে ঠিক হয়েছে। ও অমনি অন্নপূর্ণা পূজোর ধুয়ো তুলেছে। তুলুক। দশের লাঠি একের বোঝা! দশ-জনের চাঁদায় হবে বারোয়ারী। ওর একার লক্ষ্মীপূজো। দশও এবার লক্ষ্মীছাড়া নয়। উনো লক্ষ্মী এবার দুনো হয়েছেন। মাঠ-ভরা ধানে, খামার গোলা ছয়লাপ হয়ে যাবে। দশ টাকা মণ ধানের। পঞ্চাশের পর থেকে মা দুনো হয়েই আসবেন বছর বছর।

* * *

"এস পৌষ বস পৌষ জন্ম জন্ম থাকো; গেরস্ত ভরিয়ে থাকো দুধে ভাতে রাখো। এবার সেই দুধে ভাতে রাখার পৌষ এসেছে। পঞ্চাশ বছর দুখের পর পঞ্চাশ বছর সুখ। এত দিন পৌষ এসে 'বাউনির বাঁধন' মানে নাই, মাঘ মাস যেতে না যেতে—গোলা খালি হয়েছে, খাজনায় মহাজনের পাওনায় সব কর্পূরের মত যেন উপে গিয়েছে। আসছে বছরের খোরাকীর জন্য আবার মহাজন ঠিক করতে হয়েছে। এ গাঁয়ের মহাজন ওই চেকা। ওই ওরই দোরে যেতে হয়েছে মানুষকে। এবার যা নমুনা তাতে ওর দোরে আর যেতে হবে না। বছর বছর যদি এমনই পৌষ আসে মাঠ থৈ থৈ করা ধান—খামার ভর্ত্তি গোলা ভর্ত্তি ঘর ভর্ত্তি করা পৌষ, তবে সে পৌষ আর যাবে না। সে জন্ম জন্মই থাকবে গেরস্তকে দুধে ভাতেই রাখবে। ছেলেপুলে খোরা পাথোরা ভরে ভাত খাবে। আবার হবে এই জোয়ান, মোল্যানীয়াও হবে আবার ঝলমলে মেয়ে—তাদের এক দুয়ে শাঁখ বেজে উঠবে; শিঙের মত, এক দুপুর ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে কুটে তুলবে বিশ দরুণে ধান। গোটা বাড়ীটা নিত্য নিকিয়ে তুলবে গোবর আর রাঙা মাটির গোলায়, ঘরে খামারের চতুঃসীমায় কোথাও থাকবে না এতটুকু ঝুল কি পাতা কি কুটো কি ময়লা। পৌষ সংক্রান্তির ভোর রাত্রে তারা যখন প্রদীপ জ্বেলে ধূপ দিয়ে রঙকরা চালগুড়োর আল্পনা এঁকে শুদ্ধ কাপড়ে, শুদ্ধ মনে পৌষকে বলবে—'পৌষ-পৌষ-পৌষ বড় ঘরের মেঝেয় উঠে বোস'—পৌষ তখন কি যেতে পারবে? পঞ্চাশ সাল—শয়ে শূন্যের অর্দ্ধেক হল পঞ্চাশ—এটা হল সর্ব্বনাশের বছর—হয়েছেও সর্ব্বনাশ, কাল যুদ্ধে না কি লাখে লাখে মানুষ মরছে, তিরিশ টাকা মণ চাল, দশ পনেরো টাকা জোড়া কাপড়, নুন নাই, চিনি নাই, ওষুদ নাই, দেশ ভাসানো বান রোগ-মড়ক সর্ব্বনাশের আর বাকী কি? কিন্তু অতি মন্দের পরেই নাকি ভাল আসে, শুকনো গাছে ফুল ফোটার মত এবার সেই ভালোর নমুনা দেখা দিয়েছে মাঠ ভরা ধানে। পালের অকাট্য ধারণা তাই। ভালো বছর এইবার থেকে আরম্ভ হল। নিশ্চয়-নিশ্চয়-নিশ্চয়! এই চৈত্র নাগাদ যুদ্ধ মিটে যাবে, রোগ এই বসন্তের বাতাস বইলেই দূর হবে। সুবাতাসের মুখে রোগ কতক্ষণ? সুসময় এলে—দুঃখ অভাব সব পালায় আলো ফুটলে দুঃস্বপনের মত।

পাল আবার তুলতে আরম্ভ করলে ধানের আঁটি। হাঁপটা এইবার গিয়েছে। ধান পান তুলে সে একবার যাবে পারুলের কোবরেজের কাছে। চিকিৎসা করাবে। শরীরটাকে তাজা করতে হবে। বয়স অবশ্য হয়েছে, তবে ষাট বছর—কি এমন বয়স? তার বাবার জ্যাঠা ষাট বছর বয়সে ফের বিয়ে করেছিল; সেই স্ত্রীর তিন কন্যে হয়; শুধু তাই নয়—সে স্ত্রী যখন মরে, তখন বুড়ো বেঁচেছিল—তার পরও সে মাঠে যেত। বাঁচতে তাকে হবে। সমর্থও থাকতে হবে। সরস্বতীর ছেলেটাকে মানুষ না ক'রে সে মরতে পারবে না। তা হ'লে ওই চেকাই সর্ব্বনাশ করে দেবে। সরস্বতীর ওপর নজরও যে সে না দিতে পারে এমনও নয়। হুস হুস ক'রে সে ধান তুলতে লাগল।

আবার হৈ-হৈ উঠছে। কার গাড়ী আসছে। কিন্তু গাড়ী কই? কোথায়? তবে? কি হ'ল? কার কি হ'ল? কান খাড়া করে পাল শুনলে—কোন্ দিক থেকে আসছে হৈ-হৈ শব্দটা। গ্রামের দিক থেকে মনে হচ্ছে। কার কি হ'ল। বুকটা তার ধড়াস করে উঠল। সরস্বতী ছেলেটা—? পাল দ্রুতপদে চলতে আরম্ভ করলে।

—কে—?—কে হে? ওহে!—একটা লোক গাঁয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে জোর হাঁটনে চলেছে কোথায়।—কে হে?

—আমি শশী!

—গাঁয়ে গোল কিসের?

—রমণ কাকা—

—কি—কি হ'ল?

—রমণ কাকা মারা গেল। ধানের পালুই বাঁধতে বাঁধতে—বুকে কি হ'ল বলে—যাস। আমি চল্লাম কাকার জামাইকে ডাকতে।

রমণ পাল মরে গেল! মুকুন্দদের দলের লোক সে। এক বয়সী! ভাল লোক, ভাল লোক—বন্ধু লোক। ভাসানের দলে সাজত নারদ মুনি। দিন রাত্রি হরি হরি করেই সারা হ'ত রমণ। পালের চোখে জল—রমণকে মনে করে! কিন্তু এইটুকু জোরে হেঁটেই আবার হাঁপ ধরেছে। একটু মৃতসঞ্জীবনী হলে হ'ত! ভাল ওষুদ! বারবার—বারবার মুকুন্দ রমণকে বলেছিল—রমণ ওষুদটা ভাল ওষুদ, খাও। নইলে পারবে না। রমণ বলেছিল—ছি! না। নারায়ণ নারায়ণ! আমার গোবিন্দ আছে। মূর্খ—মূর্খ! গোবিন্দ ওষুদ খেতে বারণ করেন না। আর যদিই করেন—তবে যাও ধর্ম্ম নিয়েই স্বর্গে যাও।

পাল ফিরল মাঠের দিকে। ধান পড়ে আছে, গরু বাঁধা আছে। আজ এ ক্ষেতের ধানটা তুলতেই হবে। শুধু তোলা নয়, আজ কতকটা ধান পিটে কিছু ধানও বিক্রী করতে হবে। পৌষের আজ হল চব্বিশে! জমিদারের লাটবন্দী যাবে আটাশে। তার আগে খাজনা কিছুটা দিতেই হবে। সে না দেওয়াটা দারুণ অন্যায়। চিরকাল দিয়ে এসেছে। তা ছাড়া লক্ষ্মীর আয়োজন আছে। সরস্বতীর কাপড় ছিঁড়েছে, লক্ষ্মীরও কাপড় চাই, নিজেরও চাই, সরস্বতীর ছেলের একটা দোলাই চাই। পূজো থেকে কাপড় হয় নাই। সে আবার মাঠে এসে ধান বোঝাই করতে লাগল। হুস হুস করে বোঝাই করে চলল ধান। বাপরে বাপরে—ধান আর শেষই হবে না যেন। এ গাড়ীতে আর ধরবে না। বোধ হয় এই বেশী হয়ে গেল। বোঝাই ধানের উপরে বাঁশটা দিয়ে শণের রশি টেনে কষে বাঁধতে বাঁধতে একবার ভাবলে পাল। বেশী হয়েছে কিছু। তা হোক। পরক্ষণেই সে হাসলে। বেশী? হায়রে কলিকাল! সে আমল হলে—হায়—হায়—হায়! সে কাল কি আর আছে? সে আমলে পালের একবার একটা বলদ হঠাৎ ম'রে গিয়েছিল—এমনি ভর্ত্তি ধান তোলার সময়। গরুর জন্যে ধান তোলা বন্ধ ছিল না পালের। একদিকে গরু জুড়ে—আর একদিকে নিজে দুইহাতের থাবে জোয়াল ধরে বুক দিয়ে টেনে তুলেছিল ধান! আর আজ এ ধান কটা না হ'লে চলবে না যে বরং আরও চারটি হ'লে ভাল হ'ত। খাজনা লক্ষ্মীর উয্যুগ,—কাপড়! বাঁশটা কষে পাল নিজে গাড়ীর মুখটা একবার তুলে দেখলে। হুঁ—বেশী হয়েছে।—কিরে—কেলে? পারবি না বেটা?

কেলে নিজের নামটা বেশ বুঝিতে পারে। পালের দিকে চেয়ে সে ফোঁস করে উঠল। পাল হাসলে—হ্যাঁ—পারবি। তোর জন্যে তো ভাবি না রে। ভাবনা—ওই ধর্কটি জোয়ানটার জন্যে। বেটা আমার জোয়ান! পায়ে কেবল শিং নাড়ছে। নে চল দেখি। আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন। আপন মনেই পাল গরু দুটোর

সঙ্গে বকতে বকতে গাড়ী জুতলে। ধানের গাদায় লুকানো ছিল সঞ্জীবনী বোতলটা। এক ঢোক খেয়ে—শরীরটাকে চাড়া দিয়ে নিজের শক্তিটা অনুভব করে নিয়ে—বললে চল—চল—বেটা!—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ!

গাড়ীর জোয়ালটা গরু দুটোর কাঁধে চেপে বসেছে; কেলের পিঠ ধনুকের মত বেঁকেছে—পিছনের পা দুটোতে ঠেলা দিয়ে তীরের মত সোজা করতে চাইছে সে। ঘাড়টা টানের চোটে লম্বা হয়ে উঠেছে। নড়েছে! সাবাস বেটা!—আচ্ছা—! জোয়ানটাও টানছে বলিহারি বলিহারি রে বেটা! বাপরে—ধন রে—মাণিক রে!—হ্যাঁয়—হ্যাঁয়—হ্যাঁয়। গাড়ী চলেছে—গাড়ীর ওপর কোঠা ঘরের মত বোঝাই করা ধান—দুলছে মা লক্ষ্মী ছেলে দুলে চলেছেন তার ঘরে।

গাড়ীটা থেমে গেল, শব্দ হ'ল একটা ঘ্যাঁচ করে। একটা আলের কাটে চাকা আটকে গেল। বাঁ দিকে জোয়ান গরুটাকে তাড়া দিয়ে পাল বললে, শালা ভাত খাবার যম তুমি! সে কষে দিলে এক পাঁচন লাঠির বাড়ি। গরুটা টানলে। চাকাটা নড়ল। কিন্তু ওদিকের চাকাটা নড়ল না। কেলে টানছে—মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে তার, কিন্তু চাকা নড়ছে না।

—কেলে লে—বেটা—লে। হ্যাঁয় হ্যাঁয়। কেলে!

চাকা নড়ছে না। কেলে পারছে না টেনে তুলতে।—কেলে! কেলে! পাল খেয়ে নিলে আর এক ঢোক। শরীরটাকে আর একবার চাড়া দিলে। তারপর চাকার কাঠ দুই হাতে ধরে বুক দিয়ে ঠেলতে আরম্ভ করলে। দাঁতে দাঁতে কষে টিপে—বাঁকা শাল খুঁটির মত পালের সর্ব্বাঙ্গ শক্ত হয়ে উঠল। উঠছে—হাঁ উঠেছে! বহুৎ আচ্ছা। উঠে গেছে গাড়ীখানা। আবার চলছে। পালের বুকে, হাতে মুখেও লেগেছে চাকার ধুলো। শরীরটা যেন সেকালের শরীরের মত ফুলে উঠেছে। হাঁ! ঠিক হ্যায়! সে জোয়ানই আছে। শুধু হাঁপ ধরেছে খানিকটা। বুকের ভেতরটা ধড় ধড় করছে একটু বেশী! হাঁ একটু বেশী! পাল একটা দীর্ঘ নিশ্বাস টেনে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। গাড়ীর উপর ধানের বোঝাই ঠিক আছে। হেলছে দুলছে। উঃ! বুকটা নিয়ে সোজা হওয়া যাচ্ছে না। এ কি! এ কি হল? আঃ! নাক দিয়ে কি গড়াচ্ছে গরম? আঃ বুকের ভেতরটা! এক হাত বুকে দিয়ে আর এক হাতে পাল নাকটা মুছলে। এ কি? এ যে রক্ত! এ কি? থর থর করে কেঁপে উঠল পাল। বুকের ভেতর কেমন করছে! চারিদিক কেমন হয়ে আসছে! চাঁদনী রাতে বকের পালকের মত রঙের মলমলে ঢাকা মা বসুমতী—! এ কি! তার এ কি হ'ল?—সরস্বতী, তার ছেলে, লক্ষ্মী, মাঠ ভরা ধান—এ কেলে—। সে দুই হাতে আঁকড়ে ধরলে তার গাড়ীতে বোঝাই ধানের আঁটির ডগা। আঁটির ডগায় ঝলছে ধান। জোরে, সজোরে চেপে ধরল। নইলে পড়ে যাবে সে। গাড়ী চলছিল। পালের দুই হাতের মুঠোর মধ্যে ছিঁড়ে এল মুঠো-ভর্ত্তি ধান। গাড়ী চলে গেল। পাল মাটিতে পড়ে গেল মহা-প্রস্থানের পথে ভীমের মত। বারকতক পা দু'টো ছুঁড়লে—নাকটা মুখটা ঘষলে ক্ষেতের ধুলোর ওপর, এক মুখ ধুলা কামড়ে ধরলে বাঁচবার ব্যগ্রতায়! রক্তে মাটিতে মিশে একাকার হয়ে গেল। ধানভরা মুঠো-বাঁধা হাত দু'খানা প্রসারিত করে দিয়ে সমস্ত আক্ষেপ তার স্তব্ধ হয়ে গেল পরমুহূর্ত্তে।

* * *

সংক্রান্তির শেষ রাত্রে পালের বাড়ীতে পৌষ আগলাতে উঠে সরস্বতী, লক্ষ্মী শুধু কাঁদলে। কাঁদতে কাঁদতেই কোন রকমে পৌষ পুজোর ছড়া বললে। শাঁখটা বাজাতে গিয়ে বাজাতেই পারলে না।

যোগেন্দ্র উঠে বসে ছিল ঘরে। চুপ করে। রমণ মরেছে, মুকুন্দ মরেছে, এইবার—। সে হুকায় করে খোলা জানালাটা বন্ধ করে দিলে।

লাইন-বাবু ও মাল-দিদি

(২৩ পৃষ্ঠার পর)

লালগোপালকে দেখবার জন্যই সাজে গোজে সময় বুঝে সিঁড়িতে এসে হাজির হয়, খাটার বদলে ঝাণ্ডেল লটকায়। না, অস্পষ্ট করতে গিয়ে আরো সে স্পষ্ট করেছে নিজেকে, প্রত্যাখ্যান করতে এসে করছে সে ভিক্ষা। তার শিকার ধরে গেল। আগে যদি বা লালগোপাল ছিল বোকা পাঁঠা, এখন ক্রমশ হয়ে দাঁড়াচ্ছে সে কেঁদো বাঘ। এটা নিশ্চয়ই মালতীর সাধনফলন।

মায়ের সঙ্গে মালতী দূরে তার দেশের বাড়ীতে চলে এল। যত তুমি সরবে, ততই তুমি অনুসৃত হবে। যত দূর তত মধুর। এবার আর ভাবনা নেই। এবার নিঃশেষ নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলতে পারবে নিজেকে। আর মুছে ফেললেই আসবে ঠিক লাল অক্ষরের নিমন্ত্রণ পত্র।

লাল অক্ষরের নিমন্ত্রণ-পত্র পেল প্রথমে লালগোপাল। আগামী পঁচিশে শ্রাবণ মালতীর বিয়ে।

হাতের কাছে খুর পড়ে ছিল খোলা, তাই সে তুলে নিল তক্ষুণি। দাড়িটা কামিয়ে ফেলবার জন্যে নয়, প্রেমানন্দ সন্নেসীকে খুন করবার জন্যে।

মঠের বাইরে থেকে লালগোপাল হাঁক পাড়ল, 'ও সাধু! ও শালা।'

প্রেমানন্দ দয়ার অবতার। বাইরে বেরিয়ে এসে স্নিগ্ধমুখে বললেন, 'কে, লালু? কী খবর?'

'কী খবর। তোমাকে আমি খুন করব। ভণ্ড, জোচ্চোর কোথাকার।' বলে বাঁ হাতে সন্নেসীর টুঁটি টিপে ধরে ডান হাতে সে খুর ওঁচালো। চকিতে লক্ষ্য করে দেখল, যেটা সে হাতে করে নিয়ে এসেছে, সেটা খুর নয়, চিরুণি। ইদানি দাড়ি চুলকোতে সে চিরুণিই ব্যবহার করছে।

'মারবে তো, এত ব্যস্ত কেন?' প্রেমানন্দ সাহস পেয়ে বললেন সহজ গলায়।

'শম দম ত্যাগ তিতিক্ষা আজ আর আমার কিছু নেই—'

'কেন, হয়েছে কী?'

'হয়েছে কী! সর্বনাশ হয়েছে! আসছে শনিবার মালতীর বিয়ে।'

'মালতীর বিয়ে!'

'ধোঁকা দিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত ধোঁয়া বানিয়ে ফেললে. এখন তুমি ন্যাকা সাজছ? গেঁজেল, গাড়োল কোথাকার? এই তোমার নিবৃত্তির পুরস্কার?'

'মালতী পাল দিল বলে মন ভার করে এলাম তোমার কাছে সান্ত্বনার জন্যে, তুমি আমাকে খুব নিবৃত্তির পথ বাৎলে দিলে। বললে, না-চাওয়ার মধ্যেই পাওয়া—দূরে ঠেলার মধ্যেই বুকে টেনে আনা। তখন কি জানতাম তুমি চণ্ডু খাও? কি একটু ও কঠিন হয়েছিল বলে আমি তোমার পরামর্শে একেবারে একটা মূর্তিমান কঠোপনিষৎ হয়ে গেলাম? তখন কি জানতাম তুমি একটা চোর, ধাপ্পাবাজ?'

'নিবৃত্তির পথ কি কখনো ধাপ্পা হতে পারে, বেটা?'

'নিবৃত্তি? কী পেলাম এই নিবৃত্তিতে? দাড়ি, ঘামাচি, চুলকুনি আর পাঁচড়া। প্রথম বুড়ো আঙুল দেখাল, পরে নাকের সঙ্গে জিভ ঠেকিয়ে মুখ ভেংচাল, শেষে জানলার শিকের সঙ্গে ঝাঁটা ও জুতো ঝুলিয়ে দিল। তবু আমি তোমার কথা শুনে নিবৃত্তির নরকে ধুঁকে মরতে লাগলাম। তখন কি জানি, তুমি পানের সঙ্গে কোকেন খাও? হাতের কাছ দিয়ে উড়ে গেছে, নিবৃত্তির কথা ভেবে পথ আগলে দাঁড়াইনি। দেখা হয়েছে নির্জনে, নিবৃত্তির কথা ভেবে নিজের উপর গর্জন করে উঠেছি। বলো, কি ফল হল তার? বলো, দু'দিন এখনো বাকি আছে বিয়ের, বলো, এখন আমি কী করব?'

'আমার সঙ্গে চলে আয়, বেটা। নিবৃত্তিতে পরানন্দ, পরা শান্তি! নিজের নিবৃত্তিতে যত সুখ, পরকে নিবৃত্ত করে তারো চেয়ে বেশি সুখ। সে একটা মহাভোগ, পরকে নিবৃত্ত করবার প্রচারে। আমার চেলা হয়ে চলে আয়, বেটা। তোর নাম রাখব ক্ষেমানন্দ। দাড়ির এমন মোটা পত্তন অকারণে নষ্ট হতে দিসনে, বেটা।' প্রেমানন্দ সস্নেহে লালগোপালের গালে একটু হাত বুলিয়ে দিলেন।

'কাকে তুই বেটা বেটা করছিস?' বলে সন্নেসীর চাঁছা ছোলা গালে লাল-গোপাল চোয়াড়ে হাতে প্রকাণ্ড চড় বসিয়ে দিল। 'তুই যে আমার শ্বশুরের বেটা তার খবর রাখিস?'

(৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পিণ্ডিতত্ত্ব

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

পানদোষে অন্যান্য অনেকেই কারণে অকারণে অল্পবিস্তর সন্তাপগ্রস্ত হইয়া থাকেন। সত্যটি অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কার এমন কথা বলিতেছি না, তবে ব্রজেন্দ্রবাবু সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। ভদ্রলোক সারাটা জীবন আদর্শ চরিত্র অক্ষুন্ন রাখিয়া হঠাৎ প্রৌঢ় বয়সে বিগড়াইয়া গেলেন। সন্ধ্যার দিকে একটু চুকু চুকু না করিতে পারিলে ক্ষুধা মন্দ হয়, প্রাণটা আনচান করিতে থাকে। "এবয়সে ক্ষুধা মন্দ হওয়া খুবই স্বাভাবিক, অতএব ঔষধ হিসাবে একটু আধটু চলিতে পারে বৈকি"—কৃপাপ্রার্থী দরদীর দল সোৎসাহে এবং একযোগে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ব্রজেনবাবু সদাশয় ব্যক্তি, অকারণ কাহাকেও ক্ষুন্ন করিতে চাহেন না, দরদীদের সদুপদেশ তিনি মানিয়া লইয়াছিলেন। গোড়ার দিকে একটু আধটুর উপর দিয়াই গোপনে স্বাস্থ্য ঠিক রাখিতেছিলেন। ক্রমান্বয় স্বাস্থ্যোন্নতির প্রকরণ এমন একটা পর্য্যায়ে আসিয়া উপস্থিত হইল যখন গোপন করিবার ইচ্ছায় গলদ না থাকিলেও মাত্রায় বেসামাল হওয়ার দরুণ গোপন খবর তাঁহার অজ্ঞাতেই কেমন করিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছিল।

মাত্রায় বেসামাল হইলে কি হইবে, আসল ব্যাপারে কিন্তু মানুষটি ঠিক ছিলেন, ধরা পড়িলেও সহজে ধরা দিতেন না। বাধ্যতামূলক গৃহিণীর সান্নিধ্য ঘটিলে যথাসম্ভব সহজ মানুষের মত দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেন তথাপি গন্ধের উগ্রতায় সন্দিগ্ধ হইতে দেখিলে সুবোধ বালকের মত দোষ স্বীকার করিয়া ফেলিয়া বলিতেন—"একটু বেশী হয়ে গেছে।"

দেহী মাত্রেরই কোন না কোন সময় কম বেশী অসুস্থ হইয়া পড়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এইরূপ ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ের ভার চিকিৎসকেই লইয়া থাকেন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রবাবুর পরিবারে অন্য ব্যবস্থা হইয়াছে। শুধু রোগ নয়, সংসারের যাবতীয় অঘটনের কারণ গৃহিণী নির্ণয় করিয়া থাকেন এবং বৈজ্ঞানিক প্রথায় বিশ্লেষণ শেষ হইলে, অধিকতর দুর্ঘটনার জন্য বাড়ীর সকলকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হয়।

কয়দিন ধরিয়া ব্রজেনবাবুর সকালে মাথা ধরিতেছিল। সেদিন সজ্জনতার অবর্জনীয় ধর্ম দিবানিদ্রা সারিয়া অপরাহ্নের দিকে নীচে নামিতেছিলেন, মাঝপথে উপর হইতে স্ত্রী সতর্ক করিয়া দিলেন—নিজের পিণ্ডিগুলো যেন নিজে না গেলেন। অধুনা জীবিতাবস্থাতেই তাঁহার শ্রাদ্ধক্রিয়া গৃহকর্ত্রী প্রত্যহ একাধিকবার সারিয়া থাকেন, সুতরাং নিজের পিণ্ড নিজে না গিলিলে জীবনধারণেরও আর কোন প্রশস্ত উপায় নাই।

আজ্ঞাকারীর বিধান চরম মীমাংসা, "তথাস্তু" বলিয়া ব্রজেনবাবু নীচে নামিলেন। ব্রজেনবাবুর কলিকাতার বাড়ীতেই অন্দর ও বাহির মহল আছে। উভয়ের চৌহদ্দির সীমানা পূর্ব্বপুরুষরা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন একেবারে পাকা পাঁচিল তুলিয়া। তখনকার দিনে বাহির মহলের মজলিসি কথা ভিতর মহলে বড় একটা আসিত না এবং আসিলেও তাহা লইয়া তত কেহ মাথা ঘামাইত না। পুরবাসিনীরা সকলেই জানিতেন পুরুষরা একটু আধটু ওসব করিয়াই থাকে। কিন্তু নবযুগের প্রভাবে এই সংস্কারেই অনেক পরিবর্ত্তন আসিয়া গিয়াছে। সোমত্ত বয়সের মেয়েরা পড়িতে পড়িতে কলেজ পর্য্যন্ত পাড়ি মারিতেছে। পাড়ার পাতান দাদাদের সহিত অবলীলাক্রমে বাহির মহলের বুকের উপর দিয়াই হাঁটিয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইতেছে, সিনেমা দেখিতেছে এবং বাড়ী ফিরিয়া পরপুরুষের শ্রীবদনের প্রশংসা করিতে করিতে দীর্ঘনিঃশ্বাসের ঝড় তুলিয়া ছাড়িতেছে। নবজাগরণে কন্যাদের সহিত গৃহকর্ত্রীও যোগ দিয়াছেন। প্রগতির খরস্রোতে অন্দর বাহির একাকার হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন সনাতন আবরু আর নাই বলিলেই চলে। যে-আবরুর নতুন চাল এমনভাবেই প্রশ্রয় পাইয়াছে যে, দিবা দ্বিপ্রহরে একদিন গৃহিণী সশরীরে নীচে নামিয়া ব্রজেনবাবুকে খাস বৈঠকখানায় মালসহ গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। বাহির মহলে অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক উপদ্রবের পর হইতে কর্ত্তা সাবধানী হইয়া গিয়াছেন। যথেষ্ট সময় থাকিতে গৃহিণীর আগমনবার্ত্তা জানিবার নিমিত্ত নানারূপ সাঙ্কেতিক কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন। সঙ্কেতগুলি শব্দধ্বনি ও মুদ্রার দ্বারা ভৃত্যের সহিত আদানপ্রদান হইয়া থাকে। আত্মরক্ষার জন্য উক্ত প্রথা বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছে।

পিণ্ড না গিলিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিলেন সত্য, কিন্তু বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতেই অনেকটা নিরাপদ ভাবিবার সুবিধা পাইলেন। এইরূপ সুবিধা সম্বন্ধে মন স্থির হইলেই তিনি খগেনকে ডাকিয়া থাকেন। সেদিনও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই, কিন্তু উত্তর পাওয়া গেল না—খগেন তখনও আরাম করিতেছে। সে হইল খাস কর্ত্তার পুরাতন ও পেয়ারের ভৃত্য। তাহার চালচলন সাধারণের মত হইলে চলিবে কেন? বৈঠকখানায় গভীর রাত্রে সঙ্গীর অভাব ঘটিলে বাবুর হুংকার প্রসাদ পাইয়া থাকে এবং রং গাঢ় হইলে দুই চারিটা খোস গল্পও যে না চলে এমন কথা বলিতেছি না। উত্তর না পাইয়া ব্রজেনবাবু দুইবার গলা খাঁকরানি দিলেন। গৃহিণী বহির্গমনের পক্ষে যে সঙ্কেত নির্দিষ্ট ছিল তাহা বেতারবার্ত্তার মতই সুদূর অপরপ্রান্তেও ধ্বনিত হইল। অনতিবিলম্বে খগেন মুখে হাতে জল দিয়া বাবুর সামনে আসিয়া খাড়া হইবার কাশিল।

ব্রজেনবাবু মাথা দুলাইয়া অসম্মতি জানাইলেন, তৎসহিত একটি "না" শব্দ উচ্চারিত হইল। তাহার পর তুড়ী মারিয়া হাই তুলিয়া বলিলেন, "দুর্গে দুর্গতি নাশিনী"। তুড়ী, হাইতোলা এবং দুর্গতিনাশিনীর যোগাযোগে যে অর্থ দাঁড়াইল তাহা এইরূপ—"অপরিতৃপ্ত বৎস, এখন যোগাসনে বসিবার সময় আসে নাই, চতুর্দ্দিকে বিঘ্নের সম্ভাবনা অনুভব করিতেছি—কর্ত্রীঠাকুরাণী বঁদে বাহির হইয়াছেন। বিঘ্নের সম্ভাবনা তিরোহিত হইলেই দীক্ষার ব্যবস্থা করিব।"

ভৃত্য ও শিষ্য বিরূপায় হইয়া কাতরস্বরে বলিল—"তাহলে বাবু কবু"লটা তৈয়ার করে আনি?" ব্রজেনবাবু এবার সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়া বলিলেন "হুঁ।" সাধক শিষ্যের অনুরোধ কতই আর প্রত্যাখ্যান করা যায়।"

তৈয়ার করসি যখন আসিল তখন তাহার রূপান্তরিত কলেবর দেখিয়া শুধু অবাক হই নাই, মুগ্ধ হইয়া গেলাম। অপূর্ব্ব সাঙ্কেতিক ভাষা। তৈয়ার করসি আসিয়াছে স্বচ্ছ কাচের জলপাত্রের রূপে। আধারস্থ বস্তুর বাহ্যিক আকার জলেরই মত কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করিলে জলবৎ পদার্থটি 'জিন্' বলিয়া প্রমাণিত হইবে। পান করিলে রীতিমত রং ধরে,—ধরা না পড়িলে জল বলিয়া মানিতে হয়।

যে সময় ছদ্মবেশী 'জিন্' ব্রজেনবাবুকে কল্পনা-রাজ্যে অগ্রসর করিয়া দিতেছিল ঠিক সেই সময়ই বিপদের আশু সূচনা বৈঠকখানার আনাচে কানাচে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। গুরুবন্দী চাবির আওয়াজ দূরে শুনা যাইতেছিল। কথায় বলে "যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যা হয়।"

তৈয়ার জলাস দিয়া খগেন আটপৌরে করসি আনিতে বাহির হইয়াছিল, মাঝ পথ হইতে ফিরিয়া দরজার নিকট বাঘের আগমনবার্ত্তা ফেউ ডাকার মত বলিয়া গেল, "সরবৎ" অর্থাৎ বাঘ এই রাস্তাতেই আসিতেছে।

শিষ্য সরবৎ বলিয়া সরিয়া পড়িতেই গৃহিণী ঘরে ঢুকিলেন এবং কিছুমাত্র গৌরচন্দ্রিকা না করিয়া বলিলেন—আজ তাহলে কিছু খাচ্ছ না তো?

কর্ত্তা অবাক হইয়া মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। গৃহিণী সেদিকে দৃকপাত না করিয়া বলিয়া চলিলেন "তিন, চারদিন ধরে মাথাধরা রয়েছে মানেই লিভারটি একেবারে গেছে—শেষ পর্য্যন্ত "সিরোসিসে" না গিয়ে দাঁড়ায়।"

অসুখ বিসুখের নাম সম্বন্ধে ব্রজেনবাবুর তেমন অভিজ্ঞতা নাই, কিন্তু গৃহিণীর আছে। তিনি ডাক্তারের দৌহিত্রী, উত্তরাধিকারীসূত্রে চিকিৎসা বিদ্যার অনেক জটিল জ্ঞান তাঁহার উপর বর্ত্তাইয়াছিল। পরিবারে ছোটখাট চিকিৎসায় কাজ তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজেই সমাধান করিতেন এবং রোগ সঙ্কট অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইলে বলিতেন, "তাদের সবরকম জবুথবু পড়েছিল তা না হলে 'মেয়ায়"

ভাবী বৈবাহিক মহাশয়ের মনে তখন রং লাগিয়াছে, কন্যার অপূর্ব্ব গঠন দর্শনে একটি অবান্তর উচ্ছ্বাস প্রকা- রিয়া ফেলিলেন

অর্থাৎ লোকটা এমনেও মরিত, ওষুধের গুণে কয়েকটা দিন বেশী বাঁচিয়া গেল।

ব্রজেনবাবু নীরবে নিজের ভাগ্যের কথা ভাবিতেছিলেন, এমন সময় পুনরায় গৃহিণী জিজ্ঞাসার অছুহাতে আদেশ করিলেন—"আজ কিছু খাচ্ছ না তো ?"

ব্রজেনবাবু ভীত ও সপ্রশ্ন নয়নে স্ত্রীর দিকে তাকাইলেন।

দৃষ্টির অর্থ গ্রহণ করিয়া স্ত্রী ব'লিলেন, —ওসব ভালমানুষি আমি বুঝি তোমাকে জানাতে এলাম আজ রাত্রে তুমি খাচ্ছ না।

দুঃসংবাদ দিগম্বররূপে প্রকাশিত হওয়ায় গৃহিণীর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ব্রজেনবাবুর মর্ম্মে প্রবেশ করিল,—কৃপা-প্রার্থীর ন্যায় তিনি বলিলেন—খাচ্ছি না, কেন ?

গৃহিণী বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন, —এক কথা আর কতবার বলব ? তোমার লিভারটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে, কিছুদিন সাবধানে না থাকলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে যে।

রোগ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলে গৃহিণী শ্রাদ্ধের কথাই সচরাচর তুলিয়া থাকেন। কিন্তু এখন তাহ' বলিলেন না, তবু রক্ষা! ব্রজেনবাবু শুধু নীরব রহিলেন না, নিস্পন্দ হইয়া গেলেন। এমত অবস্থায় গৃহিণীর সামনে চুপ করিয়া থাকাই এ বাড়ীর নিয়ম।

আদেশ শিরোধার্য্য হইয়াছে বুঝিয়া চাবির গোছা ঝনাৎ করিয়া পিছনদিকে ফেলিয়া ফিরিবার পথে বলিয়া গেলেন —সকাল সকাল উপরে এস, বুঝলে ? রাত কোর না রোজকার মত। ক্যাষ্টর অয়েলটা খেতে হবে মনে থাকে যেন। ফেনা ভাত তোমার, তার ওপর ওষুধ খাবার সময় প্রাকামিটি আছে ষোল আনা। গরম চায়ের সঙ্গে মিশেয়ে দেব'খন, সে চমৎকার লাগবে।

শুভ খবরটি শুনাইয়া গৃহিণী বৈঠকখানা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন। ব্রজেনবাবু গুম হইয়া বসিয়া আছেন। কিছুক্ষণ বাদে খগেন এদিক ওদিক চোরাই চাহনী হানিয়া যেন পিছলাইয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল এবং ঢুকিয়াই বলিল—তা'হলে রামপাখীর ওটা কি হবে বাবু ?

চতুর চাকর—কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সব কথাই কোন গোপন স্থান হইতে শুনিয়াছিল। পক্ষী মাংসটির প্রতি খগেনের অসাধারণ পক্ষপাতিত্ব ছিল। কুক্কুটের পদলেহন সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হওয়ায় প্রশ্নটি অন্তঃ-প্রবাহে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

সমস্যার কথা—একদিকে লোভনীয় কুক্কুটের মাংস একযোগে চাট ও আহার অপর দিকে এরণ্ড তৈল! তিন চারবার কপালে তর্জ্জনীর দ্বারা টোকা মারিয়া শ্লেষ্মা বহিষ্করণের সঙ্কেত দিয়া ফেলিলেন। খগেন মনে মনে হুতোর বলিয়া চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই বড় রেকাবে সুদৃশ্য ভাবে সাজাইয়া আসল জিনিষ লইয়া ফিরিল এবং ক্ষিপ্রতাসহ ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। ইতিমধ্যে সাহা মহাশয় ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন। সাহা মহাশয় ব্রজেন্দ্রবাবুর বাল্যবন্ধু। তাঁহারই দোকানের মাল এখানে সরবরাহ হইয়া থাকে। ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন,— কাল আসল ফরাসী মাল পাঠিয়েছিলাম, কেমন লাগল ?

তাঁহারই পাঠান মাল সামনে মজুত, এক চুমুক গলাধঃকরণ করিয়া ব্রজেনবাবু বলি-লেন,—রোস, ভেতরের কাজ না দেখে তো বলা যায় না। বিচার ঠিক করিবার জন্য দ্রুত আর দুই পেগ খাইয়া ফেলিলেন। খগেন জানিত এই সময় তাকিয়ার প্রয়োজন হইয়া থাকে, যথাস্থানে তাকিয়াটি রাখিয়া দিল। দেহভার তাহার উপর চাপাইয়া ব্রজেনবাবু প্রশ্ন করিলেন,—আচ্ছা বলতো ভাই সা—রেড়ীর তেল সুস্বাদু হলে কি রকম খেতে লাগে ? সা মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—ভাল রেড়ীর তেলের মতই।

ব্রজেনবাবু—ভেবে দেখ, গিন্নী আজ এই ভাল জিনিষ খাবার জন্য স্বয়ং এসে নিমন্ত্রণ কোরে গিয়েছেন। এখন কি করা যায় বলত ভায়া ?

সা মশাই বলিলেন,—পেটে কিছু না পড়লে বুদ্ধি খোলে না। কে হে, আমার ভাগটা কি হোল খগেনচন্দ্র ? সা মশাই বুদ্ধিমান এবং ব্যবসায়ী লোক। মালে ভাগ চাহিয়াছিলেন নিরবচ্ছিন্ন গুণাগুণ বিচার করিয়া দিবার জন্য। বন্ধুলোককে তো প্রতারণা করা যায় না! জবরদস্ত চুমুক দিয়া বলিলেন,—ভাল মাল হে!

ব্রজেনবাবু—তাই তো মনে হচ্ছে, কিন্তু ক্যাষ্টর অয়েলের কথা ভাবতেই সব যে মাটি হয়ে যাচ্ছে।

সা মশাই বিশেষ চিন্তার পর বলিলেন, —তুমি যে ভাবিয়ে তুললে হে। আমি বলি এবারটা তুমি গৃহিণীর কথাই রাখ—ওটা খেয়ে ফেল। খেতে তেমন মুখরোচক না হ'লেও ফল ওতে ভালই হয়।

ব্রজেনবাবু চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন,—অ্যাঁ, বল কি ? খেয়ে ফেলব ? এবার নিয়ে এই মাসের ভিতরই যে তিনবার হয়ে গেল, সে খবর রাখ ?

সা মশাই তা হোক, গিন্নী যখন বলছেন, তখন তাঁর অনুরোধটা রাখা উচিত। লিভারের কাজ ঠিক হচ্ছে না এইটুকু মানলেই যদি গোল মিটে যায়, তাহ'লে মেনে নেওয়াই তো ভাল। ঘরোয়া মনকষাকষি পুষে রাখতে নেই বুঝলে হে।

ব্রজেনবাবু বন্ধুর উপদেশে খুশিত হইয়া

গেলেন— বল কি, একটা গোটা মুরগী রোজ হজম কোরে ফেলছি, তবু আমার লিভার খারাপ কি রকম ?

এ কোন দেশী অমুরোধ অসুখ নেই তবু মেনে নিতে হবে আমি অসুস্থ !

সা মশাই— দেখ, তোমার শরীর খারাপ হ'লে তোমার চেয়ে আমারই ক্ষতি বেশী। বাজে মাল খেয়ে খদ্দেররা দোকান বদলি কোরে ফেলবে। তোমার এখানে চেখে নিয়ে তবে আমি খদ্দেরকে জিনিষ ছাড়ি কিনা। ভেবে দেখ, আমি তোমার জন্যেই ক্ষতি স্বীকার কোরে নিচ্ছি।

কথাটা সত্যই বটে, ব্রজেনবাবুর শরীর খারাপ হইলে সা মহাশয়েরই ক্ষতি বেশী। নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ব্রজেনবাবু মানিয়া লইলেন তাঁহার যকৃতের কাজ ঠিকমত চলিতেছে না।

কিছুদিন পরের কথা—ব্রজেনবাবু সুস্থ দেহে পথ্য খাইতেছেন। সা মশাইও প্রত্যহ আসিতেছেন এবং মাল চালানও যথা-নিয়মে চলিতেছে। মাঝখান হইতে সা'-মশাইয়ের কাজ বাড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে কোন বিশিষ্ট তাজা সামগ্রী পরীক্ষা করিলেই তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইত। ব্রজেনবাবুর যকৃত অচল হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন লেবেলমারা জিনিষ আসিতেছে। এ অবস্থায় তো কড়া জিনিষ দেওয়া চলে না। প্রাণের আনচান্ ভাবটা সামলাইবার জন্য নেহাৎ যেটুকু পথ্যের উপযুক্ত না দিলে নয় তাহাই দিতেছেন। গৃহস্থের বাড়ীতে যেমন বাসী মড়া রাখিতে নাই সেইরূপ মার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন হইতে হইলে বোতলে উদ্বৃত্ত অংশও বাসী হইতে দেওয়া শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। সা মশাই বন্ধুর অকল্যাণের ভয়ে দুই একটা খাজহীন বোতল একেবারে ফাঁপা করিয়া রাখিতেছিলেন।

বাধ্যতামূলক রোগের তদ্বির তো আছেই, তদুপরি আর এক উপদ্রব আসিয়া জুটিল। ব্রজেনবাবুর বড় মেয়ের পাকা দেখার দিন স্থির হইয়া গিয়াছে। বরপক্ষীয়রা এমন একটি সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন যখন ব্রজেনবাবু আনচান্ ভাবটা কাটাইবার অবকাশ পান। সঙ্কটাপন্ন হইয়া শুভাকাঙ্ক্ষী সা মহাশয়কে ব্রজেনবাবু আসন্ন দুর্দ্দিনের কথা বলিয়া ফেলিলেন।

ঘটনাচক্রের ফলে ব্রজেনবাবুর ভাবী বৈবাহিককে সা মহাশয় চিনিতেন। পরিচয় ঘোড়দৌড়ের মাঠে। বাজি মারিয়া ভদ্রলোক সা মশাইয়ের টেল-এ জিনকে জানাইয়াই পান করিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবার ভার সা মহাশয়কেই লইতে হইয়াছিল। ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত সা মশাই-এর দরদকে মধ্যস্থ করিয়া।

সা মশাই বলিলেন,—আরে, তুমি অত ঘাবড়াচ্ছ কেন ? তোমার বেয়াইকে আমি চিনি, অনেক দিনের আলাপ। লোকটা ঘু ঘু মার্কা হে, ডুবে ডুবে জল খায়। আমাদের তুলনায় নেহাৎ ছোকরা, কাঁচা বয়সে বিয়ে করার ফলে ছেলে বড় হ'য়ে উঠেছে।—কুছ পরোয়া নেই, আসুক তোমার বেয়াই। শর্ম্মা যখন রইল তখন ভয়টা কিসের, সব লালে লাল কোরে দেব'খন।

ব্রজেন্দ্রবাবু সা মশাই-এর প্রস্তাব শুনিয়া আতঙ্কিত হইয়া গিয়াছিলেন, বলিলেন—তাই গিন্নী যদি জানতে পারে ?

সা মশাই বক্ষের উপর পালোয়ানি চাপড় মারিয়া উত্তেজিতভাবে বলিলেন,—তবু কুছ পরোয়া নেই, সে আমি দেখে নেব।

মেয়ে দেখার দিন। ব্রজেন্দ্রবাবু আজ একটু আগেই নীচে নামিতেছিলেন। প্রত্যহ এই সময়টিতে মগুপানহেতু অনিবার্য্য ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনার কথা কর্ত্রী স্মরণ করাইয়া যান। কর্ত্তা ভাবিয়াছিলেন আজ অন্ততঃ রেহাই পাইবেন। কন্যার পাকা দেখার দিন, বিশিষ্ট অতিথিদের অভ্যর্থনার আয়োজনের নিমিত্ত ব্যস্ত থাকিবেন। কিন্তু দৈনন্দিন নিয়মে ব্যতিক্রম ঘটিল না। মোটা চটির আওয়াজ শুনিয়াই গৃহিণী হন্তদন্ত করিয়া সিঁড়ির চাতালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্থূল দেহভার দ্রুত বহন করায় হাঁপাইয়া গিয়াছিলেন, তাহার উপর অপ্রীতিকর কর্ত্তব্য সাধন। অন্যদিন অপেক্ষা কঠোর হইয়াই বলিলেন,—"মাথাধরা লুকিয়ে রেখে আমায় হাড়গোড় জালিয়ে খেয়েছ। পৈ পৈ কোরে বারণ করেছিলাম এখন হোল তো, আমার কথা ফলল তো ! লিবারটি একেবারে গেছে, বুঝেছ ?

মাথাটা আসলে ব্রজেন্দ্রবাবুর কিনা সে বিষয়েই সন্দেহ উঠিয়া পড়িয়াছে, তবু তিনি উত্তর দিলেন,—আমার মাথাধরা তো কবে সেরে গেছে।

গৃহিণী তেলে বেগুনে জলিয়া উঠিলেন, —বলিয়া চলিলেন,—কি বললে, সেরে গেছে ? আহা কথার কি ছিরি ! একে মাথাধরা তার উপর আর একটি বাধিয়েছেন,—দাঁতের বেদনা। সে দিন রাত দুপুরে ফোমেণ্টেসন্ দিতে দিতে মরি, এ সব ঐ ছাই, পিণ্ডি গেলার জন্যেই তো। সেরে গেছে ? আমার কথা না শুনে যা খুসী করবেন। তার ফলে আমার গতরখানি পর্য্যন্ত যেতে বসেছে।

শত্রুর মুখে ছাই দিয়া বলিতে পারি কর্ত্রী ঠাকুরাণীর গতর যাইয়াও যেটুকু আছে তাহা একটি বুভুক্ষু শার্দ্দূল পরম পরিতোষের সহিত দুই দিন আহার করিতে পারে।

দাঁতের বেদনা আগের ঘটনা। তখন ব্রজেন্দ্রবাবু গোটা দুই দাঁতের মালিক ছিলেন এবং অধম দাঁত বলিয়া দারুণ যন্ত্রণাও অনুভব করিয়াছিলেন। ডাক্তারের পরামর্শ লইতে যাওয়ায় তিনি দক্ষিণার সহিত দুইটি দাঁতও তুলিয়া রাখিয়া দিলেন। উপযুক্তভাবে প্রতিবাদ করিবার পূর্ব্বে দাঁত ডাক্তারের হস্তগত হইয়া গিয়াছিল। সাফাই হাত নিস পিস করিতেছিল—ভীত রোগীকে দেখিয়া কর্ত্তব্যবোধকে ডাক্তার বাধা দিতে পারেন নাই। তিরস্কারের নব উদ্ভাবিত কারণ ডাক্তারদত্ত বাঁধান দাঁত উপলক্ষ করিয়া। ভাবি বৈবাহিক মহাশয়ের সামনে ফোগলা মুখ লইয়া বাহির হইতে চান নাই, সেই কারণে সকালে নব-নির্ম্মিত দন্তপংক্তি মুখ গহ্বরে পুরিয়াছিলেন। নবাগতের সংস্পর্শে জিহ্বা ও তালুর সংঘর্ষণ দারুণভাবে অস্বস্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল, আপন মনেই বলিয়াছিলেন,—ইস্ লাগে যে, তালুটা শেষ পর্য্যন্ত কেটে যাবে নাকি ? বমি আসে যে, ইত্যাদি। উক্ত পীড়নজড়িত আত্মপ্রশ্নগুলি সশব্দে উচ্চারিত হওয়ায় কর্ত্রী ঠাকুরাণী কুটনা কুটিতে কুটিতে অলক্ষ্যে শুনিয়া ফেলিয়াছিলেন। ফলে আসল দাঁতের কথা বিস্মৃত হইয়া নকল দাঁতকে উপলক্ষ করিয়াই ফোমেণ্টেসনের কথা মনে পড়িয়া গিয়াছিল। ব্রজেনবাবুর প্রতিবাদ করিবার সাহস নাই। গত্যন্তর না থাকায় বাঁধান দাঁতের বেদনা লইয়াই নীচে নামিলেন।

ঘরে ঢুকিয়াই লক্ষ্য করিয়াছিলেন কেমন একটি জমকাল ভাব। অনেকগুলি ভাড়া করা তাকিয়া ও ফুলদানী আসিয়াছে। ফুলদানী দুইটিতে বড় স্বদেশী জমাট তোড়া। ফুলগুলিকে ঠাসিয়া কৃত্রিম সৌন্দর্য্যে অভিষিক্ত করা হইয়াছে। তাহারই মধ্যস্থলে সা মহাশয় আমীরি চালে বসিয়া আছেন, বেশের পারিপাট্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চাল-চলনে মৌজ লাগিয়াছে, চক্ষু দুইটি রক্তিমাভ ও ঢুলুঢুলু।

ব্রজেন্দ্রকিশোর ঘরে ঢুকিতেই সা মহাশয় সম্বর্দ্ধনা জানাইলেন "স্বাগতম্"। তোমার বেয়াইকে আজ 'শ্যাম্পেনে' চুবিয়ে দেব, বুঝলে কিনা। খরচের কথা ভেব না, ধীরে সুস্থে চুবিয়ে দিলেই হবে। তুমি তো ঘরের লোক। তোমার এখানে মাল দেওয়া মানে কাঁচা টাকা লক্ষ্মীর সিন্দুকে তোলা।

ব্রজেন্দ্রবাবু বলিলেন,—তুমি যে দেখছি আগে থাকতেই চালিয়েছ, অ্যাঁ ? দেখো ভাই, বেয়াইমশাই যেন আমাদের মাতাল না বলে যান।

সা মশাই তখন সুরা-বিরোধীদের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়া ফেলিয়াছেন। ব্রজেনবাবুর অর্থহীন আতঙ্কে গুরু ঊর্দ্ধদিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন,—দামী মাল খেয়ে যদি একটু নেশাই না হল তো পয়সা খরচ কোরে লাভ ? রং চড়া মানেই তো একটু মকারের আত্মপ্রকাশ। অবশেষে তুমিও কিনা যে রসিকের খপ্পরে পড়লে !

সা মহাশয়ের যুক্তিগুলি অকাট্য। সত্যই মগুপ যদি উপযুক্ত পানের পর মাতাল বলিয়াই প্রতিপন্ন না হইল তো সরল জলে তুষ্ট থাকিলেই হয়। তিনি নিজের দোকানেই দেখিয়াছেন কেবলমাত্র স্পিরিটের গন্ধ শুঁকিয়া লোকে মাতলামির ভান করিয়াছে। ইহার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিলে জানা যাইবে, মাতাল হইবার পিছনে গৌরবাত্মক প্রতিষ্ঠার একটি গাঢ় আকাঙ্ক্ষা আছে। সা মহাশয়ের যুক্তিতে মাতাল নয় কে ? ধার্ম্মিক হইতে রাজনৈতিক,

শিল্পী, কবি সব মাতাল, যে যাহার পেশা অনুসারে আনন্দের নিমিত্ত প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক চিন্তা করিয়া থাকে। শুধু চিন্তা করিয়া থামিলেও যা রক্ষা ছিল, চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অধ্যবসায়কে অদমনীয় করিয়া তোলে কাজে আত্মহারা হইয়া যায়। এইরূপ আত্মহারা হওয়া সাধারণ সুস্থ মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক। চিন্তাগ্রস্ত ভিন্নপন্থী আত্মহারাকে লোকে বলে কাজে মাতিয়াছে, অথচ একটু মদ পান করিয়া আত্মহারা হইলেই সে হইল মাতাল। সুবিচার বটে। কাজে মাতিয়া যাহারা আত্মহারা হয়, তাহারাও অনেক সময় কর্মব্রতে নিজের খাইয়া বনের মোষ তাড়াইয়া থাকে, অনেক ভুলচুক করিয়া থাকে। মাতালও আনন্দের উদ্দেশ্যে খরচ করিয়া মসগুল হইতে চায়। ধার্ম্মিক, রাজনৈতিক, শিল্পী, কবি কাজ করিয়া অনুকূল ঘটনাচক্রের ফলে একের অধিককে শান্তি ও আনন্দের উপকরণ যোগাইয়া থাকে, মাতাল নিজের আনন্দেই বিভোর হইতে চায়—সুতরাং মাতালের সংখ্যা যদি বাড়িয়া যায় তো আনন্দ ভোগের অধিকারীও ভিন্নভাবে বাড়িয়া যাইবে এবং সমাজের সব মানুষই যদি মাতাল হইয়া আনন্দে বিভোর হইয়া থাকে তো দুঃখের প্রশ্নই ওঠে না। আনন্দ সংগ্রহই মানুষের চরম লক্ষ্য, প্রভেদ কেবল স্তর ও প্রকরণে। তাহাও কাল, আবেষ্টনী এবং ব্যক্তিগত রুচি হিসাবে বিচার সাপেক্ষ।

উক্ত যুক্তি সাহা মহাশয় ব্রজেনবাবুকে দীক্ষা দিবার পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছিলেন, তাহার ফলে আজ ব্রজেনবাবু সিদ্ধপুরুষ। সিদ্ধিলাভের পরেও মদ খাইয়া মাতাল হইলে যে মানুষ মাতলামীকে অপকর্ম্ম ভাবিতে পারে, তাহাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিতে হয়। আত্মাভিমান থাকিলে এমন কথা সুরার উপাসক বলিতে পারে?

সা মহাশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, বলিলেন—আমাদের মাতাল বলবে কি হে? মদের ব্যাপারে আমি বনেদী ঘরের ছেলে, চোদ্দপুরুষ এই কারবার কোরে এল। আসুক তোমার বেয়াই তাকে যদি ......, কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ব্রজেনবাবু সা মহাশয়ের মুখে হাত দিয়া বলিলেন—ওহে আস্তে, আস্তে, গিন্নী এদিকে আজ দুই একবার হানা দেবেই। প্রতিমার ভাবী শ্বশুরের চেহারাটা নয়ন ভুলান রাজপুত্তুরের মত তাতো জান? বরণ কাঁচান শ্রীবদন এক আধবার না দেখে কি গিন্নী চুপ করে থাকবেন?

সাহা মহাশয় কর্ত্রী ঠাকুরাণীর নাম শুনিয়া শান্ত হইলেন বটে, কিন্তু পৌরুষকে খর্ব্ব করিতে পারিলেন না। বলিলেন—আজকের দিনে মেয়েদের অত ভয় কোরতে নেই, তুমি হলে বাড়ীর কর্ত্তাব্যক্তি, একটু দমভারি হওয়া দরকার। তাছাড়া দেখ না হলে বাপবাবার কি রকম ব্যবস্থা কোরেছি। কিছু মনে কোর না ভাই, তোমার আশা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারিনি, একটা বোতল খুলে ফেলেছি। বেশীর ভাগই বরফের বালতিতে পোরা আছে, তোমার জন্যে জিইয়ে রেখেছি। জাতে শ্যামপেন কিনা, বেজায় সৌখীন জিনিষ, একটু তোয়াজ না পেলেই গেল। এস ভাই, তাড়াতাড়ি বোতলটা খালি করে দিয়ে যাও।

শ্যামপেনের নাম উঠিতেই ব্রজেনবাবুর প্রাণ আনচান করিয়া উঠিয়াছিল। তাহার উপর বরফে মজার খবর। ব্রজেনবাবুও মজিলেন, গৃহিণীর জয়াল রূপের কথা ভুলিলেন, নিজের আতিথেয়তায় সুব্যবস্থার জন্য অগ্রসর হইয়া গেলেন।

সাহা মহাশয় ব্রজবাবুর মত না লইয়াই খগেনের সাহায্যে অভিনন্দনের অধিকন্তু ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। বৈঠকখানার পাশেই খুপচিমাখা প্রাচীনকালের অন্ধকূপ, অধিকন্তুর ব্যবস্থা উহারই অভ্যন্তরে হইয়াছিল। ব্রজেনবাবু মজিতে ঢুকিয়াছিলেন, মজিয়াই ফিরিলেন। ইতিমধ্যে বরপক্ষীয়রা আসিয়া উপস্থিত।

শিক্ষিতা ডাগর মেয়ে পছন্দ করিতে আজকাল বর নিজে আসিয়া থাকে। যিনি বর হইবেন তিনি কলেজের পড়ুয়া হইলেও প্রাচীন নিয়মে খড়মে সায়েস্তা ছেলে। ভাবী বৈবাহিক মহাশয়ের পরিবারে মেয়ে দেখার দায়িত্ব গ্রহণ গুরুজন ব্যক্তিরা বংশানুক্রমে বহন করিয়া আসিতেছেন। নববধূ তো কেবল ছেলের বৌ নয়, সংসারের দাসীও বটে। কর্ম্মপটুতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না হইলে অযথা মাহিনা দিয়া একটি দাসী রাখিতে হয়। ভাবী বৈবাহিক মহাশয়ের বয়স কম হইলে কি হইবে, এদিক দিয়া তিনি জাগ্রত চাল বজায় রাখিয়াছেন। পাকা দেখার ব্যাপারে অনেক হিসাবের তালিকা থাকায় বিচক্ষণ ব্যক্তি পাড়ার যোগীন খুড়াকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। এসব বিষয়ে তাঁহার বিচার নির্ভরশীল।

ভাবী বৈবাহিক মহাশয় গুছাইয়া বসিবার পূর্ব্বেই সা মহাশয় অধিকন্তুর প্রস্তাবটা গুছাইয়া বলিয়া ফেলিলেন। সাহা মহাশয়ের ক্রিয়াকলাপে সম্মোহন শক্তি আছে, তাহা না হইলে যোগীন খুড়াও উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন কেন? সলজ্জ প্রতিবাদ উঠিলেও তাহা সম্মতির আভাস। দেখা গেল অনতিবিলম্বে থাকাবায় থামিয়া গিয়াছে এবং যোগীন খুড়াসহ ভাবী বৈবাহিক মহাশয় গোপন ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন।

দেশী প্রথায় শ্যামপেনের ব্যবহার সরবতের মতই হইয়া থাকে। ভাবী বৈবাহিক ও যোগীন খুড়া এক চুমুকে গেলাস খালি করিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। খগেন নিকটেই ছিল। রসাল ব্যাপার শেষ হইতেই অতিত তাহার হাসির সঙ্কেত দিয়া বলিল,—আজ্ঞে তাহ'লে গিন্নীমাকে খবর দিয়ে আসি?

গৃহিণীর নামেই ব্রজেনবাবু চমকিত হইয়া উঠিলেন তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন,—তুই থামনে বরং পড়ে যাবি, ঝিটাকে বরং ডাক। ঝি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল, আসিতে পারিল না। খগেন খানিকটা আতরসিক্ত তুলা কাণে গুঁজিয়া অন্দর মহলে খবর দিয়া আসিল।

ঘটনাটি ব্রজেনবাবু সহজভাবে লইতে পারেন নাই। খগেন ভিতর বাড়ীতে গিয়াছে মানেই গন্ধগোকুল জানোয়ারের অস্তিত্বের মতই তাহার মুখের গন্ধে সব কিছুই ফাঁস হইয়া গিয়াছে। ঝিটার প্রতি মনে মনে চটিয়া উঠিলেন,—বাড়ীতে বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত না থাকিলে একটা তুমুল কাণ্ড করিয়া ছাড়িতেন। "গতস্য শোচনা নাস্তি", যাহা কপালে আছে তাহা ঘটিবেই।

যথাসময় কর্ত্রী ঠাকুরাণী কন্যাকে সাজাইয়া বৈঠকখানায় পাঠাইয়া দিলেন। যোগীন খুড়া ঝুঁদ অবস্থায় বসিয়াছিলেন কিন্তু পায়জোড় ও ঝুমকি পরিয়া সুন্দরী ডাগর মেয়ে ঘরে ঢুকিতেই সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন। খুড়া মহাশয় নারীর সৌন্দর্য্য বিচার সম্বন্ধে একজন রসগ্রাহী ব্যক্তি। ডাগর মেয়েদের তিনি পছন্দ করেন, তাহার উপর প্রতিমার গঠন সৌন্দর্য্য তাঁহাকে সহজেই আকৃষ্ট করিয়াছিল। কালবিলম্ব না করিয়া সকলের সমক্ষে ভাবী বৈবাহিক মহাশয়ের কানে কানে একটি রসাল উপদেশ দিয়া ফেলিলেন। ফরাসী দ্রাক্ষারস ইতিমধ্যে বরকর্তাকে এমন একটি মার্গে তুলিয়া ফেলিয়াছিল যে, তাঁহার দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যের কথাটাই ভুলিয়া বসিয়াছিলেন। বরকর্ত্তার বাহ্যদৃশ্য প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, ইতিমধ্যে দরজার আড়ালে মেয়েদের মধ্যে সুদর্শন পুরুষ সম্বন্ধে অনুকূল মতামতেরও আদানপ্রদান হইয়া গিয়াছে। খুড়ার গোপন উপদেশ ভাবী বৈবাহিক মহাশয় প্রকাশ্যেই স্বীকার করিলেন। নতনয়নে প্রতিমা দাঁড়াইয়াছিল। যোগীন খুড়া সাহা মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন, মেয়েকে একটু হাঁটান দরকার। ব্রজেনবাবুর তাহাতে আপত্তি ছিল না। ক্ষুদ্র পরিধির ভিতরই প্রতিমা তিন চার পাক ঘুরিয়া পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাবী বৈবাহিক মহাশয়ের মনে তখন রং লাগিয়াছে। কন্যার অপূর্ব্ব গঠন দর্শনে প্রীত হইয়া একটি অবান্তর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। কথাটা শুধু অবান্তর নয়, বরের পিতার মুখে অমন কথা উচ্চারিত হওয়াও অশোভনীয়। দরজার পাশে মেয়েদের ফিসফাস আলোচনা সুরু হইয়া গেল। আলোচ্য বিষয় বৈবাহিক মহাশয়ের ভাবোচ্ছ্বাস লইয়া। যথারীতিতে নারী প্রদর্শনী শেষ হওয়ায় প্রতিমা ভিতর বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছে।

কিছুক্ষণ বাদে ঝনাৎ করিয়া দরজার পাশেই চাবির আওয়াজ হইল। সঙ্কেতটিতে কোনরূপ রহস্য জড়িত ছিল না, একেবারে সোজা কথা, গৃহিণী কোন জটিল সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিয়াছেন। চাবির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ব্রজেন্দ্রকিশোরের টনক নড়িয়া গেল, বৈবাহিক মহাশয়ের প্রস্তাব মাথায় ঘুরিতেছিল। অকস্মাৎ বলিয়া ফেলিলেন,—হ্যাঁ!

পরের ঘটনা যাহা অনুমান করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল, গৃহকর্ত্তাকে ভিতর বাড়ীতে ডাক পড়িল। সৌখীন জিনিষ জিয়াইয়া রাখিবার উপায় না থাকায় যে পরিমাণে তাহা গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন তাহা পিণ্ডী গেলার অবস্থাতেই আসিয়া পড়িয়াছিল। পায়ের টাল সামলাইতে গিয়া মুখের কথা বেসামাল হইয়া যাইতেছিল, তথাপি গৃহিণীর সামনে নিরীহ প্রাণীর ন্যায় দাঁড়াইবার চেষ্টার কোন ত্রুটি হয় নাই।

ব্রজেনবাবু ভিতরবাড়ীতে ঢুকিবার আগে সা মহাশয়ের নিকট মতলব লইয়া আসিয়াছিলেন। বিপদে তাঁহার বুদ্ধিই শেষ অবলম্বন, কিন্তু গৃহিণীর জেরার মুখে কোন্ প্রশ্নের কোন্‌টি সঠিক উত্তর হইবে ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। গৃহিণী বলিলেন,—একি কাণ্ড ছেলের বৌ দেখতে এসে নিজে বিয়ে কোরতে চায়। ব্রজেনবাবু এইরূপ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসেন নাই। সা মহাশয় কেবল পিণ্ডী গেলার সদুত্তরগুলি ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। তাড়াতাড়ি উত্তর দিতে গিয়া বলিয়া ফেলিলেন,—আরে চটো কেন? ওটা রসিকতা। বৈবাহিক মানুষ একটু আধটু রসের কথা না বললে মানায়? গৃহিণী চাবির থোকা সংযুক্ত আঁচলটা পিঠে না ফেলিয়া বিপদসঙ্কুল কেন্দ্রের ভিতর ঘুরাইতে লাগিলেন—কারণ ছিল। বাবুর পেয়ারের ভৃত্য খগেন প্রতিমার সামনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দোলাইয়া অপমানকর কথা বলিয়াছে। বেচারাকে দোষী করা চলে না, তথাপি ঘটনাটি দোষণীয়। সে অযাচিতভাবে কতকগুলি উপদেশ দিয়া ফেলিয়াছিল। প্রদর্শনী গৃহে প্রতিমার হাঁটাটা যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক হয় নাই, এই ধারণা বদ্ধমূল হওয়ায় নিজের অঙ্গ দুলাইয়া কিভাবে পুরুষের চিত্ত আকর্ষণ করিতে হয় দেখাইয়া দিয়াছিল। অঙ্গ ভঙ্গীতে ভব্যতার অভাব থাকায় অভিমানী কন্যা তাহার শাস্তির বিধান অপেক্ষায় নিরালায় বসিয়া কাঁদিতেছিল।

গৃহিণী চাবীর থোকা ঘুরাইতে ঘুরাইতে রোরুদ্যমানা কন্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া গম্ভীর গলায় বলিলেন কি দেখছ? কর্ত্তার তখন আর সহজ দৃষ্টি নাই, পিণ্ডির প্রক্রিয়ায় ঝাপসা হইয়া গিয়াছে, তদুপরি কন্যাও আলো আঁধারিতে বসিয়াছিল। তাহাকে দাসী ভাবিয়া রুখিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওকে এখুনি বাড়ী থেকে বার করে দাও, হারামজাদি। ওর এত বড় স্পর্দ্ধা ডাকলে আসে না, তার উপর আমার সামনে বসে থাকে—অ্যাঁ! আঁস্তাকুড়ের ঝি, অ্যাঁ!

কন্যা পিত্রোক্তি শুনিয়া সত্যই উঠিয়া দাঁড়াইল। একে চাকরের নিকট অপমান তাহার উপর ভৃত্যকে কিছু না বলিয়া অকারণ কন্যাকেই শাসন? ডাগর, শিক্ষিতা মেয়ে চক্ষুলজ্জার মাথা খাইয়া বলিয়া ফেলিল,—ওঁর সঙ্গেই বিয়ে দাও বাবা, বারে বারে আমাকে বাজারের জিনিষ কেনার মত দেখতে আসা আর ভাল লাগে না। তার উপর চাকরের কাছে থেকে অপমান। তোমার গালাগালি, অসহ্য হয়ে উঠেছে। স্বামীর বাড়ীতে ঝাঁটাজুতো খেয়েও পড়ে থাকব, কিন্তু বাপের বাড়ীতে নয়।

মেয়ের কথায় ব্রজেন্দ্র কিশোরের হুঁস হইল। তিনি হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলেন। কটূভাষ যে নিজের কন্যার উপর প্রয়োগ করেন নাই তাহা প্রমাণ করিবারও অবকাশ পাইলেন না।

গৃহিণী চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন,—কাঁদিসনে মা, এ ভবিতব্যের কাজ, তোর ভালই হবে আমি আশীর্ব্বাদ করছি। এ পিণ্ডি গেলার বাড়ীতে থাকিস নে। যেখানে চাকর বেলেল্লাগিরি কোরে আস্কারা পায় সেখানে...সব কথা বলিতে পারিলেন না, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন।

ব্রজেনবাবু মরিয়া হইয়া প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু উনি যে বৈবাহিক মহাশয়, ওঁর সঙ্গে?—

গৃহিণী জোর দিয়া বলিলেন,—হাঁ ওঁর সঙ্গেই হবে। হাজার হোক উনি ভদ্রলোক, তোমার মত পিণ্ডি গেলার অভ্যাস নেই।

এতটা বলিয়া গৃহিণী কন্যার হাত ধরিয়া হেঁসেলের দিকে চলিয়া গেলেন। অতিথি সৎকারের জনাই বোধ হয় ওদিকে যাওয়া প্রয়োজন হইয়াছিল।

ব্রজেনবাবুও ভবিতব্যকে মানিয়া আপন মনেই বলিলেন, "তথাস্তু"। বৈঠকখানায় ফিরিয়া দেখিলেন আড়ালের পিছনে সকলেই আস্ত পিণ্ডি গিলিয়া চলিয়াছেন, ভাবিতে লাগিলেন—নিজের পিণ্ডি নিজে গিলিলে কাহার কপালে কি ঘটে একমাত্র ভাগ্যবিধাতাই জানেন!

লাইন-বাবু ও মাল-দিদি

(৩৩ পৃষ্ঠার পর)

এর পর পুলিশের চাকরি পেতে লালগোপালের আর দেরি হল না।

এক যুগ—

মাল-বাবুর বাড়ির মেয়েরা বেড়াতে এসেছেন লাইনবাবুর বাড়িতে। রবিবারের বিকেল।

লাইন বাবু বাইরের ঘরে বসে সেফটি রেজারে দাড়ি কামাচ্ছিলেন। লেশমাত্র অবশেষ না থাকে, উল্‌টিয়ে উল্‌টিয়ে কামাচ্ছিলেন বারে বারে। চকিত ছায়া ফেলে কে যেন হঠাৎ স্খলিত স্মৃতির মত দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। কোনো দিন দেখেন নি জীবনে, তবু অনুভবেই মনে হল, মাল বাবুর স্ত্রী হবেন নিশ্চয়ই। তেমনি একটি সভ্রান্ত ঘোমটা।

হঠাৎ ঘোমটার অর্দ্ধেক গেল খসে আর মাল-দিদি নাকের সঙ্গে প্রায় জিভ ঠেকিয়ে মুখ ভেংচে বলে উঠলেন, 'তুমি একটি গাধা।'

লাইন-বাবু লাফিয়ে উঠলেন। তার আগেই মাল-দিদির মুখে ঘোমটা নেমে এসেছে।

পরের গালটা আর না খান সেই ভয়ে মুহূর্তেই লাইন বাবু গুটিয়ে নিলেন নিজেকে। উদগত নিশ্বাসটাকে নিরুত্ত করে তার অপসরণের দিকে স্থির চোখে চেয়ে থেকে শুধু বললেন, 'আর, তুমি—তুমি একটি রত্ন।'

চীনা শিল্পী অঙ্কিত চীন রণক্ষেত্রের একটি দৃশ্য (এচিং)

স্বপ্ন

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী (মাদ্রাজ)

মুঘল চিত্রকলার নোতুন নিদর্শন

ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়

(১)

মুঘল রাজসভায় চিত্রকলার সমৃদ্ধি বহুজ্ঞাত এবং বহুআলোচিত। আমাদের দেশে ও বিদেশে আকবর-জাহাঙ্গীর-শাহজাহানের পোষকতায় পুষ্ট চিত্ররীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে শিল্পী ও শিল্পরসিকদের উৎসাহ এক সময় খুবই দেখা গিয়েছিল। এখন সে উৎসাহে কিঞ্চিৎ ভাটা পড়লেও একেবারে বিলুপ্ত হয়নি; এখনও এই যুগের সভা-শিল্পের নোতুন কোনো নিদর্শন আবিষ্কৃত হ'লে শিল্পরসিক মহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্য দেখা যায়। ব্যক্তিগত সংগ্রহে এমন নিদর্শন এখনও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যা' সাধারণ্যে প্রচারিত হয়নি, কোথাও প্রকাশিত হয়নি; মুঘল চিত্রকলার সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা হ'লে এই সব নিদর্শনের আশু প্রচার ও প্রকাশ একান্ত প্রয়োজন। কিছুদিন আগে কলিকাতায়, রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির এক প্রদর্শনী-সভায় আকবরের রাজসভায় রাজাজ্ঞায় অনূদিত ও লিখিত হরিবংশের একটি ফারসী পাণ্ডুলিপির উল্লেখ করা হ'য়েছিল; এই পাণ্ডুলিপিতে ১২।১৩টি রঙ্গীন ছবি আছে এবং তার প্রত্যেকটিই যে আকবরের রাজসভায় আঁকা, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। এই ছবিগুলির ফটোগ্রাফিক প্রতিলিপি সেই সভায় উপস্থিত করা হ'য়েছিল; কিন্তু একটি কি দু'টি ছাড়া এই গ্রন্থের কোনো চিত্রই লোকলোচনের গোচরীভূত হয়নি'; এবং তা' নিয়ে আলোচনাও কিছু হয়নি'। আর একটি নিদর্শন আমার জানা আছে। প্রায় বছর দুই আগে মাত্র তিন চারদিনের জন্য একখানি সুবৃহৎ ফারসী পাণ্ডুলিপি আমার হাতে এসেছিল। পাণ্ডুলিপিটি এক সময় আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের মুঘল রাজকীয় গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত ছিল; এই তিন সম্রাটেরই নামের স্বাক্ষর ও শীল-মোহরই তার সাক্ষ্য। এই স্বাক্ষর ও শীলমোহর শুধু পাণ্ডুলিপিটির ভেতরকার মলাটেই নয়; পাণ্ডুলিপিটিতে যে দু'খানি পূর্ণপৃষ্ঠা রঙ্গীন ছবি আছে তার পেছনেও আছে। আমি যতদূর জানি, এই ছবি দু'টি এ পর্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয়নি', অথচ মুঘল চিত্রশিল্পের ইতিহাসের দিক থেকে ছবি দু'টির মূল্য অনস্বীকার্য। রীতি পদ্ধতি, বর্ণবিন্যাস ও বস্তুবিন্যাস এবং চিত্ররচনার পরিবেশ থেকে আমার সন্দেহ ছিল না যে দু'টি ছবিই আকবরের আমলের। ভাল করে পরীক্ষা করে দেখবার সময় ও সুযোগ আমি পাইনি'; তবু আমার মনে হ'য়েছিল, ছবি দু'টি আকবরের রাজসভায় এমন শিল্পীর আঁকা যিনি সমসাময়িক পারসিক চিত্রশৈলীতে অভ্যস্ত ছিলেন, এবং পারসিক চিত্রপরিবেশ যাঁর মনন-কল্পনার বহির্ভূত ছিল না। কিন্তু এই জাতীয় অজ্ঞাত বা স্বল্পজ্ঞাত নিদর্শন সত্ত্বেও একথা বলা চলে, মুঘল চিত্রকলার মোটামুটি কাঠামো-ইতিহাস আজ আর আমাদের কাছে অজ্ঞাত নয় এবং মাঝে মাঝে নোতুন নিদর্শন যা' জানা যাচ্ছে তা' উপকরণ হিসেবে নোতুন হ'লেও শিল্পগত তথ্যের দিক থেকে নোতুন কোনও ইঙ্গিত, নোতুন কোনও আলোর সন্ধান দিচ্ছে না—জ্ঞাত তথ্যের সমর্থন বহন করছে মাত্র।

কিন্তু বছর দুই তিন হ'লো গুজরাট অঞ্চল থেকে মুঘল চিত্রকলার এমন কয়েকটি নিদর্শন আবিষ্কৃত হ'য়েছে এবং বড়োদার গাইকোয়াড় সরকারের পোষকতায় শ্রীযুক্ত হীরানন্দ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হ'য়েছে যা' শুধু উপকরণ হিসেবেই মূল্যবান নয়, মুঘল চিত্রকলার ইতিহাসেও তা' নোতুন ইঙ্গিত বহন করছে, নোতুন আলোকপাত করছে। শ্রীযুক্ত হীরানন্দ শাস্ত্রী মশায় ইতিপূর্বেই এই চিত্র-গুলির সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ইঙ্গিতের প্রতি ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, এখানে আমি আর তার পুনরুক্তি করবো না। তবে, মুঘল চিত্রকলার ইতিহাসের দিক থেকে এদের আলোচনা একেবারেই হয়নি', এবং শিল্পরসিক মহলের দৃষ্টিও এ পর্যন্ত আকৃষ্ট হয়নি'। অথচ, আমার ধারণা এই নোতুন নিদর্শনগুলি মুঘল

(৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জাহাঙ্গীরের প্রতিকৃতি

(৪১ পৃষ্ঠার পর)

চিত্রকলার ইতিহাসে এক নোতুন দিক উন্মোচন করেছে এবং তা' আলোচনার যোগ্য। এই নিদর্শনগুলো লোকলোচনের সামনে উপস্থিত করবার কৃতিত্ব হীরানন্দ শাস্ত্রীজীর এবং এদের প্রাথমিক আলোচনার সূত্রপাতও করেছেন তিনি। এজন্য তিনি ঐতিহাসিকদের কৃতজ্ঞতার পাত্র হ'য়েছেন, সন্দেহ নেই।

(২)

পাটন বন্দরের জৈন আচার্য মুনি পুণ্য বিজয়ের বিজ্ঞপ্তিপত্র-সংগ্রহে সম্রাট জাহাঙ্গীরের ফরমানসহ একটি বিজ্ঞপ্তিপত্র আছে। এই পত্রটি ১৩ ফুট লম্বা ও ১০ ইঞ্চি চওড়া এক খণ্ড কাগজে মারবাড় বুলিতে ও নাগর অক্ষরে লিখিত; রচনার তারিখ ১৬৬৭ বিক্রম সংবৎ (=১৬১০ খ্রীষ্টাব্দ), কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া তিথি, সোমবার। পত্রটির

(৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)
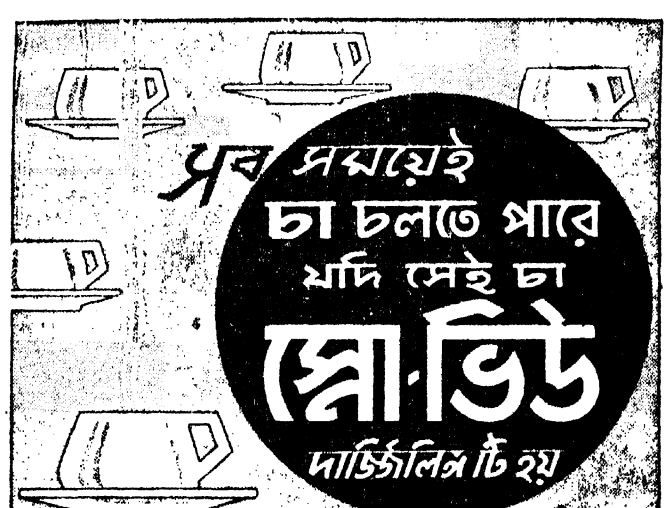
শিল্পী: জয়নুল আবেদিন

সূর্য্য তামসী

জীবনানন্দ দাশ

কোথাও পাখির শব্দ শুনি ;
কোনো দিকে সমুদ্রের সুর ;
কোথাও ভোরের বেলা রয়ে গেছে—তবে।
অগণন মানুষের মৃত্যু হ'লে—অন্ধকারে জীবিত ও মৃতের হৃদয়
বিস্মিতের মতো চেয়ে আছে ;
এ কোন্ সিন্ধুর সুর :
মরণের—জীবনের ?

এ কি ভোর ?
অনন্ত রাত্রির মত মনে হয় তবু।

একটি রাত্রির ব্যথা স'য়ে—
সময় কি অবশেষে এ রকম ভোরবেলা হয়ে
আগামী রাতের কালপুরুষের শস্য বুকে ক'রে জেগে ওঠে।

কোথাও ডানার শব্দ শুনি ;
কোনো দিকে সমুদ্রের সুর—
দক্ষিণের দিকে,
উত্তরের দিকে,
পশ্চিমের পানে।

সৃজনের ভয়াবহ ক্ষণে ;—
তবু জীবনের বসন্তের মতন কল্যাণে
সূর্য্যালোকিত সব সিন্ধু-পাখিদের শব্দ শুনি ;
ভোরের বদলে তবু সেইখানে রাত্রি-করোজ্জ্বল
ভিয়েনা, টোকিও, রোম, মিউনিখ—তুমি ?
সার্থবাহ, সার্থবাহ, অই দিকে নীল
সমুদ্রের পরিবর্তে আটলান্টিক চার্টার নিখিল মরুভূমি।

বিলীন হয় না মায়ামৃগ—নিত্য দিকদর্শিন ;
অনুভব ক'রে নিয়ে মানুষের ক্লান্ত ইতিহাস
যা জেনেছে—যা শেখে নি—
সেই মহাশ্মশানের গর্ভাঙ্কে ধূপের মত জ্ব'লে
জাগে না কি হে জীবন—হে সাগর—
শকুন্ত-ক্রান্তির কলরোলে।

এক ঝাঁক পায়রা

বিমল চন্দ্র ঘোষ

উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা—
সূর্য্যের উজ্জ্বল রৌদ্রে,
চঞ্চল পাখ্‌নায় উড়্‌ছে।
নিঃসীম ঘন নীল অম্বর,
গ্রহতারা থাকে যদি থাক্ নীল শূন্যে।
হে কাল হে গম্ভীর,
অশান্ত সৃষ্টির—
প্রশান্ত মন্থর অবকাশ,

হে অসীম উদাসীন বারোমাস।
চৈত্রের রৌদ্রের উদ্দাম উল্লাসে—
তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই
শুধু শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ
এক ঝাঁক উজ্জ্বল পায়রা॥

দুপুরের রৌদ্রের নিঃঝুম শান্তি
নীল কপোতাক্ষির কান্তি—
এক ফালি নাগরিক আকাশে—
কালজয়ী পাখ্‌নার চঞ্চল প্রকাশে—
চৈতালি সূর্য্যের থমথমে রৌদ্রে
জীবন্ত উল্লাসে উড়্‌ছে,
পাঁচ রঙা এক ঝাঁক পায়রা।

এক ফালি আকাশের কোল ঘেঁসা কার্ণিশ
রঙ্‌চটা গম্বুজ, দিগন্তে চিম্‌নী,
সোনার প্রহর কাঁপে চঞ্চল পাখ্‌নায়
ছোটকালের ঘেরে প্রাণ তবু তন্ময়—

লীলায়িত বিস্ময়,
সৃষ্টির স্বাক্ষর এক ঝাঁক পায়রা!
রূপালী পাখায় কাঁপে ত্রিকালের ছন্দ—
দুপুরের ঝলমলে রদ্দুর,

হে কপোত, পারাবত, পায়রা,
যেদিকে দু'চোখ যায় দেখা যায় যদ্দুর—
রূপালী পাখায় আঁকা শূন্য!

আকাশী-ফুলের শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ
কম্পিত শত শত উড়ন্ত পাপ্‌ড়ী,
তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই
দুপুরের ঝলমলে জীবন্ত রৌদ্রে—
ওড়ে শুধু এক ঝাঁক পায়রা।

স্বদেশ

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

জননী মোর জন্মভূমি তোমার পায়ে নোয়াই মাথা।
স্বর্গাদপি গরীয়সী, স্বদেশ আমার, ভারত মাতা॥

তোমার স্নেহ বায় বয়ে মা শত ধারায় নদীর স্রোতে,
ঘরে ঘরে সোনার ফসল ছড়িয়ে পড়ে আঁচল হ'তে,
স্নিগ্ধ-ছায়া মাটির বুকে তোমার শীতলপাটি পাতা॥

স্বর্গের ঐশ্বর্য্য লুটায় তোমার ধূলি মাখা পথে,
তোমার ঘরে নাই যাহা মা নাইক তাহা ভূ-ভারতে ;
ঊর্দ্ধে আকাশ, নিম্নে সাগর গাহে তোমার জয়-গাথা॥

আদি জগদ্ধাত্রী তুমি, জগতেরে প্রথম প্রাতে
শিক্ষা দিলে, দীক্ষা দিলে, করলে মানুষ আপন হাতে।
তোমার কোলের লোভে মা গো রূপ ধ'রে আসেন বিধাতা॥

ছেলের মুখের অন্ন কেড়ে খাওয়ালি মা যাদের ডেকে
তারাই দিল তোর ললাটে চির-দাসীর তিলক এঁকে।
দেখে শুনে হয় মা মনে, নেইক বিচার নেই বিধাতা॥

মুঘল চিত্রকলার নোতুন নিদর্শন

(৪৩ পৃষ্ঠার পর)

উপরার্ধে বিজ্ঞপ্তির বিষয়বস্তুটি চিত্রিত, চিত্রকর হচ্ছেন আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজসভার খ্যাতনামা চিত্রকর শালিবাহন। নিম্নার্ধে বিজ্ঞপ্তি রচনা ; লেখক জনৈক সীকহসা নামধেয় ব্যক্তি। ঐতিহাসিকদের কাছে এ তথ্য একেবারে অজ্ঞাত নয় যে, পশ্চিম ভারতের জৈন আচার্যদের প্রভাবেই আকবর অহিংসা ধর্মের অনুরাগী হ'য়েছিলেন। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি পূতচরিত্র আচার্য হীরবিজয় সূরিকে রাজসভায় আমন্ত্রণ করে আনিয়েছিলেন এবং প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় জৈন পর্যুষণাপর্বে মুঘল রাজান্তঃপুরে এবং রাজধানীতে এবং পরে অন্যান্য আরো অনেক স্থানে প্রাণীহত্যা নিষিদ্ধ হয়, আকবর মৃগয়াব্যসন পরিত্যাগ করেন এবং মাছ ধরা সম্বন্ধে নানা বিধিনিষেধের প্রবর্তন করেন। আকবরের মৃত্যুর পর এই সব বিধিনিষেধ অনেকটা শিথিল হ'য়ে পড়ে, বিশেষ করে পর্যুষণাপর্বে প্রাণীহত্যা নিষেধাজ্ঞা কেউই আর মান্য করতেন না। তার ফলে ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য বিজয়সেন সূরির দুই শিষ্য বিবেকহর্ষ এবং উদয়হর্ষ রাজা রামদাসকে মুখপাত্র করে আগ্রায় জাহাঙ্গীরের রাজসভায় উপস্থিত হন—উদ্দেশ্য ছিল আকবরের নিষেধাজ্ঞার পুনঃপ্রবর্তন। জাহাঙ্গীর তখন আমখাসদরবারের ঝরোখায় উপবিষ্ট; ডানহাত প্রসারিত করে মদের পেয়ালা গ্রহণ করছেন কোন পরিচারকের হাত থেকে। এমন সময় রাজা রামদাস দুই জৈন আচার্যকে তাঁর সামনে এনে উপস্থিত করলেন এবং আকবর-দত্ত ফরমান জাহাঙ্গীরকে দেখালেন। এদের বক্তব্য শুনে জাহাঙ্গীর আবার একটি নোতুন ফরমান এদের দান করলেন এবং তার ফলে পর্যুষণাপর্বে আবার নোতুন করে প্রাণীহত্যা নিষিদ্ধ হ'লো। আগ্রার সদর রাস্তায়, বাজারে জৈন সংঘ সভ্যদের সম্মুখে সানন্দে ও সাড়ম্বরে ঢোল সহরত সেই রাজাদেশ প্রচারিত হ'লো। ফরমানটি হাতে করে বিবেকহর্ষ ও উদয়হর্ষ গুরু বিজয়সেন সূরির নিকট ফিরে গেলেন এবং তাঁর হাতে ফরমানটি সমর্পণ করলেন; বিজয়সেনের সংঘবিহারে আনন্দ উৎসব সুরু হ'লো, বীণা পাখোয়াজ-সরোদ-করতাল বাদ্য ও নৃত্য সহযোগে। আগ্রায় যে সব জৈন সংঘসভ্য ছিলেন, রাজসভায় যে সব জৈন রাজকর্মচারী ছিলেন তাঁরা চিত্রকর শালিবাহনকে দিয়ে এই ঘটনাটি বিভিন্ন দৃশ্যে পুংখানুপুংখ রূপে আঁকিয়ে, সীকহসাকে দিয়ে রাজাজ্ঞার প্রচারের সংবাদটি লিপিবদ্ধ করিয়ে এবং পর্যুষণাপর্ব কি করে সে বৎসর আগ্রা, দিল্লী, মেবার এবং রণথম্ভোর দুর্গে প্রতিপালিত হ'য়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে এই বিজ্ঞপ্তিপত্রটি তাঁদের সংঘগুরু আচার্য বিজয়সেন সূরিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

'শালিভদ্র মহামুনি চরিত্র' গ্রন্থের চিত্র

এই গুটানো ছবিটির উর্ধাংশে জাহাঙ্গীর আমখাসের ঝরোখায় সাধারণ একটি রাজতক্তে উপবিষ্ট, অত্যন্ত ঘরোয়া তাঁর বসবার ভঙ্গি। জাহাঙ্গীরের যে সব প্রতিকৃতি এ যাবৎ আমাদের জানা আছে তার প্রায় প্রত্যেকটিতেই তাঁর মাথার চারদিকে জ্যোতির্মণ্ডল এবং বসবার ভঙ্গি যথার্থ সচেতন এবং রাজকীয়। এ-প্রতিকৃতিটি একেবারেই তা নয়, বরং তার উল্টো; রাজকীয় মর্যাদা বা গাম্ভীর্য প্রকাশ করবার এতটুকু চেষ্টা এই প্রতিকৃতিটির কোথাও নেই—অথচ আকৃতি বৈশিষ্ট্যে, মুখমণ্ডলের গড়নে, দেহভঙ্গিমায় প্রতিকৃতিটি যে জাহাঙ্গীরের এ-সম্বন্ধে সন্দেহের এতটুকু অবকাশ নেই। সুরাসক্ত জাহাঙ্গীর রাজকার্য পরিচালনার সময়ও যে সুরাপাত্রটি কামনা করছেন এবং বামহাতের এবং বামদেহ পার্শ্বের উপর ঈষৎ ভর রেখে, দক্ষিণ জানুটি ঘরোয়া ভঙ্গিতে খাড়া রেখে দেহটি একটু বামদিকে হেলিয়ে সাগ্রহে গ্রীবাদেশ অগ্রসর করে পানপাত্রটি গ্রহণ করছেন—এই সমস্ত দেহভঙ্গিমাটির ভিতর শিল্পীর একটি ঘরোয়া সহজ দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে প্রত্যক্ষ। রাজাদেশ বা রাজসভার সাধারণ আদবকায়দার বন্ধন বা প্রাণহীন মর্যাদাবোধ যে শিল্পীর কল্পনা ও বাস্তব দৃষ্টিকে ব্যাহত করেনি তাও সমান প্রত্যক্ষ। প্রতিকৃতিটির নীচে সমসাময়িক নাগরী অক্ষরে লেখা আছে :

জহাঙ্গীরশাহি আমখাস বইঠ

ঝরোখই বইঠা ছই প্যালা

পেশকেসি কিয়া।

জাহাঙ্গীরের পশ্চাতে ডানদিকে নপুংসক চোরীবাহক ফরসৎ খাঁ এবং সম্মুখে বামদিকে দণ্ডায়মান "সুলতান খুররাম।" এঁদের প্রত্যেকের নাম এঁদের প্রতিকৃতির নীচে লেখা রয়েছে, কাজেই এ-সম্বন্ধে ভুল হ'বার কোনো কারণ নেই।

আমখাসের ঝরোখার নীচেই হাতিপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান প্রহরী রাজা রামদাসের আগমন বার্তা ঘোষণা করছে। সম্মুখে উদগ্রীব হয়ে দণ্ডায়মান রামদাস আকবর দত্ত ফরমানখানা হাতে নিয়ে জৈন আচার্যদের উপস্থিত করছেন এবং তাঁরই পেছনে মুণ্ডিত মস্তক শ্বেতবস্ত্র পরিহিত পণ্ডিত বিবেকহর্ষ কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করছেন। রামদাস ও বিবেকহর্ষের দেহভঙ্গি বিশ্লেষণ করলে সন্দেহের কারণ থাকে না যে, শিল্পী শালিবাহন স্বচক্ষে এদৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং সমস্ত চিত্রটির কল্পনা ও বিন্যাসে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার সঞ্চার করতে সমর্থ হ'য়েছিলেন। শুধু এই দৃশ্যটিই নয়, পরবর্তী কয়েকটি দৃশ্যও জীবন ঘনিষ্ঠ গতিময়তা এবং বাস্তবানুভূতির সঞ্চারে সজীব ও প্রাণবান। এই দৃশ্যটির সম্মুখে রাজসভার অন্যান্য সভাসদবর্গ দাঁড়িয়ে আলাপ আলোচনায় রত এবং তার নীচেই দেখা যাচ্ছে, আবেদন মঞ্জুর হওয়ার পর রামদাস সভাগৃহ পরিত্যাগ করে সভামণ্ডপবেষ্টনী অতিক্রম করছেন—দুইপাশে উন্মুখ পারিষদবর্গ হাত অগ্রসর করে সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে গলা বাড়িয়ে সম্রাট সন্দর্শনের ফলাফল জানতে চাইছেন, সম্মুখে ডান দিকে তুর্কী টুপী পরা জনৈক বিদেশী অবাক হ'য়ে রামদাসের দিকে তাকিয়ে এবং আর একটি বিদেশী

(৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

GOVERNMENT LIBRARY

তাঁর আনন্দ হইয়াছে। বহু লোকের সমাগমে বাড়ীর হাওয়া যেমন স্ফূর্ত্তিযুক্ত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করায় বাড়ীর চেহারাও তেমনি সুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে।

লোকে বলিবে, আনন্দময়ীর মায়ের গুণেই এমন রূপান্তর ঘটে।

ছেলেমেয়েগুলির উল্লাসের একশেষ—শাসন শিথিল, পড়া একেবারে বন্ধ…তার উপর নূতন সঙ্গী পাইয়া উভয় ভ্রাতার পুত্রকন্যাগুলি পরম আহ্লাদিত হইয়া কেবলি গলাগলি হইয়া বেড়াইতেছে…আর এত গল্প করিতেছে যে, তাহা দেখিয়া তাহাদের ঠাকুমা যজ্ঞেশ্বরী অবাক হইয়া গেছেন—এত কথার সৃষ্টি ওরা কেমন করিয়া করে! যজ্ঞেশ্বরী চাহিয়া চাহিয়া কেবল উহাদের মুখের ভঙ্গী আর কথার ভঙ্গীই দেখিতেছেন।

জেঠা মহাশয় যেসব খেলনা আনিয়াছেন তাহাদের বৈচিত্র্য আর খেলার আনন্দ দিবার ক্ষমতা আশ্চর্য্যজনক।

উহাদের মতে সে-খেলায় বয়সের বিচার থাকিতে পারে না—ঠাকুমাও আসিতে পারেন; কিন্তু তিনি খানিক হাসিয়া ঐ প্রস্তাবের জবাবেই বয়স দেখাইয়া, নয় অবসরের অভাবের অজুহাতে অসম্মতি দিয়াছেন।

আবার ঐ খেলনা লইয়াই উহাদের মতভেদ, যুক্তি প্রদর্শন আর তর্কের অবধি নাই।

পশুর মতে যে পুতুলটিকে দম দিয়া মাটিতে রাখিয়া দিলেই সে উল্টাইয়া উল্টাইয়া ডিগবাজি খাইতে থাকে, এই পুতুলরাজ্যের সেই রাজা—তাহার সঙ্গে একমত হইল নিপু আর হলা।

কিন্তু জয়, অণি আর পশুর মতে ওটা কিছুই নয়, উড়োজাহাজটাই সর্বোত্তম—আকাশে উঠিয়া উড়িতে পারে না বটে, চাকার উপর মাটিতেই চলে, কিন্তু শব্দ করে ঠিক উড়োজাহাজের মত।

যে জিনিষ কেবল শব্দের দ্বারা এমন

ভ্রান্তি ঘটাইতে পারে তাহার সঙ্গে আর কিসের তুলনা করা চলে?

শেষোক্ত দলকে সমর্থন করিতেছেন জেঠাইমা আর ঠাকুমা; প্রথমোক্তকে কাকীমা ও জেঠামহাশয়। জেঠামহাশয়কে প্রাধান্য দিয়া প্রথম দল রে-রে শব্দে জয়ডঙ্কা বাজাইয়া দিল।

দ্বিতীয় দলের জয় বলিল, বাবা শোনেইনি ভাল করে'; কাকার সঙ্গে ধানের কথা বলছিল।

তদুত্তরে নিপু বলিল, কাকীমা? কাকীমা ত' শুনেছে। সে কি বল্‌লে?

ইতাবসরে হলা বলিল, ঠাকুমা চোখেই দেখে না।

বিরুদ্ধ পক্ষ সমস্বরে হলার উক্তির প্রতিবাদ করিল—না, চোখে দেখে না! ছুঁচে সুতো পরায় রোজ—তা' জানিস?

যাহা হউক, ঘুমাইবার পূর্ব্বে তর্কের অবসান হইল না।

শিবকণ্ঠের স্ত্রী বিজয়া সেলাইয়ের কল আর থান কয়েক জামার কাপড় আনিয়াছেন—দেবরপুত্র আর কন্যাগণের সম্বৎসরের পোষাক প্রস্তুত করিয়া দিয়া যাইবেন—পূজার কাপড় আর পোষাক ত' আনা হইয়াছেই। ছেলেমেয়েরা পূজার কাপড় দেখিয়াই তুলিয়া রাখিতে অনুমতি দিয়াছে—পরিয়া ভাসান দেখিতে যাইবে।

আনন্দময়ীর প্রতিমা এ-গৃহে পূজিত হইতেছে না সত্য, কিন্তু তাঁর সচ্ছল আনন্দচ্ছটা আবির্ভূত হইয়া গৃহকে পুলকোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে; অন্তরে অন্তরে মায়ের পদার্পণ ঘটিয়াছে।

ছেলেমেয়েরা প্রতিমা দেখিয়া বেড়াইতেছে।

দশমীর দিন নীলকণ্ঠের স্ত্রী রূপমঞ্জরী বলিল, দিদি, আজ ত' দশমী…বিজয়ার জলখাবার কিছু ঘরেই করতে হয়। লোকজন আসবে।

বিজয়া হাসিয়া বলিল, আসবে, তা' ছাড়া আমরাও আছি। ফর্দ করে' দে, ঘি ময়দা চিনিটিনি আনুক।

—মাকে ডাকি।

—মা তাঁর ছেলেদের কাছে আছেন, সেখানেই থাকুন—বৌমা তাঁর কে!

বলিয়া বধূদ্বয় যে পুত্রদ্বয়ের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে আবদ্ধ—অর্থাৎ কান টানিলেই মাথা আসে—তাহা অনুভব করিয়া উভয়েই নিঃশব্দে সুখবোধ করিল।

বড়বৌ বলিল,—মায়ের নাতি নাতনী নিয়ে অবসর নেই; আমরা যা' জানি তা-ই করি।

তথাপি ছোটবৌ মেয়েকে দিয়া জানিতে চাহিল যে, মা আর জেঠাইমা বিজয়া উপলক্ষে এবং নিজেরা খাইবার জন্য, আর গ্রামস্থ সমস্ত ও কল্যাণীয়গণের অভ্যর্থনার জন্য কিছু কিছু মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে চান—তাহাতে ঠাকুমার মত কি?

যজ্ঞেশ্বরী অবিলম্বে সায় দিলেন,—করুক, করতেই ত' হয়!

ঘি ময়দা প্রভৃতি আনিতে বাজারে লোক গেল।

সংবাদ পাইয়া ছেলে-মেয়েরা আরো লাফাইতে লাগিল।

বৈকালে সকাল সকাল মাছের ঝোল আর ডাল ভাত রাঁধিয়া রাখিয়া বধূদ্বয় খাবার প্রস্তুতে রত হইল।

চারিদিকেই কম্পজ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে—আর কার্ত্তিকের হিম ভাল নহে বলিয়া এবার নিরঞ্জনোৎসব সন্ধ্যার প্রাক্কালেই সম্পন্ন হইয়া গেল…ঢাকের নীরবতা যেন একটা শোকনিমগ্নতার করুণা আর গভীরতা লইয়া বিরাজ করিতেছে।

ছেলেরা ভাসান দেখিয়া ফিরিয়াছে।

যজ্ঞেশ্বরী নাতি নাতনীদের কাছে ডাকিয়া সমগ্রভাবে পূজা কেমন দেখা হইল সেই সমাচার লইতে বসিলেন।

দেখা ভালই হইয়াছে ইহা সবাই একবাক্যে স্বীকার করিল।

কিন্তু নিপু বলিল,—সেনেদের ঠাকুরের চাইতে দত্তদের ঠাকুর ভাল। নয়, দাদা?

সে প্রশ্নের জবাব না আসিতেই হলা বলিল,—সেনেদের তিনটে ঢাক, দত্তদের পাঁচটা। আমি গুণেছি।

জয় বলিল,—দত্তদের ঠাকুরের সিংহের মুখটা কুকুরের মুখের মত দেখতে হয়েছিল।

উক্ত সিংহের মুখাকৃতির যথাযথ বর্ণনা শুনিয়া নীলকণ্ঠ এবং শিবকণ্ঠও হাসিতে লাগিলেন।

নীলকণ্ঠ বলিল,—এবার বৌদির শরীর তেমন ভাল নেই দেখছি,—হজম ভাল হয় না বলছিলেন। এখানে যদি কিছুদিন থাকেন তবে শরীর সারতে পারে মনে হয়। এ সময়টা ওদিকটা ভাল নয়।

শিবকণ্ঠ বলিলেন,—চুয়াডাঙ্গা জায়গা ভাল নয়, কার্ত্তিকের পর থেকেই…।

যজ্ঞেশ্বরী বলিলেন,—তবে রেখে যাও এবার, শীতটা বৌমা এখানেই থাক্।

শুনিয়াই শিবকণ্ঠের ছেলে-মেয়েরা আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল…গ্রামেই তাহারা অনেকদিন থাকিতে পাইবে।

—মাকে বলে আসি। বলিয়া চতুর পশুপতি দৌড়াইয়া মাকে খবর দিতে গেল।

খবরটা দিয়াই পশুর ফিরিবার কথা, কিন্তু গিয়াছে সে যেখানে খাবার প্রস্তুত হইতেছে সেইখানে এবং ফিরিতে বিলম্ব করিতেছে…ইহাতে সংশয়াবিত হইয়া একে একে উঠিয়া সবাই সুখবরটা লইয়া সেই-দিকেই গেল।

শিবকণ্ঠ ভাবিয়া বলিলেন,—দেখি এ মাসটা, শরীরের উন্নতি দেখলে রেখে যাব।

কিন্তু তাঁর বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল না বলিয়া নীলকণ্ঠ চুপ করিয়া রহিল।

আহারাদির কষ্ট, সাংসারিক বিশৃঙ্খলা, ছেলেদের পড়ার ক্ষতি প্রভৃতি বিঘ্ন সম্বন্ধেও কিছু বলিবার ইচ্ছা শিবকণ্ঠের ছিল, কিন্তু তখনই অনেক দূরে হঠাৎ কেউ ডাকিয়া

(৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার কর্ত্তৃক উন্নত ধরণে প্রস্তুত আমাদের 'গৌরী' পাম্প টিউবওয়েলের জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাম্প বলিয়া স্বীকৃত। 'গৌরী' পাম্প অপরাপর পাম্প অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী ও সুষ্ঠু কার্য্যক্ষম---অথচ মূল্য বেশী নয়। আজই একটি 'গৌরী' পাম্প বসান।

ডি. এন. সিংহ এণ্ড কোং

কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক

— অফ এশিয়া লিঃ —

একমাত্র ব্যাঙ্ক যাহাকে **আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র** পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন।

কেন?

যেহেতু—
ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন এবং ইহা তাদেরই একটি প্রচেষ্টা;

যেহেতু—
তিনি জানিতেন ইহাতে ন্যস্ত তাদের অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ;

যেহেতু—
তিনি জানিতেন যে, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় জাগ্রত হইলেই **জাতীয় শিল্প** বিস্তার সহজে সম্ভব।

হেড অফিস:---
১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন: ক্যাল. ৫৮৯০

ব্রাঞ্চ:—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, লৌহজঙ্গ, চরমুগুরিয়া, মাদারীপুর, গোপালদী (ঢাকা), সুনামগঞ্জ (আসাম), শিলং (আসাম), বৃন্দাবন (মথুরা)।

কলিকাতা শাখা:—
৯৩নং রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা।

ইহাতে যোগদান উপলক্ষে **আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের** বাণী:—

"একথা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, বাংলাদেশে এরূপ ব্যাঙ্ক খুব কমই আছে, যাহারা তাদের দুঃসময়ে…একটি অর্থশালী ও প্রতিপত্তিশালী পরিবারের উপর নির্ভর করিতে পারেন।"

"ইহাদের পরিচালনায় এই ব্যাঙ্কের সাফল্য সুনিশ্চিত"

এম্. পাল, এম-এ
ম্যানেজিং ডিরেক্টার।

হিসাব

দুই [illegible] চার [illegible]
কিন্তু [illegible]
আমার [illegible]
তেমনি [illegible]

[illegible]

[illegible] আত্মীয়স্বজন এমন কেউ নেই যে 'ভার' নেয়। পরের বাড়িতে রেঁধে বেড়েই বাধ্য হয়ে গৃহকর্মনিপুণা হতে হয়। তা না হলে বাসন-মাজা, কাপড়-কাচা, রান্না করা, উঠোন ঝাড় দেওয়া, ঘর নিকোনো, গোয়াল পরিষ্কার করা কে করবে। পদি নিজের ঘরের কাজ তো সব করতোই, পাড়াপড়শীর ফরমাসও শুনত। কারো বড়ি দিয়ে দিচ্ছে, কারও সেলাই করে দিচ্ছে, কারো ছেলে আগলাচ্ছে। মামাদের অবস্থা একটু ভাল। কিন্তু তাঁরাও এমন লক্ষ্মী মেয়ের 'ভার' নিতে চান না। পারে কোথায়? তাছাড়া চারদিকেই লকলক করছে আগুন—যুক্তক্ষেত্রের ভার নেবে কে?

দুই আর দুই যোগ করে' ঠিক চার হয়ে যাচ্ছিল, আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম।

পদির নামে একটা কলঙ্ক রটল, পাড়ার দু'একটা ছোঁড়া তাকে ইসারাও করল।—চলছিল। হিসেবে ভুল হয়নি।

আমরা জানতাম পদির বিয়ে হবে না এবং শেষ পর্যন্তও—সম্ভাব্য পরিণতিগুলোকে স্পষ্টরূপে আর ভাববার চেষ্টা করতাম না। তবুও সেগুলো বিভ্রান্ত করেনি আমাদের, কারণ সেগুলো সব দুই আর দুইয়ে চারের পর্যায়ে হিসেবের মধ্যেই।

হঠাৎ একদিন কিন্তু আচমকা এমন একটা কাণ্ড ঘটল যার জন্যে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না।

গ্রামেরই ছেলে রামচরণ ছুটিতে এক-দিন গ্রামে ফিরে এল। রামচরণ নামটা যেমন সেকেলের মতো, লোকটা তেমন নয়। বেশ চালিয়াৎ লোক। রাজ-সরকারে হাজারখানেক না হাজার দেড়েক টাকা মাইনে পায়। ফার্স্ট ক্লাস ছাড়া চড়ে না। প্রত্যেক ছেলের জন্য একজন করে শিক্ষক এবং প্রত্যেক মেয়ের জন্য একজন করে আয়া আছে। চার ছেলে চার মেয়ে। হঠাৎ স্ত্রী-বিয়োগ হবার পর এই রামচরণ একদিন দেশে ফিরে এল এবং শুনলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না—ওই পদিকে বিয়ে করে' বসল।

আমরা চমকে গেলাম বটে কিন্তু অঙ্ক কষে' দেখলাম হিসেব ঠিক মিলেছে। পদ্মাবতী রূপসী ছিল। অবিশ্বাসী মন অবশ্য বাজে তর্ক তুলেছিল দু'একটা। পদ্মার চেয়ে বেশী রূপসী আর একটি মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ এসেছিল তার, নিখুঁত সুন্দরী সে, বংশও ঢের ভাল, ধরেওছিল তারা খুব—তবু রামচরণ পদ্মকেই পছন্দ করল কেন। পছন্দ-অপছন্দর নিগূঢ় হেতুটা কি? মনের এসব বাজে কৌতূহলকে অবশ্য প্রশ্রয় দিই নি। পছন্দ হয়েছে বিয়ে করেছে—দুই আর দুইয়ে চার- এর আবার 'কেন' কি!
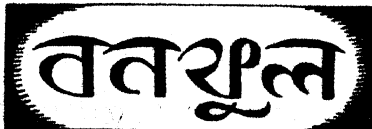
বনফুল

পদিকে বিয়ে করাতে রামচরণ দেবপুত্র-বাচা হয়ে উঠল প্রায়। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। পদি খুব খুশি। এক-গা গয়না, দামী, কাপড়-জামা মাথায় চওড়া সিঁদুর, একমুখ হাসি, তার আহ্লাদ কপাই খুলে গেল একটা।

যাবার দিনে ষ্টেশনে গেলাম সবাই। রিজার্ভ ফার্স্ট ক্লাস গাড়ি—ফুলপাতা দিয়ে সাজানো হয়েছে সেটাকে। রামচরণ উঠে বসল। ছেলে মেয়েরা পাশের কামরায় ছিল। পদি উঠেই এক কাণ্ড করে বসল। উঠেই উপরের দিকে চেয়ে "আঃ" বলে চীৎকার করে' উঠল সে। তারপরই অজ্ঞান। সমস্ত দেহ থরথর করে কাঁপতে লাগল। মুখের সমস্ত হাসি মিলিয়ে গেল—ফুটে উঠল আতঙ্ক। উপরের দিকে হাত জোড় করে' বলতে লাগল,—আমার কোন দোষ নেই, আমাকে জোর করে' বিয়ে করেছে, আমি কিছু বলি নি— আমাকে কিছু কোরো না তোমার পায়ে পড়ি…।

সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেল সে।

ভুত?

আজকাল ভুত বিশ্বাস করে না কি কেউ!

বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা পদির অবচেতন মন বিশ্লেষণ করে যখন দুই আর দুইয়ে চার করবার চেষ্টায় ছিলেন তখন আর এক কাণ্ড ঘটল।

ছোট্ট একটা মাদুলি পরে পদি সেরে গেল হঠাৎ।

—

মাধব

(৪৯ পৃষ্ঠার পর)

উঠিল···তার পশ্চাতেই একাধিক কুকুরের ডাক এবং তৎসঙ্গে মনুষ্যকণ্ঠের কলরব শুনা গেল।

সকলে সেইদিকে উৎকর্ণ হইলেন।

জোটিয়া একখানা কাঁরিয়া কচুরি হাতে করিয়া ফিরিল।

শিবকণ্ঠ জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিসের গোলমাল?

নীলকণ্ঠ বলিল,—বাঘ বেরিয়েছে বোধ হয়।

শুনিয়াই ছেলে-মেয়েরা কেহ যজ্ঞেশ্বরীর, কেহ শিবকণ্ঠের, কেহ নীলকণ্ঠের দিকে বেজায় ঘেঁষিয়া গেল।

শিবকণ্ঠ বলিলেন,—বাঘ এদিকে আসে না কি?

—বছর দুই থেকে শীতের সুরুতে দু'একটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে; এটা বোধ হয় তাদের কোথাও যাবার পথ।

জয় বলিল,—খুব বড় বাঘ কাকা?

—না, ছোট ছোট; মানুষ খায় না তারা; গরুর ছোট ছোট বাছুর, কুকুর-টুকুর এই সব ধরে। বলিয়া নীলকণ্ঠ জয়ের পিঠে হাত বুলাইয়া তাহাকে অভয় দিল।

পত্ত জিজ্ঞাসা করিল,—ছোট ছোট মানুষকেও ধরে না?

যজ্ঞেশ্বরী হাসিয়া উঠিলেন—বলিলেন,—ধরে; তুই খাটের নীচে ঢুকো।

—আমারও ছোট যে হলা, তা' বুঝি জান না? বলিয়া স্বাগপর পশুপতি নিজেকে নিরাপদ মনে করিল।

—আহ্নিকটা সেরে আসি বলিয়া যজ্ঞেশ্বরী উঠিয়া গেলেন।

ওদিকে কুকুরের ডাক আর মানুষের কলরব দূরে যাইতে লাগিল···ছেলেরা সাহস পাইয়া আলগা হইয়া বসিল।

শিবকণ্ঠ বলিলেন,—ভৈরব মুখুজ্জেরা আর কান্তি সরকারেরা কেউ এবার দেশে আসেনি দেখছি।

উপযুক্ত ভদ্রব্যক্তিগণের সাহচর্য্যে শিবকণ্ঠের ছুটির মাসটা কাটিত ভাল; কিন্তু এ বৎসর তাঁহারা কেহ আসেন নাই।

নীলকণ্ঠ বলিল,—তাঁরা দেওঘর গেছেন শুনেছি; দুই পরিবার একটা বাড়ী ভাড়া করে আছেন।

শিবকণ্ঠ বলিলেন,—তোমার বৌদিকে বাড়ীতে রেখে যেতে পারলে ভালই হয়—মা-ও খুশী হন, কিন্তু আমার বড় কষ্ট হবে।

—হাঁ, খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট ত' হবেই।

—মা ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, আগামী বৎসর থেকে বাড়ীতে আমরা পুজো আনি···পূর্ব্বপুরুষদের ছিল।

নীলকণ্ঠ বলিল,—করলে ভালই হয়, দেশে সম্ভ্রম তাতে বাড়ে—খুব আমোদেও কিছুদিন থাকা যায়। প্রজারা আর অনুগত যারা তারাও তা-ই চায়···বলিয়া নীলকণ্ঠ একটু হাসিয়া বলিল,—এবার ভাদ্র মাসে ত' আমাদের দশ-বিশ জন প্রজা এসে মাকে ধরে' বসল, এবার পুজো করতেই হবে।···করলে ভালই হয়।

—কত খরচ পড়ে?

—আমরা ত' দত্তদের মত দেবোত্তরের পুজো করব না, যদি করি সে পুজো খুব অল্পেই হয়। আজকাল জিনিষপত্তর কিছু কিছু সস্তা হয়েছে—তিনশো টাকাতে মাঝারিরকম হয়···বলিয়া নীলকণ্ঠ দাদার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল।

অনুজের কথার সুরে শিবকণ্ঠের মনে হইল, তাহার ইচ্ছা খুবই প্রবল—সে যেন উদগ্রীব হইয়া আছে—কেবল একটি ইঙ্গিতের অপেক্ষা।

নীলকণ্ঠ দাদার মুখের দিকে তাকাইয়াই পুনরায় বলিল,—মায়েরও ইচ্ছা খুব।

মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ করা সম্ভব কি না শিবকণ্ঠ তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

ছেলেমেয়েরা যাইয়া পুনরায় সেই খাবার প্রস্তুতের কাছে তুমুল কলরব তুলিয়াছে।

বড় বধূর কণ্ঠ-তাড়না মাঝে মাঝে তাহারও উপরে উঠিতেছে—এবং তাহারও উপরে যে একটা আর্ত্তনাদ সহসা কাঁপিয়া উঠিয়াই থামিয়া গেল তাহা মর্ম্মান্তিক···শুনিয়া দুই ভাই-ই শিহরিয়া উঠিলেন।

ছেলেদের কলরব থামিয়া গেল।

নীলকণ্ঠ সন্ত্রস্ত হইয়া লণ্ঠন তুলিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল,—মায়ের চীৎকার নয় ত'! তাঁর আহ্নিকের ঘর থেকেই শব্দটা এসেছে মনে হচ্ছে।

বলিতে বলিতে যখন নীলকণ্ঠ আর শিবকণ্ঠ ছুটিয়া বাহির হইলেন তখন বধূরাও বাহির হইয়াছেন···।

ছেলেমেয়েগুলি তাঁহাদের পশ্চাতে।

আর, দেবীপক্ষের দশমীর জ্যোৎস্না তখন উঠানে ঢেউ খেলিতেছে।

মায়ের আহ্নিকের ঘরখানা একটু দূরে, উঠানের প্রান্তে—আর ভিতর হইতে বাহিরে যাইবার দুইটি দরজার একটির একেবারে সম্মুখে।

উঠান পার হইয়া সকলে ছুটিয়া আসিয়া সেই আহ্নিকের ঘরেই প্রবেশ করিলেন এবং লণ্ঠনের আলোকে যে দৃশ্য চোখে পড়িল তাহা ভয়ঙ্কর — মুখ শুকাইয়া গেল।

দেখিলেন মৃৎপ্রদীপ নিবু নিবু; মা কাৎ হইয়া পড়িয়া আছেন—তাঁহার পৃষ্ঠের মধ্যস্থলে শিরদাঁড়ার দুই পাশে দু'টি সুবৃহৎ ক্ষত, তাহা রক্তে মাখা—ক্ষতের রক্তে মাটি ভিজিয়া গেছে···ঝির্ ঝির্ রক্তের ধারা তখনও নির্গত হইতেছে।

শুষ্ককণ্ঠে নীলকণ্ঠ বলিল, বাঘের থাবা।

ছেলেরা চেঁচাইয়া কুঁক ডাইয়া উঠিল—

বধূরা বসিয়া পড়িল—

শিবকণ্ঠ আর্দ্র স্বরে ডাকিলেন, মা?

যজ্ঞেশ্বরী কথা কহিলেন···।

কম্পিত ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, ওরে, আমার মাধব এসেছিল।

যজ্ঞেশ্বরীর প্রথম যে পুত্রটি জন্মগ্রহণ করিয়া মাত্র সাত বৎসর জীবিত ছিল তাহারই নাম ছিল মাধব।

কেহ তাহা জানে, কেহ তাহা জানে না।

আজ অর্দ্ধ শতাব্দী পরে জননী তাহার নামোচ্চারণ করিলেন।

ডাক্তার আনিতে লোক ছুটিল।

অচেতনপ্রায় জননীকে শয্যায় আনা হইল।

কখনো অবিরাম, কখনো থামিয়া থামিয়া, কখনো অস্ফুটস্বরে, কখনো জড়াইয়া, কখনো কাৎরাইয়া—আর, আর সবাইকে বিস্মৃত হইয়া জননী কেবল মাধবের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

অন্তরের পুঞ্জীভূত ধ্যান যেন সরব হইয়া রহিল···বলিতে লাগিলেন, আমার মাধব এসেছিল।

লিনো-কাট শিল্পী: জয়নুল আবেদিন

মুঘল চিত্রকলার নোতুন নিদর্শন

"শালিভদ্র মহামুনি চরিত্র" গ্রন্থের চিত্র

(৪৬ পৃষ্ঠার পর)

টুপী হাতে নিয়ে নত হ'য়ে অভিবাদনরত ; বাম দিকে সুসজ্জিত ও সসম্ভ্রমে সারিবদ্ধ হ'য়ে দণ্ডায়মান প্রহরীশ্রেণী। সামনের মাঠে একদল বাদক ঢোল, ঝাঁঝ, শিঙ্গা ইত্যাদি নিয়ে রাজাজ্ঞা প্রচার করার জন্য প্রস্তুত ; তাদের তাড়া করে নিয়ে ছুটে চলেছে একটা হাতী। দরবার আঙ্গিনার বেষ্টনী পার হ'য়েই দেখা যাচ্ছে বাদ্যকর ও নিশান-বাহীর দল জাহাঙ্গীরের ফরমান প্রচার করবার জন্য আগ্রা দুর্গের ফটক অতিক্রম করতে চলেছে। ফটকের বাইরে দুইপাশে দণ্ডায়মান দুইটি হস্তীমূর্তির এবং পৃষ্ঠে স-মাহুত আরূঢ় রাজপুত বীর জয়মল ও পত্তার মূর্তির চিত্ররূপ ; আকবর প্রতিষ্ঠিত এই স্মারক প্রস্তর মূর্তি দু'টি শালিবাহনের কল্পনায় যে চিত্ররূপে রূপান্তরিত হ'য়েছে তা'তে তারা প্রস্তরমূর্তি আর থাকেনি, নোতুন জীবনরূপ গ্রহণ করে চিত্রের অন্যান্য নায়কের এবং সমসাময়িক বিষয়বস্তুর সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে উঠেছে। ফটকের সম্মুখে জনৈক নাগরিক প্রহরীর সঙ্গে বিতর্কে রত এবং প্রহরী নাগরিকটিকে প্রহারে উদ্যত। পরের দৃশ্যেই দেখা যাচ্ছে বিবেকহর্ষ ও উদয়হর্ষ আগ্রার বাজার ও বড়-বাজারের ভেতর দিয়ে হেঁটে চলেছেন ফরমানটি হাতে করে ; আগুপিছু চলেছেন মির্জা কাডল্লা, সেখ ফরিদ, আকুল, কোতোয়াল আগাতুর, দরবান কমাল এবং বাদক, প্রচারক দল প্রভৃতি। ছবিটির এই অংশে ও অন্যান্য অংশে এইসব নাম ও ছবিটির বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্তভাবে লেখা আছে, নাগরী অক্ষরে মারবাড়ী ভাষায় :

রাজা শ্রীরামদাস জহাংগিরী ফরমান দিখাই ছই পজুসন কী অমারী কী অর্জ করই ছই। পণ্ডিত শ্রীবিবেকহর্ষ চংগো- রেকা হুকম দিয়া মির্জা কাডল্লা শেখ ফরীদ অকুল আগাতুর কোটবাল কমাল দরবান।

জয়মল পত্তা

বাজার (বড়া) বাজার

ছবির শেষ অংশে দৃশ্যস্থান পরিবর্তিত। বিবেকহর্ষ ও উদয়হর্ষ জাহাঙ্গীর-দত্ত ফরমান সঙ্গে করে নিজেদের সংঘবিহারে ফিরে এসেছেন এবং ফরমানটি সমর্পণ করছেন তাঁদের গুরু আচার্য বিজয়সেন সূরির হস্তে। পাশে শুভ্রবস্ত্র পরিহিত মুণ্ডিত-মস্তক আরো তিনটি জৈনমুনি উপবিষ্ট ; গৃহস্থ জৈনেরাও অনেকে রয়েছেন নানাভাবে ও ভঙ্গিতে উপবিষ্ট ; এঁদের মধ্যে একজন দণ্ডায়মান, আর একজন সদ্য এসে পৌঁছে সংঘগুরুকে প্রণাম নিবেদন করছেন। সংঘবিহারে জৈন আচার্যরাও আছেন উপবিষ্ট ; সুখবর এসেছে, গৃহস্থ জৈন নারীরা নৃত্যময় ভঙ্গিতে এসে লাজবর্ষণ করছেন সংঘনারীদের সম্মুখে। এঁদের সামনেই চলেছে নৃত্যোৎসব ও গীতবাদ্য, নারীরাও এতে যোগ দিয়েছেন। জৈন সন্ন্যাসীদের প্রতিকৃতির নীচেই লেখা রয়েছে :

ভট্টারক শ্রীবিজয়সেন সূরি বখান করই ছই
পণ্ডিত বিবেকহর্ষ ফরমানে পেশকসি
করই ছই

পণ্ডিত উদয়হর্ষ
শ্রীবীতরাগায় নমঃ শ্রীগুরুভ্যো নমঃ
শ্রাবিকো গুহংলী করই ছই।

লক্ষণীয় এই, জৈন আচার্য এবং সংঘনারী প্রত্যেকেই আপাদমস্তক শুভ্রবস্ত্র পরিহিত এবং বেশে ভূষায় ভাবে ভঙ্গিতে অন্যান্য সকলেই শ্রেণীগত ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। বস্তুতঃ, যে-কজনার নাম চিত্রটিতে উল্লিখিত আছে তাদের প্রত্যেককেই শালিবাহন ব্যক্তিগত-ভাবে জানতেন এবং তিনি যে তাদের যথাযথ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য প্রতিকৃতিগুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন তা' সন্দেহ করবার কারণ নেই। জৈন সংঘগুরু বিজয়সেন সূরির প্রতিকৃতিটি তো তাঁর পূত, বিদগ্ধ ও সাধনদীপ্ত শ্রদ্ধেয় চরিত্রের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ; বিবেকহর্ষ এবং উদয়হর্ষ সম্বন্ধেও কতকটা একথা বলা চলে। তাহা ছাড়া, সভাসদ-বর্গ, বিদেশী নাগরিক এবং সংঘবিহারে যে ক'টি গৃহস্থ নর-নারীর প্রতিকৃতি আছে তাদেরও ব্যক্তিক চরিত্র ও ভাবভঙ্গির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সর্বোপরি, লক্ষণীয় চিত্রকল্পিত বিষয়বস্তুর নাটকীয় অভিব্যক্তি এবং গল্পের স্বচ্ছ সরল বহমানতা। প্রত্যেকটি দৃশ্যের এই জীবন্ত বস্তুনিষ্ঠ বহমান নাটকীয় অভিব্যক্তি মুঘল রাজকীয় সভাশিল্পে বিরল, নেই বললেই চলে। এই বস্তুনিষ্ঠ সচল নাটকীয় অভিব্যক্তি ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্য আলোচ্য বিজ্ঞপ্তিপত্রটিতে সম্পূর্ণ উপস্থিত। এই বৈশিষ্ট্য ভারতীয় গুটানো পটচিত্রে সর্বত্রই আছে, রাজপুত কলমের চিত্রশালায়ও আছে, কিন্তু মুঘল সভাশিল্পে বিরল। বস্তুতঃ পারসিক চিত্রপদ্ধতি ও ঐতিহ্যে এই নাটকীয় অভিব্যক্তির পরিচয় নেই।

(৩)

শালিবাহনের অন্য চিত্র রচনার সঙ্গেও সম্প্রতি আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছেন শ্রীযুক্ত হীরানন্দ শাস্ত্রীজী। পূর্বে কলকাতার সদ্য স্বর্গত শেঠ বাহাদুর সিংজী সিংঘীর সংগ্রহে, কিন্তু বর্তমানে আহমদাবাদের জৈন মুনি জিনবিজয়জীর সংগ্রহে "শালিভদ্রমহামুনি চরিত্র" নামে একটি পাণ্ডুলিপি আছে। এই পাণ্ডুলিপিটি রচনা করেন পণ্ডিত লাবণ্য-কীর্তি, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ১৬৮১ বিক্রম সংবতের (= ১৬২৪ খৃষ্টাব্দের) চৈত্রের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে শুক্রবারে। শালিভদ্র মহামুনির সমস্ত জীবনকথাটি এই গ্রন্থে চিত্রে অঙ্কিত আছে এবং প্রত্যেকটি চিত্র শালিবাহনের আঁকা। প্রত্যেকটিই অর্ধচিত্র, কিন্তু তৎসত্ত্বেও চিত্রগুলিতে গল্পের বিষয়-বস্তুর একটা সরল সুস্পষ্ট বহমানতা বিদ্যমান। খণ্ড খণ্ড অর্ধচিত্র হওয়া সত্ত্বেও ছবিগুলির মধ্যে গুটানো পটচিত্রের বর্ণনাত্মক গুণ অনস্বীকার্য। জাহাঙ্গীরের ফরমান চিত্রটিতে শালিবাহনের শিল্পের যে-সব গুণ প্রত্যক্ষ, "মহামুনিচরিত্রে"র প্রত্যেকটি ছবিতে সেই সব গুণ সমভাবে বিদ্যমান। এই পাণ্ডুলিপির যে-দু'টি ছবি এখনো ছাপা হ'চ্ছে তাদের বর্ণ বিন্যাস এবং বস্তুবিন্যাস এবং চিত্র পরিবেশের সঙ্গে ফরমান চিত্রটির সাদৃশ্য অনস্বীকার্য। এই উভয় নিদর্শনেই বর্ণের ঔজ্জ্বল্য, বর্ণের এবং

(৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুনঃ খাদ্য ও আশ্রয়-সমস্যা

দুর্ভিক্ষের প্রাবল্যের সূচনা

মন্বন্তর

মুনাফাখোরদের আক্রমণ

১৩৫০

মন্বন্তরের পর

বর্তমান পরিস্থিতি
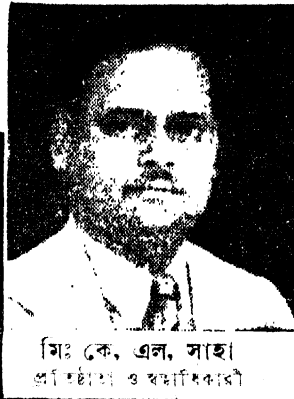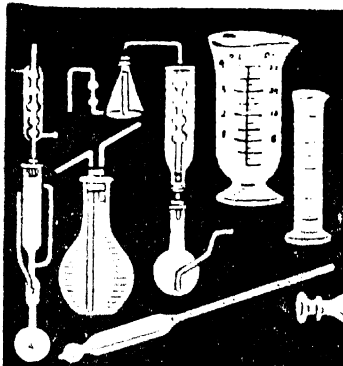
ভারতের শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক ও জ্যোতির্ব্বিদ

মহামান্য ভারত সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হস্তরেখাবিদ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, তন্ত্র ও যোগাদি শাস্ত্রে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন **রাজ-জ্যোতিষী জ্যোতিষ-শিরোমণি যোগ-বিদ্যাভূষণ পণ্ডিত শ্রীযুত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য,** জ্যোতিষার্ণব, সামুদ্রিকরত্ন, এম্-আর-এ-এস্ (লণ্ডন); প্রেসিডেন্ট—বিশ্ববিখ্যাত অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী।

এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবামাত্র মানব জীবনের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। ইঁহার তান্ত্রিক ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষমতা দ্বারা ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, স্বাধীন রাজ্যের নরপতি এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, যথা—ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের মনীষিবৃন্দকে যেরূপভাবে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে ভূরিভূরি স্বহস্ত লিখিত প্রশংসাকারীদের পত্রাদি হেড অফিসে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ভারতের মধ্যে ইঁনিই একমাত্র জ্যোতির্বিদ—যাঁহার গণনাশক্তি উপলব্ধি করিয়া মহামান্য সম্রাট স্বয়ং প্রশংসা জানাইয়াছেন এবং আঠারজন স্বাধীন নরপতি উচ্চ সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন।

ইঁহার জ্যোতিষ এবং তন্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও অধ্যাপকমণ্ডলী সমবেত হইয়া ভারতীয় পণ্ডিত মহামণ্ডলের সভায় একমাত্র ইঁহাকেই "জ্যোতিষ-শিরোমণি" উপাধিদানে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যোগবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির অব্যর্থ শক্তি প্রয়োগে ডাক্তার-কবিরাজ পরিত্যক্ত যে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, জটিল মোকদ্দমায় জয়লাভ, সর্বপ্রকার আপদুদ্ধার, বংশ নাশ হইতে রক্ষা, দুরদৃষ্টের প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন। অতএব সর্বপ্রকারে হতাশ ব্যক্তি পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিতে ভুলিবেন না।

কয়েকজন সর্বজনবিদিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়া হইল।

হিজ হাইনেস্ মহারাজা আটগড় বলেন, "পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায় মুগ্ধ ও বিস্মিত।"

হার হাইনেস মাননীয়া ষষ্ঠমাতা মহারাণী ত্রিপুরা ষ্টেট্ বলেন—"তান্ত্রিক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হইয়াছি। সত্যই তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।"

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, কে-টি বলেন—"শ্রীমান রমেশচন্দ্রের গণনাশক্তি ও প্রতিভা কেবলমাত্র স্বনামধন্য পিতার উপযুক্ত পুত্রতেই সম্ভব।"

সন্তোষের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর স্যার মন্মথনাথ রায়চৌধুরী, কে-টি বলেন—"ভবিষ্যৎ বাণী বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে। ইঁনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

উড়িষ্যার মাননীয় এডভোকেট জেনারেল মিঃ বি, কে, রায় বলেন "তিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি—ইঁহার গণনাশক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিস্মিত।"

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী রাজা বাহাদুর শ্রীপ্রসন্নদেব রায়কত বলেন—"পণ্ডিতজীর গণনা ও তান্ত্রিকশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া স্তম্ভিত। ইঁনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।

কেউনঝর হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়সাহেব শ্রীসূর্যমণি দাস বলেন—"তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন —জীবনে এরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখি নাই।"

ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত মনীষী মহামহোপাধ্যায় ভারতাচার্য মহাকবি শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বলেন—"শ্রীমান রমেশচন্দ্র বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পন্ন যোগী। ইঁহার জ্যোতিষ ও তন্ত্রে অনন্যসাধারণ ক্ষমতা।"

উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেম্বলীর মেম্বার মাননীয়া শ্রীযুক্তা সরলা দেবী বলেন—"আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশক্তি-সম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই।"

বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের মাননীয় বিচারপতি স্যার সি, মাধবম্ নায়ার, কে-টি বলেন—"পণ্ডিতজীর বহু গণনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সত্যই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী।"

চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর মিঃ কে, রুচপল বলেন—"আপনার তিনটি প্রশ্নের উত্তরই আশ্চর্যজনকভাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।"

জাপানের অসাকা সহর হইতে মিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন "আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শান্তিময় হইয়াছে পূজার জন্য ৭৫ পাঠাইলাম।"

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটি অত্যাশ্চর্য কবচ (উপকার না হইলে মূল্য ফেরৎ গ্যারাণ্টিপত্র দেওয়া হয়)

ধনদা কবচ—ধনপতি কুবের ইঁহার উপাসক, ধারণে ক্ষুদ্র ব্যক্তিও রাজতুল্য ঐশ্বর্য, মান, যশঃ, প্রতিষ্ঠা, সুপুত্র ও শ্রীলাভ করেন। (তন্ত্রোক্ত) মূল্য ৭৷৷৵০। অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন ও সত্বর ফলপ্রদ কল্পবৃক্ষতুল্য বৃহৎ কবচ ২৯৷৷৵০। প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কর্তব্য।

বগলামুখী কবচ—শত্রুদিগকে বশীভূত, পরাজয় ও যেকোন মামলা মোকদ্দমায় সুফললাভ, আকস্মিক সর্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা ও উপরস্থ মনিবকে সন্তুষ্ট রাখিয়া কর্মোন্নতিলাভে ব্রহ্মাস্ত্র। মূল্য ৯৵০, শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪৵০ (এই কবচে ভাওয়াল সন্ন্যাসী জয়লাভ করিয়াছেন।)

সূর্য কবচ—সূর্যদেবই মানবের রোগমুক্তি ও স্বাস্থ্যসুখ বিধান করিতেছেন সুতরাং সূর্যকবচ ধারণে মানব নীরোগ, সুস্থকায় ও দীর্ঘজীবী হয়। মহাব্যাধি প্রমেহ, অর্শ, বহুমূত্র, ভগন্দর, যক্ষা, হাঁপানী প্রভৃতি যে কোন দুরারোগ্য জটিল ব্যাধি হইতে আরোগ্যলাভ করে। মূল্য ৫৵০, বৃহৎ শক্তিশালী মূল্য ১৫৵০। সত্বর ফলপ্রদ আশ্চর্য শক্তিসম্পন্ন ২৫৵০।

অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী (রেজিঃ)

(ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান)

হেড অফিস—১০৫, (ঘ) গ্রে ষ্ট্রীট, "বসন্ত নিবাস" (শ্রীশ্রীনবগ্রহ ও কালী মন্দির), কলিকাতা।

ফোন: বি, বি, ৩৬৮৫। সাক্ষাতের সময়—প্রাতে ৮৷৷টা হইতে ১১৷৷টা।

ব্রাঞ্চ অফিস—৪৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট (ওয়েলিংটন স্কোয়ার মোড়), কলিকাতা। ফোন: কলি: ৫১৪২। সময়—বৈকাল ৫৷৷ হইতে ৭টা

লণ্ডন অফিস—মিঃ এম, এ, কার্টিস, ৭-এ, ওয়েষ্টওয়ে রেইনিস পার্ক, লণ্ডন।

মুঘল চিত্রকলার নোতুন নিদর্শন

(৫৪ পৃষ্ঠার পর)

বিষয়ের ঘনিষ্ঠ অনুভবোজ্ঞতা, সবুজ, হলুদে, নীল এবং লাল রঙের পটভূমি, রেখায় সীমানায় রঙের নির্দিষ্ট রূপায়ন, নারীর দেহ-রূপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাবোধ, ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্যের ঔজ্জ্বল্য এবং মুঘল সভাশিল্প-বহির্ভূত বর্ণপ্রসাধন ও বস্তুবিন্যাসের রীতি শালিবাহনের শিল্পপ্রতিভাকে একটা বিশিষ্ট শিল্পব্যক্তিত্ব দান করেছে। এপর্যন্ত আমরা আকবর-জাহাঙ্গীরের রাজসভার অন্যতম শিল্পী-রূপে শালিবাহনের নামই শুধু জানতুম; এই ছবিগুলিতে আমরা তার শিল্পপ্রতিভার পরিচয় পেলুম।

(৪)

মুঘল সভাচিত্রী শালিবাহনের এই চিত্রগুলি মুঘল সভাশিল্পের ইতিহাসে নোতুন ইঙ্গিত দান করছে, একটি নোতুন অধ্যায় উন্মোচন করছে, একথা আগেই বলেছি। কিন্তু এ উক্তি কি ভাবে সত্য ও সার্থক তা' একটু সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

প্রথমত, প্রাথমিক দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে ইহাদের সামগ্রিক পরিবেশ মুঘল চিত্রের পরিচিত পরিবেশ থেকে ভিন্নতর। যে সজ্ঞান সচেতন মর্যাদাবোধ, প্রায় প্রথাগত বস্তুবিন্যাস, সজ্জা-সজ্জা ও যান্ত্রিক স্থাপত্য-বিন্যাস এবং স্থিতগতি ও কেন্দ্রাশ্রিত চিত্র-ধর্ম ক্ষুদ্রপরিসর অলঙ্কৃত-সীমাবদ্ধ মুঘল গ্রন্থচিত্রের বা চিত্রগ্রন্থের বৈশিষ্ট্য, শালিবাহনের চিত্রগুলিতে তার প্রত্যেকটিই প্রায় অনুপস্থিত। রাজা বা রাজসভাসুলভ মর্যাদা-বোধ অন্যত্র দূরে থাক, জাহাঙ্গীরের প্রতি-কৃতিটিতেও নেই; সবগুলি ছবিই একটা ঘরোয়া ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাবোধে নিবিড় ও উচ্ছল, একটা অনুভবোজ্ঞতা একেবারে অনস্বীকার্য, রাজকীয় মুঘল শিল্পে যার একান্ত অভাব। রাজসভার সভাসজ্জা এবং রাজকীয় জীবন-বিন্যাস চিরকালই প্রথাগত এবং নির্দিষ্ট নিয়মে শাসিত; মুঘল রাজসভা এবং রাজকীয় জীবনেও ইহার কিছু ব্যতিক্রম হয়নি এবং স্বভাবতই মুঘল সভাশিল্পের বস্তু-বিন্যাসে তাহার প্রভাব ও প্রতিচ্ছবিও সুস্পষ্ট। শালিবাহন অঙ্কিত চিত্রগুলি এই প্রথাগত বস্তুবিন্যাস এবং যান্ত্রিক স্থাপত্যবিন্যাস প্রায় অস্বীকারই করেছে। রাজকীয় মুঘল চিত্র স্থিতগতি; এমন কি মৃগয়া বা যুদ্ধের চিত্র-গুলিতেও গতি যেন চিত্রিতমুহূর্তে এসে স্তব্ধ হ'য়ে আছে, সেই মুহূর্তটির উপর কে যেন মৃত্যুর শীতল হস্তের স্পর্শ রেখে দিয়েছে। শালিবাহনের চিত্রগুলি তার বিপরীত; নাটকীয় গতিময়তা, চঞ্চল জীবনবেগই এই ছবিগুলির বৈশিষ্ট্য। রাজকীয় মুঘল চিত্র একান্তই কেন্দ্রাশ্রিত; চিত্র বিন্যাসের কেন্দ্রে সম্রাট স্বয়ং অথবা চিত্রবর্ণিত বস্তু বা চরিত্র-গুলির প্রধান ব্যক্তি বা বস্তু এবং তাকে আশ্রয় করেই অন্যান্য বস্তু বা ব্যক্তির স্থান-বিন্যাস। শালিবাহনের ছবিগুলিতেও কেন্দ্রে অথবা মূলে আছেন চিত্রবর্ণিত প্রধান ব্যক্তি, কিন্তু তাঁকে আশ্রয় করেই ছবির বস্তুবিন্যাস গড়ে উঠেনি, সে বিন্যাস গড়ে উঠেছে গল্পের ভেতরকার প্রয়োজনে এবং তার স্বকীয় গতি-ময়তার প্রেরণায়। মুঘল সভাশিল্পরীতির ছবিগুলি অলঙ্কৃত বেষ্টনীর সীমায় আটসাট করে বাঁধা এবং বস্তু ও বিষয়বিন্যাস এই সীমাবেষ্টনীদ্বারা কতকাংশে নিয়ন্ত্রিত। শালিবাহনের ছবিগুলির বেষ্টনী কিছু একেবারেই নেই এবং সেই হেতু বস্তুবিন্যাস অবারিত, সীমাবেষ্টনী ছবিগুলিকে অযথা নিয়ম সংযমে বাঁধেনি।

দ্বিতীয়ত, সভাশিল্পী শালিবাহনের ছবিগুলির বিষয়বস্তুর নোতুনত্বও লক্ষণীয়। মুঘল সভাচিত্রীদের ছবির বিষয়বস্তু সাধারণতঃ রাজসভা ও রাজকীয় জীবনকে কেন্দ্র করেই; রাজসভার অধিবেশন, রাজান্তঃপুর, নৃত্যগীত, গৃহনির্মাণ, উদ্যান রচনা, যুদ্ধবিগ্রহ, মৃগয়া, রাজকীয় প্রতিকৃতি, মিছিল, এই সব নিয়েই প্রধানতঃ ছবিগুলি রচিত। শালিবাহনের ছবিগুলিতেই বোধহয় আমরা সব প্রথম অন্যতর জীবনযাত্রার কিছুটা আভাস দেখতে পাচ্ছি, যদিও সে জীবন অনেকটা সমসাময়িক আভিজাত্যাদর্শদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মুঘল সভাশিল্পীরা যে রাজাদেশের বা রাজ-সভানুমোদিত বিষয়বস্তুর বাইরে অন্যতর বিষয়বস্তু নিয়েও ছবি আঁকতেন, শালি-বাহনের ছবিগুলিতে তার প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল, বিশেষ করে পাওয়া গেল পশ্চিম ভারতীয় সমসাময়িক জৈন সমাজের জীবনের পরিচয়। মুঘল সভাশিল্পে বৃহত্তর জীবনের পরিচয় এত ক্ষীণ যে, এই স্বল্প পরিচয়ও মস্ত একটা লাভ।

তৃতীয়ত, বর্ণবিন্যাস ও আঙ্গিকের দিক থেকে এবং নারী দেহের রূপকল্পনার দিক থেকে শালিবাহনের চিত্রগুলি মুঘল সভাশিল্পাপেক্ষা রাজপুত চিত্র-ঐতিহ্যের সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা দাবি করে। বহু বর্ণ এবং মিশ্রবর্ণের লীলা মুঘল সভাচিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য; বর্ণের প্রসাধনক্রমও এ চিত্রে বিশেষ লক্ষণীয়। মিশ্রবর্ণ শালি-বাহনও ব্যবহার করেছেন আলোচ্য চিত্র-গুলিতে, কিন্তু প্রসাধনক্রমের পরিচয় এগুলিতে নেই বললেই চলে। বহুবর্ণও তিনি ব্যবহার করেননি। কিন্তু সবচেয়ে লক্ষণীয় এই যে, যে-রঙই তিনি ব্যবহার করে থাকুন না কেন, তা' সুনির্দিষ্ট সীমায় সীমিত, এবং সুস্পষ্ট সবুজ, লাল, নীল বা' হলুদে রঙের পটভূমিকায় সজীব সুস্পষ্টতায় নির্ণীত। রঙের এইরূপ ব্যবহার রাজপুত চিত্রপদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য; কিন্তু রাজপুত চিত্রে বর্ণ ও বস্তুবিন্যাসের এইটা সুকুমার অনুভবোজ্ঞতা প্রায় দেখা যায় না। শালিবাহনের বস্তু-বিন্যাসে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাবোধের কথা আগেই বলেছি; এর প্রধান কারণ, সভা-শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর একান্ত ঘরোয়া একান্ত আটপৌরে দৃষ্টিভঙ্গি যা' রাজপুত চিত্র রীতিতেও খুব বিরল, কারণ রাজপুত চিত্রেরও বস্তুবিন্যাস সাধারণভাবে অত্যন্ত প্রথাগত। "শালিভদ্র-মহামুনিচরিত্র" পাণ্ডু-লিপির দ্বিতীয় ছবি যেটি এখানে উদ্ধার করা হ'য়েছে তার বস্তুবিন্যাস এবং সাধারণ রূপ-পরিবেশ একটু বিশ্লেষণ করে দেখলেই বুঝা যাবে, মুঘল সভাপদ্ধতি ও রাজপুতপদ্ধতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শালিবাহনের দৃষ্টিভঙ্গি কত ভিন্ন। শালিবাহনের ছবিগুলির অলঙ্কার বিরলতাও খুব লক্ষণীয়। সমসাময়িক মুঘল সভাশিল্প অলঙ্করণ-সমৃদ্ধ, রাজসভার ঐশ্বর্যের প্রতিচ্ছবি এবং সজ্ঞানবোধ ছবিগুলিতে সুস্পষ্ট; কিন্তু এই জৈন চিত্রগুলি জৈন আচার্যদের মতই বিরলভূষণ; ফুল লতাপাতার অলঙ্কারও এগুলিতে নেই।

শালিবাহন ছিলেন আকবর-জাহাঙ্গীরের রাজকীয় কলাভবনের অন্যতম অলঙ্কার। আগ্রার রাজসভায় মান্য কর্মচারীদের মধ্যে কেউ কেউ হিন্দু জৈন ছিলেন, এর প্রমাণ জাহাঙ্গীরের এই ফরমানটিতেই সুস্পষ্টরূপে জানা যাচ্ছে। আমার নিজের ধারণা শালিবাহনও ছিলেন জৈন গৃহস্থ। "মহা-মুনিচরিত্রের" ছবিগুলি তিনি কোথায় বসে' এঁকেছিলেন বলা শক্ত, কিন্তু ফরমান-বিজ্ঞপ্তিপত্রটি যে আগ্রায় তাঁর কলাভবনে বসে' আঁকা এসম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না—আগ্রার জৈন সমাজই এটি আঁকিয়েছিলেন শালিবাহনকে দিয়ে। "মহামুনিচরিত্রের" ছবিগুলির বিষয়বস্তুও জৈন। যে দরদ ও ব্যক্তিগত অনুভবোজ্ঞতা এই ছবিগুলির বৈশিষ্ট্য তা' দেখলে মনে হয় শালিবাহন নিজেও ছিলেন জৈন। রাজাজ্ঞায় এবং রাজসভানুমোদিত আদর্শে এবং সভাশিল্প পদ্ধতিতে আঁকা শালিবাহনের কোনো ছবি এখনও আমাদের জানা নেই; তা' থাকলে একই শিল্পীর দুই সৃষ্টিরূপ আমরা দেখবার সুযোগ পেতুম। তবে এই ছবিগুলিতে এটুকু জানা গেল যে, সভা-শিল্পীরা সুযোগ ও অবসর পেলে অন্যতর বিষয়বস্তু এবং অন্যতর পদ্ধতি আশ্রয় করে চিত্ররচনা করতেন। শালিবাহনের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি, এই বিষয়বস্তু রাজসভার বাইরে লৌকিক জীবনকে অবলম্বন করেছে এবং এই পদ্ধতি মুঘল সভাশিল্প পদ্ধতির বাইরে সমসাময়িক রাজস্থানী শিল্পপদ্ধতিকে আশ্রয় করেছে বেশি, তার সঙ্গে আত্মীয়তাই ঘনিষ্ঠতর। আর, এরই ভেতর শালিবাহনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে, তাঁর ব্যক্তিগত ঘরোয়া, আটপৌরে এবং অত্যন্ত জীবনঘনিষ্ঠ লৌকিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বর্ণ ও বস্তুবিন্যাসে তাঁর নিজস্ব রীতিপদ্ধতি।

[প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়]

মিঠা ও লোনা জলে মৎস্যের বাস। খাদ্য হিসাবে কৃষির পরই মাছের স্থান। পাশ্চাত্য দেশে লোনা জলের মাছের চাহিদা বেশী হইলেও ভারতে, বিশেষ বাংলায় মিঠা জলের মাছের আদর বেশী। সামুদ্রিক মাছ বাংলার লোকে বড় একটা পছন্দ করে না, তাহার কারণ, বাংলার সর্ব্বত্র সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায় না। এই না পাওয়ার জন্য বাংলার লোকের সামুদ্রিক মাছের প্রতি তেমন অনুরাগ নাই।

বাংলার মৎস্য-চাষকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়:

১। মিঠা জলের মৎস্য-চাষ
২। লোনা জলের মৎস্য-চাষ
৩। সামুদ্রিক মৎস্য-চাষ

মিঠা জলের মৎস্য-চাষের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল দুইটী—(ক) জনন ও (খ) পালন।

লোনা জলের মৎস্য জননের উপর আমাদের হাত নাই বলিলেই চলে। ইহার একমাত্র বিষয় হইল কিরূপে পালন করা যাইতে পারে।

সামুদ্রিক মৎস্য চাষে জনন বা পালন দুইই কার্য্যকরী নয়। ইহার একমাত্র বিষয় হইল কিরূপে বেশী সামুদ্রিক মাছ আহরণ করা যায়। আমেরিকার ন্যায় ধনকুবের দেশে সামুদ্রিক মাছের জনন ও পালন সম্বন্ধে নানা ব্যবস্থা করা হয়; কিন্তু ভারতের ন্যায় গরীব দেশে এই বিষয়ে কিছু করা প্রায় সাধ্যাতীত।

মাছের ভেড়ী

লোনা জলের মৎস্য চাষের জন্য সমুদ্র সংলগ্ন জলাভূমি বা নদীর মোহনার নিকট জলাভূমির মধ্যে যে সব খাল বিল ঢুকে তাহার কাছাকাছি অনেক জমিতে বাঁধ দেয় এবং স্থানে স্থানে জল খাল হইতে বাঁধে আসিবার ব্যবস্থা রাখা হয়, ইহাকে ভেড়ী বলে। যখন এই সব লোনা খালে বান (জোয়ার) আসে, তখন বাঁধে যে স্থান খোলা থাকে তাহার মধ্য দিয়া জল ভিতরে ঢুকে। ভাঁটার সময় জল আবার বাঁধযুক্ত জলাভূমি হইতে খালে চলিয়া যায়। জোয়ারের সময় যে মাছ বা তাহাদের বাচ্চা খাল দিয়া বাঁধের মধ্যে আসিয়া পড়ে তাহারা আর ফিরিতে পারে না, কারণ, বাঁধে বা খাল-সংলগ্ন খোলা স্থানে যাহার মধ্য দিয়া জল ঢুকে বা বাহির হয়, তাহার মুখে এক প্রকার জালের বাক্স থাকে। এই বাক্সের ডালায় সূক্ষ্ম তারের জাল লাগান থাকে। জোয়ারের সময় এই বাক্সের ডালা খোলা থাকে, তাহাতে মাছ ও জল ভিতরে আসে। ভাঁটার সময় এই জালের বাক্সের ডালা বন্ধ করা হয়, যাহাতে জল খালে ফিরিয়া যায়, কিন্তু মাছ বা তাহাদের বাচ্চা আর ফিরিতে পারে না। এই ব্যবস্থা চৈত্র মাসের শেষ হইতে শ্রাবণ, ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত চলে। গরমের সময় সামুদ্রিক মাছ ডিম ছাড়িতে খালে আসে। এ কারণে বাঁধে আমরা ভেটকী, ভাঙ্গন, তোপসে, খরশুলা, খয়রা ও চিংড়ী মাছ ও তাহাদের বাচ্চা প্রচুর পরিমাণে পাইয়া থাকি। তারপর ৪।৫ মাসে বাঁধের সমস্ত মাছ ধরিয়া বিক্রয় করা হয়। মাঘ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত বাঁধ প্রায় শুষ্ক থাকে। তার-পর পূর্ব্ববর্ণিতভাবে আবার মাছের আবাদ করা হয়।

এইভাবে ভেড়ী করার দরুণ সমুদ্রের বহু মাছ আমরা অতি শৈশবাবস্থায় ধরিয়া লইতেছি। ছোট ছোট চারা মাছ বা যে সকল মাছ ডিম পাড়িবার উপযুক্ত হইয়াছে তাহাদের যদি ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিত তাহা হইলে অধিক পরিমাণে বড় মাছ পাওয়া যাইত। কিন্তু আপাতমধুর বলিয়া আমাদের দেশে প্রত্যেক ভেড়ীতে সব মাছ তুলিয়া লওয়া হয়। দূরদর্শিতার অভাবে আমরা মূলধন খাইয়া ফেলিতেছি। ইহার পরিণাম যে মোটেই সুবিধার নয়, তাহা বলাই বাহুল্য। এই প্রকারে লোনা জলের মাছের ক্রমশঃ বংশ লোপ হইতেছে।

কিছুদিন হইতে সুন্দরবনের অনেক ভেড়ীর অবস্থা অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে। পলি পড়িয়া এসব খাড়ি মজিয়া যাওয়ায় আর বেশী জোয়ার ভাঁটা খেলে না। তাহার জন্য খাড়ির মুখটা বন্ধ করিলে ভিতরে জল সারা বৎসর থাকে তাহা ছাড়া বৃষ্টির জল পাইয়া এসব ভেড়ীর জল প্রায় মিঠা জলে পরিণত হইয়াছে। মিঠাজলে লবণ নাই বলিলেই চলে কিন্তু এসব ভেড়ীতে কতকটা লবণ থাকে তাহা হইলেও ইহাতে রুই, মৃগেল, কাতলা, কালবোস প্রভৃতি মাছ পালন করা হয়। ভেড়ীতে মাছের খাদ্যাদির কোন ব্যবস্থা সাধারণতঃ বড় একটা করা হয় না। কিন্তু যে সকল ভেড়ী এখন মিঠা জলে ক্রমশঃ পরিণত হইতেছে এবং যাহা কলিকাতার ময়লা ফেলা খাল হইতে অল্পদূরে, সেই সব ভেড়ীতে এই জলবৎ ময়লা ঐ ভেড়ীতে পরিমাণ মত ঢুকান হয়। এখন নজর রাখা হয় যে, যে পর্য্যন্ত জলে বিশেষ কোন দুর্গন্ধ না হয়, সে পর্য্যন্ত ময়লা খালের জল দেওয়া হয়। তাহাতে মাছেরা নানাবিধ খাদ্য পায় ও এই সকল ভেড়ীর মাছ বেশ বড় হয়। এ সকল ভেড়ীতে বার মাসই জল থাকাতে সব মাছ এক সময় তুলিয়া ফেলিতে হয় না এবং জোয়ার ভাঁটা বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। অত্যন্ত পলি পড়ায় এই সব ঘটিয়াছে। নদীর পলিতে যেমন নদীগুলি মজিয়া গিয়াছে, সেইরূপ খাড়িতে পলি পড়িয়া খাড়িগুলিও মজিয়া যাওয়ায় ভেড়ীগুলিতে জোয়ার ভাঁটা খেলে না।

ধান ক্ষেতে পোনার চাষ

ধান ক্ষেতে চিংড়ী, কৈ প্রভৃতি সারা বাংলায় জন্মাইলেও, ইচ্ছা করিয়া পোনার চাষ বাংলায় করা হয় না। চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে বহু দিন হইতে ধান ক্ষেতে পোনার চাষ চলিতেছে। ইহা একেবারে নূতন পরিকল্পনা নয়। এমন কি K. G. Gupta বা Nicholsonএর Fishery reportএ ইহার উল্লেখ আছে ও তাঁহারা উভয়ে ইহা আমাদের দেশে অচল, এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি বাংলা সরকার এই ধান ক্ষেতে পোনার চাষের জন্য খুলনা ও ডায়মণ্ডহারবারে চেষ্টা করিতেছেন।

ইহাতে জমির চারদিকে বড় আইল দিতে হয় ও আইলের মধ্যে নালা কাটিয়া বেশী জলে মাছ রাখা হয়। মধ্যে মধ্যেও এই প্রকার নালা কাটা যাইতে পারে, যাহাতে জল কমিলেই সব মাছ মারা না পড়ে। এখন কথা হইতেছে আমাদের দেশে ক্ষেত অতি ছোট, তাহাতে উঁচু আইল দেওয়া চলে না। যে কারণে tractor চলে না সেই কারণেই উঁচু আইলও চলে না। তারপর হঠাৎ কেহ পাশের আইল কাটিয়া মাছ ও জল তাহার জমিতে লইলে মামলা সৃষ্টি ছাড়া আর উপায় নাই। সামান্য জলের জন্যই যখন দেশে খুন জখম পর্য্যন্ত হইতেছে, তখন মাছ লইলে নূতন মামলার সৃষ্টি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তারপর মাছ চুরি করিয়া লইতে গিয়া ধানও নষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইবে কিনা বিশেষ সন্দেহ।

মিঠা জলে পোনা মাছের জনন

অতি প্রাচীন কাল হইতে মিঠা জলে মাছের চাষের ব্যবস্থা হইয়া আসিলেও আজও ইহা আদিম অবস্থায় পড়িয়া আছে। এমন কি প্রায় সমস্ত মাছেরই জীবনেতিহাস আজও অজ্ঞাত। সারা ভারতে নানাস্থানে মৎস্য-চাষ বিভাগ বহু বৎসর ধরিয়া থাকিলেও দুঃখের বিষয় মৎস্য-জীবনেতিহাস সম্বন্ধে প্রায় কিছুই কাজ হয় নাই। যে কোন মাছের সাধারণ জীবনী কিছুই জানা নাই। আয়ু বৃদ্ধি, খাদ্য, ওজন বা কতটা দৈর্ঘ্য হওয়া

সম্ভব তাহাও কিছু জানিবার উপায় নাই। সম্প্রতি এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি পড়িয়াছে।

পোনা মাছ (অর্থাৎ রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবোস প্রভৃতি) সাধারণতঃ নদীতে জন্মে। আগে ধারণা ছিল যে, নদীর উৎপত্তি স্থানে সামান্য জলে পোনা মাছ স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে গিয়া হাজির হয় ও সেখানে ডিম পাড়ে। স্ত্রী-মৎস্য ডিম পাড়ামাত্র পুরুষ-মৎস্য তাহাদের জনন বীজ দিয়া নিষিক্ত করে। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। দেখা গিয়াছে যে, একই নদীর মধ্যে নানা আকারের পোনার বাচ্চা পাওয়া যায়। মৎস্য-শিশু ডিম হইতে বাহির হইয়া নদীর জলের সহিত নীচে নামিয়া আসে। তখন ধীবরেরা কাপড় ছাঁকা দিয়া তাহাদের ধরে। এখন যদি নদীর এক স্থানে যে আকারের মৎস্য-শিশু পাওয়া যায় তাহা হইতে ছোট আকারের মৎস্য-শিশু নদীর আরও মোহানার দিকে পাওয়া যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, কেবলমাত্র নদীর উৎপত্তি স্থানেই মৎস্য জনন হয় না। সম্প্রতি দেখা গিয়াছে যে, নদীর দুই পাড়ে নীচু জমিতে বর্ষার বৃষ্টির জল জমিয়া একাকার হইয়া যায়। এই জমা বৃষ্টির জলে অক্সিজেন (oxygen) গ্যাস বেশী পরিমাণে গোলা থাকে। বৃষ্টির জলের অতিরিক্ত অক্সিজেন গ্যাসই জনন ক্রিয়ার উদ্দীপক এবং এই প্রকার বৃষ্টির জলে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের বিহার ফলে ডিম প্রসব করে ও তাহা নিষিক্ত হয়। পোনার ডিম জলে ডুবিয়া যায়। কৈ, খলিসার ডিম

মেদিনীপুরের প্রথম প্রকার বাঁধ

জলের উপর ভাসিতে থাকে। কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে, পোনার ডিম ভাসে কিন্তু তাহা ঠিক নয়। পোনার সদ্যোজাত ডিমের আকার সরিষার মত। জল পাইয়া ফুলিয়া মটর দানার মত আকার ধারণ করে। ডিমের মধ্যে ভ্রূণ ক্রমবর্দ্ধিত হয় ও গোলাকার হইতে লম্বাকৃতি প্রাপ্ত হয়। প্রথমে ভ্রূণের নড়া চড়ার শক্তি থাকে না, পরে ডিমের খোসার মধ্য দিয়া ভ্রূণকে ঘুরিতে দেখা যায়। ডিম পাড়িবার ১৫।১৬ ঘণ্টার মধ্যে ভ্রূণ পুষ্ট হয় ও ডিমের খোলা কাটাইয়া বাহির হইয়া পড়ে। কাহারও কাহারও মতে ২৪ হইতে ৩৬ ঘণ্টা সময় লাগে কিন্তু তাহা ঠিক নয়। ডিমের মধ্যে ভ্রূণ ছাড়া ভ্রূণের খাদ্য পীত বর্ণের কুসুম থাকে। এই কুসুম হইতে ভ্রূণ বড় হয়। ভ্রূণ বাহির হইবার পরও মৎস্য-শিশুতে যে সামান্য কুসুম তখনও অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে পুষ্ট হয় বলিয়া এ সকল মৎস্য-শিশুর তখনও মুখ খুলে না। এই সকল ক্ষুদ্র মৎস্য-শিশু ডিমের খোলা হইতে বাহির হইয়াই জলে ভাসিতে থাকে। নদীর পার্শ্বে জমা বৃষ্টির জল হইতে এই সকল ক্ষুদ্র মৎস্য-শিশু ক্রমশঃ নদীতে আসিয়া পড়ে ও নদীর স্রোতের সহিত মোহনার দিকে নামিয়া আসে।

বিশেষ পুষ্করিণীতে পোনা মাছের জনন

সাধারণ পুষ্করিণীতে পোনা মাছের জনন হয় না। কিন্তু বাংলা দেশে স্থানে স্থানে এমন সব বিশেষ পুষ্করিণী আছে, যাহাতে ঐ সকল মৎস্যের জনন সম্ভব হয়। মেদিনীপুর বীরভূম, বাঁকুড়া ও চট্টগ্রামের নানাস্থানে পোনা মাছের জনন হইয়া থাকে। এই সকল স্থানে উঁচু ও নীচু জমি পাশাপাশি থাকে। উঁচু জমির নিকট নীচু জমিতে পুকুর থাকে। এই পুকুরসংলগ্ন নীচু জমিতে বাঁধ দিয়া (মাটির দেওয়াল) তিন দিক ঘেরিয়া দেওয়া হয় ও চতুর্থ দিকে উঁচু জমি থাকাতে জল গড়াইয়া বাঁধে পড়ে। এই ঘেরা স্থানটায় পুষ্করিণীর অনুপাতে আরও ৮।১০ গুণ স্থান থাকে।

বর্ষার মুষল বৃষ্টিধারায় উঁচু জমি হইতে জল প্রবল বেগে বাঁধে আসিয়া পড়ে। ইহাকে ঢল বলে। প্রথমে পুষ্করিণীর জল বাড়িতে থাকে। ক্রমশঃ জল পুষ্করিণী ছাপাইয়া সমস্ত বাঁধ ভরিয়া উঠে। উঁচু জমির ঠিক উল্টা দিকে আলের গায় একটি স্থান সামান্য কাটা থাকে। এই খোলা স্থান দিয়া জল বাহির হইতে থাকে। জল বাহির হইয়া যে নালা দিয়া ক্রমশঃ নদীতে গিয়া পড়ে সেই নালাকে বুলান কহে। উঁচু জমি হইতে বৃষ্টির জল প্রবেশ করিয়া পুষ্করিণীর পুরাতন জলের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় বুলান দিয়া বাহির হইয়া যায়। তাহা ছাড়া অতিরিক্ত জল প্রবেশ করিলে বুলান না থাকিলে বাঁধ ছাপাইয়া উঠিতে পারে। ইহাতে পুষ্করিণীতে রক্ষিত বড় বড় রুই কাতলা প্রভৃতি মৎস্য বাঁধ হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারে।

মুষলধারে বৃষ্টির সময় ও তাহার পর বুলান দিয়া অনেক জল বাহির হইয়া যায়, তাহাতে পুষ্করিণীর পুরাতন জল বাহির হইয়া নূতন বৃষ্টির জলে পূর্ণ হইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া উঁচু জমি হইতে জল গড়াইয়া আসে এবং সেই ঢল পুষ্করিণী ছাপাইয়া বাঁধের সব স্থানটা জলে ভরিয়া যায়। পুষ্করিণী বাদে বাঁধের অন্য জমিতে প্রায় এক হাঁটু জল জমে। বৃষ্টি বন্ধ হইলে বুলানের মুখে বাঁধের নিকট যে বাঁশের ছিটাবেড়া দেওয়া থাকে তাহাতে কাদা ও খড় দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে ছেঁড়া বলে। বৃষ্টির জল বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় যে, বড় বড় মাছের স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই পুষ্করিণীর গভীর জল ছাড়িয়া হাঁটু ভোর বাঁধের জলে আসিয়া ঝাঁপাঝাঁপি করিয়া থাকে। এই সামান্য গভীর বাঁধের জলকে মোয়ান বলে। ছেঁড়া দিয়া জল বাহির হওয়া বন্ধ থাকার দরুণ জননের সময় বাঁধে জল একেবারে বদ্ধ জলে পরিণত হয়। অতএব কাহারও কাহারও ধারণা যে, স্রোত ছাড়া অন্য জলে পোনা মাছের জনন হয় না, ইহা একেবারে ভুল। কাহারও কাহারও ধারণা যে, বাঁধে মাটি খুব শক্ত হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু মেদিনীপুরেই এমন বাঁধ আছে যাহাতে মৎস্য জনন সময় ছাড়া অন্য সময়ে ধান প্রভৃতির চাষ হইয়া থাকে। এমন কি দেখা যায় যে কাটা ধানের গোড়া সকল তখনও বাঁধে সামান্য জলে জাগিয়া রহিয়াছে।

বৃষ্টির জল ছাড়া কোন মাছেরই জনন হয় না, তবে কোন কোন মাছের সামান্য বৃষ্টির জল পাইলেই জনন উদ্দীপনা আসে; যেমন শোল, শাল, ল্যাটা —ইহাদের জননের জন্য সামান্য বৃষ্টির জল পুকুরে পড়িলেই সম্ভব হয়। সেজন্য আমাদের দক্ষিণ বঙ্গে এই সব মাছ সাধারণ পুকুরে বাচ্চা পাড়ে।

কৈ প্রভৃতি ছোট মাছের জনন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য গবেষণাগারে কয়েকবার বৃষ্টির জল দিয়া জনন ক্রিয়া সম্ভব হইয়াছে। একজোড়া কৈ হইতে ৩০০০ ডিম পাওয়া যায়। নিষিক্ত ডিমের কোন প্রকার রং নাই, একেবারে স্বচ্ছ। এই ডিম ভাসিতে থাকে। রং না থাকাতে পাখী প্রভৃতিতে খাইতে পারে না। ভাসে বলিয়াই রং থাকে না। ইহা প্রকৃতির আশীর্ব্বাদ।

বাঁধে ডিম আহরণ

মৎস্য জনন ক্রিয়া আরম্ভ হইতে ১০ ঘণ্টার পর বুলানের খানিকটা দূর হইতে মশারীর জাল দ্বারা ডিমাহরণ আরম্ভ করা হয়। এই সকল জাল দৈর্ঘ্যে ২০ গজ ও প্রস্থে ১০ গজ। কিনারা শক্ত করার জন্য সাদা ফিতায় মুড়ি সেলাই করা থাকে। জল পাইয়া নিষিক্ত ডিম মুক্তার মত দেখায়।

মেদিনীপুরে ডিমাহরণের পর এই সকল ডিম উঁচু জমিতে ছোট ছোট গর্ত্ত কাটিয়া তাহাতে বাঁধের জল দিয়া সেই জলে রাখা হয়। গর্ত্ত দৈর্ঘ্যে ২।। ফুট, প্রস্থে ১।। ফুট এবং ১।। ফুট গভীর। গর্ত্তগুলিকে হাপা বলে। হাপা পাশাপাশি সাজান থাকে, পরস্পরের সহিত যোগ থাকে। যাহাদের হাপার সংখ্যা অধিক তাহারা হাপার জল শুকাইয়া নালে ডোঙ্গার দ্বারা বাঁধের জল ছাঁকিয়া নিকটস্থ হাপায় ঢালে। তাহাতে বহুদূরস্থ হাপাতেও ঐ জল চলিয়া যায়।

ডিমের খোসা কাটাইয়া বাচ্চা বাহির হইয়া গেলে খোসাগুলি জলের নীচে চলিয়া যায় ও পচিতে থাকে। ইহাতে জল শীঘ্রই খারাপ হইয়া যায়। তাহা ছাড়া পোনার এই সময় মুখ খুলে ও তাহারা জলের মধ্যস্থ শেওলা বা এককোষ প্রাণীদের খাইতে থাকে। এই সকল খাদ্য খাওয়াতে তাহা হজম করিয়া বিষ্ঠা ত্যাগ জন্য জল আরও নষ্ট হয়। সাধারণতঃ হাপায় খাদ্য দিবার ব্যবস্থা নাই। সেজন্যও অক্সিজেন গ্যাসের অভাবে হাপায় কয়েক দিনের মধ্যেই মড়কের সৃষ্টি হয়। তাহা ছাড়া হাপায় পোনা ছাঁকিয়া মধ্যে মধ্যে ক্রেতাদের দেখাইতে গিয়া অনেক পোনাই আঘাতপ্রাপ্ত হয়। জল পচার জন্য শীঘ্রই হাপার জলে ব্যাকটিরিয়া দেখা দেয়। ব্যাকটিরিয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া হাপার জলে পড়ে ও পচা জলে ইহাদের সংখ্যাধিক্য ঘটে। একমাত্র অক্সিজেন ও রৌদ্র পাইলে ব্যাকটিরিয়া বাড়িতে পারে না কিন্তু এই দুইয়েরই অত্যন্ত অভাব ঘটে।

শ্বাসকার্য্যের সাহায্য

খুব সস্তায় অক্সিজেন পাইতে হইলে জলের মধ্যে বাতাস দেওয়া প্রয়োজন। এই বাতাস ইলেকট্রিক পাম্প দ্বারা দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু বাংলা দেশে, বিশেষ পল্লীগ্রামে ইলেকট্রিকের অভাব। সেজন্য যাহাতে খরচ কম ও যাহা সহজলভ্য তাহার উপরই নির্ভর করিতে হয়।

তাহা ছাড়া পোনা বাচ্চা দূরে লইয়া যাইতে বা অনেকক্ষণ হাঁড়িতে রাখিতে হইলে, জেলেরা হাত দিয়া হাঁড়ির জলের উপর চাপড় মারিতে থাকে, যাহাতে বায়ু বা অক্সিজেন গ্যাস জলে মিশ্রিত হয়। ইহাতে মৎস্য শিশুর শ্বাসকার্য্যে সুবিধা হয়

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের মৎস্য গবেষণাগার হইতে শ্বাসকার্য্যের সুবিধা বা হাপায় হাওয়া দেওয়ার জন্য হাত চাপড়াইয়া বায়ু দেওয়া অপেক্ষা আর এক সুবিধাজনক ব্যবস্থা আবিষ্কার করা হইয়াছে। মোটর-গাড়ীর চাকার বা বাইসাইকেল গাড়ীর চাকার ভিতরের টিউবে হাত পাম্প দিয়া বাতাস পুরিয়া তাহাতে একটি ছোট সরু রবারের নল লাগাইয়া সেই রবারের নলের মুখে pinch cock (এক প্রকার চিমটা) লাগাইয়া সেই pinch cock-য়ে যে স্ক্রু থাকে তাহা সামান্য খুলিলে অতি মন্থর গতিতে হাওয়া বাহির হইবে। এখন জলের মধ্যে নলের মুখ ডুবাইয়া রাখিলে বুড়বুড়ি কাটিতে থাকিবে। এইরূপে বায়ু জলে মিশ্রিত করা হাত চাপড়ানর মত শ্রমসাধ্য নয় এবং

সর্ব্বসময়ে অর্থাৎ হাঁটিবার সময়েও বায়ু দেওয়া চলে। নৌকা করিয়া অথবা গরুর গাড়ীযোগে মাছ বা বাচ্চা আনিবার সময়েও সর্ব্বত্র ব্যবহার করা চলে। এমন কি জিওল মাছ রাখিতেও ইহার দ্বারা হাওয়া দিলে মাছ বেশ তাজা থাকে ও প্রত্যহ জল পাল্টাইবার আবশ্যক হয় না। তাহা ছাড়া মাছ ধরিবার সময় জীবন্তাবস্থায় আনিতে হইলে নৌকায় সামান্য জলে এই রবার পাম্প লাগাইয়া দিলে মাছ মারা যাইবার ভয় থাকে না ও সহজেই আনা চলে। ইহাতে খরচ অতি সামান্য।

হাপায় পোনা-শিশুর খাদ্য হিসাবে শৈবাল, এককোষ প্রাণী, চিংড়ী প্রভৃতি দেওয়া আবশ্যক -- এই সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী খুব সহজেই সংখ্যায় বর্দ্ধিত করা যায়। শৈবালের জন্য সামান্য কিছু লবণজাতীয় দ্রব্যের আবশ্যক। এই লবণজাতীয় দ্রব্য জলে দ্রবীভূত করিয়া তাহাতে সামান্য পরিমাণ এককোষ শৈবাল রাখিলে সহজেই সংখ্যায় বাড়ে। তখন তাহা হাপার জলে বা ডোবাতে অথবা পুষ্করিণীতে ঢালিয়া দেওয়া যায়। জলে পড়িলে তাহা আরও বৃদ্ধি পায়। শুষ্ক খড় বা দুর্ব্বা জলে কয়েকদিন ভিজাইয়া হাওয়ায় রাখিলে উহাতে এককোষ প্রাণী জন্মে। এই সকল প্রাণী হাওয়াতে ভাসিয়া আসিয়া এই প্রকার জলে দেখা দেয় ও সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। গোবর বা শুষ্ক কচুরী-পানা পুষ্করিণীর জলে ভিজাইয়া রাখিলে যদি উহাতে সামান্য পরিমাণ ক্ষুদ্র চিংড়ী থাকে তাহা অতি সত্বর সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। শুষ্ক খড় হইতে যে এককোষ প্রাণী পাওয়া যায় তাহা বেশীদিন ঐ জলে রাখিলে তাহাতে ব্যাকটীরিয়ার জন্ম হয় ও ক্রমে ব্যাকটীরিয়ারা এককোষ প্রাণীদের মারিয়া ফেলে, ব্যাকটীরিয়া একেবারে নিবারণ করা যায় না। তবে প্রথম হইতেই বাতাস উক্ত জলের মধ্যে ছাড়িলে ব্যাকটি-রিয়ার প্রাদুর্ভাব কম হয়। তাহাতে অনেক দিন পর্য্যন্ত এককোষ প্রাণী পাওয়া যায়। এককোষ প্রাণীর খাদ্য হইল এককোষ শৈবাল। সেজন্য যে জলে শুষ্ক জলজ গাছ বা শুষ্ক খড় রাখিয়া এককোষ প্রাণীর চাষ করিতে হয় তাহাতে খানিক শৈবাল রাখা আবশ্যক। শৈবালের খাদ্য তৈয়ারী করিতে লবণজাতীয় দ্রব্য ও রৌদ্রের প্রয়োজন। ক্ষুদ্র চিংড়ীরাও শৈবাল খায়।

তাহা হইলে হাপায় পোনা-শিশুর খাদ্য হিসাবে শৈবাল, এককোষ প্রাণী, ক্ষুদ্র চিংড়ী প্রভৃতি দিলে এই সকল মৎস্য-শিশুর খাদ্যাভাবে হাপায় অকাল মৃত্যু ঘটিবে না। শ্বাসক্রিয়ার জন্য মধ্যে মধ্যে টিউব দিয়া হাওয়া দেওয়া আবশ্যক। ইহা ছাড়া প্রত্যেক হাপার চার কোণে চারিটি ছোট জলজ গাছ দেওয়া যাইতে পারে। গাছ তাহার অঙ্গার আত্মকরণের জন্য বাতাসের কারবণ ডাই-অকসাইড হইতে কারবণ লইয়া অক্সিজেন গ্যাস ছাড়ে। ঐ অক্সিজেন পচা জীবদেহ অক্সিডাইজ করিয়া জল পরিষ্কার রাখিতে অনেক সাহায্য করে। তাহা ছাড়া অক্সিজেনে ব্যাকটীরিয়ার বৃদ্ধি কম হয়।

ইহা ছাড়া ডিমের খোসা যাহাতে পচিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং খরিদ্দারকে দেখাইবার জন্য মৎস্য-শিশুকে অনবরত ছাঁকিবার জন্য যাহাতে আঘাতপ্রাপ্ত না হয় তাহারও ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এই দুইয়ের জন্য নিম্ন-লিখিত পরিকল্পনার সাহায্য লওয়া যাইতে পারে।

প্রত্যেক হাপারের চার কোণে চারিটি খুঁটি পুঁতিয়া তাহাতে খুব আলগাভাবে চার কোণা মোটা কাপড় বাঁধিয়া দিতে হইবে ও কাপড়ের মধ্যখানে একটি ইট বা পাথর রাখিয়া দিলে কাপড়ের মধ্যেখানটার অনেকটাই জলের ভিতর আসিবে। এই মোটা কাপড়ের উপর মশারীর ছেঁদাযুক্ত নেট কাপড়ের আর একটি কাপড় ঐ পূর্ব্ব-বর্ণিত খুঁটায় বাঁধিয়া দিতে ও তাহারও মধ্যখানে একটি ইট বা পাথর রাখিতে হইবে। এই নেট কাপড়টিও জলের মধ্যে থাকিবে। এখন মাছের ডিম্বাহরণ করিয়া সেই ডিম যদি উক্ত নেট কাপড়ের মধ্যে রাখা যায় তাহা হইলে ১৫ হইতে ১৮ ঘণ্টা মধ্যে ঐ সকল মৎস্য-শিশু খোসা খসাইয়া বাহির হইয়া পড়িবে ও ডিমের খোসাগুলি নেটের উপর থাকিবে। আর মৎস্য-শিশুগুলি নেট কাপড়ের ছেঁদা দিয়া মোটা কাপড়ের মধ্যে গিয়া পড়িবে। ইহার পর খোসা সমেত নেট কাপড়টি জল হইতে খোঁটার বাঁধন খসাইয়া সরাইয়া লইলে আর পচিবার ভয় থাকিবে না। খরিদ্দারকে দেখাইবার জন্য

(৬৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হাওয়া দিবার জন্য মটর গাড়ীর চাকার ভিতরের টিউব

তক্ষশিলা

পৃথিবীর প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়!

তক্ষশিলা ভারতের তথা সমগ্র পৃথিবীর প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঠিক কাল আজিও নির্দ্ধারিত হয় নাই কিন্তু খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীতে বিখ্যাত বৈয়াকরণিক পাণিনি যে তক্ষশিলারই ছাত্র ছিলেন একথা অবধারিত সত্য। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সূত্রেও যে সকল প্রামাণিক নিদর্শন পাওয়া যায় তাহা-দ্বারা তক্ষশিলার অস্তিত্ব অন্ততঃ আরও কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বেই সূচিত হয়।

অর্থশাস্ত্র প্রণেতা মহামতি কৌটিল্য এবং আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র বিশারদ মহাচার্য্য চরক এই বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যয়ন করিতেন। সকল শাস্ত্রাধ্যয়নের ব্যবস্থা তক্ষশিলার বৈশিষ্ট্য ছিল; তন্মধ্যে চিকিৎসা-বিদ্যাচর্চ্চাই সবিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তক্ষশিলার শিক্ষা-পদ্ধতির খ্যাতি ও বৈশিষ্ট্যে দেশ-দেশান্তর হইতে বহুশতাব্দী যাবৎ অগণিত বিদ্যার্থী জ্ঞানলাভকামনায় এই শিক্ষাতীর্থে সম্মিলিত হইত।

সেযুগে কাগজ আবিষ্কৃত হয় নাই। বহুসাধনলব্ধ জ্ঞান ও বিদ্যা প্রধানতঃ স্মৃতি ও শ্রুতির সাহায্যেই যুগপরম্পরায় রক্ষিত হইত।

বিজ্ঞানের কল্যাণে সে অভাব যে কেবলমাত্র পূর্ণ হইয়াছে তাহা নহে, আজ আমাদের ভারতেই বহুল পরিমাণে বিভিন্ন প্রকারের কাগজ প্রস্তুত হইতেছে।

শ্রীগোপাল পেপার মিল্‌স্ লিমিটেড্

ম্যানেজিং এজেন্টস্:—
করমচাঁদ থাপার এণ্ড ব্রাদার্স লিমিটেড্।
৫, রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।
ভারতের সর্ব্বত্র ডিষ্টিবিউটর্স্ আছে।

S. G. P.—1.

বাংলার মৎস্য-চাষ

(৬৬ পৃষ্ঠার পর)

মোটা কাপড় সমেত মৎস্য-শিশুদের জলের বাহিরে সহজে আনা চলে, তাহাতে তাহাদের আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প।

এই প্রকারে মৎস্য-শিশুদের রাখিয়া খাদ্য এবং শ্বাসের জন্য হাওয়া দিলে মৎস্য-শিশুগুলি অনেক দিন পর্যন্ত নীরোগ ও সুস্থাবস্থায় মড়ক না হইয়া হাপায় থাকিতে পারে। তাহাতে খরিদ্দারদের অযথা কম দামে ও তাড়াতাড়ি বিক্রয় করার প্রয়োজন হইবে না এবং বহু দূরের লোককে এই সকল মৎস্য-শিশু ক্রয়ের জন্য আসিতে সময় দেওয়া চলিবে। লাভের হারও অনেক বেশী হইবে।

মোয়ানটা ঢলেরই পর এবং বুলানটা পুষ্করিণীর পর। আর তৃতীয় প্রকার যাহার মোয়ান বুলান কিছুই নাই। একটা বাঁধ দেওয়া স্থানে বৃষ্টির জল ধরা হয় ও নিকটস্থ পুষ্করিণী হইতে বড় বড় মাছ সেই জলে জননের জন্য ছাড়া হয়। ইহাতে ডিম্ব কম পাওয়া যায়। যে স্থানে মৎস্য শিশুর অত্যন্ত অভাব ও জমি কাটিয়া বাঁধ করা সহজ নয় সেখানে তৃতীয় প্রকার বাঁধের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

মৎস্য-শিশু ও মৎস্য পালন

নদী হইতে বা বাঁধ হইতে মৎস্য-শিশুদের প্রথমে ছোট ডোবায় ফেলা উচিত। কারণ পোনা মাছের শিশুর সহিত বহুবিধ মাংসাশী মাছের শিশু থাকে। ইহাদের ছোট

করিলে ৪০ দিনে ১০৯৬টি রুই কাতলার বাচ্চা মাত্র একটি বোয়ালের বাচ্চা খাইয়াছিল। আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে যে, বোয়ালের বাচ্চা অত্যন্ত দ্রুত বাড়িতে থাকে। ৪০ দিন বয়সের রুই দৈর্ঘ্যে ৩৫ মিলিমিটার কিন্তু বোয়াল ২৯২ মিলিমিটার। এখন কথা হইতেছে যে, পরীক্ষার সময় বোয়াল বাচ্চাটি যে ভাবে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ১০০টি রুই কাতলার বাচ্চা পাইয়াছিল, সেটা পুষ্করিণীতে পাওয়া সম্ভব কিনা—কিন্তু কথা হইতেছে যে, পুষ্করিণীতে একটা দুইটা বোয়ালের বাচ্চা না থাকিয়া অনেকগুলি থাকার সম্ভাবনাই বেশী। তাহাতে বড় বোয়ালও থাকিতে পারে। এ ছাড়া অন্যান্য মাংসাশী মাছ ও মাছশিশু
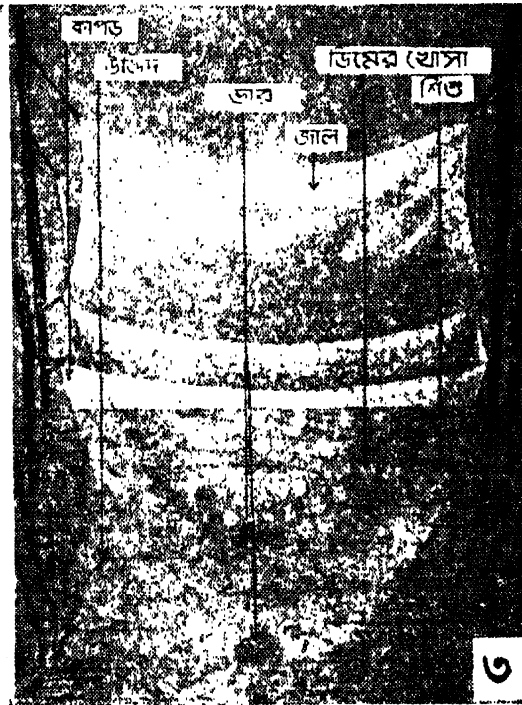
নূতন প্রকারে মৎস্য শিশু রাখার পদ্ধতি

সর্বত্র কি প্রকারে বাঁধ করা যায়

এখন দেখা যাউক মেদিনীপুরে যে ভাবে মৎস্য জনন হইতেছে তাহা বাংলার অন্যান্য স্থানে হওয়া সম্ভব কিনা। খুব নীচু জমিতে পুষ্করিণী দেখিয়া তাহার তিনদিক হইতে ১০ গুণ জমি এমন ভাবে কাটিয়া নামাইয়া দিতে হইবে যে তাহা সংলগ্ন জমি হইতে অন্ততঃ ৭টি ইঞ্চি নীচে থাকে। বাকি দিকে উঁচু জমি হইতে এমন ঢল নামাইতে হইবে যে অতিরিক্ত বর্ষার সময় প্রচুর জল ঐ পুষ্করিণীতে আসিয়া পড়িতে পারে। যে মাটি কাটিয়া জমি নীচু করিতে হইবে সেই মাটি দিয়া অন্যান্য জমি হইতে বাঁধ দিতে হইবে। ঢলের বিপরীত দিকে আল করিয়া বুলান অর্থাৎ ছোট খাল করিতে হইবে। মেদিনীপুরের বাঁধ তিন প্রকার। প্রথম প্রকারের কথা আগেই বলিয়াছি। দ্বিতীয় প্রকার প্রায় প্রথমেরই মত, তবে

অবস্থায় রুই কাতলার শিশু হইতে পৃথক করা সাধারণের পক্ষে শক্ত কিন্তু না করিয়া সবশুদ্ধ একেবারে পুষ্করিণীতে ফেলিলে হিতে বিপরীত ঘটিতে পারে। মাংসাশী মৎস্য যেমন চিতল বোয়াল প্রভৃতি অতি ছোট শিশু অবস্থা হইতেই অন্য মাছের, বিশেষতঃ রুই কাতলা প্রভৃতি পোনা খাইতে থাকে। মেদিনীপুরে এই বোয়াল মাছের বাচ্চা ও রুই কাতলার বাচ্চা একই দিনে যাহাদের জন্ম হইয়াছে সেইরূপ দুই প্রকার মাছের বাচ্চা লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে একটি বোয়ালের বাচ্চার সহিত ১০০টি রুই কাতলার বাচ্চা এক সঙ্গে রাখিলে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় এই বোয়ালের বাচ্চাটি কত রুই কাতলার বাচ্চা খায়? ২৪ ঘণ্টা অন্তর যতগুলি রুই কাতলার বাচ্চা খাইয়া ফেলে সেগুলিকে আবার নূতন বাচ্চা দিয়া পূরণ

যে থাকিবে না তাহাও বলা শক্ত। ফলে অনেক সময় পোনা ফেলিয়াও উপযুক্ত ফল লাভ করা হইয়া উঠে না। এ সকল কারণে মাছ না বাড়িয়া একেবারে লুপ্ত হইলে লোকে বলিয়া থাকেন "চারা ফেলিলাম কিন্তু হইল না একেবারে পচিয়া গেল।" সাধারণতঃ এ সকল চারা পচে না, অন্য মাছে বা মৎস্য শিশুতে খাইয়া ফেলে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে চারা চেনা কতটা আবশ্যক। সাধারণতঃ জেলেরা যে বলে এটা রুই, ওটা মৃগেল, এটা কাতলার চারা সেটা প্রায়ই ভুল। নির্ভুল ভাবে প্রত্যেকটি চারা নির্দ্ধারণ করিতে কোন জেলেকে আজ পর্য্যন্ত দেখি নাই। অথচ সকলেই বলে তাহাদের নির্দ্ধারণ একেবারে নির্ভুল। খানিকটা বড় হইলে অবশ্য অনেকেই বলিতে পারে কিন্তু সে বলায় কোনও লাভ নাই।

চারা যত ছোট কেনা যায় ততই লাভের অঙ্ক বড় হয়। খুব ছোট অবস্থায় মেদিনীপুরের রুই কাতলার চারা তাম্বুলবিহারের কৌটার ঢাকনিতে ১০০০ ধরে। এই ১০০০টি চারার (যদিচ তাহারা ইহাকেই ডিম বলে) দাম ১৲ হইতে ১৷৹ তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, চারা অতি ছোট অবস্থায় কিনিতে হইবে এবং এই কেনার সময় বুঝিয়া লইতে হইবে যে কোন্ মাছের চারা ছাড়া হইতেছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত নিম্নলিখিত উপায়ে পোনা মাছের চারা চিনিতে পারা যায়:—

১। মাথা প্রকাণ্ড (১১'২ মিলিমিটার হইতে বেশ বুঝা চলে) গোঁফ নাই। লালফুলকা কানদুয়ার মধ্য দিয়া দেখা যায়—**কাতলা**।

(২) ঠোঁট কোঁকড়ান নয়।

(/০) একটা কাল ফোঁটা পিঠের উভয় পার্শ্বে, ঠিক শরীরের মাঝখান হইতে ৫।৬টা আঁশ ছাড়াইয়া উপর দিকে (শরীরে লম্বা দাগ যুক্ত)—**বাটা**।

(৵০) কাল ফোঁটা নাই

(৫) পিঠের পাখনার নীচে একটা কাল জড়ুল। একটি দ্বিতীয় কাল ফোঁটা ৩০'৫ মিলিমিটার হইতে দেখা দেয়। ১৪'২ মিলিমিটার লম্বা অবস্থায় উপরের ঠোঁটে একজোড়া গোঁফ দেখা যায়—**পুঁটি**।

(১০) পিঠের পাখনার নীচে কাল জড়ুল নাই।

(অ) একটি ছোট কাৎভাবে উঁচু দাগ পিঠের পাখনার আগার নীচে থাকে যাহা ক্রমশঃ ডিম্বাকৃতি বা গোলাকার ধারণ করে—**সরল পুঁটি**।

পড়িয়া থাকিবেই—এই পড়িয়া থাকা খাদ্য জীবন্ত না হইলেই জলে থাকিলেই পচিবে। পচা খাদ্য জলে থাকিলে সেই জলও নষ্ট হইবে। ছোট কাচের Jar বা সিমেন্টের মাছ রাখা চৌবাচ্চার জল নষ্ট হইলে সহজেই তাহা ফেলিয়া দিয়া পুনরায় নূতন পরিষ্কার জলে পূর্ণ করা চলে কিন্তু যদি পুষ্করিণীর জল বা ঝিলের জল নষ্ট হয় ত তাহা ব্যয় সাপেক্ষ। শুধু ব্যয়সাপেক্ষ কেন পাম্প বা অন্য কোন প্রকারে জল ছাঁচিয়া ফেলা বেশ শক্ত। তারপর জল না হয় ব্যয় করিয়াও উঠাইয়া ফেলা গেল কিন্তু নূতন জল আসিবে কি প্রকারে? সাধারণতঃ নূতন পুষ্করিণী কাটাইলে জলের জন্য বৃষ্টির উপরই নির্ভর করিতে হয়। পুষ্করিণীর জল তুলিয়া ফেলিলে আর জল পাইবার সম্ভাবনা নাই, যতক্ষণ না বৃষ্টি জমিয়া পুষ্করিণী পূর্ণ হয়।

মেদিনীপুরে দ্বিতীয় প্রকার বাঁধ

মেদিনীপুরে তৃতীয় প্রকার বাঁধ

২। মাথা সাধারণ—

(ক) ল্যাজের একটু আগে সাদা জমির উপর ৩ বা ৪টি কাল ফোঁটা, ঠোঁট কোঁকড়ান, ছাই রং, পিঠের পাখনার অগ্রভাগের নীচে হরিদ্রা রংয়ের ফোঁটা এবং গলার নিকট ঈষৎ হরিদ্রা রংয়ের দাগ, কাল গোঁফ—**কালবোস**।

(খ) ল্যাজের আগে কাল ফোঁটা কিন্তু সাদা জমি বাদ।

(১) ঠোঁট কোঁকড়ান

(/০) গায় লম্বা লম্বা দাগ, পাখনায় ফোঁটা ফোঁটা কাল দাগ—**গাঁণ**।

(৵০) গায় লম্বা দাগ নাই, পাখনায় লাল সিন্দুর রংয়ের ফোঁটা দাগ—**রুই**।

(আ) পিঠের পাখনার আগার নীচে দাগ বা ফোঁটা কিছু থাকে না।

(/১) ঠোঁটের ধার কাল। ক্ষুদ্র কাল ফোঁটার রেখা শরীরের মাঝখান দিয়া লম্বাভাবে থাকে। পরে জুড়িয়া গিয়া মোটা রেখায় পরিণত হয়—**রাইবাটা**।

(/২) ঠোঁটের ধার সাদা। সারা শরীর কাল লম্বা দাগযুক্ত—**মৃগেল**।

ভারতের মৎস্য বিভাগে প্রায় সকল প্রদেশেই মাছের কি খাদ্য পুষ্করিণীতে বেশী করিয়া দিলে মৎস্য শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে তাহার বহু পরীক্ষা হইয়াছে। এসকল পরীক্ষায় নানাবিধ ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। প্রথম কথা হইতেছে যে, কোনও খাদ্য দিলেই তাহার সবটা মাছে খাইবে না। অন্ততঃ কিছু ইহাতে ২।৪ মাস সময়ও লাগিতে পারে। এতদিন পুষ্করিণীর মাছ থাকিবে কি প্রকারে? সেজন্য স্বাভাবিক জীবন্ত খাদ্য না দিয়া অন্য প্রকারে মাছের খাদ্যের সাহায্য করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। তাহাতে সাহায্য ত হইবেই না, সমূলে নির্ম্মূল হওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইবে।

স্বাভাবিক খাদ্য যাহা মাছ পুষ্করিণী বা নদীতে পায় তাহা প্রায়ই জীবন্ত। তাহাদের যতটা হউক মাছ খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। যাহা বাকি থাকে তাহা আরও বর্দ্ধিত হয় এবং পরে আবার খাদ্যরূপে ব্যবহার করা চলে। এখন দেখিতে হইবে যে, পুষ্করিণীতে যে সকল জীবন্ত দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা

(৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

উপহারে-
কালিদাস

(৭০ পৃষ্ঠার পর)

সেই পুষ্করিণীর মাছের পক্ষে যথেষ্ট কিনা। যদি মনে হয় তাহা যথেষ্ট নয় তাহা হইলে ঐ সকল যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সকলের ব্যবস্থা হইল তাহাদের culture করিয়া সেই culture বীজরূপে পুষ্করিণীর জলে মাঝে মাঝে ঢালিয়া দেওয়া। ইহাতে তাহাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হইবে এবং খাদ্য হিসাবে যতটা মাছ খাইবে তা ছাড়া বাকিটা জীবন্ত বলিয়া পচিবে না। জলও একটুও পচিবে না এবং জলজ গাছ থাকায়

মাটির হাঁড়ীতে এককোষ প্রাণীর চাষ। রাত্রে হাঁড়ীর মুখ কাপড় দিয়া ঢাকা

গামলায় শেবাল চাষ

অঙ্গার আত্মকরণের সময় জলে যথেষ্ট অক্সিজেন গ্যাস পাওয়ায় ব্যাকটিরিয়া বাড়িবার সম্ভাবনা অল্প হইবে।

আমাদের দেশে শতকরা ৯৫টি পুকুরের জলই পানীয় জলরূপে ব্যবহৃত হয়। সে কারণে যে সকল সার ব্যবহার করিলে শৈবাল, এককোষ প্রাণী, চিংড়ী প্রভৃতি বাড়ে তাহাই পুষ্করিণীতে দেওয়া চলে না। যে সব পুষ্করিণীর জল পানীয় জলরূপে ব্যবহৃত হয় না বা বাদা অঞ্চলের পুকুরে গোবর, পচা খোল, আস্তাবলের আবর্জনা বা রান্নাঘরের আবর্জনা, এমন কি সহরের ড্রেণের ময়লা জল দিলে অতি সত্বর শৈবাল জন্মিয়া জলটাকে সবুজ করিয়া ফেলে। বেশ গাঢ় সবুজ হইলে আর বেশী সার দেওয়া উচিত নয়। তাহাতে জলে সার বেশী হইলে মাছ মারা যাইবার সম্ভাবনা থাকে। খড় বা ঘাস শুষ্ক অবস্থায় বাণ্ডিল বাঁধিয়া পুকুরের পারে। পানীয় জল ও মাছ এক পুকুর হইতে পাইতে হইলে পুকুরে সার দিলে চলিবে না। মাটির হাঁড়ীতে খড় বা কচুরীপানা ও পুকুরের জল দিয়া culture করিতে হইবে। রাত্রে এই হাঁড়ীর মুখ কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে, নচেৎ মশারা বাচ্চা পাড়িয়া যাইবে ও মশার বাচ্চা এককোষ প্রাণীদের খাইয়া সব নষ্ট করিয়া দিবে। গামলায় শৈবাল culture করা যাইতে পারে। শৈবাল culture করিতে Knop বা Moor's solution দিতে হইবে। বিলাতী হারে দিলে চলিবে না কারণ হারটা ইতরবিশেষ করিলে তবে শৈবাল ভালভাবে বাড়ে। এই প্রকারে পুকুরের বাহিরে খাদ্য culture করিয়া পুকুরে ফেলিলে সময়ে তাহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া মাছের অনেক উপকারে লাগিবে। একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, মাছের মধ্যে একেবারে উদ্ভিদভোজী বা একেবারে শিশু অবস্থায় মাংসভোজী থাকে তখন তাহাদের মধ্যে কখনও কখনও নানা কারণবশতঃ, যেমন স্থানাভাব, খাদ্যাভাব ইত্যাদির জন্য স্বজনভুক (cannibalistic) হইয়া পড়িতে দেখা যায়। ইহা অদ্ভুত হইলেও সত্য। কিন্তু আর পরে এসব থাকে না। মাংসভোজী মাছের এই স্বভাব প্রায়ই দেখা যায়। যেমন সিংঙ্গী, মাগুর, কৈ প্রভৃতিতে। এই স্বজনভুক অবস্থার একটা ছবি এখানে দেওয়া গেল।

বড় উদ্ভিদভোজী মাছ যে শুধু শৈবাল খায় তাহা নহে, প্রকৃতপক্ষে শৈবাল তাহাদের হজম হয় না। সে কারণ শৈবাল প্রায় টাটকা-ভাবে অন্ত্রের শেষের দিকেও পাওয়া যায়। মাছ যদি কেবলমাত্র উদ্ভিদ জগতের শৈবালই খাইত তবে প্রায় সকল পুকুরে বা নদীতে খাদ্যাভাব ঘটিত। উদ্ভিদভোজী মাছ প্রায় সকলপ্রকার জলজ উদ্ভিদ খায় তবে ঈষৎ পচা

স্বজন ভুক মাগুর মাছ

জলে ডুবাইলে দিন কয়েকের মধ্যে এককোষ প্রাণী দেখা দেয় এই এককোষ প্রাণী হাওয়ায় ভাসিয়া আসে। শুষ্ক কচুরীপানা জলে ডুবাইয়া রাখিলে জলে যদি ক্ষুদ্র চিংড়ী থাকে তাহা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। খড় বা কচুরীপানা বাণ্ডিল বাঁধিয়া একটি দড়ি সমেত ডুবাইলে খুব সত্বর বাহির করিয়া ফেলা চলে, নচেৎ সারা পুকুরে ছিটাইয়া যায় ও পচিতে থাকে।

কিন্তু যে সকল পুকুরের জল পানীয় জলরূপে ব্যবহার করা হয় তাহাতে গোবর, পচা খোল, আস্তাবলের আবর্জনা বা রান্নাঘরের আবর্জনা বা ড্রেণের জল দেওয়া একেবারে চলিবে না। ইহাতে নানা রোগ আসিবার সম্ভাবনা। মাছ বাড়াইতে গিয়া প্রাণ যাইতে

মাংসভোজী মাছ নাই বলিলেই চলে। সকলেই উদ্ভিদ ও মাংস খায় তবে কেহ বেশী উদ্ভিদ খায় বা বেশী মাংস খায়—তাহাদের উদ্ভিদভোজী ও মাংসভোজী বলে। এই উদ্ভিদভোজীদের মধ্যে পোনামাছ পড়ে। পোনামাছ শিশু অবস্থায় আবার মাংস খায়। পোনামাছ ১০ মিলিমিটার হইতে ২০।২২ মিলিমিটার পর্য্যন্ত মাংস খায়। পরে তাহারা উদ্ভিদভোজী হইয়া পড়ে। এই ১০ হইতে ২০।২২ মিলিমিটার পর্য্যন্ত তাহাদের অন্ত্র খুব মাংসভোজী মাছের মত ছোট থাকে। মাংসভোজী মাছদের অন্ত্র দৈর্ঘ্যে দেহ হইতে প্রায় ছোট বা সমান, কি সামান্য বড় থাকে। কিন্তু উদ্ভিদভোজী মাছের অন্ত্র প্রায় দেহের ৫।৭ গুণ বড় হয়। উদ্ভিদভোজী মাছ যখন নরম অবস্থায়, কারণ আমাশয়ে (stomach) কখনও ভাল অবস্থায় কোন উদ্ভিদাংশ পাওয়া যায় না। তাই বলিয়া পুকুরে সব উদ্ভিদই রাখা উচিত নয়, বিশেষ যে সকল উদ্ভিদ জল ঢাকিয়া ফেলে, যেমন কচুরীপানা, পদ্ম, শালুক প্রভৃতি। তবে ইহাদেরও সামান্য পরিমাণ রাখা চলে কারণ তাহাতে গ্রীষ্মকালে প্রখর রৌদ্র আটকাইতে পারে।

পুষ্করিণীর সংস্কার

একবার পুষ্করিণী কাটাইয়া নিরবচ্ছিন্ন তাহাতে মাছ রাখা চলে না কারণ তাহার মধ্যে জলজ গাছ, অন্যান্য খাদ্য, মৃত জীবদেহ এবং আরও নানাপ্রকার আবর্জনা জলের নীচে পচিয়া পাঁকে পরিণত হয়। এই পাঁক একবার

বেশী রকম জমিলে জল বাহির করিয়া সেই পাঁক তুলিয়া পরিষ্কার না করিলে আর উপায় থাকে না। স্বাভাবিক অবস্থায় কতকগুলি প্রাণী পুকরিণীতে ময়লা আবর্জ্জনা, মাছের বা অন্য প্রাণীর মৃতদেহ এমনকি বিষ্ঠা প্রভৃতি খাইয়া পরিষ্কারের সাহায্য

করে। যেমন, ছোট ছোট চিংড়ী, ঝিনুক, শামুক, গেঁড়ী, গুগলী, ট্যাংরা জাতীয় মাছ, ব্যাঙাচি ও ব্যাঙ। কিন্তু পাঁক একবার জমা হইলে তাহা তুলিয়া বাহির করিতে বিশেষ ব্যয়সাধ্য। অনেক সময় ব্যয় করিয়াও জল বাহির করা সম্ভব হয় না। সে জন্য বেশী পাঁক না জমিতেই যাহাতে ঐ পাঁক সহজে উঠে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তাহা ছাড়া জল উঠাইলে আর বৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত জল পাওয়া যাইবে কি প্রকারে?

এজন্য পাঁক যাহাতে একটু একটু করিয়া সারা বৎসর ধরিয়া তোলা যায় ও যাহাতে ব্যয় ও সময় অতি সামান্য লাগে এরূপ এক ব্যবস্থা হইতেছে একটি galvanized iron suction pump। ছবিতে যেরূপ দেখান হইয়াছে সেইরূপ একটি pump করিতে কলিকাতা সহরে ৪৲ খরচ পড়ে। প্রত্যহ দশবার এই pump দিয়া জলের তলার পাতলা পাঁক তুলিলে ৫ বালতি পাঁক উঠিবে। এই পাঁক ফেলিয়া না দিয়া কোন স্থানে জমা করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে অতি উত্তম সার হইবে। কারণ ইহাতে মোটামুটি জান্তব পদার্থ থাকে—হয় প্রাণীদেহ না হয় উদ্ভিদ দেহ। বহুকাল ধরিয়া এই পাঁক পচিলে নানাপ্রকার দূষিত গ্যাস বাহির হয়, তাহাতে মৎস্য প্রভৃতির নানা পীড়া জন্মে বা শ্বাস রোধের কারণ হয়। এমন কি কখনও কখনও marsh gasও বাহির হইতে দেখা গিয়াছে। পুষ্করিণীর সর্ব্বস্থানেই ইহা (pump) ব্যবহার করিতে হইবে তবে

পুষ্করিণীর মধ্যে এইভাবে পাম্প ব্যবহার করা হয়।

অতিরিক্ত ব্যবহারে সুফল দর্শিবে, কারণ পুষ্করিণীর মধ্যে মাটির উপর মাছের নানা-প্রকার খাদ্য থাকে যেমন কতকগুলি শৈবাল যাহা মাছে খায়, অতিরিক্ত pump ব্যবহার করিয়া এই সকল খাদ্যতালিকাভুক্ত শৈবাল তুলিয়া ফেলিলে হিতে বিপরীত হইবে। অতএব বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক পুষ্করিণী বিশেষে কতটা পাঁক তুলিতে হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইবে। প্রত্যহ এই pump কিছু কিছু ব্যবহার করিলে এক বৎসরে বড় কম পাঁক উঠে না, ইহা আপাত-দৃষ্টিতে যতই অসম্ভব মনে হউক, কার্য্যতঃ পাঁক নির্ম্মূল হইয়া যায়।

ইহা ছাড়া পাঁকের দরুণ আর এক বিভ্রাট ঘটে, সেটা হইতেছে যে, পাঁক যত বাড়ে তাহার ফল হইতেছে জলকে অম্লাত্মক করিয়া দেওয়া। ph. H. 7 হইল এমন এক অবস্থা যেখানে ph. H অম্লাত্মক বা ক্ষারাত্মক কোনটাই হয় না। ৭য়ের বেশী হইলে ক্ষারাত্মক এবং ৭য়ের কম হইলে অম্লাত্মক হয়। বৃষ্টির জল হইল স্বাভাবিক জলের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ। অতএব বৃষ্টি জলের ph. H. হইল ৭।

মাছের পক্ষে জল যদি বেশী ক্ষারাত্মক হয় তাহা হইলে খারাপ এবং বেশী অম্লাত্মক হইলেও খারাপ। জলের এই পরিবর্তনের জন্য অনেক সময় এক সঙ্গে মাছের মড়ক দেখা যায়। এইজন্য যে মাছ মারা যায় তাহা সাধারণতঃ শ্বাসকার্য্যের ব্যাঘাতেরই জন্য।

কলিকাতার অতি নিকটবর্ত্তী নাথমারী নামক স্থানে ১৯৪০ সালে গ্রীষ্মকালে হঠাৎ খবর পাওয়া গেল যে, জনৈক ভদ্রলোকের বাগানের একটি পুষ্করিণীতে জল অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে এবং প্রায় ২৫০।৩০০ মাঝারী ও বড় রুই কাতলার শ্বাসকার্য্যে বিঘ্ন ঘটায় জলের উপর তাহারা মুখ উঠাইয়া খাবী খাইতেছে। অতি শীঘ্র কিছু না করিলে সব মাছই মারা পড়িবে। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই আমরা গোটা ৭ মোটরের টায়ার, একটি হাত pump এবং জলের ph. H. লইবার ব্যবস্থা সমেত সেই পুষ্করিণীর নিকট উপস্থিত হইলাম। বেলা তখন প্রায় ২॥টা প্রথমেই ৭টি টায়ার একটি নারিকেল দড়ির মধ্যে খানিক অন্তর টায়ারের মালা গাঁথা গেল। এই টায়ারের মালা সমেত দড়ি পুষ্করিণীর এপার হইতে-ওপার পর্য্যন্ত লম্বমান-ভাবে রাখিয়া দুইজন জলের এক কোণ হইতে অপর কোণ পর্য্যন্ত এবং সেই কোণ হইতে পুনরায় পূর্ব্ব কোণে অনবরত টানিয়া আনিতে লাগিল। টায়ারগুলি দড়িতে গাঁথিবার আগেই হাত-পাম্প দিয়া হাওয়া ভরা হইয়াছিল ও মধ্যে মধ্যে ফুরাইয়া গেলে

(২১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হারাণো রতনে আজি পেয়েছি খুঁজিয়া
পাহাড়পুর ঔষধালয়
প্রতিষ্ঠাত্রী- শ্রীঅমিয়বালা দেবী, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী
পাহাড়পুর - দিনাজপুর

কেরায়া নায়ের মাঝি

বিলের ফুরফুরে বাতাসে অতি ভোরেই জমিলার ঘুম ভাঙলো। শিয়রের দিকের দুয়ারটা খোলা। দুই ছেলে আর শিশু মেয়ে তখনো ঘুমন্ত, শুধু আজাহার বিছানায় নেই—পুরু কাঁথাটা পায়ের কাছে সরিয়ে দিয়ে উঠে গেছে। গত হপ্তাখানেক ধরে আমাশায় ভোগা কাহিল শরীরে সে বিছানা ছেড়েই উঠতে অক্ষম, তবু এই এতো ভোরে কোথায় বেরিয়ে গেলো?—এদিক ওদিক সম্ভাব্য স্থানে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে বিস্ময়বিমূঢ় মনে সে পুকুরপাড়ে এসে দাঁড়ালো।

ঘাটে নৌকোখানাও নেই। জমিলা যেন হঠাৎ আঘাত খেয়ে নিশ্চল হয়ে পড়লো। ঐ শরীরে আজাহার তাকে না জানিয়েই কেরায়া বাইতে বেরিয়ে গেলো?

দক্ষিণ বাঙ্গলার একবৈঠা কেরায়া নৌকার ওপর জীবিকা নির্ভরশীল পরিবার সমূহের মধ্যে আজাহারও অন্যতম। জমি সামান্য যেটুকু আছে, তার শস্য ক্ষুধার পক্ষে পর্যাপ্ত তো নয়ই বরং বিলের জমি বলে শস্যও খুব ভালো ফলে না। ওদিকে খালপাড়ে কাঠাখানেক ধুলোট-কৃষি ক্ষেতের আয় আর বাকী সময়ের 'কেরায়া'র আয় মিলে তার পরিবারের জীবন তেরোশো এগারো সাল থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত চালিয়ে এসেছে। এ বন্ধুর পথ-যাত্রায় জীবনের অঙ্গগুলো ঝুরঝুরে হয়ে গেলেও চলার বিরাম ঘটেনি বা সংগ্রামও শেষ হয়নি; মোটামুটি তারা বেঁচে ছিলো, কিন্তু পঞ্চাশের মহাঘাতো যেন চলার শক্তিটুকুই কেড়ে নিতে চাইছে। অর্ধাহার এবং অসুখ এই দু'য়ের আবৃত্তিতে কোনোরকম চলছিলো, এরি মধ্যে অকস্মাৎ আজাহারের শক্ত অসুখ কয়েক দিনব্যাপী অনাহারের দুর্ভাগ্য নিয়ে এলো।

আজাহার সে কষ্ট সহ্য না করতে পারলেও জমিলার নির্ভরতা ছিলো, আশ্চর্যরূপে পরিপূর্ণ এবং নিরবচ্ছিন্ন ছিলো সে খোদার দয়ার ওপর বিশ্বাসে। সে বিশ্বাসের শিথিলতা অথবা গতো বিকেলের আত্মসংবরণ অসাধ্যতা তার আর আজাহারের মধ্যে মনোমালিন্যের ঝড় তুলেছিলো। হয়তো সেই ক্রোধেই আজাহার এতো ভোরে নীরবে বেরিয়ে গেছে—অসুখ-কাঁপা শরীরেও।

খালের ঘাটে মুখ ধুতে বসে গতো বিকেলের ঘটনাটা একবার পর্যটনা করে এলো জমিলা। ছোট ছেলে কাসেম কাল বিকেলে মুন্সীবাড়ীর দিক থেকে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসেছিলো; জমিলা প্রশ্ন করে জানে, তাঁদের কাছারীর সামনের শশামাচা থেকে সে একটা ছোট শশা ছিঁড়েছে দেখে ছোট মিয়া তার গালে চুরির অভিযোগে এক চড় কষিয়ে দিয়েছে। সে কী চড়! পাঁচ পাঁচটা আংগুল রক্তশূন্য হলদে গালে কালো হয়ে ফুটে উঠেছিলো! সামান্য একটা কচি শশার এই মূল্যাধিক্য জমিলাকে ক্ষিপ্ত করে তোলে, এমন গালাগাল ছিলো না যা সে নেপথ্যবাসী ছোট মিয়ার উদ্দেশ্যে পাড়েনি! আজাহার হৈ হৈ করে ধমক দিয়ে ওঠে—চুপ, চুপ হারামজাদী, হেরা হোনলে আর রক্ষা থাকপে না! হপ্তায় হপ্তায় মুন্সীবাড়ীর কেরায়াডা পাই দেইখ্যাই খাওনডা জোডে হেয়া মনে রাহিস্!

জমিলার তখন মত্ত মেজাজ, বলছে—তুমি চোপো। তোমার নাহান অতো ভিজা বিলই আমি না যে, এতো অন্যায় সইয়াও চুপ করইয়া থাকমু! আমার পোলারা চোর একথা কইবে কেউ? খিদার চোডে এউক্কা শশাই যদি নিয়া থাহে হেতে—

—আমি ভিজা বিলই?—আজাহার তার খিটখিটে মেজাজ সত্ত্বেও প্রাণপণে নিজেকে সংবরণ করেছে। ছেলে-মানুষের মতো অভিমান আর বদমেজাজীর উষ্মা দুই-ই তাতে মেশানো।···সে-মুহূর্তটি মনে পড়লে জমিলার এখনো হাসি পায় অথচ এরি জবাবে সে কী না বলে ফেলেছিলো—ভিজা বিলই না? পোলাগো খাওইয়াতে পারবানা, হেরা এরডা ওরডা খাইয়া মরবে, অন্যায় মাইর খাইবে হেয়ার কিছু কইতে পারো না? কিছু কইতে পারবা না, খাইতেও দেতে পারবা না, তয় জন্ম দেছেলা ক্যা?

এরপর আর আজাহার একটি কথাও উচ্চারণ করে নি—গভীর রাতে ঘুম ভাঙবার সময় জমিলা অস্পষ্ট জোছনার আলোয় দেখতে পেলো, আজাহার ছেলের আহত গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

খালের ওমুহে একটা অগ্রসরমান নৌকো দেখা যেতেই জমিলা পাড়ে উঠে এলো; নৌকোখানা করিম মাঝির। তার বাড়ীও এই গ্রামে, একই ব্যবসাসূত্রে আজাহারের সংগে তার ঘনিষ্ঠতা আছে। যেতে যেতে জমিলাকে প্রশ্ন করলো সে—আজাহার আছে কেমন, ভাবীছাব!

ঘোমটার নিচ থেকে তাড়াতাড়ি জবাব দিলো জমিলা—অসুখ হেই রহমই, তউ আইজ ব্যানে নাও লইয়া বাহির অইছে! কিছু কইয়াও যায় নায়—আপনি হেরে পাকলে যেরহম পারেন বাড়ী পাঠাইয়া দিয়েন!—

—নাও লইয়া বাহির অইছে?—করিম মাঝি বৈঠা চালানো থামিয়ে বিস্ময়ধ্বনি করলো—আচ্ছা, আমি ঐ কেরায়াডায় দিয়া কাইলই আবার ফিরমু; এহার মধ্যে বিচরাইয়া দেখমুহানে আর দেহা অইলে তো কথাই নাই।

নৌকোর আরোহীর কী প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে করিম চলে গেলো।

খালের ওপারের ঘাটে পানি নাড়ার শব্দ পেয়ে জমিলা তাকালো সেদিকে—সালেহা মুখ ধুতে এসেছে। জমিলা অপেক্ষাকৃত হাল্কা মনে তার সংগে কথা বলার জন্য আম গাছের আড়াল ছেড়ে পাড়ের দিকে এগিয়ে গেলো।

—জানো সালেহা, হাসেমের বাপে আইজ ব্যানে রাগ অইয়া নাও লইয়া বাহির অইছে!

—রাগ অইয়া! ক্যা, ঝগড়া হইছিলি বুঝি?

—বুঝলি ক্যামনে?

আবুল কালাম শামসুদ্দীন

—ঝগড়া ছাড়া ব্যারামইয়া দেহে আর কীতে 'রাগ অওয়াইবে। তুইও যেমন—ব্যারামইয়া ব্যাভারে—কী কইছিলি হুনি।

জমিলা সংক্ষেপে জানালো, তার ম্লান মুখ সত্ত্বেও সালেহা হেসে উঠলো—মা, খাঁয়ের পোর রাগ অওনেরো কারণ আছে, সুস্থ মর্দও একথা হোনলে খ্যাপে, হেতো এহে ব্যারামইয়া, হেয়ার উপরে তোর আদরের।

সালেহার সহাস্য মন্তব্যে জমিলা ধমক দিয়ে উঠলো—দূর মুখপুড়ী, দিন দিন তোর বয়েস কমে না বাড়ে?

সালেহা হাসতে হাসতে পাছে উঠে গেলো কুলি ছিটিয়ে—যেতে যেতে মুখ ঘুরিয়ে বলে গেলো—ভাবিস না, দেহিস আনে হাঁঝের আগেই আবার কোলে ফিরইয়া অইছে।

—ধোৎ! তামাসা উপভোগ করার মতো মনের অবস্থা জমিলার নেই। ছেলেরা নাচনমহল হাটে ডিম বিক্রী করতে যাবে বলে ডাকাডাকি সুরু করেছিলো, জমিলা তাড়াতাড়ি ঘরে চলে এলো।

কুঁকুড়ি পোষা হাঁস-মোরগের ডিম বাচ্চা করার জন্য রেখে দিয়েছিলো; মুরগী আর হাঁস বেচে দিয়েছে অনেক দিন, আজ ওগুলো বিক্রী না করলে কপালে খাদ্য লেখা নেই। অথচ এই সব হাঁস-মুরগীকে এতো ভালোবাসে জমিলা। আজাহার তো ঐ প্যাঁক প্যাঁক আর কঃ কঃ শুনতেই পারে না; কিন্তু তাদের প্রতি জমিলার সন্তানতুল্য আদর আর মমতা! কোনো দিন একটি ছানাও যদি চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে যেতো, তাহলে কাতরতার অন্ত রইতো না। আজাহার যেদিন জোর করে হাঁস-মুরগী সব হাটে বেচে দিয়ে এসে চাল কিনে আনলো, জমিলা তার একটি কণাও মুখে তোলে নি; অনুতপ্ত আজাহারের সাধাসাধিতে রেঁধে দিয়েছিলো এই পর্যন্ত। আজাহার কতো কাকুতি করে বুঝিয়েছে আবার তাকে কয়েক জোড়া হাঁস-মুরগী কিনে দেবে; কিন্তু দিন দিন যা অবস্থা, জমিলার আজ মনে হোলো, তাতে আর কোনোদিন তার উঠোনে তাদের কাকলী বেজে উঠবে কী না কে বলবে! ডিমগুলো গামছায় বেঁধে ছেলের হাতে দেবার সময় জমিলার বুক ঠেলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এলো।

ছেলে দু'টি হাসেম আর কাসেম, লাঠি আর পুঁটলী নিয়ে খালপাড়ের পথে হাটের দিকে চলে গেলো।

ছোট মেয়ের ঘুম ভেঙেছে; তাকে মাই দিয়ে ঠাণ্ডা করে, গামছা পরে তার নষ্ট করা কাঁথা কাপড় ধুয়ে, স্নান করে আবার দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসার সময় জমিলা লক্ষ্য করলো সূর্য এর মধ্যেই মাথার ওপর উঠে এসেছে। ক্ষুধা লেগেছে তার, কিন্তু ঘরে এমন কিছু নেই যা খাওয়া যায়। কালকে পাড়া একটা নারকেলের অর্ধেকটা ছেলেরা খেয়ে গেছে, বাকি অর্ধেকটা শিকের দুলছে; হয়তো ওরা ফিরে এসে খাবে। জমিলা খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করে সেটা নামিয়ে এনে কামড়ে কামড়ে খেতে লাগলো।

হাওয়ায় একটা গুমোট গুরুতা। সারা গায়ে ঘাম ছেড়েছে। দক্ষিণের দুয়ারটার কাছে পাটি বিছিয়ে জমিলা শুয়ে পড়লো; সালেহাদের আমবাগানে নিত্যকার মতো তু-তু-তু স্বরে সেই বাঁশীটা বেজে উঠেছে। বাজার খাঁয়েদের মুনিষ, সেই বাবরিওয়ালা তেল-চকচকে ছেলেটা। তার অপূর্ব সুর নিদাঘকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে উদাস করে তোলে। সুরটা জমিলার পরিচিত; ঐ ছেলেটি গাইতে গাইতে প্রায়ই এ পথ দিয়ে যায়। তুতু তুতু-তু বাঁশী বলে—বন্ধু, তোমার এপথে আসার জন্য আমি আঁচল বিছিয়ে পথ তৈরী করে রেখেছি, চোখের পানিতে তোমার পা ধুইয়ে কবরী দিয়ে মুছিয়ে দেবো; আমার অন্তরকে তোমার প্রতি ভালোবাসায় চর্চিত করে রেখেছি, কিন্তু যদি তুমি না আসো, তবে ভোরের শিশির আর ঘুঘুর স্বরে আমার বেদনার সন্ধান কোরোনা,—প্রেমিকের এই অভি- মানের সুর কেমন করে এতো করুণ হয়ে ওঠে? জমিলার চোখে অশ্রু জমে। বালিশে উপুড় হয়ে বিলের দিকে তাকিয়ে শুয়ে রইলো সে। মনে এক অদ্ভুত উদাস স্বপ্নাচ্ছন্নতা।

চোখে পড়ে বিলের বুক চিরে জেলা বোর্ডের নোতুন গড়া পথ। সোজা চামটা-হাট পর্যন্ত চলে গেছে। ছাতা মাথায় একটি লোক হাটের দিকে যাচ্ছে—রোদে ঝিলমিল্ করছে তার দেহ।...রাস্তায় চামটা হাটের দূরত্ব চার মাইল অথচ আগে এই নদীনালা খালবিলের দেশে সেখানে যেতে সকাল-সন্ধ্যা লাগতো। বিয়ে হবার দু' বছর বাদে আজাহারের সাথে সে একবার 'গাজীর গীত' শুনতে গিয়েছিলো চামটা। আঁকাবাঁকা খালবিলের পথে বড়ো ভালো লেগেছিলো! তখন হাঁ, আশ্বিন মাসই—সকালে রাঁধাভাতসহ তারা রওনা হোলো। সে ছইয়ের মধ্যে বসা, সামনে পর্দা টাঙানো; আজাহার নিজের হাতেই বৈঠা বাইছিলো। সেসব কথা এখনো জমিলার অতি স্পষ্ট মনে আছে। সামনের ঝুলোনো পর্দার জন্য কিছুই দেখতে পাচ্ছিলো না, অথচ আজাহার নির্দেশ দিয়েছে শান্ত শিষ্ট কলাবউয়ের মতো বসে থাকতে। জমিলা বহুবার উসখুস করলো, কিন্তু আজাহারের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই দেখে লোকালয় একটু পাতলা হতেই সে পর্দাটা খুলে ফেললো একটানে। বাবারে বাবা, আমি কী একটা মানু না! কোন হান্ দিয়া আইলাম গেলাম হেয়া দেখমুনা তয় আইলাম ক্যা? আজাহার তো হা হা করে উঠেছে—আহা-হা কী করো কী করো, ব্যাডারা আছে।

—আছে হেতে কী অইবে? খাইয়া তো হালাইবে না কেউ?—বলতে ছইয়ের বাইরে গিয়ে সে বসেছিলো, তারপর চারদিক দেখে বললে—চারদিকে বিল, এয়ার মধ্যে তোমার বউরে দেখতে কেউ আইবে না।

আজাহার হেসেছে আর কিছু বলেনি। ঐ বিলের মাঝামাঝি তখন তারা পৌঁছেছে—যেখানে ঐ রাস্তায় ছাতা মাথায় লোকটি দেখা যাচ্ছে, প্রায় অমনি জায়গায়—আজাহার তাকে আপনাদের বাড়ীটা দেখিয়ে দিলো। সবুজ গাছপালা ঘেরা ছোট জংগলের মতো তাদের বাড়ী বিলের পাশে দাঁড়ানো। ঘর-টর কিছু চোখে পড়েনি। কী যে বিচিত্র মধুর ছিলো সে দিনের স্বাদ! বিলের স্বচ্ছ জলের বুক ঠেলে ধানের গোছা, শাপলার পাতা, ফুল বেরোনো; হাতে সে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল সব। রাঙা শাপলার ফুল ছিঁড়ে খোঁপায় পরলো একটা, অহেতুকভাবে একটা পুঁটি লাফিয়ে উঠলো নৌকোয়! গাঙ শালিখের 'হটিটি' চীৎকার শুনে সে হেসে গড়িয়ে পড়ছিলো বার বার, আজাহার তার চাঞ্চল্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলো—ছইর মধ্যে যাইয়া ব্যও ওরহম করলে পড়ইয়া যাবা। না অয় আমারে এট্টু তামাক খাওয়াও।

তামাক খেয়ে আজাহার আবার বৈঠে হাতে নিলো, জমিলা তার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলো খানিকক্ষণ। আজাহারের ঘর্মাক্ত পেশীগুলোর ফুলে ফুলে ওঠা বিচিত্র লাগছিলো, দরদর করে তার গা থেকে তখন রোদে ঘাম ঝরছে, সারা গা, চোখ মুখ সব লাল হয়ে ওঠেছে। জমিলা বললে, এট্টু জিরাইয়া লও।

আজাহার তা শোনেনি, জমিলাই তাকে জোর করে ছইয়ের মধ্যে টেনে আনলো, তাকে শুইয়ে গায়ের ঘাম মুছিয়ে দিলো, ঝুঁয়ে কপালের ঘাম মুছিয়ে দেবার সময় তার খোঁপা থেকে রাঙা শাপলার ফুলটা আজাহারের মুখের ওপর পড়ে গেলো। আবার সেটা তুলে খোঁপায় পরবার সময় জমিলা বললে, তোমার মুখখানাও রোদে পুড়ইয়া এই রাঙা শাপলাডার নাহান অইছে।

—আজাহার উঠে দুষ্টুমি শুরু করে দিলে—হাচাইও? আমারে দেইহে কোনহানে লবা? বিলে ভাসমান নৌকো তখন লক্ষ্যহারা।

—ছিঃ ঐ দেহ ব্যাডারা!—জমিলা ধমকে উঠতেই আজাহার তাড়াতাড়ি আবার গলুইতে গিয়ে বৈঠা হাতে বসলো।

—কই ব্যাডারা?

সামনে ফের পর্দা টানিয়ে জমিলার সে কী উচ্ছ্বসিত হাসি!—খাওনা, তরাতরি হাঁঝের আগে পৌঁছবা কেমনে?

সেই মাদকতাময় দিনগুলি কোথায় গেলো? ছেলেমানুষ, অতি ছেলেমানুষ আজাহার যে সেদিন পর্যন্ত কেরায়া বাইতে যাবার মুখে জমিলার পান-রাঙা ঠোঁটের চুমু না খেয়ে বেরোতো না—তাকে কেন সে কাল অমন শক্ত কথাটা বলতে গেলো? এমনি রাগ জমিলার সংগে আজাহার আর কোনদিনই করেনি। সে কী তাদের খাওয়া পরাবার চেষ্টার কসুর করে? ধুলোট-কুশির সময় সকাল সন্ধ্যা খাটুনি, একা একা জোঁকের কামড় খেয়ে বীজ বুনোনো, চাই বুনে মাছ ধরা, হাটে বিক্রয় করা তারপর অবিরাম 'কেরায়া' বাওয়া—কতো আর করবে একলা মানুষ? জমিলার চাইতে সে কী ছেলেদের

(৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ক'রে তুলুন
ভারতকে
এক মহাশক্তিমান্
দেশ

কেশ-
প্রসাধনে
অঞ্জলি
সুবাসিত নারিকেল তৈল
সতীশ এণ্ড সন্
২৭, নিউ জগন্নাথ ঘাট রোড,
কলিকাতা।

(৭৮ পৃষ্ঠার পর)

কম ভালোবাসে। কাসেমের গেলোবার জ্বরের সময় সারারাত নির্ঘুম চোখে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়েছে। একদিন অবস্থা একটু খারাপ হোলো, কাসেম কথা বলে না, বুকের মাঝে কেমন একটা ভাঙাচোরা ঘড়ঘড় শব্দ। আজাহার কাঁপা ঠোঁটে কী কম কেঁদেছে সেদিন। জমিলার অনুতাপ আর দুঃখের অন্ত রইলো না, বালিশ ভিজে উঠলো তার বুক গুমড়ানো কান্নায়। অন্ন অসুখ নয়, আজাহারের রক্ত আমাশয়, শরীর শুকিয়ে এমন হয়েছে যে, আর পয়সার বল নেই, উঠতে গেলে যে কেঁপে বসে পড়ে, কেমন করে সে আজ নৌকো নিয়ে বেরিয়ে গেলো? অল্পে রাগার স্বভাব আজাহারের নয় আর এমন রাগ তো সে কোনোদিন করেওনি।

সে বিরহী বাঁশীর সুর অনেকক্ষণ হোলো থেমেছে। পাখী-পাখালীর ডাকে আর নিস্তব্ধ আকাশে বিকালের ঘোষণা। রাস্তার ওপরে গরু নিয়ে ফিরছে কয়েকজন লোক। খালে কাদের নৌকো যাওয়ার শব্দ। মেয়ে জেগে উঠে মাই হাতড়ে কাঁদতে সুরু করেছে, তবু জমিলার আচ্ছন্নতা কাটলো না — যেন সে হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে কোথায় ঐ দূরের বিল প্রান্তের ঝিলমিলে গাছপালার অন্তরালে।

শেষে ছেলেরা এসে পড়তেই সে উঠে পড়লো। বড়ো ছেলের হাতে চালের বড়ো পোঁটলা, সেটা দাওয়ায় নামাতেই ছোট ছেলে ভেতর থেকে কী একটা মোড়ক তুলে নিলে; বড়ো ছেলে হা হা করে উঠলো — দে দে আমাডেরে দে, হারাইয়া দিবি তুই। থাবা দিয়ে সে সেটা নিজের হাতে নিলো। বাজানে আইছে মা?

—না, ক্যা? তোর আতে ওডা কী?

—অষুধ, হাটখোলা অশ্বিনী কবিরাজের আত পাও ধরইয়া এজু আমছি বাজানের লইগ্যা। দেত্তে কী চায় — কাসে—। ছোট ছেলে বলে উঠলো — এয়া খাওয়াইলেই আমাশা ভালো অয়। হে কইছে।

দিগ্বিজয় করে এসেছে যেন দু'ভাই। পথকষ্টে দেহ শ্রান্ত, কিন্তু এই অষুধটুকুর জন্যই তাদের সারা অন্তর উৎসাহ আর আনন্দে প্রদীপ্ত।

—যা, মাচার উপরে থুইয়া আয়। এত্তে চাউল কয় সের?

—দুই সের—মা রাঁধো তরাতরি, খিদা লাগছে— বলেই ছোট ছেলে দাওয়ার ওপর শুয়ে পড়লো। জমিলা তাড়াতাড়ি রান্না বসাতে যায়, ছেলেদের মুখ এতটুকু হয়ে গেছে।

ওষুধটা রেখে বড়ো ছেলে ঘর থেকে নেমে এলো ভাইয়ের ক্লান্ত কথায় ধমক দিয়ে বলে উঠলো — এক্কার মধ্যে আবার খিদা। সিকদারবাড়ী দেহি।

হঠাৎ জমিলার দিকে চেয়ে সে চুপ করে গেলো।

—কী, সিকদারবাড়ী কী?

ছেলে এড়াতে চাইলো, জমিলা না শুনে ছাড়বে না — সিকদারবাড়ী ভাত চাইয়া খাইছিলি বুঝি?

—হুঁ।

—হুঁ, এক্কার মধ্যে খয়রাত করাও ছেকছো। বাড়ী আইয়া খাওনের আর তর সইলেনা? জাইত-কুল বেবাক খুয়াইলি হারামজাদারা। জমিলা ছেলেদের ওপর রেগে আগুন হয়ে উঠলো।

বড়ো ছেলে দোষ স্খালনের চেষ্টা করলো —আমি কী হরমু; সিকদারবাড়ীর উপর দিয়া যাইতে লাগছি, হেয়া আইতনায় অতিথ-টতিথ লইয়া খাইতে আছেলে; ও দেইখ্যাই আমাডেরে কয়—ম্যাভাই খিদা লাগছে। সিকদার জানি কেমন তারা কতাডা হোনলে—তাহার বোলাইয়া নিয়া দুই-জনেরেই খাইতে দেলে, আমরা কী হরমু।

ছোট ছেলের দিকে তেড়ে মারতে গেলো জমিলা, চাল ধোয়া বন্ধ করে—এতো খাওন ক্যা, তোমার প্যাডে হানছে কী। কাইল বাজাইছেলা এক যন্ত্রণা আবার আইজ এক চাঁড়ালের বাড়ীতে গেলতে গেছো, খাড়া, আইয়া লউক তোর বাপে—দেহিস আনে।

চড় খেয়ে ছেলেটা হতভম্ব হয়ে গেলো; তাকিয়ে রইলো মায়ের দিকে; ঠোঁট দু'খানা থর থর করে বেঁকে বেঁকে কেঁপে উঠলো —টল টল করে উপচে এলো সমস্ত চোখে কান্না। একটু পরে দাওয়া থেকে নেমে কাঁদতে কাঁদতে উঠানের সামনে জামরুল গাছ তলাটায় গিয়ে দাঁড়ালো।

ভাত চড়াতে যেয়ে জমিলা তখনো তাদের গালিগালাজ করছে। মনে দুই রাগের সংমিশ্রণ। তার বাবা একদিন এই গ্রামে চৌকিদারী করতো, জায়গা জমি ছিলো, মুনিষ রেখে কাজ করাতো —দুর্ভাগ্য ক্রমে কালের কবলে পড়ে তারা। সে সম্পদ না-হয় আজ নেই, কিন্তু তাই বলে তার ছেলেরা ভিক্ষেয় বেরুবে? আজাহারের মুখে কালি লেপে এসেছে তারা। যাদের বাড়ীর উঠোনে একদিন 'ভাঁটি' থেকে আনা ধানের স্তূপে পাহাড় গড়ে উঠতো, সেই বাড়ীরই ছেলেরা ভিক্ষে করে ভাত খাবে কল্পনাতেও তা জমিলার পক্ষে অসহ্য। আর চাইতেও গেলো কী না কাদের সিকদারের বাড়ী।

কাদের সিকদার গ্রামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি—ধনে, মানে এবং জমিলার মতে চুরিতেও। সে অতো বড়ো হয়েছে নাকী কেবল চুরি করে করেই। উকীলের মুহুরিগিরি করে বাপ কিছু পয়সা জমিয়েছিলো, চড়া সুদে সে তাই গরীব চাষীদের ধার দিতো। তারা পারতো না শুধতে, সুদ তো ক্রমান্বয়ে বেড়ে আসলের তিন চতুর্গুণ হয়ে দাঁড়ায়। তখন হতে থাকে ভিটেমাটি জমাজমির গ্রাস। কাকুতি করলে দাড়ি নেড়ে জবাব দিতো —আসলডা বরং ছাড়ইয়া দেতে পারি, কিন্তু সুদ ছাড়মুনা। এই করে করে এই সরমঙ্গল গ্রামটা জুড়ে তো তারই তালুক গড়ে উঠেছে। অথচ এর প্রকৃত মালিক যারা ছিলো, কোথায় তারা আজ?

আজাহারও অমনি একজন ভুক্তভোগী বলে জমিলা দু'চোখে ও লোকটাকে দেখতে পারে না। এমন একটি দিন নেই তার, যেদিন মা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কাদেরের প্রতি তার সর্বনেশে শাপবাণী উচ্চারিত হয়। দুরন্ত কলেরাতে আজাহারের বাড়ী একদম খাক্ হয়ে গেলো, বাপ জমানো টাকা বলতে একটি পয়সাও রাখেনি, সুতরাং বিয়ের সময় লাগলো টানাটানি। বাধ্য হয়ে হাত পাতলো কাদেরের কাছে। সে টাকা দিতে রাজী হোলো; কিন্তু খারাপ দিন-কালে মরণ বাঁচন অনিশ্চিত বলে বললে—দুইশো টাহা চাও দেত্তেপারি, কিন্তু ম্যাভাই কয়েক কুড়া জমি বাঁধা থুইতেই অইবে।

আজাহারের আছে তখন গ্রামে খাসে পাঁচকুড়া আর ভাঁটিতে বন্দোবস্ত নেওয়া সাতকুড়া মাত্র জমি। বাধ্য হয়ে খাসের চারকুড়া বন্ধক রাখলো, সে সময় এক মুহূর্তও তার মনে কোনো সন্দেহ রেখাপাত করেনি। ভরসা ছিল পরের খন্দেই টাকাটা শুধে দিতে পারবে। বিয়ের কয়েক মাস পরে ভাঁটি থেকে খবর এলো — বাপ যে সাতকুড়া জমির বন্দোবস্ত নিয়েছিলো নগদ টাকায় তার মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে; নোতুন বন্দোবস্ত নিতে হলে অবিলম্বে দেড়শো টাকাসহ তার চলে আসা প্রয়োজন। কাদেরের টাকাই তখন পর্যন্ত শোধ করা হয়নি; সুতরাং নোতুন করে আর ধার চাইবার সাহস হোলো না, জমিলাও বারণ করলে। সে ভেবেছিলো দেশে যা আছে, তাতেই কোনো রকমে তাদের দিন চললেই হোলো; জমিলাকে একলা রেখে তার আর অতো দূর দেশে যেয়ে কাজ নেই। ছেলেমানুষী করে জমিটা তারা ছেড়ে দিলো অথচ কাদেরের কাছে বাকী খাসের কুড়া-খানা বন্ধক রাখলে হয়তো আরো দেড়শো মিলতো। 'ভাঁটি'র সে জমিখানার খবর না জানি কেমন করে পেয়ে কাদের সিকদারই কিনে নিলো। এদিকে কাদেরের টাকা আর শোধ হয় না। শেষটায় কেমন কেমন কারসাজী করে জমি চারকুড়া কাদের সিকদার একেবারে নিয়ে নিলো। তার তালুক গড়ার পলিসী এই। গ্রামের সবাই জানে তার খবর কিন্তু করবে কী, তাকে সেলাম দিয়ে আনুগত্য না দেখালে দুঃখের দিনে হাত পাতার আর জায়গা কোথায়?

কিন্তু জমিলার সে মনোবৃত্তি নেই। তাদের যে একেবারে পথের কাঙাল করে দিলো, তার প্রতি তার ঘৃণা আর কোনো-দিন মুছবার নয়। অথচ কী ধড়িবাজ লোক কাদের। নিঃস্ব আজাহারকে দয়া দেখাবার নামে আরো কতো মতলব পাকিয়েছিলো কে জানে। জমি নেবার পরে টেরি কেটে তেল চকচকে বাঁধানো লাঠিখানা হাতে নিয়ে প্রায়ই সময় অসময়ে জমিলাদের বাড়ীতে আসতো, আজাহার বাড়ীতে না থাকলে নেপথ্যবাসিনী জমিলাকে উদ্দেশ করে পরম দয়ালু দানশীলের মতো কথা বলতো। হয়তো বারান্দায় মোড়ায় বসে ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে বলতো —ঘরডা তো মারামতের দরকার। খায়ের পোয়রে কইও, বিনা সুদেই দিমু হানে কিছু টাহা।

(৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শ্রীপরিমল গোস্বামী

মাত্র এক আধ মিটারের ব্যবধান নিয়ে ঝগড়াটা আজ কয়েক বছর ধ'রে চলে আসছে।

সলিল আর অনিল দুই বিখ্যাত সাঁতারু—প্রতি বছর এদের প্রতিযোগিতা। প্রথম ছিল এক মাইলের পাল্লা, বাড়তে বাড়তে আজ পাঁচ বছরে পাঁচ মাইলের পাল্লায় এসে পৌঁচেছে। কিন্তু এদের মধ্যে কে যে শ্রেষ্ঠ তার অবিসংবাদিত মীমাংসা আজও হয়নি। তার কারণ প্রায় পালা ক'রে একবার সলিল, একবার অনিল জিতে আসছে এবং এভাবে চললে কোনো দিনই হয়তো সে মীমাংসা হবে না।

সলিল বালিগঞ্জের ছেলে, অনিল শ্যামবাজারের। দু'দলে প্রায় কুড়ি হাজার উৎসাহী লোক দু'জনের পৃষ্ঠপোষক। কাজেই উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ সাঁতারু তার একটা ভাল রকম মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত কেউ কাউকে ছাড়ছে না। এবারে ষষ্ঠ বছরে তারই আয়োজন চলছে। বালিগঞ্জ এবং শ্যামবাজার উভয় দলই অশান্ত হ'য়ে আছে, এদের মধ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার।

শ্যামবাজারের উৎসাহীরা বলে, অনিল শ্রেষ্ঠ সাঁতারু, কেননা সে বালিগঞ্জের বাবু নয়, সে রীতিমতো সাধনা ক'রে সাঁতার শিখেছে।

বালিগঞ্জের সবাই আরামপ্রিয় এবং বিলাসী এই রকম একটা ধারণা শ্যামবাজারের মনে বদ্ধমূল। আবার বালিগঞ্জের লোকেরও গোঁড়ামি আছে। তারা বলে শ্যামবাজারের ছেলে হেদোর খালে সাঁতার শেখে, সে তো কূপমণ্ডূক। বিস্তীর্ণ লেকের জলে সাঁতার না শিখলে তাকে আবার সাঁতার শেখা বলে?

ওরা প্রতি বছর ঠিক একই সঙ্গে রওনা হয় এবং উৎসাহী জনতার হর্ষধ্বনির মধ্যে সাঁতার কাটতে থাকে। ওদের সাঁতার শেষ হয় এসে চিৎপুরের খালের কাছে। কেবল রওনা হওয়ার জায়গা বছরে এক মাইল ক'রে উত্তরে স'রে যাচ্ছে।

সাঁতার প্রতিযোগিতায় এক সঙ্গে রওনা হওয়ায় অসুবিধা আছে। নির্দিষ্ট দূরত্ব কে কত আগে অতিক্রম করতে পারে তার জন্য পাশাপাশি রওনা হওয়ার কোনো কারণই থাকতে পারে না, কিন্তু এদের বেলায় তার ব্যতিক্রম করতে হয়েছে। এর অবশ্য অনেকগুলো কারণ আছে।

প্রথমে যখন পৃথক রওনা হওয়ার কথা হয় তখন শ্যামবাজার দলের মুখপাত্র ক্ষিতীশ ভট্ট বলেছিল, আমাদের কি গাধা পেয়েছ? যে আগে রওনা হবে অসুবিধা ভোগ করতে হবে তাকে, আর যে পরে রওনা হবে তার সুবিধা ষোল আনা। সে আগের সাঁতারুর উপর নজর রাখতে পারবে, তার দুর্বল মুহূর্ত বুঝে তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে, কোথায় তার ভুল হচ্ছে তা দেখতে পারবে। আমাদের পার্টিকে যদি পরে যেতে দাও তা হ'লে রাজি।

বালিগঞ্জের ক্যাপ্টেন বলে, আমরাই বা আগে যাব কেন?

গঙ্গাপাড়ের লক্ষ লক্ষ দর্শকও তাতে রাজি নয়, তারা দু'বারে দু'জনের জন্যে অত সময় নষ্ট করবে না।

শেষে ঠিক হয় ওরা একই সময় একই সঙ্গে রওনা হবে এবং তাই হয়ে আসছে এত দিন। কিন্তু লক্ষ্যস্থলে এসে দুজনে আগু-পিছু হয়ে পড়ে। যেবারে অনিল পিছিয়ে পড়ে সেবারে সে বলে সলিল বোধ হয় তাকে ধাক্কা মেরেছে সাঁতার কাটতে কাটতে সেই রকমই তার মনে হয়েছে দু-একবার। আবার যে বছর সলিল পিছিয়ে পড়ে সে বছর সলিল বলে অনিল তাকে দু-একবার ধাক্কা মেরেছে বলে তার সন্দেহ হয়।

এই ধাক্কা মারা ব্যাপারেও আড়ালে আড়ালে দুপক্ষ গর্ব অনুভব করে।

সলিল যেবারে ধাক্কা মারে সেবারে বালিগঞ্জের উৎসাহীরা বলে এমন দূর পাল্লায় সাঁতার কাটতে কাটতেও যে ধাক্কা মারতে পারে সে বাহাদুর। আবার যে বছর অনিল ধাক্কা মারে সেবারে অনিলের ক্ষমতায় শ্যামবাজারের লোকেরা পুলকিত হয়ে ওঠে। বলে, অনিল নয় তো যেন পদ্মার কুমীর—ভুল ক'রে মানুষের ঘরে জন্মেছে।

ক্ষিতীশ ভট্ট শ্যামবাজারের উৎসাহীদের বলেছে, এবারে কোনো ত্রুটি রাখা হবে না—এবারে এমন কিছু করতে হবে যাতে বালিগঞ্জকে অন্তত আধ মাইল দূরে ফেলে শ্যামবাজার এগিয়ে যেতে পারে।

সে আরও বলেছে যথেষ্ট খরচ করতে হবে এজন্যে, শ্যামবাজারের শ্রেষ্ঠত্ব এবারে স্থায়ীভাবে প্রমাণ করতে হবে নইলে সাঁতার খেলার মধ্যে আর আমি নেই।

ক্ষিতীশ ভট্টের বুদ্ধিতে কি না হ'তে পারে? শ্যামবাজারের লোকেরা তার ক্ষমতায় এত বিশ্বাসী যে, তার মুখের ঐ কথাটি শুনেই সবাই মনে মনে ভাবতে লাগল এবারে বালিগঞ্জ ডুববে।

সমস্যা যতই জটিল হোক ক্ষিতীশ ভট্ট সহজে তার মীমাংসা করতে পারে। স্থূল দেহ, মাথাটি ছোট, চুল আরও ছোট, দেখে মনে হয় বাংলার আদুরে দুলাল, কিন্তু কাজে নামলে তার তুল্য সাহসী, কৌশলী এবং একগুঁয়ে আর কেউ থাকতে পারে বলে মনে হয় না।

এবারে অনিলকে স্থায়ীভাবে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ না করিয়ে সে ছাড়বে না এই তার প্রতিজ্ঞা।

ক্ষিতীশ ভট্ট কণ্ঠপ্রতি আট আনা ধার্য করেছে। যার কণ্ঠে যত বেশী জোর, যার চীৎকার আধ মাইল দূরের লোক শুনতে পারে এমনি লোক বেছে বেছে সে জোগাড় করেছে হাজারখানেক। পঞ্চাশখানা নৌকো ভাড়া করা হয়েছে তাদের জন্যে। তারা সাঁতারের সময় অনিলের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, অনিলকে তারা চীৎকার করে উৎসাহ দেবে, তাতে অনিলের মনে প্রতি মুহূর্তে নতুন উদ্দীপনা জাগবে, সে ছুটে চলবে টর্পেডোর মতো। আর তাতে গৌণ ফলও একটা লাভ হওয়ার সম্ভাবনা। অর্থাৎ অনিলের পক্ষে এত উৎসাহদাতার আবির্ভাবে সলিল মনে মনে জ্বলতে থাকবে, সে উত্তেজিত হয়ে উঠবে, আর ঐসঙ্গে তার হাত পা শিথিল হয়ে আসবে। হারবে সে নির্ঘাৎ।

খুব গোপনে এই সব প্ল্যান করা হ'ল। কিন্তু কথাটা গোপন রইল না। কেমন ক'রে বালিগঞ্জের কানে কথাটা পৌঁছুল

(৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পাঁচ সের চূণের বায়না। ভোমরার হাতখানা একটু বেশী পরিমাণে ছুঁয়েই এক টাকার নোটখানা গুঁজে দিয়েছে হরিলাল। চমকে ভোমরা তিন পা পিছিয়ে গেছে, নোটখানা উড়ে গেছে হাওয়ায়। মৃদু হেসে সেখানা কুড়িয়ে এনে চালের বাতায় রেখে দিয়েছে হরিলাল। তির্যক কটাক্ষ হেনে বলেছে, মনে থাকে যেন, সাতদিন পরেই কিন্তু বিয়ে।

হরিলাল গ্রামের তালুকদার। জমি আছে, পয়সা আছে। কারবার তো আছেই। যুদ্ধের বাজারে আরো কতদূর কী করেছে ভগবানই জানেন। সুতরাং কুড়ি টাকার চালের দিনেও সে ভালো করেই মেয়ের বিয়ে দিতে চায়। অনেক বরযাত্রী আসবে, গাঁয়ের বহু লোকের পাত পড়বে তার বাড়ীতে। পাঁচ সের চূণের কমে এত বড় একটা ক্রিয়াকাণ্ড হওয়া শক্ত। সের প্রতি আট আনা দর সে দিতে চায়, সুতরাং ভোমরাকে একটু বেশী করে স্পর্শ করবার অধিকার তার নিশ্চয় আছে।

কিন্তু ভোমরা ছেলে মানুষ। অধিকার অনধিকারের ব্যাপারগুলো এখনো সে ভালো করে বুঝতে পারে না। হরিলালের লোলুপ চোখ আর অনুভূতিপ্রখর স্পর্শে তার সমস্ত শরীর শির শির করে শিউরে উঠল। খেতু বাড়িতে নেই, দূরের ইষ্টিশানে সোয়ারী নামিয়ে দিতে গেছে। এমন সময় হরিলালের আবির্ভাবটা তার ভালো লাগল না। সংকীর্ণ জীর্ণ কাপড়ের প্রান্ত আকর্ষণ করে ঘোমটা দেবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করলে।

হরিলাল চেহারায় খাটো। হালে ঠিক ব্রহ্মতালুর ওপরে চিকচিকে একটা টাক নিশানা দিয়েছে। মোটা আর ছোট ছোট হাত পা—আঙুলগুলো সব সময়ে চঞ্চল, কখনো স্থির থাকতে পারে না। মনে হয় তারা যেন সদা-সর্বদা কী একটা আঁকড়ে ধরবার চেষ্টায় আছে, একবার পেলে [illegible] লোলুপ মুঠির ভেতর নিঃশেষে সেটাকে নিষ্পেষিত করে ফেলবে। এক হিসাবে অনুমানটা নির্ভুল। হরিলালের হাতের ভেতর যা একবার এসে পড়েছে তাকে আর কখনো সে ছাড়েনি—খত নয়, জমি নয়, নারীও নয়।

হরিলাল চলে গেলে ভোমরা আরো কিছুক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এ গাঁয়ের অন্যান্য ভুঁইমালী মেয়েদের মতো চূণ সে-ও তৈরী করে কিন্তু আর সকলের মতো কখনো হাটে বিক্রী করতে যায় না। খেতুই যেতে দেয় না তাকে। ভোমরাকে বিয়ে করেছে এই সেদিন, এখনো নেশা কাটেনি। একহাট লোকের ক্ষুধিত দৃষ্টির সামনে বসে সে বেচাকেনা করবে, ভুঁইমালীর ছেলে খেতুও এটাকে বরদাস্ত করতে পারে না।

কিন্তু পাঁচ সের চূণের বায়না তাকে নিতেই হবে। ধানের দর এবারেও গত বছরের মতো বেড়ে চলেছে ধাপে ধাপে। এ জেলাটা পুরোপুরি দুর্ভিক্ষের এলাকায় পড়ে না, তবু ঘটিবাটি আর রূপার খাড়ু বিক্রী করে গত বছর পেটের দাবী মিটাতে হয়েছে। খেতুর জমি নেই, আধিও নেই, সোয়ারী বয়েই দিন কাটে। গাড়ির ভাড়া পাঁচ থেকে দশ টাকায় উঠেছে বটে, কিন্তু জিনিষপত্রের দামও বেড়েছে পাঁচগুণ। যথাসর্বস্ব বিক্রী করে দিয়ে গেল বছর ওরা বর্ষাকালের ধকল সামলে নিয়েছে, কিন্তু সে দুদিন যদি এবারেও দেখা দেয় তা হলে প্রাণ বাঁচাবার কোনো পথই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সোয়ারী বয়ে খেতু যখন গ্রামের কাছাকাছি এসে পৌঁছল, বেলা তখন দুপুর। শাণ দেওয়া ছুরির মতো রোদ ঝলকাচ্ছে মাথার ওপর। নির্মল আকাশে প্রখর রোদ যেন সমস্ত পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিচ্ছে—হঠাৎ তাকালে চোখে ধাঁধাঁ লেগে যায়, মনে হয় পূব থেকে পশ্চিম অবধি সবটা যেন জ্বলন্ত একটা কাঁসার পাত দিয়ে মোড়া। জ্যৈষ্ঠ শেষ হয়ে যায় অথচ মেঘের চিহ্ন নেই কোথাও। দূরে বাবলা গাছগুলোর অপ্রচুর পাতা রোদের তাপে ঝলসে ঝরে পড়ছে—যেন আগুনে পোড়া কঙ্কালগুলো এলোমেলো আলপালা শস্যহীন মাঠের মরুভূমির মাঝখানে দাঁড়িয়ে।

ময়লা গামছায় কপালের ঘাম মুছে প্রাণপণে 'খাটো' হাকড়াচ্ছে খেতু। 'ডাঁ-ডাঁ-ডড়াঁহিন'। অবিসার গোরুর পাতলা চামড়ার ওপর পাঁচনের দগদগে রক্তচিহ্ন ফুটে উঠছে একটার পর একটা। বাঁ দিকের গোরুটার কাঁধের ওপর জোয়ালের ঘষায় অনেকখানি জায়গা নিয়ে ঘা হয়ে গেছে, সেখান থেকে এখন ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছে রক্ত। ডাঁশের দল সেখানে পরমানন্দে ভোজের আসর বসিয়েছে, আর মর্মান্তিক যন্ত্রণায় গোরুটা এক একবার থমকে থেমে দাঁড়িয়ে পড়বার চেষ্টা করছে।

কিন্তু গোরুর প্রতি দরদের চাইতে প্রয়োজনের তাগিদ খেতুর অনেক বেশী। ভোরবেলা সোয়ারীকে ইংরেজ বাজারের রেলগাড়িতে তুলে দিয়ে খেয়েছে চার পয়সার 'লাহরী' আর খেয়েছে টাঙন নদীর এক পেট জল। অসহ্য খিদেয় পেটের নাড়ীভুঁড়িগুলো জড়াজড়ি করছে এক সঙ্গে। রাত্রি জাগরণক্লান্ত চোখের পাতা দুটো অস্বাভাবিক ভারী হয়ে উঠেছে। আড়ষ্ট একটা আচ্ছন্নতায় শরীর ঢুলে পড়তে চাইছে, কিন্তু ডাঁশ তাড়াবার জন্যে ব্যগ্র-কাতর গোরুর লেজের ঘা চটাস্ চটাস্ করে চাবুকের মতো পায়ে লাগতেই চটকা ভেঙে যাচ্ছে। স্বপ্নের মতো মনে পড়ছে ঘরে ভোমরা ভাত বেড়ে নিয়ে তার প্রতীক্ষায় পথের দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

'ডাঁ-ডাঁ ডড়াঁহিন মহামাই'—খাটো উদ্যত করেই খেতুর হাত নেমে এলো আপনা থেকে। সত্যিই [illegible] হয় গোরু দুটোর দিকে তাকালে [illegible]'বছর আগে কী চেহারা ছিল [illegible]র কী হয়ে গেছে।

খেতে পায় না। যে গোরু আগে এক দমে পনেরো ক্রোশ পথ অরেশে পাড়ি দিয়ে যেত, তারা আজকাল তিন ক্রোশ রাস্তা না হাঁটতেই এমন করে ঝিমিয়ে আসে কেন তার খবর খেতুর চাইতে বেশি করে আর কে জানে।

সামনে তালদীঘি। আমের বন, মহুয়ার গাছ, তালের সারি। এতক্ষণে যেন চোখ জুড়িয়ে গেল। তালদীঘির কালো জল অপরিসীম স্নিগ্ধতায় যেন ডাকছে হাতছানি দিয়ে---ঠিক যেন ভোমরার শান্ত দুটি কালো চোখের মতো। জল আর ছায়ার ছোঁয়ায় বাতাসের স্পর্শও মধুর আর শীতল হয়ে উঠেছে। এইখানে গাড়িটাকে খানিক্ষণ জিরেন দিলে মন্দ হয় না। অন্তত বলদ দুটোকে একটু জল খাওয়ান দরকার।

এক পাশে মুচিপাড়া। এখানে এসে খেতু মাঝে মাঝে আড্ডা দিয়ে যায়, নীলাই মুচির সঙ্গে তার বন্ধুত্ব বহুকালের। এখানে গাড়ি থামানোর পেছনে সে আকর্ষণটাও আছে, অন্তত এক ছিলিম তামাক টেনে যাওয়া চলবে।

জোয়াল নামিয়ে প্রথমে বলদ দুটোকে ছেড়ে দিলে খেতু। তারপর বালতী করে জল নিয়ে এল তালদীঘি থেকে। গোরুগুলো এক নিশ্বাসে সে জল নিঃশেষ করে দিলে---বুকের ভেতরটা তৃষ্ণায় যেন শুকিয়ে পাথর হয়ে গেছে ওদের। ততক্ষণে গাড়ির পেছন থেকে কয়েক আঁটি পোয়াল টেনে নামিয়েছে খেতু, কৃতজ্ঞ এবং বেদনার্ত চোখে তার দিকে একবার চেয়ে অনিচ্ছুকভাবে ওরা খড় চিবুতে সুরু করে দিলে। ভাবটা এই, শুকনো খড় যে এখন গলা দিয়ে নামতে চায় না।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল খেতুর। খইল, ভূষি, কলাই ডালের খিচুড়ি—সে সব এখন গত জন্মের স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষই না খেয়ে মরে যাচ্ছে তো গরু! আস্তে আস্তে সে এসে মুচিপাড়ায় পা দিলে।

ঘরের দাওয়াতেই নীলাই বসে আছে। মাথার চুলগুলো বড় বড়, চোখের দৃষ্টি উদভ্রান্ত। বললে, মিতা যে, আয় আয়। তালদীঘির পাড়ে দেখলাম গাড়ি থামল একখানা। তোর গাড়ি যে বুঝতে পারিনি।

আশ্চর্য নিরুৎসুক কণ্ঠ নীলাইয়ের। কথা বলছে যেন নিজের সঙ্গে—নিজের মনে মনেই। তার কথার কোনো লক্ষ্য বা উপলক্ষ নেই। সে খেতুর দিকে তাকিয়ে আছে, কিংবা তার পেছনে তালদীঘির দিকে, অথবা তারও পেছনে রৌদ্র-ঝকিত দিগন্তের দিকে কিছুই স্পষ্ট করে বোঝা যায় না যেন।

সবিস্ময়ে খেতু বললে, তোর কি হয়েছে মিতা!

—আমার? অত্যন্ত শুষ্ক খানিকটা হাসি হাসল নীলাই। আমার কিছু হয়নি।

—কিছু হয়নি তো অমন করে বসে আছিস কেন?

নীলাই আবার তেমনিভাবে তাকাল খেতুর দিকে—অথবা খেতুর ভেতর দিয়ে লক্ষ্যহীন সীমানাহীন অনিশ্চিত কোনো

একটা দিগন্তের দিকে।' বললে, ঘরে এক রত্তি চামড়া নেই, কাল থেকে হাঁড়ি চড়েনি। বউকে পাড়ায় পাঠিয়েছি চালের চেষ্টায়। আর বসে বসে ভাবছি মানুষ না হয়ে যদি গোরু ঘোড়া হতাম তা হলে মাঠের ঘাস-পাতা খেয়েও বেঁচে থাকা চলত।

এক ছিলিম তামাক চাইবার কথা খেতুর আর মনে পড়ল না। তার ঘরে আজও খাবার আছে, কিন্তু—কিন্তু দু'দিন পরে তার অবস্থাও যে এমন দাঁড়াবে না কে বলতে পারে! ধানের দর তো বেড়েই চলেছে। নীলাইয়ের পাশে বসতে তার ভয় করতে লাগল। কী অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে নীলাই—যেন মরা মানুষের চোখ। যেন সে চোখ দুটো ক্রমাগত বলছে—

খেতু দাঁড়িয়ে উঠল। কোনো কথা তার মনে এল না, একটা সান্ত্বনা নয়, একটা আশ্বাসের বাণীও নয়। অত্যন্ত অসংলগ্নভাবে বললে, আমি যাই।

—যাবি? দুটো টাকা দিয়ে যা মিতা। সোয়ারী বয়ে এলি, ভাড়ার টাকা নিশ্চয় পেয়েছিস। কাল শোধ দিয়ে দেব, আজই কিছু চামড়া আসবার কথা আছে।

চামড়া আসবে কিনা অথবা কাল টাকা সে সত্যিই শোধ করে দেবে কিনা সে জিজ্ঞাসা খেতুর মনে এল না। আপাতত যেন এই লোকটার হাত থেকে সে নিষ্কৃতি চায়। ট্যাঁক থেকে দুটো টাকা বের করে নীলাইয়ের হাতে তুলে দিলে খেতু।

কালো কালো ময়লা দাঁত বের করে নীলাই খানিকটা নির্জীব হাসি হাসল। বললে, বাঁচালি মিতা। কাল ঠিক শোধ দিয়ে দেব। দীঘির পাড়ে ও দুটো বলদ কার? তোর বুঝি?

—হাঁ, আমার।

—ঈ-স, কী চেহারা ও দুটোর!—নীলাইয়ের ধোঁয়াটে মৃত চোখ দুটো যেন পলকে জীবন্ত হয়ে উঠল: ওরা তো আর বেশি দিন বাঁচবে না। যদি মরে যায়, চামড়া দুটো আমাকে দিস তা হলে। ভুলে যাসনি যেন। দিবি তো?

মুহূর্তের মধ্যে ক্রোধে আর আতংকে খেতুর সমস্ত শরীরটা শক্ত হয়ে উঠল। ইচ্ছে হল, যে টাকা দুটো দিয়েছিল থাবা দিয়ে তা নীলাইয়ের হাত থেকে কেড়ে নেয় আর শাঁটা দিয়ে শপশপ করে ঘা কতক বসিয়ে দেয় অলক্ষুণে লোকটার মুখের ওপর।

কিন্তু খেতু কিছুই করল না। সোজা শন্ শন্ করে হেঁটে এল, জোয়ালে জুড়ে দিলে গোরু। নীলাইয়ের চোখের আওতা থেকে পালাতে হবে যত তাড়াতাড়ি হোক। বলদ দুটো আর হাঁটতে চায় না। থেমে থেমে দাঁড়ায়, কাঁচা মাটির পথের ধারে যে অপরিপুষ্ট বিবর্ণ ঘাস উঠেছে, কালো কালো শীর্ণ আর লম্বা জিভ মেলে সেগুলো খাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু খেতুর এবার আর রাগ হল না, বিরক্তিবোধ হল না এতটুকুও। কী চেহারা হয়ে গেছে এমন নতুন আর জোয়ান গোরুর, ওদের দিকে তাকাতেও ভয় করে এখন। হয়তো একবার হাঁটু ভেঙে পড়লে আর উঠতেই পারবে না। হাতের উদ্যত শাঁটা পাশে নামিয়ে সে পরম যত্নে গোরুর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, কোমল শান্ত গলায় আদর করতে লাগল—লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার।

যেমন করে হোক মণখানেক খইল এবার জোগাড় করতেই হবে।

বাড়ির দরজায় ফিরে সে 'শিকপায়া' মেরে গাড়ি থামাল। আর ওদিকের ডোবারঘাট থেকে ভিজে কাপড়ে সামনে এসে দাঁড়াল ভোমরা।

অপ্রসন্নতায় ভারী হয়ে উঠল খেতুর মন। বিশ্বাস নেই পৃথিবীকে, বিশ্বাস নেই ভোমরার রূপকে। ভিজে কাপড়ের নেপথ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে অপরূপ দেহকান্তি—যার চোখে পড়বে সঙ্গে সঙ্গে তারই নেশা ধরে যাবে।

—এখন আবার চান করলি যে? এই অবেলায়?

—ঝিনুক কুড়ুতে গিয়েছিলাম।

—ঝিনুক কুড়ুতে। খেতুর কপাল উঠল রেখাসংকুল হয়ে, আরো বেশি অশান্তিতে মনটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল। আজকে ঝিনুক দিয়ে কী হবে?

—হরিলাল টাকা দিয়ে গেছে। পাঁচ সের চুণের বায়না।

হরিলাল! সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিরক্তি ঝিমিয়ে পড়ল, ধুলোপড়া খাওয়া সাপের মতো মাথা নত করল যা কিছু উত্তেজনা। নামটার যাদু আছে। হরিলাল দাস এ গ্রামের শুধু মণ্ডল নয়, মণ্ডলেশ্বর; মহারাজ চক্রবর্তী বললেও অত্যুক্তি হবে না কথাটা। উপকার কী করে? বলা শক্ত, তবে অপকারের ক্ষমতা যে তার সীমানাহীন এ সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ-প্রয়োগই দরকার হয় না। এ হেন হরিলাল ঘটা করে মেয়ের বিয়ে দেবে—উপচার অনুষ্ঠানে এতটুকুও ফাঁক রাখবে না কোথাও। পাঁচ সের চুণের বায়না না নিয়ে উপায় কী।

—ওঃ। কিন্তু তুই যেখেটে খেটে মরে যাবি বউ।

ভোমরা মৃদু হাসল, বিষাদ নিরানন্দ হাসি। তারপর কাপড় ছাড়বার জন্যে চলে গেল ঘরের ভেতর। অসীম ক্লান্তিতে দাওয়ার একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে পড়ল খেতু।

—খিদেয় মরে যাচ্ছি। তাড়াতাড়ি দু'টি খেতে দে ভোমরা।

একটা মাটির ঘটিতে করে জল আর কচু পাতায় খানিকটা নুন এনে ভোমরা রাখল খেতুর পাশে। সেদিকে তাকিয়ে আপনা থেকেই খেতুর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। কাঁসা আর পিতল যা ছিল সব বন্ধক গেছে, ঘরের লক্ষ্মী আর কোনদিন ঘরে ফিরবে না।

ওদিকে রান্না ঘরের ঝাঁপ খুলেই ভোমরা থেমে দাঁড়াল। পা আর নড়ে না।

—কিরে, হল কি?

কী জবাব দেবে ভোমরা। পেছন দিকের ঝিরঝিরে বেড়া ফাঁক করে কখন ঘরে ঢুকেছিল কুকুর। হাঁড়ি কলসী সব ভেঙে একাকার করে দিয়েছে, রাশি রাশি ভাত আর ডাল ছড়িয়ে রয়েছে ঘরময়। ডাল মেশানো কর্দমাক্ত মাটিতে এখনো ফুটে রয়েছে কুকুরের নোংরা পায়ের এলোমেলো থাবার দাগ। ঝিনুক আনতে যখন সে বিলের দিকে গিয়েছিল, সেই ফাঁকেই কখন—।

ব্যাপারটা দেখে খেতুও স্তব্ধ হয়ে রইল। দোষ নেই কারোই—পাঁচ সের চুণের বায়না দিয়ে গেছে হরিলাল। হরিলাল। ভোমরাকে কষে একটা লাথি মারবার জন্যে তিন্স একটা পা তুলেই নামিয়ে নিলে খেতু। এক মুহূর্ত অলস চোখে তাকিয়ে থেকে বললে, বেশ।

বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে ভোমরা বললে, তুমি বোসো। আমি আবার চারটি—।

—থাক, থাক, চাল সস্তা নয় অত। কত লোক না খেয়ে মরে যাচ্ছে খবর রাখিস তার?

মনের সামনে নীলাই এসে দেখা দিলে। মড়ার মতো দুটো দৃষ্টিহীন অথচ অদ্ভুত দূরপ্রসারী দৃষ্টি মেলে যেন কিছু একটা বলবার চেষ্টা করছে—যেন তার সর্বাঙ্গ ঘিরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে একটা অশুভ অভিশাপের ইঙ্গিত। এ কি সেজন্যেই?

ট্যাঁকে টাকা আছে তিনটে, তাড়ির দোকানও খোলা আছে এখনো—যেখানে সমস্ত ক্ষুধাতৃষ্ণার নির্বাণ, যেখানে অনায়াসে সমস্ত শ্রান্তি ক্লান্তিকে ভুলে থাকা চলে। হন হন করে খেতু বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

ঘরের খুঁটি ধরে আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইল ভোমরা। সারাদিন তার পেটেও কিছুই পড়েনি; নদীর ধারের গরম বালিতে পায়ের নীচে ফোস্কা পড়ে যায়, বিলের ওপরে রৌদ্রতপ্ত আকাশ যেন হাড়-মাংস এক সঙ্গে সেদ্ধ করতে থাকে। খেতুর জন্যে না হয় তাড়ির দোকান খোলা আছে, কিন্তু তার? ভোমরার চোখ ফেটে জল নয়—মনে হল টপ টপ করে কয়েক বিন্দু টাটকা রক্ত গড়িয়ে পড়বে।

উঠোনে স্তূপাকার ঝিনুক। খানিকটা স্যাঁৎসেঁতে আঁশটে গন্ধ খালি ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে।

রাত্রেই আবার সব সহজ হয়ে গেল। তাড়ির নেশা অদ্ভুতভাবে বদলে দিয়েছে খেতুকে। স্নেহ আর আবেগে সমস্ত মনটা কোমল আর আবেশবিহ্বল হয়ে উঠেছে। সোহাগে সোহাগে ভোমরাকে অস্থির করে দিয়ে জড়িত গলায় বললে, রাগ করিসনি বউ, রাগ করিসনি। তোকে কত ভালো বাসি আমি।......

পরের দিন বেলা উঠবার আগেই বাড়ি থেকে খাওয়া দাওয়া করে বেরোল খেতু। মোহনপুরের হাটে কিছু মাল পৌঁছে দিতে হবে। মণ প্রতি বারো আনা দর ধরে দিয়েছে মহাজন। আধ সের চালের ভাত খেয়ে পরম পরিতৃপ্তিতে একটা বিড়ি ধরাল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে সপ্রেম চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল ভোমরাকে।

—তোর জন্যে হাট থেকে কাপড় কিনে আনব বউ।

ভোমরা মৃদু ক্লান্ত রেখায় হাসল। কালকের জের আজও শরীরের ওপর থেকে মেটেনি। কোনোখানে যেন আনন্দ নেই, উৎসাহ নেই এতটুকুও।

—ফিরবে কখন?

—ভোরের আগেই। সাঝ রাত্তিরে ওখান থেকে গাড়ি জুড়ে দিলে এ ক' কোশ বাটা আর কতক্ষণ। তুই কিন্তু তাই বলে রাত জেগে বসে থাকিসনে।

খেতু গাড়ি নিয়ে চলে গেল। রান্না ঘরের ভাঙা জায়গাটা পিঁড়ি আর ইট দিয়ে বন্ধ করে ভাতের হাঁড়িটা শিকেয় তুলে রেখে ভোমরাও উঠোনে এসে দাঁড়াল। আরো অন্তত দু' তিন সাজি ঝিনুক দরকার। কাল থেকেই পোড়ানো সুরু করতে হবে।

—খেতু বাড়িতে আছিস?

হরিলালের গলা। ভোমরা ত্রস্ত হয়ে ঘোমটা টেনে দেবার আগেই হরিলাল বাড়ির ভেতর এসে দাঁড়িয়েছে।—খেতু নেই বাড়িতে?

ভোমরা মাথা নেড়ে জানালে, না।

হরিলাল কিন্তু চলে গেল না। নিজেই একটা চৌপাই টেনে নিয়ে জাঁকিয়ে বসল ঘরের দাওয়াতে: চুণের কথা ভুলে যাসনি তো!

—না।

—ভুলিসনি। তোর ওপর ভরসা করে বসে আছি। বিয়ের দিন যাবি কিন্তু আমার বাড়িতে। খেটেখুটে আর খেয়ে দেয়ে আসবি। ভয় আর অস্বস্তিতে ভোমরা চঞ্চল হয়ে উঠল। হরিলাল বড় বেশি তীব্র আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ওর দিকে। গলার স্বরে বড় বেশি কোমলতার আমেজ লেগেছে। পুরুষের ঐ চোখ আর কণ্ঠস্বরের অর্থ বুঝতে এক মুহূর্তের বেশি সময় লাগে না মেয়েদের। সঙ্গে সঙ্গে কি একটা যোগাযোগে ভোমরার অপাঙ্গ চোখ গিয়ে পড়ল হরিলালের হাতের ওপর। মোটা মোটা আঙুলগুলো যেন কিছু একটাকে আঁকড়ে ধরতে চায়, নির্মমভাবে নিষ্পেষিত করে ফেলতে চায় তাকে।

—একটা পান খাওয়াতে পারিস খেতুর বউ?

—না।—চাপা শঙ্কিত গলায় ভোমরা জবাব দিলে, পান নেই।

হরিলাল মৃদু হাসল—চোখ দুটো ঝলক দিয়ে উঠল এক মুহূর্তের জন্যে। তৈলাক্ত গোলাকার গালের ওপর দুটো গর্ত ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। মুখে সামনের পাটিতে একটা তীক্ষ্ণধার গজদন্ত চকিতের জন্যে আত্মপ্রকাশ করলে।

—তবে থাক, পানের দরকার নেই।—হরিলালের হাতখানা কঠোরভাবে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠল: খেতুকে বলে দিস ঋণ সালিশীর মামলাটায় ওর জন্যে বোধ হয় কিছু করা যাবে না।

ভোমরার বুকের ভেতর ধড়াস করে যেন ভারী একখানা পাথর এসে পড়ল। হরিলালের হাতে শাণিত খড়্গ হত্যার উল্লাসে ঝকঝক করে উঠেছে। বামনহাট ঋণ সালিশী বোর্ডের সে প্রতিপত্তিশালী সদস্য চেয়ারম্যান তার খাতক আর বলদ কিনবার জন্যে ইদ্রিস মিঞার কাছ থেকে যে বায়ান্ন টাকা ধার করেছিল খেতু, সে মামলা এখন ঝুলে রয়েছে বামনহাট ঋণ সালিশী বোর্ডেই। হরিলালের একটি মাত্র ইঙ্গিতে বলদ দু'টি বিক্রী করে দিয়ে কালকেই হয়তো কিস্তি শোধ করতে হবে খেতুকে। আরও কত কী হতে পারে একমাত্র হরিলালই তা জানে।

—বসুন, পান দিচ্ছি।

(৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শারদীয় উপহারে-
কেশরঞ্জন

খড়া

(৮৬ পৃষ্ঠার পর)

হরিলাল আবার হাসল। বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ—একটি মাত্র অস্ত্র দেখিয়েই জয়লাভ। এমন অসংখ্য অগণ্য অস্ত্র আছে হরিলালের যা খেতু কোনদিন কল্পনাও করতে পারে না।

—নাঃ থাক। আমারও কাজ আছে, উঠতে হবে। খেতু বাড়ি আসবে কখন?

—ভোর রাতে।

হরিলাল এগিয়ে এল অসংকোচে এবং নির্ভয়ে। বিস্তারিত ভূমিকা বা ভণিতা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক এখন—সে কাজের মানুষ। নীরব আর নির্জন বাড়ি। ঝাঁ ঝাঁ রোদে ঝিমিয়ে পড়েছে সমস্ত। পেছনের আমগাছে একটা পাখী ডাকছে, বৌ-কথা কও।

লোলুপ আর কঠিন মুঠি একখানা মাংসাশী থাবার মতো ভোমরার হাত আঁকড়ে ধরলে। মট করে উঠল এক গাছা কাঁচের চুড়ি ছ'টুকরো হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। চাপা রুদ্ধ গলায় হরিলাল বললে, সন্ধ্যের পরে আমি আসব। কোনো ভয় নেই তোর।

ভোমরার সর্বাঙ্গে যেন একটা বিষধর সাপ পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, মুখ দিয়ে কথা ফুটতে চায় না। শুধু তার আতংকবিহ্বল মুখের ওপর সাপের প্রসারিত ফণা দুলছে, লাল টকটকে চোখ দুটো জ্বলছে যেন আগুনের বিন্দু। কিন্তু চোখ সাপের নয়, হরিলালের।

—কোনো ভাবনা নেই। টাকা-পয়সা, কাপড়-চুড়ি, যা চাস। কিন্তু সন্ধ্যের পরে আমি আসব।

ভোমরার মুখ দিয়ে কথা ফুটল না।

না ফুটল, কি আসে যায় তাতে। নিপুণ ঘাতক হরিলাল, তার অস্ত্রের আঘাত অব্যর্থ আর অনিবার্য। বায়নার টাকার মামলাটা ভুলে থাকা এত সহজ নয় খেতুর পক্ষে। আরো একটু প্যাঁচ কষালে খেতুই উপযাচক হয়ে ভোমরাকে তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে যাবে। এমন সে অনেক দেখেছে। কিন্তু কী দরকার অতটা করে। হাঙ্গামা তার ভালো লাগে না। সকলের সঙ্গে যথাসম্ভব ভালো ব্যবহার করতেই সে ভালোবাসে—লোক একেবারে খারাপ নয় হরিলাল।

একখানা বড় মাঠ পেরোলেই সামনে মুচিপাড়া। আকাশের রোদ যেন আগুনের মতো গলে গলে পড়ছে। ময়লা গামছায় খেতু কপালটা মুছে ফেললে। চারদিকের মাঠে মাঠে চলেছে অদৃশ্য অগ্নিযজ্ঞ। এখনো মেঘ দেখা দিল না, বৃষ্টি নামল না এক পশলা। কবে যে লাঙল পড়বে মাঠে। ধান রোয়ার সময় চলে গেল, অসময়ে বৃষ্টি পড়লে ফসল বুনেই বা কী লাভ। ধানে 'ফুলন' লাগবে না, হাজা ধরে শুকিয়ে যাবে সমস্ত।

কেমন একটা অশুভ আশংকায় মনটা ভারী হয়ে উঠল খেতুর। পথের পাশে আলের ওপর সাদা ধবধবে একটা নরকপাল, দৃষ্টিহীন চোখের কালো গহ্বরের ভেতর দিয়ে ওর দিকে যেন প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে আছে। কোনো গোরস্থান থেকে শেয়ালে টেনে এনেছে নিশ্চয়ই।

—ড'া-ড'া-ড্ড'াহিন।

গোরুর লেজে মোচড় লাগল, আকস্মিক ভাবে ছুটতে সুরু করলে গাড়িটা। বাঁ দিকের বলদটার রক্তাক্ত কাঁধের ওপর ডাঁশ গুলো ভন ভন করে উড়তে লাগল।

মুচিপাড়ার সামনে আসতেই মনে পড়ে গেল টাকা দুটোর কথা। আজকেই শোধ দেবার কথা বলেছিল নীলাই। কিন্তু নীলাইয়ের সেই মুখখানা কল্পনা করতে ইগায়ের মধ্যে কেমন শির শির করে উঠল। কালকের দিনটা কি সেই জন্যেই কাটল অনাহারে।

হাঁক দিতেই নীলাই বেরিয়ে এল ঘর থেকে। খুশি হয়ে বললে, মিতা যে। কোথায় চললি আবার?

—মাল নামাতে যাব, রোহনপুরে। টাকা দুটো দিবি বলেছিলি।

—টাকা? সে হবে। আয় বোস। তামাক টেনে যা এক ছিলিম।

নীলাইয়ের চেহারায় অনেক পরিবর্তন চোখে পড়ছে আজকে। কথার ভঙ্গিতে আবার যেন পুরোনো মিতাকে খুঁজে পাওয়া গেল। হয়তো চামড়া পেয়েছে কিছু। অথবা সেই দুটো টাকাই এমন রূপান্তর ঘটিয়েছে তার। কিন্তু কারণ যাই হোক, মনের ওপর থেকে মস্ত একটা ভার যেন নেমে গেল খেতুর।

—কিন্তু এখন গাড়ি বাঁধতে পারব না। মাল আছে সঙ্গে।

—রেখে দে তোর মাল।—নীলাই ভ্রূভঙ্গি করলে: আধ ঘণ্টা বসে গেলে এমন কী হবে। যা রোদ্দুর, গোরু দুটোকেও একটু জিরোন দে বরং। কালকে তুই এলি অথচ তোকে একটু তামাক খাওয়াতে পারলাম না—ভারী খুঁৎ খুঁৎ করছে মনটা।

সত্যিই অসম্ভব রোদ। বেলাটা একটু ঠাণ্ডা না হলে গাড়ি হাঁকানো শক্ত। বলদগুলোর ভারী ভারী নিশ্বাস পড়ছে, দেখলেও কষ্ট হয়। তা ছাড়া কী চমৎকার নীলাইয়ের ঘরের দাওয়াটা। মহুয়া গাছের ছায়া পড়েছে, ঝির ঝির করে গান গাইছে পাতা। তালদীঘি থেকে ভিজে হাওয়া উঠে আসছে। শুধু বসা নয়, খানিকটা গড়িয়ে নিতেও ইচ্ছে করে। বলদ দুটোকে ছেড়ে দিয়ে খেতু এসে বসল।

—পেলি চামড়া?

—নাঃ। নীলাইয়ের বুকের ভেতর থেকে ফোঁকো হাওয়ার মতো শব্দ করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। আজও এল না ব্যাপারীরা। এবারে কপালে কী আছে কে জানে। সকালে ঘোষ গাঁয়ে ঢোল বাজিয়ে এলাম, আট গণ্ডা পয়সা দিলে। কিন্তু এভাবে ক'দিন চলবে। আচ্ছা, যুদ্ধ কবে থামবে বলতে পারিস?

মহুয়ার ঝির ঝিরে হাওয়াটা বড় আরাম বুলিয়ে দিচ্ছে শরীরে। চোখে যেন ঘুম জড়িয়ে ধরে। কিন্তু নীলাইয়ের কথাগুলো এই নিশ্চিন্ত প্রশান্তির মাঝখানে সাঁওতালী তীরের মতো এসে বেঁধে, বিষ বইন করে। মনে পড়ে যায় ওর মামাতো ভাই বিষ্টুকে বুনো শুয়োরে গুঁতিয়ে মেরেছিল—পেটের চামড়া ছিঁড়ে নাড়ীভুঁড়িগুলো ঝুলে পড়েছিল বাইরে; চৌকীদার আলী মহম্মদকে ডাকাতেরা ধরে জবাই করে দিয়েছিল, রক্তাক্ত গলাটা আর হাত ফাঁক হয়েছিল একটা রাক্ষুসে হাঁয়ের মতো। নীলাইয়ের সর্বাঙ্গ ঘিরে যেন যত অপঘাত, যত অপমৃত্যু, আর যত অভিশাপ এসে প্রেতের মতো ছায়া ফেলেছে।

—যুদ্ধ কবে থামবে? ভগবান জানেন।

—তা বটে। ভগবান জানেন—ভগবান! হিংস্রভাবে কথাটার প্রতিধ্বনি করলে নীলাই।

ঘরের ভেতর থেকে তামাক সেজে নিয়ে এল ওর বউ। চকিতের জন্যে মিতানের সরু সরু পা দুটো চোখে পড়ল খেতুর। কী অসম্ভব রোগা—এত রোগা হয়ে গেছে বউটা। মুখের দিকে তাকাতে ভরসা হয় না, অকারণে চেতনাকে চমকে দিয়ে মনে হল ওর মুখে হয়তো সেই মড়ার খুলিটার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে। ভোমরা এখনো তাজা আছে, এখনো যৌবনের ঐশ্বর্যে টলমল করছে সে। কিন্তু—।

দা-কাটা তামাকের উগ্র গন্ধটা লোভনীয়। কিন্তু হুঁকোতে একটা টান দিয়েই খেতু সেটা বাড়িয়ে দিলে নীলাইয়ের দিকে।

—না, মিতা, খা তুই। কিছু ভালো লাগছে না আমার।

ভালো লাগছে না কারোই। ভালো লাগবার কথাও নয়। অন্যমনস্কভাবে নীলাই কলকেটাকে উবুড় করে দিলে। তারপর তাকিয়ে রইল দূরে খেতুর অভিসার বলদ দুটোর দিকে। যা চেহারা হয়েছে ওদের, বেশিদিন আর বাঁচবে না। ওই দুটো গোরুর চামড়া পেলে—।

খেতু বললে, নাঃ, উঠি এবার। চার ক্রোশ বাটা যেতে হবে।

—বোস মিতা বোস। এত তাড়া কিসের? তুই তো সুখী মানুষ, একদণ্ড না এখানে বসেই যা। ঘরে ঠাণ্ডা আছে, গলাটা একটু ভিজিয়ে যাবি নাকি?

—ঠাণ্ডা? তাড়ি? মুহূর্তে সমস্ত মনটা যেন নেচে উঠল। কিন্তু তাড়ির নেশায় ধরলে সব কাজ একেবারে পণ্ড। বড় টাকার মাল রয়েছে গাড়িতে। রাত বিরেতে সাঁওতাল-পাড়ার পথঘাট আজকাল একেবারেই ভালো নয়। অভাবের তাড়নায় লোকগুলো ক্ষেপে রয়েছে হন্যে কুকুরের মতো। কায়দায় পেলে লুটেপুটে নেওয়া আদৌ অসম্ভব নয়।—

—এত গরমে একটুখানি ঠাণ্ডা পেলে তো বেঁচে যাই। কিন্তু নেশা হয়ে গেলে সব মাটি হয়ে যাবে রে। পথ ভারী খারাপ আজকাল।

—একটুখানি গলা ভিজিয়ে যাবি, নেশা হবে কেন।

—তা তা মন্দ নয় কথাটা।—সলোভে খেতু চাটল ঠোঁট দুটো।

মাটির ভাঁড়ে করে এল গাঁজিয়ে ওঠা তালের রস। আর কটুগন্ধী সেই অমৃতধারা অমৃত জিভে পড়তেই খেতু ভুলে গেল সমস্ত। রোহনপুরের ইস্টিশান মালবোঝাই গাড়ি,

(৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কেরায়া নায়ের মাঝি

(৮১ পৃষ্ঠার পর)

মানষের খাইনইয়া জাগাডা ভালো না অইলে বাঁচে কেমনতারা।

বলাবাহুল্য ওরা তা সত্বেও তার কাছ থেকে আর টাকা নেয়নি। বাঁধা রাখার পর থেকে সেই জমি চারকুড়া আক্কাহারই বর্গায় চষতো। কিন্তু সহসা একদিন কাদেরের কুৎসিত রসালাপের অন্তরালে লালসালোলুপ অধীরতার প্রকাশ দেখে জমিলা শিউরে উঠলো। ভেবেছিলো চুপ করেই থাকবে, কিন্তু একদিন অতিষ্ঠ হয়ে সোজাসুজি কাদেরের মুখের ওপরই বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিলো, তার ফল হলো এই যে, জমি চারকুড়ার বর্গা অধিকার অপমানিত কাদের কেড়ে নিলে। এহেন কাদের নানানভাবে তাদের শত্রু। তার হুমারে চেয়ে দু ভাতের মত ভাত খাওয়া জমিলার সারা অন্তর দুরন্ত ছিছিকারে ভরে তুললো—ভেবে পেলো না কী করবে।

খাওয়া দাওয়া ধোয়া মোছা সারা হতেই বিকেল প্রায় শুরু হয়ে আসে। দূরের অথৈ বিলের পানি তীক্ষ্ণভাবে ঝলমলায়; কাঁঠাল আর আমগাছের আড়ালে ঢাকা সূর্য, পাতার ফাঁকে ফাঁকে রোদ-ছায়ার চঞ্চলতা রচনা করে বিস্তৃত উঠোনে। গাছে গাছে পাখী-পাখালীর হিসাব নিকাশ, নীল আকাশের গায়ে সার বাঁধা বকের অভিযান আর গাঙ-শালিখের কাচিৎ সরবতা যেন কলরব করে জানায় সন্ধ্যার আগমনী। একটা সুপুরি মুখে দিয়ে জমিলা উঠানে নামলো।

ছেলেরা বাঁশ চেঁছে 'চাঁই' তৈরী করতে ব্যস্ত। ওগুলো 'বাগে' বিলে পেতে মাছ ধরাতে দু'ভাইয়ের উৎসাহের অন্ত নেই। আর ওস্তাদও খুব, মাছ বেচে কী দু'ভাই কম পয়সা এনে দিয়েছে তাদের হাতে। মাছ থাকলে ভাতের অভাব তাদের ঘটে খুব কম, আবার ভাত থাকলে মাছ দিয়ে খাবার ব্যতিক্রম নেই। তবু আগে যেমন হাঁড়ি হাঁড়ি ওরা কই মাগুর শোল-গজালে ঘর ভরে যেতো, এখন যে কেন আর সেদিন নেই বুঝতে পারে না জমিলা—স্বাচ্ছন্দ্যময় দিনগুলি যেন ধীর অবসানতায় প্রস্থানমান—নইলে ওর বাবা—ভাবনায় বাধা পড়ে জমিলার—এখনো কী আক্কাহারের রাগ পড়েনি?

হাঁটতে হাঁটতে খাল পাড়ে এসে দাঁড়ালো সে, ও পারের ঘাটে চোখে পড়লো সালেহাকে।

কয়েকদিন থেকে লক্ষ্য করছে জমিলা, সালেহা প্রায়ই একটু সেজেগুজে খালের উপর শুয়ে পড়া নারকেল গাছটায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বিকেলের দিকে। কেন দাঁড়ায়—জমিলার সঙ্গে বাক্যালাপের জন্য, কী অন্য কোনো উদ্দেশ্যে—সে নিয়ে জমিলা কোনোদিন মাথা ঘামায়নি, আজও ঘামালো না; কেবল সালেহার পান টুকটুকে ঠোঁট দু'টি দেখে তার খেয়াল হোলো—শুধু সুপুরি চিবিয়ে চিবিয়ে তার মুখটা কেমন খসখসে হয়ে গেছে; বললে—তুইতো পান খাইয়া ঠোঁট রাঙাইয়া লইছো, আমারে এট্টু দেতে পার?

সালেহা হেসে যতোটা সম্ভব পাড়ে এগিয়ে এলো; কোমর থেকে একটি সাজানো পানের পোঁটলা কলাপাতায় মুড়ে এপাড়ে ছুঁড়ে দিলো। মধ্যে খালের ব্যবধান মাত্র আট ন'হাত, সহজেই জমিলার কাছে এসে পৌঁছায়। পানটা মুখে দিয়ে সে শুধালো—আলাদারে কেমন আছে আইজ কাইল?

'আলাদার' অর্থাৎ হাওলাদার সালেহার যক্ষারুগ্ন স্বামী। তিন বছর ধরে মরণ-বাঁচার খেলনা।

ঠোঁট কুঁচকে যেন অনিচ্ছার সংগে জবাব দিলো সালেহা—হেই রহমই! কিন্তু তোর কি খবর? কাসেমের বাপে আয়নায়?

—না!

—বাপুরে বাপু! রাগওতো বাড়ার!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে খানিক পরে কী বলতে যাচ্ছিলো জমিলা, কিন্তু ওধার থেকে গান গাইতে গাইতে কে নৌকা নিয়ে আসছে দেখে সরে এলো; সালেহা যেন হঠাৎ চঞ্চল হয়ে মুখ ফেরাল সেদিকে।

'আমায় এতো রাতে কেন ডাক দিলি
প্রাণ কোকিলারে'···

সেই বাবরিওয়ালা সুনিধ ছেলেটির গলা। হয়তো রোজকার মতো বিলে পাতা চাইয়ের মাছ নিয়ে বাড়ি ফিরছে। আরো একটু অন্তরালে জমিলা সরে দাঁড়ালো। লোকটি যেতে যেতে গান থামিয়ে সালেহার দিকে তাকালো; কী যেন বলেও উঠছিলো সে—কিন্তু সালেহার ভীত হাত ইশারায় থেমে গেল; সালেহার হাতচোখের ইশারায় একবার জমিলাদের পাড়ের দিকে চেয়ে সে তাড়াতাড়ি নৌকা নিয়ে অদৃশ্য হোলো।

এই হঠাৎ ঘটা ব্যাপারটাতে জমিলা তো একেবারে থ। স্বামীকে ছেড়ে সালেহা শেষে ঐ ছেলেটাকে নিয়ে মজলো! দুর্বোধ ইতস্ততঃ এলো আবার খালপাড়ে গিয়ে দাঁড়াবে কিনা। এমন সময় ডাকলো সালেহাই—জমিলা গেছো নাকি?

—না। জমিলা এলো তবু বেরিয়ে। সালেহার গোপন ব্যাপারটা দেখে ফেলে যেন সে-ই অপরাধী হয়ে পড়েছে। চকিতে সালেহার দিকে একবার শুধু চোখ বুলিয়ে বললে—তয় এক্কির যাই, মাইয়াডা একলা ঘরে থুইয়া আইছি—হাঝও অইছে তুইও যা, খাড়া একলা ঘরে রইছে।

সালেহা তার দিকেই তাকালো, শেষে যেন কতকটা আশ্বস্ত তবু ক্ষীণ গলায় বললে—আমিও যাই—জমিলা স্বাভাবিকতার চেষ্টায় একটা গানের কলি ফুটিয়ে তুললো গলায় তাকে শুনিয়ে, যেন ও ব্যাপারটার কিছুই সে দেখেনি।

সাঁঝ উৎরে ক্রমে গভীর রাতে সারাদেশ নিথর হয়ে গেলো, জমিলা তখনো আক্কাহারের প্রতীক্ষায় নির্ঘুম চোখে জাগছে। খালপাড়ে বা বাইরে সামান্য একটু শব্দ হলেও সে চমকে উঠছে—ঐ বুঝি এলো, খালে মাছ বা শেয়াল পেরোবার সময় ঝুপ ঝুপ শব্দ করে ওঠে—চকিতে বিছানায় উঠে বসে সে; —দাওয়ায় নেমে সেদিকে কিছু দেখতেও চেষ্টা করে, কিন্তু কখনো সেদিককার নিশ্ছিদ্র অন্ধকার আর নীরবতা ভেংগে আক্কাহারের লম্বা শীর্ণ দেহাবয়ব বেরিয়ে আসছে দেখা যায় না। জমিলা স্বপ্নাচ্ছন্ন-ভাবে আবার এসে বিছানায় বসে। রাত বাড়ে, ক্ষীণ একটু চাঁদ আকাশের ওপাশ থেকে যাত্রা সুরু করে।

বিলের বুক-বহ একটা ঘুম পাড়ানো হাওয়া অনেক পত্র ঝরার শব্দ তুলে বাড়ীর ওপর দিয়ে বয়ে গেলো; পরিষ্কার শুনলো জমিলা খালপাড়ে কার নৌকো-শিকলের শব্দ। তাড়াতাড়ি উঠে সে দাওয়ায় নেমে দাঁড়ালো, ঘরে এককোঁটা রেড়ির তেলও নেই যে, কুপিটা জ্বালবে। একটু একটু আবছা আলোয় খালপাড়ে যাবার সংকীর্ণ পথটি দেখা গেলেও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও জমিলা সেপথে কাউকে দেখতে পেলো না। ভাবলো—হয়তো এখনো রাগ পড়েনি আক্কাহারের। তার ছেলে-মানুষী অভিমান তাকেই সাধাসাধি করে ভাঙাতে হবে, সেজন্যই সে নৌকো ছেড়ে উঠছে না হয়তো। দাওয়া থেকে নেমে সে খালপাড়ে এগিয়ে গেলো, কিন্তু কোথায় পাড়ে নৌকো। ভাঁটার টানে স্রোতমান খালে ওপরের গাছের পাতার ফাঁকে ঝিলি-মিলি চাঁদের ছায়া যতোটুকু স্থান স্পষ্ট করে তুলেছে—কোনো নৌকোর চিহ্ন নেই কোনোখানে। ভাঙা মনে আমগাছটায় ঠেস দিয়ে সে দাঁড়ালো। মাথাটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেছে তার, মনে হচ্ছে হয়তো বা সে ঘুরে পড়ে যাবে।

দূর বিলের ওধারে জংগলে কতোগুলি নিশাচর পাখী ডাকে, সারা বাতাসে অবাধে তাদের কলরব ছড়ায়, সালেহাদের বাড়ীর বাদাম গাছে বাদুড় ডানা ঝটপটায়, আশে-পাশেই কোথায় কোন ঝোপেঝাড়ে ডাহুক ডাকে। কেমন একটা ব্যাকুল শূন্যতায় জমিলা অস্থির হয়ে উঠলো। হাওয়ায় মাথাটা জুড়িয়ে নেবার জন্য আমগাছটার গোড়ায় শিকড়ের ওপর সে বসে পড়লো।

হঠাৎ তার চোখে পড়লো সালেহাদের ঘাটে একখানা ডিংগি নৌকো বাঁধা। তাহলে নৌকোর শব্দ সে ভুল শোনেনি; কিন্তু পরি-জনহীন সালেহাদের বাড়ী এতো এলো কে? প্রশ্নটা ক্রমেই আবার তা নিচ্ছে যাচ্ছিল—এমন সময় চাঁদের আলোয় দেখলো, নারকেল গাছটায় হেলান দিয়ে দু'টি ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে।

চোর মনে করে প্রথমটা সে একটু ভয় পেলেও ভেবে দেখলো সালেহারা এমন সম্পদ-শালী নয় যে, তাদের বাড়ী দু'দুটো লোক চুরি করতে আসবে, কিন্তু এরই মধ্যে তার মনে আর একটি কথা চমক দিয়ে গেল যে,

চোরই যদি হবে তাহ'লে দু'জনে আলিংগনাবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে কেন; সালেহা আর সেই মুনিষ ছেলেটা নয়তো ওরা? কী রকম একটা অদ্ভুত উত্তেজনার সাথে জমিলা কান খাড়া করে তাদের ফিসফিসানো কথাগুলো ধরতে চাইলো, কিন্তু পারলো না। সংকুচন অথচ কৌতূহলে সে উদগ্রীব চোখ-কান মেলে ভালো করে দেখবার চেষ্টা করলো; একটু পরে ওরা অন্ধকারে কোথায় যে মিশে গেল কোন দিকে—তা জানবার চেষ্টা তার ব্যর্থ হল। রাতের অন্ধকারে তার কাছে অর্ধস্ফুট হয়ে রইলো কী এক রহস্য!

বিলের ওপারের জংগলে হুক্কাহুয়া করে উঠলো একপাল শেয়াল; শর শর করে নিচে কেয়াবনের ঝোপে কী একটা চলে গেলো—অনেকক্ষন পরে নিঃশব্দে ঘরে চলে এলো জমিলা। দুশ্চিন্তা আর নির্ঘুম নির্জীবতায় মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠেছে। হতাশ মনে নানা ভাবনার মধ্যে বিছানায় শুয়ে পড়লো বটে; কিন্তু বাকী রাতটুকুর মধ্যে আর ঘুম এলো না।

ভোরে বড়ো ছেলেকে পাঠিয়ে দিলো নলছিটি হাটে; সেখানকার গঞ্জের ঘাটে আজাহার যদি যেয়ে থাকে! নিজে নির্জীব হয়ে শুয়ে রইলো দুপুর পর্যন্ত। দেহে এমন আলস্য ধরে গেছে যে, উঠে গুয়াবা শাক চাল দু'টো রাঁধবার সাধ্যও তার নেই।

শেষে ছোট ছেলের খিদের কাঁদাকাটিতে উঠে ভাত রাঁধলো; ছেলের গামছা পরে নিজের কাপড়খানা ধুয়ে শুকোতে দিয়ে আবার ঘরে উঠেছে, এমন সময় বড়ো ছেলে খবর নিয়ে ফিরে এলো যে, গঞ্জের ঘাটে আজাহারের দেখা মেলেনি, ঘাটমাঝিও তার কোনো খবর জানে না। জমিলা সহজভাবেই কথাটা শুনলো, তারপর তাকে স্নান করতে বলে ভাত বাড়তে বসে গেলো।

দুপুর গড়িয়ে যায় যায়, অথচ তখনো আজাহারের দেখা নেই। এতোও রাগ করে মানুষ! খানিক আগে যে জমিলা উদ্বেগাকুল মনে ছেলের প্রতীক্ষা করেছে—তারও ব্যাকুলতা ধীরে ধীরে খানিকটা বিরক্তির রূপ নিলো। কিন্তু মন বলছিলো আজাহার আজ দিনের মধ্যে ফিরে আসবেই।

ভাত খেয়ে কাপড়খানা পরে সে আবার খালপাড়ে এসে দাঁড়ালো ছায়া শীতল একটা গাব গাছের তলায়। সালেহাদের ঘাটের দিকে তাকাতেই গতো রাতের ঘটনাটি স্বপ্নের মতো মনে পড়ে গেলো। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘাটে এলো সালেহা। জমিলা তাকে দেখেই বলে উঠলো—হোন সালেহা, কাইল রাইতে তোগো ঘাটে—সালেহা শাদা হয়ে চকিত চোখে তার দিকে তাকাতেই জমিলা তাড়াতাড়ি নিজেকে বদলে নিলো—কাইল রাইতে তোগো ঘাটে না কোনহানে শব্দ শুনইয়া ভাবলাম, বুঝি উনি আইছে কিন্তু কোনে কেডা! আইজ তাইনও হের দেহা নাই।

সালেহা জবাব দিলো একটু পরে—আয়নায় বুঝি?

—না।

হঠাৎ হেসে সালেহা বললো—তুইও যেমন অতো ভাবোস ক্যা? পোলাপান তো না যে হারাইয়া যাইবো মন মাও আইবেই হানে।

—ব্যারামইয়া শরীলে গেছে বলইয়াই তো ভাবনা, নইলে আর ভয় আছিল কী!

ঘাটের কাছ থেকে কয়েকটা পানিকচু তুলে, গোড়াগুলো খালে নেড়ে ধুয়ে সালেহা চলে যেতে যেতে বললে—যাই ভাই, রান্ধোন চড়াইয়া আইছি।

সন্দেহ সত্য, প্রমাণ পেয়ে জমিলা বিস্মিত মনে অনেক কথা ভাবলো। সহসা একসময় জমিলার সারা গা শির শির করে কাঁটা দিয়ে উঠলো শীতে; একটা দুর্নিরিক্ষ্য ঝাঁকুনি যেন সমস্ত দেহটাকে খিঁচড়ে তাকে মাটিতে বসে পড়তে বাধ্য করলো। স্পষ্ট বুঝতে পারলো জমিলা তার গায়ে প্রবল জ্বর এসেছে। থরথর করে সে কাঁপছে; আঁচলটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে উঠে দাঁড়াবার সাধ্যও যেনো নেই। হাতে ভর দিয়ে কোনোমতে উঠবার মুখে আবার সে তাকালো খালের প্রান্তে—এবার ঘরে যেয়ে বিছানায় তাকে শুয়ে পড়তেই হবে। হায় খোদা! আজাহারকে তুমি এনে দাও, জমিলা তার পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইবে! আর কোনোদিনই তার অভিমানী মনে ব্যথা দিয়ে জমিলা কোনো কটু বাক্য করবে না।

কিন্তু সে পরিচিত নৌকোখানা বিপরীত দিক থেকে কখন যে এতো কাছে এসে পড়েছে, জমিলা সহসা তা দেখেনি। দেখতে পেয়েই তার শরীরে বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো উল্লাস ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু ও কী? তাদের নৌকো করিম বাইছে কেন? আর নৌকোর মাঝে শোয়াই বা রয়েছে কে? আজাহারের অসুখ কী তাহলে খুবই বেড়েছে? তবু, অমন বিদঘুটেভাবেই বা কেন সে শোয়ানো রয়েছে? করিম মাঝি চোখ ফিরিয়ে লুকোতে চাইছে কী?

করিম মাঝি কোনো প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আগে নৌকাটা বাঁধলো, পরে নামানো মুখে বললে—আর কী জিগাও ভাবীছাব, ম্যাভাই আর নাই।

জমিলার আর্তনাদে ওবাড়ীর সালেহাও অপর পাড়ে দৌড়ে এলো—ও মাঝি কী, কী অইছে?

মাঝি চোখ মুছলো—আজাহার আউ গাইছে। শ্যামতীর হাটখোলা যাইয়া দেহি আধা সাজানিয়া কল্কি হাতে নায়ের মধ্যে মরইয়া পড়ইয়া রইছে!

জমিলা হঠাৎ চীৎকার করে উঠে আবার নিথর হয়ে পড়েছিলো; অবশভাবে তাকে আমগাছটার সংগে হেলে পড়তে দেখে মাঝি আহা হা করে তাড়াতাড়ি পাড়ে লাফিয়ে পড়লো। ওদিকে ছোট ছেলে কাসেম দূর থেকে বাবাজানের নৌকো আসতে দেখে ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকেছিলো, ওষুধটা দিয়ে তার বাবাকে চমকে খুশী করবে বলে।

* * *

কবর দেওয়ার পরে করিম মাঝি কার কী প্রশ্নের জবাবে বলছিলো—শ্যামতীর হাটখোলা ঘাটমাঝিকে আজাহারের কথা জিগাইলাম—হে কইলে—হ, কাইলই এই খান দিয়া একটা কেরায়া লইয়া পাওতা গেছেলে, আইজ ফেরছে। আজ্ঞে হেরে দেকলাম, চাউল ডাইল কেমতে লাগছে। হে বোলে জিগাইছেলে এতো বেরামিয়া দেহে বাইর অইছো ক্যা? আজাহার কইছে—বাড়ী থাইকা হরমু কী, না খাইয়া মরমু? পোলাডা খিদার চোডে আরেক বাড়ীর পশা খাইয়া মাইর খায়, বইয়া বইয়া কেমন তারা এ সব দেখতে কয়েন!—

করিমের এ কথাটুক না শুনলে আজাহারের প্রয়ানের কারণ জমিলার কাছে প্রচ্ছন্ন হয়েই থাকতো।

* * *

সমস্ত বাড়ীটা নিঝুম হয়ে পড়েছে, যেন প্রাণ নেই কোথাও। অথচ ওরা ঐ দাওয়ায় শুয়ে রয়েছে দুমুঠো খাও দাও—দেখবে মরাতাও আবার বেঁচে উঠেছে—হাসি-গল্প-গানেরা সব পুরানো দিনগুলি নিজেদের উজ্জ্বলা নিয়ে আবার ফিরে এসেছে...মৃত আজাহার সমস্ত রাগ ভুলে কাফন সরিয়ে উঠে বসেছে।

ওদের বাঁচা মরা—জীবন—সবই তো ওই দুই মুঠো খাওয়া! মরা এখন নিয়ে দুঃখ কারো! অথচ...!

শিল্পী : নীরদ রায়

শ্যামবাজারের জয়

(৮৩ পৃষ্ঠার পর)

পৌছল। বালিগঞ্জের ক্যাপ্টেন শিশির জালদার বলে উঠল, তাই নাকি? আচ্ছা, আমরাও দেখে নেব এবারে। আমরা চোরের উপর বাটপাড়ি করব।

উদ্দেশ্যটা মনোমত হ'লেও বালিগঞ্জের মুখে শ্যামবাজারী ভাষাটা সহকারী ক্যাপ্টেন তরুণকুমারের পছন্দ হ'ল না। সে কথাটা সংশোধন করে বলল...আমরা ডবল্‌ ক্রস করব। শ্যামবাজারকে ডোবাতেই হবে।

এবং কিভাবে ডোবাতে হবে তার পরামর্শ চলতে লাগল।

বালিগঞ্জ যে শ্যামবাজারের প্ল্যান সব জেনে ফেলেছে সে কথা শ্যামবাজারের কানে পৌছতে দেরী হ'ল না, এমন কি তারা পাল্টা যে সব প্ল্যান করবে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর এসে গেল ক্ষিতীশ ভটের কাছে। শ্যামবাজারের গুপ্তচর সব নিজে কানে শুনে এসেছে। জানা গেছে বালিগঞ্জের দল দু'শো জয়ঢাক আর কুড়িখানা নৌকো বায়না করতে যাচ্ছে। এই কুড়িখানা নৌকো সলিলের পাশে থেকে তাকে উৎসাহ দেবে, আর তার শব্দে শ্যামবাজারের সকল কণ্ঠধ্বনিকে তারা ডুবিয়ে দেবে।

ক্ষিতীশ ভট প্রমাদ গণল। জয়ঢাকের বাদ্যে মানুষের গলা সত্যিই যে ডুবে যাবে। এ অবস্থায় সাঁতারের জয় পরাজয়ের কোনো মানে হয়?

কেন?...শ্যামবাজারের সহকারী ক্যাপ্টেন নীলু ঘোষ নির্বোধের মতো প্রশ্ন করল।

ক্ষিতীশ ভট বিরক্তভাবে বলল, এটুকু বুঝলে না? একদিকে মানুষের চীৎকার আর একদিকে জয়ঢাকের শব্দ...দর্শকেরা জয়ঢাককেই বেশী সম্মান দেবে। তাছাড়া ওতে অনিলের মন দমে যাবে।

নীলু ঘোষ কথাটি বুঝতে পেরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, তাইতো!

ক্ষিতীশ ভট জিজ্ঞাসা করল, হাতে আছে কত?

...শ'দুই টাকা হবে।

...ওতে কিছু হবে না।

...তাহ'লে উপায়?

...ভাবছি। ব'লে ক্ষিতীশ ভট দু'হাতের উপর মাথার ভার ন্যস্ত করে মিনিট তিনেক বসে ভাবল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বলল, আমি একটু ঘুরে আসছি।

মারোয়াড়ী মহলে এদের সাঁতার নিয়ে বছরে বছরে বাজি খেলা হয় বহু লক্ষ টাকার। ক্ষিতীশ ভট গেল এক পরিচিত মারোয়াড়ী ধনীর কাছে। তার প্রস্তাবটা হ'ল:

...হাজার পাঁচেক টাকা চাই।

...কেন?

...ভিক্ষা চাই না, টাকায় টাকা উঠে আসবে, টাকা দশগুণ ফিরে আসবে।

...কিমন ক'রে হোবে সমঝিয়ে দিন।

ক্ষিতীশ ভট তার প্ল্যানটা সব খুলে বলল। যে দু'শো জয়ঢাক বালিগঞ্জ বায়না করেছে তাদের আরও বেশী টাকা দিয়ে শ্যামবাজারের দিকে টেনে আনতে হবে। তাছাড়া কলকাতা সহরে আর যত জয়ঢাক আছে তাদেরও বায়না করতে হবে।

...তাহ'লেই যে শ্যামবাজার জিতবে তার গ্যারাণ্টী কোন্‌ দিবে?

...স্রেফ উৎসাহে শ্যামবাজার জিতে যাবে। আর এই উৎসাহের অভাবে বালিগঞ্জ হারবে। তোমাদের খেলায় আর 'চান্‌স'-এর প্রশ্ন থাকবে না—জিৎ তোমাদের নিশ্চিত হবে।

মারোয়াড়ী বুদ্ধিমান। সে বলল, না বাবু, ও হচ্ছে তোমাদের হার-জিত, আমাদের হার-জিত তো ওভাবে হোবে না। তোমরা ভাবছ জয়ঢাকে তোমরা জিতবে, বালিগঞ্জ জয়ঢাক বাজাতে পারবে না, জরুর হোবে। কিন্তু যারা জলে ভাসবে তারা ঐ আওয়াজে ফুর্তি পাবে না।

...কিন্তু বালিগঞ্জ তো জয়ঢাক বাজাবেই।

...ওরা নিজেদের লোকসান করবে, তোমাদেরও লোকসান হোবে।

ক্ষিতীশ ভট নিরাশ হয়ে ফিরে এল। মারোয়াড়ী ঘুঘু ব্যবসায়ী, ধরেছে ঠিক। সাঁতারুদের কি অবস্থা হবে তা এরা কেউ ভাবে নি। এরা কেবল উৎসাহী আর পৃষ্ঠপোষকদের জয়-পরাজয়ের কথাটাই ভাবছে।......

পরক্ষণেই ক্ষিতীশ ভটের মনে হ'ল, কিন্তু সেটাও তো কম কথা নয়। শহরের লাখ লাখ লোকের চোখের সম্মুখে বালিগঞ্জ কেবল জয়ঢাক বাজিয়ে জিতে যাবে, শ্যামবাজারের পক্ষে সে কি কম অপমান?

ক্ষিতীশ ভট দমল না। তার মাথায় আর এক কৌশলের উদয় হয়েছে। সে ফিরে এসে নিজেদের মধ্যে অতিরিক্ত চাঁদা তুলল হাজারখানেক টাকা। তারপর শ্যামবাজারের ড্রামাটিক ক্লাবের এক পরম উৎসাহী অভিনেতাকে স্মরণ করল। বয়স তার কুড়ি বাইশ, কিন্তু যুদ্ধের বাজারেও বেকার। থিয়েটারে অভিনয় করার সখ তার বহু দিনের। সৈন্য করবে মিথ্যা ভয়ে যুদ্ধের চাকরিতে ঢোকেনি এবং সৈন্যের ভূমিকা অভিনয় করতে হবে ভয়ে ব্যবসাদারী থিয়েটারে ঢোকেনি। সৌখীন থিয়েটার পার্টিতে তার কিছু মর্যাদা আছে, কিন্তু সে নায়কের ভূমিকা চায়। পূজোয় শাজাহান হবে তাদের ক্লাবে, এবারে সে শাজাহান হবে এই তার ইচ্ছা। এ বিষয়ে ক্ষিতীশ ভটের কিছু হাত আছে। সুতরাং ক্ষিতীশ ভটের আদেশ সে পরম আনন্দের সঙ্গে পালন করতে প্রস্তুত।

তারই শিক্ষা মতো সে সফল অভিনয় করল গিয়ে মাঝিদের আড্ডায়। তাদের কাছে বলল, সে বালিগঞ্জ থেকে আসছে। সে বলতে এসেছে জয়ঢাক নিয়ে ঢাকীরা যখন নৌকোয় উঠবে তখন প্রত্যেক নৌকোয় একখানা ক'রে লাল নিশান ওড়াতে হবে। সেজন্যে প্রত্যেকে এক টাকা ক'রে অতিরিক্ত পাবে। সেই টাকাই সে অগ্রিম দিতে এসেছে। নিশান এখনও সব তৈরি হয় নি, নৌকো ছাড়ার সময় দেওয়া হবে।

এতে অভিনয়-নৈপুণ্যের বিশেষ কিছু দরকার ছিল না, একটা ক'রে টাকাই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু মিথ্যা কথাটি অভিনয়ের পর্যায়ে পড়ে ব'লে অভিনেতাকেই এ কাজটি করতে হ'ল।

ক্ষিতীশ ভট প্রয়োজন মতো লাল নিশান তৈরি ক'রে ফেলল। তাদের দলের প্রত্যেকের হাতেও একখানা ক'রে লাল নিশান থাকবে, সবগুলো নৌকোতেও থাকবে, এতে দর্শকেরা ভাববে জয়ঢাকও শ্যামবাজারের। বালিগঞ্জকে অন্তত একটা বিষয়েও জব্দ করা হবে এইটেই আপাতত তাদের লাভ মনে হ'ল।

প্রতিযোগিতার দিন এসে পড়েছে। গঙ্গার ধারে লক্ষ লক্ষ লোক দাঁড়িয়ে গেছে। ওপার থেকে যারা এ পারে আসতে পারেনি তারা ওপারেই দাঁড়িয়ে গেছে—ভাগ্যবানেরা অপেরা গ্লাস চোখে লাগিয়েছে। স্ত্রী-পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ শহর এবং মফঃস্বলের বুক খালি ক'রে এসে দাঁড়িয়েছে নদীর ধারে। চিৎপুরের খাল থেকে উজান দিকে পাঁচ ছ' মাইলের মধ্যে তিল ধারণের জায়গা নেই। দশ পনেরো হাত দূরে দূরে খাবারের দোকান, পান-সিগারেটের দোকান ব'সে গেছে।

সাঁতারের সময় ঘনিয়ে আসছে। দুই ডাক্তার দুই সাঁতারুর দেহ পরীক্ষা ক'রে বললেন, কোয়াইট ফিট্‌।

বেলা সাতটার মধ্যে দু'পক্ষে প্রায় পাঁচ সের চর্বি ফুরিয়ে গেল। সলিল এবং অনিল যখন চর্বিলিপ্তদেহে জলের ধারে এসে দাঁড়াল তখন মনে হ'ল তারা যেন মাটির মানুষ থেকে দু'জন দু'টি জলের জন্তুতে পরিণত হয়েছে।

আটটা বাজতে আর মিনিট তিনেক দেরি, দুজনে জলে গিয়ে নামল। বাঁশী বাজলেই সাঁতার আরম্ভ হবে। সবাই সাঁতারুদের নিয়ে ব্যস্ত, কিন্তু ক্ষিতীশ ভট ব্যস্ত আছে অন্য কাজে। তার ইঙ্গিতে বালিগঞ্জের অলক্ষ্যে, তাদের জয়ঢাকের নৌকোগুলোয় লাল নিশান বিলি হয়ে গেল।

আকাশে এতক্ষণ বড় এক খণ্ড কালো মেঘ ছিল সূর্যকে ঢেকে, সে মেঘও ঠিক এই সময় সরে গেল, সূর্যের হাসি এসে ভেঙে পড়ল দুই সাঁতারুর উপর, জলের ঢেউগুলো ঝলমল ক'রে উঠল। রৌদ্রালোকে দর্শকের মুখ আরও উজ্জ্বল হ'ল, এমনি সময় নৌকো থেকে দ্রুততালে জয়ঢাক বেজে উঠল। সাঁতারের বাঁশীও বাজল একই সঙ্গে। দর্শকদের হর্ষধ্বনি তরঙ্গায়িত হ'য়ে ছুটে চলল চিৎপুর খালের দিকে।

বালিগঞ্জের শিশিরকুমার এবং শ্যামবাজারের ক্ষিতীশ ভট সদলবলে পৃথক নৌকোয় সাঁতারুদের সঙ্গে রওনা হ'ল।

বালিগঞ্জের নৌকো থেকে শিশিরকুমার হঠাৎ লক্ষ্য করল জয়ঢাকের নৌকোগুলোয় লাল নিশান উড়ছে।

এ কি ক'রে সম্ভব হ'ল? লাল নিশান তো শ্যামবাজারের চিহ্ন! সে চেঁচিয়ে উঠল, —কে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? নামাও, নামাও নৌকো থেকে লাল নিশান, নামাও।

(৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

খড়্গা

(৮৮ পৃষ্ঠার পর)

রাত্রির অন্ধকারে শংকা-সংকুল সাঁওতালপাড়া—কোনো কিছুই আর মনে রইল না। ভাঁড়ের পর ভাঁড় উজাড় করে নেশায় আর ক্লান্তিতে খেতুর সর্বাঙ্গ ঝিমিয়ে এল অতি গভীর অবসাদে। কী ঠাণ্ডা ছায়া পড়েছে নীলাইয়ের দাওয়ায়—আর কী মিষ্টি হাওয়া দিচ্ছে মহুয়ার কচি কোমল পাতাগুলো।...

তারপরে বেলা গড়িয়ে এল—সূর্য নামল পশ্চিমের দিগন্তে। মহুয়া পাতার ফাঁক দিয়ে বিকেলের রাঙা আলো বাঁকা হয়ে খেতুর মুখের ওপর এসে পড়তেই যেন আচমকা ভেঙে গেল ঘুমটা। ধড়মড় করে উঠে বসল খেতু, তাইতো বেলা একেবারে নেমে পড়েছে যে। রাত দুপুরের আগে আর ইষ্টিশানে পৌঁছোনো চলবে না।

সামনে বসে নির্বিকার মুখে বিড়ি খাচ্ছে নীলাই।

—ইস, কী ঘুমটাই ঘুমোলি মিতা। বেলা একেবারে কাবার।

হাত পা কাঁপছে, মাথাটার ভার যেন বইতে পারা যায় না। হঠাৎ নীলাইয়ের ওপর একটা বিজাতীয় ক্রোধে খেতুর মনটা বিষাক্ত হয়ে উঠল।

—তুই তো আমাকে এই ফাঁসাদে ফেললি। কতদূরে যেতে হবে এই রাত্তিরে—ভাখ তো। ও কি!

ভয়ে বিস্ময়ে খেতুর চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল আর পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠল নীলাইয়ের মুখ: বলদ দুটো অমন করছে কেন?

দ্রুত পায়ে খেতু ছুটে এলো বলদের কাছে। একটা তখন হাত পা ছড়িয়ে নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে, দুটো চোখের ওপর নেমেছে সাদা পর্দা, সারা গায়ে ভন্ ভন্ করে উড়ছে মাছি। আর একটা অন্তিম চেষ্টায় আকাশের দিকে মুখ তুলে নিশ্বাস টানছে, জিভ বেরিয়ে এসেছে, কালো দীর্ঘায়ত চোখের কোণায় টলমল করছে অশ্রুর বিন্দু।

—আমার বলদ মরে গেল!—আর্ত কণ্ঠে চীৎকার করে খেতু আছড়ে পড়ল বলদের গায়ে। চর্মসার প্রকাণ্ড পাঁজরার হাড়গুলো মট মট করে উঠল বুকের চাপে।

নীলাই নিরাসক্ত গলায় বললে, যে গরম, সর্দি-গর্মি—।

—সর্দি-গর্মি!— ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো খেতু বিদ্যুৎ বেগে দাঁড়ালো সোজা হয়ে। সামনে একটা মাটির পাত্রে ভুষি মেশানো হলুদ রঙের খানিকটা দুর্গন্ধ জল। এই জল কে খেতে দিয়েছিল বলদকে, কে দিয়েছিল!

—সর্দি-গর্মি! শা—লা, চামড়ার লোভে আমার গোরুকে বিষ খাইয়েছিস, বিষ খাইয়েছিস তুই। শালা গো হত্যাকারী, আমি খুন করব, খুন করে ফেলব তোকে।—খেতুর গলা চিরে আকাশের বাজ গর্জে উঠল: আজ যদি তোর রক্ত না দেখি তা হলে দুইমালীর বাচ্চা নই আমি।

বেলা গড়িয়ে এল, সন্ধ্যার ঘন ছায়া নিঃশব্দে নামল মাটিতে। কালো রাত্রির ভেতরে গা ঢাকা দিয়ে হরিলাল খেতুর দরজায় এসে দাঁড়াল। হরিলাল জানে তোমরা তাকে ফেরাতে পারবে না, নিজেকে বাঁচাতে পারবে না তার কঠিন মুষ্টির নিষ্ঠুর নিষ্পেষণ থেকে। তার হাতে যে খড়্গ উদ্যত হয়ে আছে, খেতুকে বধ করতে তার একটিমাত্র আঘাতই যথেষ্ট।

অন্ধকারের বুক বিদীর্ণ করে বহু দূরে উত্তরের আকাশটা বিচিত্র রক্তিমচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যেন ছড়িয়ে পড়ল সদ্যোনিহত একটা মানুষের টাটকা খানিকটা তাজা রক্ত। কোথাও আগুন লেগেছে নিশ্চয়!

শ্যামবাজারের জয়

(৯০ পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু দশ লক্ষ লোকের হর্ষধ্বনি আর জয়ঢাকের বাজনায় সে চীৎকার কারো কানেই গেল না। শিশিরকুমার বৃথাই বলতে লাগল, এ নিশ্চয় শ্যামবাজারের জোচ্চুরি। আমরা এ কিছুতেই মানব না।

ক্ষিতীশ ভট্ট তার নৌকো থেকে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, লাল নিশান দেখে ক্ষেপে উঠল কে? এ্যা? কে লাল কাপড় দেখে শিং বাঁকায়? শুনে আর সবাই হো হো ক'রে হেসে উঠল।

এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটে গেল। লক্ষ লক্ষ নরনারী নদীর পাড় থেকে হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠল—ডুবল ডুবল।

এমন প্রবল চীৎকারে হঠাৎ বাজনা থেমে গেল, হঠাৎ যেন একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটে গেল। 'ডুবল' 'ডুবল' চীৎকারের ঢেউ জনতার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হ'ল। যারা দূরে ছিল তারা কিছুই বুঝতে পারল না। শ্যামবাজারের উৎসাহীরা বলতে লাগল, নিশ্চয় বালিগঞ্জ ডুবছে, বালিগঞ্জের লোকেরা বলতে লাগল, ডুবছে শ্যামবাজার, আমরা আগেই জানি ওরা ডুববে।

তারপরেই আবার চীৎকারের আর একটা ঢেউ এসে সবার কানে কানে ধাক্কা মেরে বলে গেল, দুজনেই ডুবছে।

একটা অসম্ভাবিত সর্বনাশ ঘটে গেল দশ মিনিটের মধ্যে। আকাশ থেকে যেন বজ্রাঘাত হ'ল।

সলিল আর অনিল পাশাপাশি এগিয়ে যাচ্ছিল। প্রথম পাঁচ মিনিট তারা বেশ ভালভাবেই চলছিল, যদিও অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারে তাদের গতি ছিল মন্থর। দর্শকেরা মনে করেছিল প্রথমেই ওরা ক্লান্ত হ'তে চায় না, সেই জন্যেই ধীরে ধীরে যাচ্ছে। তারপর দেখা গেল সলিলের মাথাটা জেগে আছে, দেহটা জলের মধ্যে কয়েক ইঞ্চি ডুবে গেছে। তার কয়েক সেকেণ্ড পরে অনিলেরও পিঠ আর দেখা গেল না। তারপর ধীরে ধীরে ওদের মাথাও ডুবতে লাগল। তখন সবাই ভাবল ওরা প্রতিযোগিতা ক'রে দু'জনেই ডুব সাঁতার কাটছে। কিন্তু এক মিনিট, দু'মিনিট, তিন মিনিট কেটে গেল তবু ওরা উঠল না।

দর্শকদের মধ্যে যারা 'রেস' খেলায় অভ্যস্ত তাদের কেউ কেউ প্রশ্ন করতে লাগল এবারে কি ওদের কিছু কিছু 'হ্যাণ্ডিক্যাপ' দেওয়া হয়েছে? কিন্তু তার উত্তর কেউ দিতে পারল না।

উৎসাহীদের মুখে আশঙ্কার ছায়া গাঢ় হ'য়ে এল, তারা উন্মাদের মতো পরস্পরকে প্রশ্ন করতে লাগল, কি হ'ল? এরা উঠছে না কেন? তারপর পাঁচ মিনিটের মধ্যেও যখন কারো মাথা দেখা গেল না তখন অনেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তারা ডুবে ডুবে অনুসন্ধান করতে লাগল কিন্তু তাদের কোনো পাত্তাই পাওয়া গেল না।

আকাশের সূর্য আবার কালো মেঘের আড়ালে অস্ত হ'ল, চারিদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এল, প্রবল বৃষ্টি পড়তে লাগল। সবারই মুখে উৎকণ্ঠা, সবারই মুখে প্রশ্ন, কি হ'ল—কি হ'ল?

গঙ্গার স্রোত তরতর বয়ে যাচ্ছে—তার অন্তরে সহস্র রকম রহস্য, সে রহস্য কে উদ্ঘাটন করবে?

সলিল এবং অনিল দু'জনেরই আত্মীয়েরা নদীর তীরে হায় হায় করতে লাগল। পুলিশ দেখা দিল ঘটনাস্থলে। তারপর বহু চেষ্টা ক'রে ডুবুরীর সাহায্যে দু'টি অজ্ঞান দেহকে টেনে তোলা হ'ল জল থেকে, ডাক্তাররা বহু চেষ্টা করলেন তাদের বাঁচাতে, কিন্তু বাঁচানো গেল না।

দু'পক্ষের ক্যাপটেন এবং তাদের প্রধান অনুচরদের গ্রেফতার করা হ'ল। সবারই মনে সন্দেহ জাগল ঘটনা সহজ নয়, নিশ্চয় বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা বিরুদ্ধপক্ষীয়ের সাঁতারুকে বিষ খাইয়েছে।

আত্মীয়-স্বজনের অনিচ্ছাসত্ত্বেও দেহ দু'টি পুলিশের হেপাজতে গেল পোষ্ট-মর্টেম পরীক্ষার জন্যে এবং তার ফল যা প্রকাশ হ'ল তা ইস্কুলের খবরের চেয়েও উত্তেজক।

সে দিন উৎকণ্ঠিত উৎকর্ণ জনসাধারণ এবং দেশী ও বিদেশী খবরের কাগজের রিপোর্টারগণ দীর্ঘকাল ধৈর্যের সঙ্গে মর্গে অপেক্ষা ক'রে শুনতে পেল:

—দুজনেরই পেটে সের দশেক ক'রে পাথর পাওয়া গেছে।

সবাই সবিস্ময়ে উচ্চারণ করল, পাথর!

—হ্যাঁ পাথর। এরা ১৯৪৪ সালের এই ক'মাসে যত ভাত খেয়েছে তার সঙ্গে প্রতিদিন অন্তত আড়াই তোলা ক'রে কাঁকর খেয়েছে। দশ সের আন্দাজ হ্যাণ্ডিক্যাপ নিয়ে কোনো সাঁতারুই মিনিট পাঁচেকের বেশী ভেসে থাকতে পারে না, এরা তো তবু আরও দু-এক মিনিট বেশী ভেসেছে!

ক্ষিতীশ ভট্ট হাজত থেকে বেরিয়ে এসেই প্রমাণ করল শ্যামবাজার জিতেছে, কেননা সলিলের মাথা ডুবে যাওয়ার পরেও অনিলের মাথা আরও তিন সেকেণ্ড বেশী ভেসেছিল।
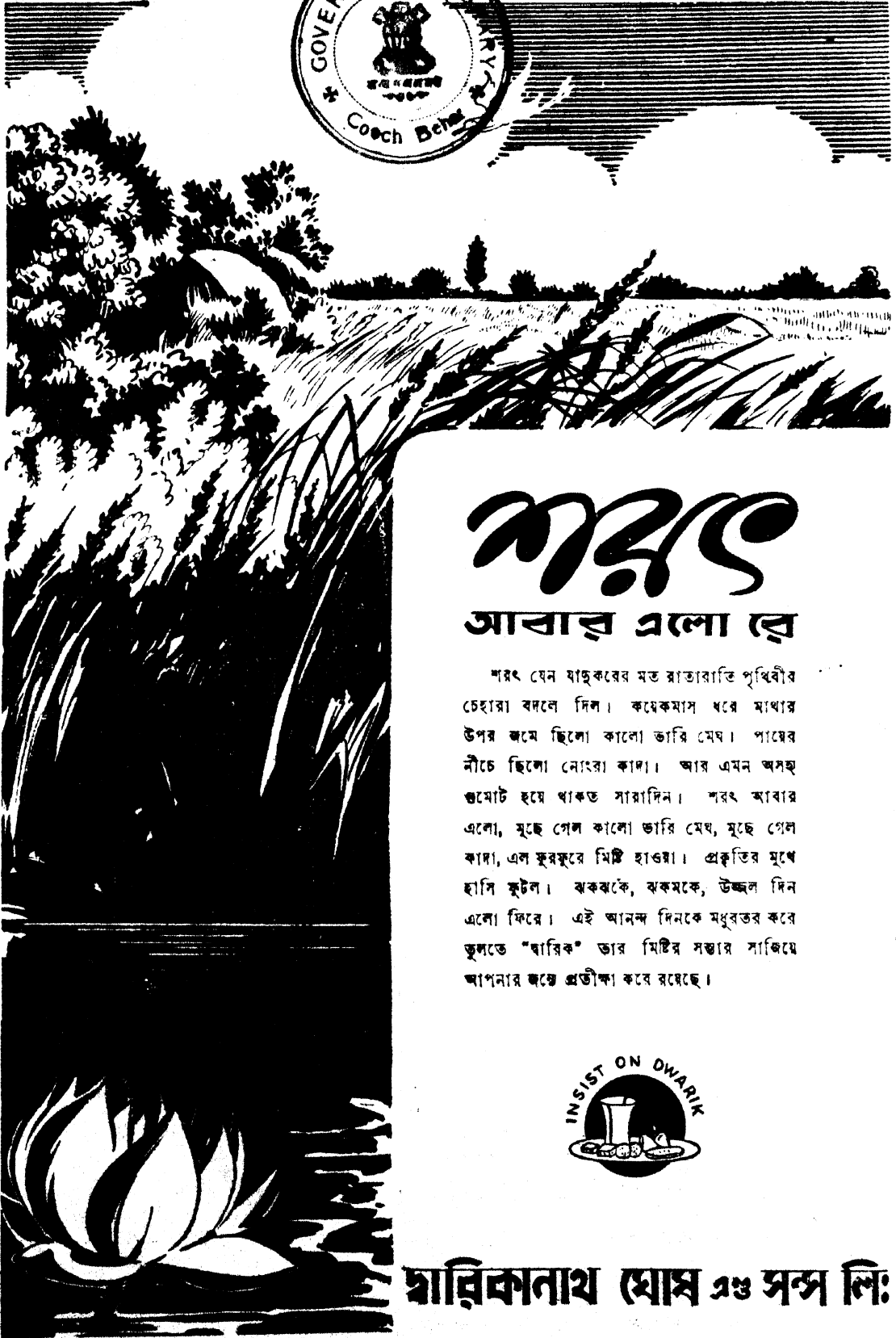
GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar
শরৎ
আবার এলো রে
শরৎ যেন যাদুকরের মত রাতারাতি পৃথিবীর চেহারা বদলে দিল। কয়েকমাস ধরে মাথার উপর জমে ছিলো কালো ভারি মেঘ। পায়ের নীচে ছিলো নোংরা কাদা। আর এমন অসহ্য গুমোট হয়ে থাকত সারাদিন। শরৎ আবার এলো, মুছে গেল কালো ভারি মেঘ, মুছে গেল কাদা, এল ফুরফুরে মিষ্টি হাওয়া। প্রকৃতির মুখে হাসি ফুটল। ঝকঝকে, ঝকমকে, উজ্জ্বল দিন এলো ফিরে। এই আনন্দ দিনকে মধুরতর করে তুলতে "দ্বারিক" তার মিষ্টির সম্ভার সাজিয়ে আপনার জন্যে প্রতীক্ষা করে রয়েছে।
INSIST ON DWARIK
দ্বারিকানাথ ঘোষ এণ্ড সন্স লিঃ

নির্জন মুহূর্তের প্রার্থনা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

(১)

নবরূপে লভিলাম।
সহরসীমান্ত ছেড়ে
হে আমার দেশ,
এখানে তোমাকে ফের নবরূপে আজ লভিলাম।
দূরে নদী ; ঝরায় সন্ধ্যার সূর্য্য যেন অবিরাম
স্থির জলে সোনালী আবীর ;
গরু লয়ে ঘরে ফিরে
ঘর্ম্মাক্ত কৃষাণ, সন্ধ্যার আকাশে
চাঁদ উঠে আসে,
অশ্বত্থ-বটের তলে ঝিঁ-ঝিঁ পোকা ধরে ঐকতান।
এক ফালি মাঠ ; পুরানো লণ্ঠন হাতে
সম্মুখের পথ দিয়ে
ছায়ামূর্ত্তি চলে গ্রামবাসী ;
পত্রঝরা চৈত্র শেষ, গন্ধরেণুমাখা দেশ,
জোনাকী যোনীর মুখে হাসি।
পুরানো মন্দির জনহীন। জ্বলে না তো সন্ধ্যাবাতি—
অবলুপ্ত স্তবগান, কুমারী-আরতি।

(২)

কেন ভয়, কেন বিহ্বলতা, কেন এই বেদনা নিগূঢ় ?
মন্থর মুহূর্ত্তগুলি
আপন স্মৃতির ভারে মৌন, তন্দ্রাতুর।
সদস্ত অঙ্গুলি তুলি'
নির্ম্মম কদমে চলে ক্ষমাহীন কাল,
উন্মত্ত ভয়াল
ক্ষিপ্র তার গতিবেগে কর্শের আভাস ;
শূন্যতার দীর্ঘশ্বাস
আকাশে বাতাসে ঘুরে মরে,
মধ্যাহ্নবেলায় সন্ধ্যায় রাতজাগা রজনীর ঘরে।
রাত্রি আসে, হাওয়া বয় উন্মুক্ত ধারালো—
সমস্ত শরীরে লাগে ভালো ;
নির্জ্জন প্রান্তরে হাঁটি, অরণ্য মর্ম্মরে শুনি কার
ক্লান্ত হাহাকার,
অনেক বাতাসে আজ হৃদয় পাথাড়।

(৩)

নবরূপে তবু লভিলাম।
সহরসীমান্ত ছেড়ে
হে আমার দেশ,
এখানে তোমাকে ফের নবরূপে আজ লভিলাম।
হে হৃদয়,
তৃষ্ণাতুর অন্ধকার নয়,
সন্ধ্যার গভীরে আনো চৈতন্যের মাঙ্গলিক দ্যুতি,
আনো অনুভূতি
আরক্ত ইন্দ্রিয় 'পরে পুষ্পগন্ধে লজ্জাতাম্র প্রদোষবায়ুর ;
বিপন্ন স্নায়ুর
রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ক্লেদ ; ঘোলাটে আবেগ
শূন্য মনে, অশান্ত শরীরে—
আসুক সেখানে ফিরে
জঞ্জালকে দূরে ঠেলে সংক্রান্ত নতুন গতিবেগ।
যাত্রাপথ তলে
মাধবী-মঞ্জরীফুলে ফুলে-ফুলে ফেলেছে আবীর
দীপ্ত দুঃখদাহে যাত্রীদলে ;
(নিদ্রাহীন বেদনায় আর কেন চঞ্চলতা হে বিজয়ী-বীর !)
মনের প্রাঙ্গণে আজ জিজ্ঞাসার লক্ষ সূর্য্য জ্বলে।
এক ফালি মাঠ ; পুরানো লণ্ঠন হাতে
ছায়ামূর্ত্তি চলে গ্রামবাসী,
পত্রঝরা চৈত্র শেষ, গন্ধরেণুমাখা দেশ,
জোনাকী যোনীর মুখে হাসি।

(৪)

হে হৃদয়,
তৃষ্ণাতুর অন্ধকার নয় ;
আকাশে বিপন্ন চাঁদ, নির্জ্জন প্রান্তরে
বাদুড়ের কৃষ্ণ ডানা নাড়ে—
কত জন্ম কত জন্মান্তরে
ভাঙা হালে পাড়ি দিতে গিয়ে তবু পেয়েছি অভয়।
অস্তাচলে সূর্য্য চলে ; নবসূর্য্য এক
মানুষের বুকে—
দুঃখদৈন্যে রুদ্ধশ্বাস তবু রাত্রিদিন
উদ্যত সে কালের বাহিনী
চলেছে সম্মুখে।
ক্ষুদ্রতার তুচ্ছতার ফাঁদ থেকে নিলো মুক্তি আজ
রক্তস্রাবী কল্লোল কালের ;
জীর্ণতার অবশেষ, উঠেছে আওয়াজ
নদী প্রবাহের, পূর্ণ নতুন প্রাণের॥

'সমর-সংগীত'

অজয় ভট্টাচার্য্য

সৈনিক তুমি দুর্জ্জয় বীর
পথ চলো হুঁসিয়ার
অত্যাচারের ইস্পাতীবাজ
গড়িয়াছে আঁধিয়ার।
সৈনিক হুঁসিয়ার।

যুগে যুগে আসি বর্গীর দল
কেড়ে নিতে চায় প্রাণের ফসল
তাদের শোণিতে রঞ্জিত কর
সঙ্গীন তলোয়ার—
সৈনিক হুঁসিয়ার।

হিমালয় আর ককেশাসে এক
মিতালীর হাওয়া বয়
বন্ধু তোমরা মাটির মানুষ
এই শুধু পরিচয়।

নহে তো শঙ্খ সাইরেণ ধ্বনি
জয়যাত্রায় উঠিয়াছে রণি
বিশ্বক্ষুধার সমান দাবীতে
ভাঙো যক্ষের দ্বার—
সৈনিক হুঁসিয়ার।

মকরধ্বজ
মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা ও সর্ব্বপ্রকার ব্যাধির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ। দেহের প্রত্যেক যন্ত্রের ক্রিয়া সতেজ করে।

সারিবাদ্যাসব
খুজলী, পাঁচড়া, বিখাজ, রক্তদুষ্টি, প্রমেহ, শ্বেতপ্রদর ও নানাবিধ চর্ম্মরোগের মহৌষধ। সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য শ্রেষ্ঠ সালসা।

সূতিকায় মৃত
দুর্ব্বলতায় সঞ্জীবনী
জ্বরে সুধা
বাতে মন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে
শতবর্ষ পরে প্রথম প্রস্তুতকারক
ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের দান কি পরিমাণ এবং তাঁর অবর্তমানে সঙ্গীত জগৎ কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল এই বিষয়ে আলোচনা করা দরকার।

একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, রবীন্দ্রনাথের গান ঠিক উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের কোঠায় পড়ে না, কারণ তার ভিত্তি ক্লাসিক্যাল্ বা মার্গ-সঙ্গীতের ওপর নেই এবং তা ব্যাকরণবিহীন যথেচ্ছাচারী ও কবির খেয়ালে গঠিত। প্রথমতঃ দেখা যাক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে অনেকের ধারণার ভিত্তিটা কী। ধ্রুপদকে যাঁরা মহাদেব গজাননের সঙ্গে জুড়ে দেন তাঁদের কল্পনাশক্তির তারিফ ক'রতে হয়, কিন্তু যথার্থ ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস আলোচনা করলে এটুক নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, যে ধ্রুপদের আভিজাত্যে আজ অনেকে আত্মহারা, কয়েক শ' বছর আগে পর্যন্ত তা লোক-সঙ্গীত মাত্র ছিল। কালক্রমে পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হ'য়ে জাতে উঠেছে মাত্র। মার্গ-সঙ্গীত যে কেবল লোক-সঙ্গীত থেকে সৃষ্ট তা-ই নয়, তার প্রাণপ্রবাহ রক্ষার জন্যে প্রয়োজনমতো তাকে বারম্বার লোক-সঙ্গীতের ধারার সাহায্যও নিতে হ'য়েছে।

খেয়ালের স্থান কোন্ পর্যায়ে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সে কথা থাক। তবে এই দেখা যায় যে, ধ্রুপদে মনের সব খোরাক পাওয়া গেল না বলে এর সৃষ্টি হ'ল। যেমন পরে হ'ল টপ্পা ঠুংরীর। জাতে উঠতে প্রথম প্রথম এদেরও যথেষ্ট বেগ পেতে হ'লেও নিজের গুণে পরে তারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মার্গ-সঙ্গীত ছাড়া আর সব সঙ্গীত উনাগগামী এরকম সঙ্কীর্ণ মনোভাব যখন থেকে সুরু, তখন থেকে আমাদের সঙ্গীতের স্রোত শুষ্ক হ'য়ে গিয়েছিল। এই মরা গাঙে রবীন্দ্রনাথ কী মন্ত্রে সঞ্জীবনী দান ক'রলেন—সে কথায় পরে আসছি, তবে এ পর্যন্ত দেখা গেল যে, আজকের যা লোক-সঙ্গীত তা' কালকের মার্গ-সঙ্গীত হ'তে পারে। রবীন্দ্র সঙ্গীতের বীজ ভাবীকালে যে কী বিরাট মহীরুহে পরিণত হ'বে তা যদি আজও আমরা বুঝতে না পেরে থাকি তাহলে সে নিয়ে আমাদের আত্মপ্রসাদ করবার কিছু নেই।

রবীন্দ্রনাথের গানের মর্মে পৌঁছতে গেলে তাঁর কবিচিত্তটিকে জানা চাই। গীত রচনার কালে সে-সময়কার সামাজিক পরিবেশ, পারিবারিক প্রভাব, প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী তাঁর মনে কী প্রতিক্রিয়া এনেছে তার সঙ্গে পরিচয় না থাকলে তাঁর সঙ্গীত সম্বন্ধে সম্যক ধারণা অসম্ভব। সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টা এখানে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত।

রবীন্দ্রনাথ যে সময় জন্মেছিলেন সে সময় বহু প্রসিদ্ধ ধ্রুপদ গায়ক তথা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতজ্ঞরা জীবিত ছিলেন। সঙ্গীত-কলার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ঠাকুর পরিবার তখন অগ্রণী ছিলেন। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-কলাবিদগণের পদধূলি তাঁদের বাড়িতে নিয়তই প'ড়েছে। এই আবহাওয়ায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবন কেটেছিল। তিনি যদু ভট্ট, বিষ্ণু চট্টো প্রমুখ বিখ্যাত গুণীদের গুরু হিসেবে পেয়েছিলেন। তবে একথা সত্য, যাকে বলে 'নাড়া বাঁধা সাগরেদী' তা' তিনি করেননি। কিন্তু অতি অল্প সময়ে গানের সূক্ষ্মতম কাজগুলি আয়ত্ত করে তাঁদের বিস্ময় উৎপাদন করেছিলেন। তার ওপর তাঁর কণ্ঠও ছিল মধুবর্ষী। সুতরাং দেখা গেল তাঁকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে কৃপা করার কিছু নেই।

ধ্রুপদ রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে এবং তা'র একটি কারণ এর শান্ত সংযত রস তখনকার তাঁদের বাড়ির আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খেয়েছিল বলে। তাছাড়া বাংলায় তখন খেয়ালের প্রচলনও ছিল কম। তবে খেয়াল গান রবীন্দ্রনাথকে কখনও ধ্রুপদের মতো মুগ্ধ করেনি—খেয়ালের তানবাহুল্য তাঁকে পীড়া দিয়েছে। ধ্রুপদাঙ্গের সঙ্গীত যে তাঁকে কতখানি স্পর্শ ক'রেছিল, একান্তভাবে উদ্বুদ্ধ ক'রেছিল, সঙ্গীত রচনায় অনুপ্রাণিত ক'রেছিল তা তাঁ'র প্রথম যুগের গানগুলির আলোচনা করলে বোঝা যায়। এই সময় তিনি বহু উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ধ্রুপদাঙ্গের সঙ্গীত রচনা করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যদি ধ্রুপদ গান রচনা করেই ক্ষান্ত হ'তেন তবে আজ তাঁকে আমরা একজন উচ্চ শ্রেণীর ধ্রুপদ রচয়িতা হিসেবেই পেতাম, তার বেশি কিছু নয়। এ সময় তিনি বাংলা গানে হিন্দুস্থানী সুর দিতেন এবং সে-হিসেবে অবশ্য তারা শ্রেষ্ঠ হিন্দুস্থানী গানের সমকক্ষ। কিন্তু তা' ছিল হিন্দুস্থানী গানের বাংলা সংস্করণ মাত্র।

এর পরে তিনি ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এক অভিনব পরীক্ষা সুরু করলেন, পাশ্চাত্য সুরের আমদানী করে। নতুন ও বৈচিত্র্য হিসেবে তাঁরা এ জাতীয় সুর মিশ্রণ কিছুকাল চালিয়েছিলেন। তবে এতে আমোদ পেলেও আনন্দ পাননি। এ জাতীয় প্রচেষ্টার মূল অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, তখনকার পাশ্চাত্য সভ্যতার ঢেউ আমাদের সমাজ জীবনে কম বেশি সব জায়গায় লেগেছিল। কিন্তু এক্ষেত্রেও এই লক্ষ্য করা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ যেমন গতানুগতিকের ভক্ত নন তেমনি আবার নূতনত্বের মোহও কখনো তাঁকে আচ্ছন্ন ক'রতে পারেনি। তাঁর রুচি, লোকোত্তর প্রতিভা বরাবর তাঁকে এগিয়ে নিয়েছে সৃষ্টির পথে। যা গ্রহণযোগ্য তা নিয়েছেন, যা বর্জনীয় তা' বিনা দ্বিধায় ফেলে দিয়েছেন। পাশ্চাত্য সুর দেশী রাগিণীর সঙ্গে মিশ্রণ করা প্রত্যক্ষভাবে স্থগিত রাখলেও, পরবর্তীকালের অনেক গানে বিশেষ বিশেষ দু' একটি ভাব প্রকাশে, যথা 'উত্তেজনা' (বীরভাবব্যঞ্জনা) ইত্যাদিতে বিদেশী সুরের আমেজ পাওয়া যায়। যতটুকু প্রকাশের অনুকূল তা'র অতিরিক্তটুকুকে রাখার তিনি বিরোধী। আর্ট বস্তুটি তাঁর কাছে বিকাশ—জাহির করা নয়। খেয়ালের অলঙ্কারবহুলতা এই কারণে তাঁর পছন্দ হয়নি, ধ্রুপদের গমকের আতিশয্য এইজন্যে তিনি বরদাস্ত করতে পারেননি।

এপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত সৃষ্টিতে সুখ পেয়েছেন কিন্তু আনন্দ পাননি, একটা কি ধূমায়মান অতৃপ্তি তাঁর মধ্যে ছিল। এমন সময় তিনি গেলেন জমীদারী উপলক্ষে শিলাইদহতে পদ্মার ধারে। এইখানে তিনি যেন ফিরে পেলেন নিজেকে; সমস্ত মনপ্রাণ পদ্মায় অবগাহন ক'রে শান্ত হ'ল, স্নিগ্ধ হ'ল। পল্লীসঙ্গীতের অনাড়ম্বর সুন্দর রূপটি তাঁর কবিচিত্তকে একান্তভাবে অভিষিক্ত করে' দিল। এরপর থেকে তাঁর গানে আমরা গ্রাম্য-সঙ্গীতের সঙ্গে রাগ-সঙ্গীতের মিলন দেখতে পাই। তবে তিনি গ্রাম্য-সঙ্গীতের মাত্রাহীন আবেগপ্রবণতা গ্রহণ করেননি। তাঁর গানে লোক-সঙ্গীত মার্জ্জিত হ'য়ে এক অপূর্ব রূপ পেল।

বাঙালী তার গানকে বেশি আপনার করে নিয়েছে যন্ত্রের চেয়ে, সুরের চেয়ে—কথাকে প্রাধান্য দিয়ে সে এসেছে বরাবর। কীর্ত্তনকে আমরা অতি উচ্চ সাহিত্যরসসম্পন্ন বলে জানি। বাঙালী সাহিত্য অর্থাৎ কথাকে বাদ দিয়ে সুরলোকে কখনও বিহার করতে চায়নি। এই থেকে বলা যায় যে, বাঙালীর গান সৃষ্টিতে কথাকে গৌণ করা তার স্বভাব বিরোধী। আরও একটি কথা রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন "বাঙালী অনুকরণে আনন্দ পাবে না, সে সৃষ্টি ক'রবেই" কথাটি বিজ্ঞের মত হেসে উড়িয়ে দেবার নয়, বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বাঙালীর অনুকরণ করার মধ্যেও একটি বিশেষত্ব দেখা যায় যে, যখন সে তা করে তখনো সম্পূর্ণ নিজস্ব করে নেয় এবং তাকে সম্পূর্ণ নতুন রূপ দেয়। যাঁদের স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের গান শোনার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁরা কথাটার যাথার্থ্য বুঝবেন।

রবীন্দ্রনাথ যে তথাকথিত মার্গ-সঙ্গীত থেকে অন্য পথে এলেন তা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বৃহৎ কলেবর তাঁকে বিভীষিকা দেখিয়েছিল বলে নয়। তিনি আলাপ-গানের যথেষ্টই মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর অভিমত এই যে, অসীমের বিহার সীমার মধ্যে দিয়ে হবে। রাগালাপের সংযম চাই, পুনঃপৌনিকতার লোভ সংবরণ করতে হবে। এই সংযম কেবল সুরের দিক দিয়েই নয়,—ভাবের দিক দিয়েও দরকার। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ কীর্ত্তনের অত ভক্ত হয়েও তার বাড়াবাড়িটা বাদ দিয়ে তাকে নিজের গানে নিয়েছেন। বাস্তবিক লুপ্তপ্রায় বিকৃত কীর্ত্তন প্রাণ ফিরে পেয়েছে—তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে। বাউল সম্বন্ধেও তাই, তাকেও তিনি বাছাই করে নিয়েছেন। অবজ্ঞাত, অখ্যাত পল্লী সঙ্গীতকে তিনি সমাজে পাংক্তেয় করে কত বড় কাজ করলেন তা আজও আমরা সঠিক বুঝিনি।

(১০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দিদিকে বিপর্যস্ত করিয়া তোলে) না না না, দাও না পেড়ে। দাও বলছি।

বীণা। (সামলাইতে সামলাইতে) আহাঃ, এ তো আচ্ছা লড়ুয়ে মেড়া নিয়ে পড়া গেল রে বাবা। আমি দিতেটিতে পারব না। শেষে সেজকা এসে আমাকেই ধুমাধুম মার দিয়ে দিক, কেমন?

খোকন। (থামিয়া) হ্যাঁঃ, মারবে না হাতী। তুমি তো বড় হ'য়ে গেছ।

বীণা। হ'লই বা। সেজকা তো আরও বড়।

বেণু। বা রে, ছোড়দিকেই সেদিন দাদা চাটি মারল ব'লে মা বকুনি দিলে, বললে অত বড় মেয়ের গায়ে হাত তুলতে নেই।

(বাণী ফিরিয়া আসে। ঘাড় গলা মুখ মুছিয়া নূতন করিয়া পাউডার দিয়া পরিচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে)

বাণী। (উৎকণ্ঠিত) এসেছে?

বীণা। বাপরে বাপ, একেবারে শ্রীরাধা! এখনও দেরি আছে।

(খোকন ইতিমধ্যে গিয়া রকিং চেয়ারে বসিয়া দুলিতে থাকে। বাণী একবার ঘড়ির দিকে তাকায়, তারপর হতাশ হইয়া চেয়ারে গিয়া বসে। খোকনের কাণ্ড চোখে পড়িবামাত্র বেণু চকিত হইয়া উঠে)

বেণু। এই, ছোড়দা!

খোকন। (দুলিতে দুলিতে) তুই চুপ করে থাক বলছি।

বাণী। খোকন, বাবা না বলেছে রকিং চেয়ারে কেউ হাত দেবে না?

খোকন। বলেছে বেশ করেছে। আমাকে নিয়ে যাবে না কেন, নেমন্তন্নে?

বাণী। (উঠিবার উপক্রম করিয়া) ওঠ এখনো বলছি।

খোকন। বারে, মা তোমাকে বারণ করেছে না, আমার গায়ে হাত দিতে?

বীণা। আচ্ছা ও দেবে না, আমি দিচ্ছি হাত। গায়ে নয়, কানে—তাহ'লে হবে?

(খোকন হাসিয়া ফেলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া নামিয়া আসে)

বাণী। বাবাঃ, ছ'টা বাজতে এখনও দেরি।

খোকন। চুপ চুপ, বোলো না, শুনতে পাবে।

বাণী। কে? কে শুনতে পাবে?

খোকন। (ঘড়ির দিকে দেখাইয়া) ও। শুনতে পেলেই আর ছ'টা বাজাবে না, ইচ্ছে করে দেরি করে দেবে।

বাণী। যাঃ। এমন উদ্‌ভুট্টি সব কথা বলিস্ তুই।

খোকন। সত্যি বলছি, একটু মিছে নয়। ভীষণ দুষ্টু বুদ্ধি ওর।

বীণা। দুষ্টু বুদ্ধি কিরে—ঘড়ি কি মানুষ, না তার প্রাণ আছে যে, বুদ্ধি থাকবে?

খোকন। আছে, তুমি জানো না। যেই দেখবে তোমার তাড়াতাড়ি, অমনি এমন আস্তে আস্তে চলতে সুরু করবে, যেন কিছুতে ছ'টা না বাজে। আবার যখন ভাববে সময়টা একটু ধীরে ধীরে যাক, টের পেলেই তক্ষুণি হুড়মুড় করে দৌড় লাগাবে।

বাণী। ঐ বুঝি এলো। (বাহিরে গাড়ী দাঁড়ানোর ও হর্ণের শব্দ হয়)

বীণা। তা হবে। ছ'টাও বাজল।

(ঘড়িটা ঘড়ঘড় করিয়া উঠে)

খোকন। ঐ দেখ, কেশে নিচ্ছে। গলা সাফ করে নিচ্ছে—

(ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ছ'টা বাজে।)

বীণা। বাঁচালে। কি বলিস বাণী?

বাণী। আহা, নিজে যাবে না বলে তাই। নইলে দেখতাম।

বীণা। কি দেখতিস? তোর মত ছটফট তো আর করতাম না। যা, এবার দৌড় লাগা, দেরি করছিস কেন?

বাণী। যাচ্ছি বাবা, দাঁড়াও না।

(তাড়াতাড়ি বেশ-বাসে ফিনিশিং টাচ দিতে গিয়া তাহার চুল কানে জড়ায়, ক্রচে শাড়ি আটকাইয়া যায়। এই সকল ক্ষুদ্র দুর্ঘটনা সামলাইতে সে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে)

বীণা। যা যা, সব ঠিক আছে। অত কি, তোর তো আর বিয়ে নয়।

বাণী। আহা, তাই বলে যেন—

নেপথ্যে দারোয়ান। কোথা গেলো সেজদিমণি।

বাণী। (সাড়া দিয়া) যাচ্ছি।

খোকন-বেণু। যাচ্ছে।

দারোয়ান (নেপথ্যে)। ঝট করিয়ে আসেন, জল আসছে।

বাণী। যাচ্ছি বাবাঃ। (ক্রচ আঁটিতে আঁটিতে প্রায় দৌড়াইয়া বাহির হইয়া যায়।)

বীণা। কিরে, ওকে যে খারাপ বলছিলি, দিলে তো ছ'টা বাজিয়ে?

খোকন। (বিমর্ষ মুখে) তা দেবে না কেন। ছ'টা বাজলেই যে মাষ্টার আসবে।

বীণা। মানে? আবার ওটা খারাপ লোক হয়ে গেল?

খোকন। গেলই ত। যাতে লোকের ভাল না হয়, ভেবে ভেবে ঠিক তেমনি করে ঘণ্টা বাজায় ও। পাজি শয়তান একটা।

বেণু। ইঃ, বোলো না।

খোকন। (মরিয়া হইয়া) বলবই তো। পাজি শয়তান!

বেণু। বোলো না ছোড়দা, ও বলা গালাগাল। মা ভীষণ বকবে।

খোকন। বকুক গে।

বীণা। খোকন ছিঃ।

খোকন। আর বলব না। (একটু থামিয়া) কিন্তু একটু দেরি করে বাজালে কি হয়?

বীণা। আর দেরি করলে সেজদি বেচারি ফিট্ হয়ে যেত একদম।

খোকন। আহা। আর আমার যে একটুও পড়তে বসতে ইচ্ছে করছে না এখন। খালি কান্না পাচ্ছে।

বেণু। এ মা, আমি তো কাঁদি না।

খোকন। তুই চুপ করে থাক। তুই কাঁদবি কেন, তুইতো এক্ষুণি মা বাড়ী ফিরে আসবে আর তার কোলে গিয়ে চড়ে বসবি, আহ্লাদী কোথাকার!

বীণা। আর তোর বুঝি এক্ষুণি ফাঁসি হয়ে যাচ্ছে?

খোকন। বারে, আমার মাষ্টার আসছে না? এলেই আর কি, যাও বসে বসে নামতা মুখস্থ কর, আর ডুইং হয়নি বলে বকুনি খাও। কেন, একদিন ছ'টা—না-বাজলে কি হয়?

বীণা। ওরে বাপরে। আজ ছ'টা না বাজলে যে যাওয়াই হ'ত না সেজদির। আর ন'টা যদি না বাজে আজ, তো তিলু-মাসির বিয়েই বন্ধ।

খোকন। তাই তো বলছি। ছ'টা বাজল—সেজদি, বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে যাও। আর খোকন, তুমি বই নিয়ে পড়তে বোসো। ন'টা বাজল—তিলুমাসি, তোমার বর এসেছে বিয়ে করতে যাও। আর খোকন, ন'টা বেজেছে, আর রাত জেগে গল্পের বই পোড়ো না, যাও শুয়ে পড়গে। সব সময় এমন করে করে বাজবে যাতে সবার মজা, আর আমার ভাগে যতো ইয়ে। আমাকে একদম দেখতে পারে না ও—আমার ওপরেই যতো রাগ পাজিটার!

বীণা। একদম পাগলা।

(একটু হাসিয়া চলিয়া যায়)

বেণু। সত্যি ভাই ছোড়দা, বোলো না ওরকম করে।

খোকন। একশ' বার বলব, হাজার বার বলব। আমার ওপরেই ওটার যত শত্রুতা, কিছুতে আমার ভাল দেখতে পারে না, জানিস?

বেণু। কেন, কাল সকালেই তো আবার—

খোকন। কি হবে কাল? কাল যেই দশটা বাজবে, তুমি, দিদি তোমরা সবাই বিয়েবাড়ি চলে যাবে। আর আমার —'খোকন, ইস্কুলে যাও, বেলা হল।'

বেণু। কিন্তু তোমার ওপরে রাগ থাকবে কি করে ওর? ও তো ঘড়ি, একটা মরা জিনিষ। ওর তো প্রাণ নেই।

খোকন। আছে আছে, ভারি জানিস তুই। জানিস, আমাদের স্যার বলেছে,

গাছপালা লতাপাতা সক্কাইর ভেতরে প্রাণ আছে। স্যার জগদীশচন্দ্রের নাম শুনেছিস্?

বেণু। (ভয়ে ভয়ে) না।

খোকন। তোদের মাষ্টার জানেই না মোটে। আমাদের স্যার বলেছে, ইট-কাঠ লোহার ভেতরেও নাকি প্রাণ আছে, স্যার জগদীশচন্দ্র তাই খুঁজে বার করেছেন। একটা লোহার ওপর হাতুড়ি দিয়ে পিটলে, পিটতে পিটতে সেটা কাহিল হ'য়ে পড়ে, জানিস? স্যার জগদীশচন্দ্র তাই বার করেছেন।

বেণু। তা হ'ক গে। আমাদের ঘড়িটাকে তো আর তিনি দেখেন নি?

খোকন। নাই বা দেখলেন, তাতে কি। ঘড়িটাও লোহা দিয়ে বানিয়েছে তো, সেইগুলো সব জ্যান্ত হ'য়ে থাকে। দেখিস নি, মাঝে মাঝে ওর অসুখ করে, ঠিকমত চলতে চায় না, মিস্ত্রি এসে ঠিক করে দিয়ে গেলে তবে আবার চলে?

বেণু। (মুগ্ধ) বা রে, সেতো খারাপ হ'য়ে যায়।

খোকন। আজ্ঞে হাঁ, খারাপ হ'য়ে যাওয়াকেই অসুখ করা বলে। বুঝেছেন?

বীণা। (নেপথ্যে) খোকন বেণু, পড়তে এসো, মাষ্টারমশাই এসেছেন।

খোকন। বাস্, দেখলি তো?

(দ্বারে ভৃত্যের আবির্ভাব)

ভৃত্য। খোকন বেণু পড়তে এসো। মাষ্টারবাবু এসেছেন।

খোকন। কোথায়?

ভৃত্য। নীচে পড়ার ঘরে। চা দিতে যাচ্ছি আমি।

খোকন। আচ্ছা চা খাওয়া হোক, আমরা যাচ্ছি।

(ভৃত্যের প্রস্থান)

আমি কি করব জানিস্?

বেণু। কি?

খোকন। (ফিস্‌ফিস করিয়া) ওকে একদম—নাঃ, তোকে বলব না, তুই বলে দিবি।

বেণু। না না বলব না।

খোকন। নাঃ, বলবি যে আবার। মেয়েমানুষরা পেটে কথা রাখতে পারে না।

বেণু। বা, আমি তো এখনও মেয়েমানুষ হই নি, আমি তো ছেলেমানুষ। লক্ষ্মীভাই ছোড়দা, বল না কি করবে।

খোকন। আচ্ছা বলছি। কিন্তু খবরদার কাউকে বলে দিবি নে, মেরে খুন করে ফেলব তাহলে।

বেণু। আচ্ছা আচ্ছা তাই ফেলো।

খোকন। (ফিস্‌ফিস করিয়া) ওকে আমি একদম—(হাত নাড়িয়া গলা কাটার ইঙ্গিত করে।)

বেণু। মানে?

খোকন। (অবাক চাইয়া) মানে—হস্তকি কোথাকার। মানে, মেরে ফেলব, খুন করে ফেলব। সন্ধ্যে না হতেই ঢং ঢং বাজানো ঘুচিয়ে দেব একদম।

বেণু। কি করে? ও তো লোহা।

খোকন। ফের বলে লোহা! এতক্ষণ বললাম কি তাহলে? ওর ভেতরে প্রাণ আছে, প্রাণ থাকলেই তো মরে—পড়িস নি, 'জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে, চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে?' যাঃ, তোদের মাষ্টারগুলো সব একদম হোঁৎকা, কিচ্ছু পড়ায় না।

বেণু। বেশ, তাই ভাল।

খোকন। ভাল না হাতী।

বেণু। সত্যি বল না ভাই ছোড়দা, কি করে মারবে?

খোকন। চুপ চুপ, শুনতে পাবে। দেখতেই পাবি তখন।

বেণু। (উত্তেজিত, চাপা গলায়) কখন?

খোকন। (চাপা গলায় ঘড়ির দিকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, যেন সত্যই সে শুনিতে পাইতেছে) আজই, সবাই ঘুমুলে পর।

বেণু। আজই?

খোকন। হাঁ। আজই সুবিধে, মা বাড়ি নেই, বাবা বাড়ি নেই, মেজদি সেজদি দাদা সেজকা কেউ বাড়ি নেই—আজই।

বেণু। দিদি?

খোকন। দিদি তো ঘুমোবে তখন। দিদির ঘুম, গায়ের ওপর দিয়ে হাতী গেলে টের পায় না।

(দ্বারে ভৃত্যের পুনরাবির্ভাব)

ভৃত্য। খোকন বেণু, মাষ্টার বাবু বসে আছেন। (প্রস্থান)

খোকন। আঃ, যাচ্ছি। চল বেণু। (ফিস্‌ফিস করিয়া) কাউকে বলবি না কিন্তু, কাউকে না। খবরদার বলে দিচ্ছি।

বেণু। আচ্ছা আচ্ছা, বলব না, দেখো তুমি। এবার শিগগির চলো, দিদি বকবে নইলে।

(খোকন যাইতে যাইতে দরজার মুখে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ঘড়িটার দিকে চাহিয়া খুব একটা রুদ্রভাব মুখে আনে, ঘুঁষি উঁচাইয়া তাহাকে শাসায়, দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলে)

খোকন। দাঁড়াও, আজই দেখাচ্ছি তোমায়!

বেণু। (পিছন হইতে তাহাকে টানিয়া) ও ছোড়দা।

খোকন। ধোৎ খালি ও ছোড়দা! চল্।

(ফিরিয়া, দু'জনে চলিয়া যায়)

(এক মিনিট ষ্টেজ খালি থাকে, কেবল ঘড়িটাই টিক্ টিক্ টিক্ করিয়া নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে। তারপর ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িয়া যায়।

পাঁচ মিনিট পরে আবার যবনিকা উঠে। ঘর প্রায় অন্ধকার, খালি একটা ছোট নীলরঙের বাল্‌ব জ্বলিতেছে, তাহার ক্ষীণ আলোকে ঘরটা কেমন আবছা রহস্যে ভরা মনে হয়। ঘড়িতে দেখা যায় বারোটা বাজিতে সামান্য বাকি—কতটুকু বাকি তাহা পূর্ব্ব দৃশ্যের মত অভিনয়ের সময় অনুসারে স্থির করিতে হইবে।

মিনিটখানেক ঘর খালি থাকে। তারপর দরজার পর্দা সরাইয়া খোকন ও বেণু প্রবেশ করে। খোকনের পরনে পায়-জামা উপর-গা খালি, বেণুর গায়ে একটা পাৎলা ফ্রক—বিছানা হইতে দুইজনে উঠিয়া আসিয়াছে। খোকনের বাঁ হাতে একটা মস্তবড় কাঁচি, ডান হাতে টর্চ। দরজা হইতে টর্চের আলো ফেলিয়া সে ঘরটা দেখিয়া লয়, তারপর খুব পা টিপিয়া টিপিয়া সাবধানে ঘরে প্রবেশ করে। বেণুর একটু ভয় ভয় করিতেছে, খোকন তাহাকে নিজের পিছনে টানিয়া আনে।

ঘরের মধ্যখানে দুইজনে আসিয়া দাঁড়ায়—খুব মৃদুস্বরে কথা বলে, উপন্যাসের খুনীদের মত।)

বেণু। বাবা কী অন্ধকার ঘরটা!

খোকন। চুপ! কথা বল্‌লে ওর ঘুম ভেঙে যাবে।

বেণু। দুৎ। ও আবার ঘুমোয় নাকি?

খোকন। নিশ্চয়ই ঘুমোয়।

বেণু। কিন্তু ঘুমুলে তো থেমে থাকত। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বাজবে কি করে?

খোকন। তুই তো ভারি জানিস। জ্যাঠামশাই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাশে না? ও ওদের অভ্যাস হ'য়ে যায়।

(একটুক্ষণ নিস্তব্ধতা। খোকন ঘড়িটার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, খুব ধীরে ধীরে এক এক পা করিয়া অগ্রসর হয়)

বেণু। এই এই, ছোড়দা!

খোকন। (ফিরিয়া) কি?

বেণু। ঐ চেন্নারটা কিরকম নড়ে উঠল।

খোকন। যাঃ, ভীতু কোথাকার।

বেণু। তুমি ওটাকে কি করবে?

খোকন। দ্যাখ না।

বেণু। আমার ভয় করছে।

খোকন। ভীতুর ডিম একটা। থাক, তোর আর কাছে যেতে হবে না। এইখানেই দাঁড়িয়ে থাক তুই, টর্চটা দিয়ে আলো ফ্যাল। ঠিক যেখানে পেণ্ডুলামটা দুল্‌ছে, ঐখানে।

(ঘড়িটা হঠাৎ ঘড় ঘড় করিয়া উঠে, বেণু 'ই' বলিয়া চীৎকার করিয়া খোকনকে জড়াইয়া ধরে।)

খোকন। (ধমক দিয়া বলে) চ্যাচাস নি। চ্যাচানি শুনে বাড়িসুদ্ধ লোক জেগে উঠুক, কেমন?

বেণু। না না, চ্যাচাব না।

(কিন্তু খোকনকে সে শক্ত করিয়া আঁকড়াইয়া থাকে, যতক্ষণ না ঘড়িতে ঘণ্টা বাজা শেষ হয়। ঘড়িতে ঘড়-ঘড় শব্দের পরে টং টং করিয়া বারোটা বাজে। বাজা শেষ হইলে বেণু খোকনকে ছাড়িয়া দেয়)

খোকন। (দাঁতে দাঁত পিষিয়া ঘড়িকে) দাঁড়াও, বাজা শেষ করে দিচ্ছি তোমার,

(১০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সান বার্লী
পার্ল পাউডার
SUN
BARLEY POWDER
THE NEW STANDARD BARLEY MANUFACTURING CO
CALCUTTA
শিশু ও রুগ্নের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য-পানীয় এখন জনপ্রিয় আকারসমূহে পাওয়া যাইতেছে।
চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত ও অনুমোদিত
দি নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড বার্লী ম্যানুফ্যাকচারিং কোঃ
১০৫, কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

হত্যাকাণ্ড

(১০৪ পৃষ্ঠার পর)

আর এ জীবনে বাজতে হবে না। (বেণুকে) নে, ধর ভালো ক'রে।

(বেণু তাহার হাত হইতে টর্চ লইয়া ঘড়ির উপর আলো ফেলে, তাহার হাতে আলো অনিশ্চিতভাবে কাঁপিতে থাকে। খোকন কাঁচিসুদ্ধ হাত পিছনে লুকাইয়া খুব সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া ঘড়ির দিকে অগ্রসর হয়। তাহার মুখে চোখে ভারি একটা নাটকীয় জীঘাংসার অভিব্যক্তি। ঘড়ির একেবারে সম্মুখে গিয়া সে এক লাফে বাকি পথটুকু অতিক্রম করে। দ্রুতহস্তে কাঁচের দরজাটা খুলিয়া ফেলে, দাঁতে দাঁত পিষিয়া নিঃশব্দ স্বরে বলে—এইবার।)

(সঙ্গে সঙ্গে কাঁচি দিয়া পেণ্ডুলামের দড়িটা কাটিয়া দেয়। দিতেই ঝন্ ঝন্ করিয়া একটা শব্দ হয়, কাচ ভাঙার শব্দ। ঘড়ি ঘড়-ঘড় শব্দ করিয়া বন্ধ হইয়া যায়।)

খোকন (বিজয়ী বীরের মত ফিরিয়া দাঁড়ায়)। ব্যস্, কর্ম্ম ফতে। এ জন্মে আর বাজতে হবে না বাছাধনকে।

বেণু। (উত্তেজিত চাপা স্বরে) হয়ে গ্যাছে!

খোকন। হাঁ। (জানালার কাছে গিয়া কাঁচিটা ছুড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয়) ব্যস্।

বেণু। (সভয় কৌতুহলে ঘড়ির কাছে যায়, টর্চ ফেলিয়া দেখে। হঠাৎ) ও বাবা, এ কি! ও ছোড়দা।

খোকন। কি হল?

(কাছে যাইতেই বেণু আঙুল দিয়া দেখায়, একটি লালরক্তের তরল ধারা ঘড়ির আসন বাহিয়া কার্পেটে গড়াইয়া পড়িতেছে।)

বেণু। রক্ত!

খোকন। অ্যাঁ!

(দুইজনে পরস্পরকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে থাকে।)

খোকন। (কাঁপিতে কাঁপিতে বলে) র—রক্ত বেরুবে তো জানতাম না—

বেণু। কি হবে?

খোকন। যা হয় তাই হবে, ফাঁসি হবে।

বেণু। (চীৎকার করিয়া কান্না) ওগো মাগো।

(বেণু একেবারে ওগো মাগো বলিয়া চ্যাচাইয়া কাঁদিয়া উঠে। খোকনও কাঁদিয়া ফেলে, তবে অতটা শব্দ করিয়া নয়। কান্নার শব্দে ঘুম ভাঙিয়া বীণা আসিয়া উপস্থিত হয়, চোখে ঘুম, চুল অগোছালো, সাদা শাড়ি শেমিজ মাত্র পরনে। ঘরে ঢুকিয়া বলে)

বীণা। কি ব্যাপার! দুপুর রাতে এঘরে ঢুকে কি হচ্ছে দু'টোতে?

(ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে সুইচ টিপিয়া বড় আলো জ্বালিয়া দেয়। বেণু ও খোকনের কান্না কমে, ফুঁপানি চলিতে থাকে)

এত কান্না কিসের? কি হয়েছে?

(বলিতে বলিতে বীণা কাছে আসিয়া দুজনকে হাতে জড়াইয়া লয়)

খোকন। কাঁচিটার ওপর আঙুলের ছাপ পাবে ওরা।

বীণা। কি বলছিস পাগলার মত! কি হয়েছে বল্ না।

খোকন। আমি—আমি ভয়ানক কাণ্ড করেছি। একেবারে খুন—নৃশংস হত্যাকাণ্ড।

বীণা। কাকে?

বেণু। হ্যাঁ হ্যাঁ, করেছে! কাঁচি দিয়ে।

বীণা। আহাঃ। কাঁচি দিয়ে তো বুঝলাম, কাকে নৃশংস হত্যাকাণ্ড করলি?

খোকন। (তখনও ফুঁপাইতেছে) কিন্তু সত্যি বলছি দিদি, আমি আগে বুঝিনি। ওকে বন্ধ করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু বাপরে। কি রক্ত! (শিহরিয়া চক্ষু বোজে)

বীণা। জ্বালালে। কার রক্ত?

বেণু। (হাত ধরিয়া টানিয়া) এই দেখ।

(বীণা ঘড়ির কাছে যায়, খোকন বেণুও সঙ্গে যায়। বীণা ঘড়িটাকে লক্ষ্য করিয়া দেখে, নীচে সেই লাল ধারাটিও দেখে)

বীণা। এই কাণ্ড! বাঃ বেশ! কার্পেটটিরও দফা সেরে রেখেছ তো! মা বাড়ি আসুক কাল, তখন হবে।

খোকন। (ভয়ে ভয়ে) দিদি, আমার কি হবে?

বীণা। হবে আর কি, মেজদি কাল বাড়ি এসে রাম ঠ্যাঙানি লাগাবে। ঠেঙিয়ে ভূত ছাড়িয়ে দেবে দুটোরই।

বেণু। বারে, মেজদি ঠ্যাঙাবে কেন? সে তো পুলিশরা এসে ধ'রে নিয়ে যাবে।

বীণা। মেজদিই তো ঠ্যাঙাবে। কি করেছ জান?

খোকন। কি?

বীণা। (লাল ধারাটি দেখাইয়া) এগুলো কি, জান?

খোকন। রক্ত। ঘড়ির রক্ত।

বীণা। তোমার মুণ্ডু।

খোকন। তবে?

বীণা। আল্‌তা। বেণু চুরি করে মেখে মেখে শিশি খালি করে দেয়, তাই মেজদি তার আল্‌তার শিশি ঘড়ির তলায় লুকিয়ে রেখে দিয়েছে। সেই শিশি ভেঙেছ। এবার মেজদি বাড়ি আসুক, তখন বুঝবে মজা।

(শেষের কথাগুলা খোকনের প্রায় কানেই যায় না। সে অকস্মাৎ এত উল্লসিত হইয়া উঠে)

খোকন। রক্ত নয়?

বীণা। না না, হাঁদারাম। ঘড়ির রক্ত থাকে নাকি? তাই ভেবে বাপরে মারে করা হচ্ছিল বুঝি?

খোকন। (দৃপ্ত) আমি না, বেণুটা কাঁদছিল। এমন ভীতু ওটা।

বেণু। আহা, আর তুমি? তুমিও কাঁদনি বুঝি?

খোকন। আমি—সে তো দেখে দেখে শেষে একটুখানি মোটে কাঁদলাম।

বীণা। থাক থাক, কেউ কাঁদেনি, আমি কেঁদেছিলাম। দুপুর রাত্তিরে জেগে জেগে যত সব উদ্ভুটি কাণ্ড—হতভাগার দল। চল্, শুবি চল।

(হাত ও কান ধরিয়া দু'জনকে টানিয়া লইয়া যাইতে থাকে। খোকন যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া বিজয়গর্কে বেণুকে বলে)

খোকন। তবু আমি যা বলেছিলাম তা করলাম তো...ওর বাজা তো বন্ধ করেছি!

(ইহারা বাহিরে চলিয়া যায়, বীণা আলো নিভাইয়া দিয়া যায়।)•

যবনিকা

• এই নাটিকার প্লটটি ইংরেজি হইতে চুরি করা। মূল নাটিকা Peter and the Clock By Kitty Barne.

সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের দান

(১০১ পৃষ্ঠার পর)

আজকের দিনে বাংলার মনে যে বাউল কীর্ত্তনের ঢেউ লেগেছে তাতে রবীন্দ্রনাথের দান আমরা স্বীকার তো করিই না, পরন্তু ব্যঙ্গ করতে পর্য্যন্ত লজ্জিত বোধ করি না।

রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি সাধারণ সাঙ্গীতিক নিয়ম মেনেছেন। প্রভাত বর্ণনাত্মক গানগুলিতে প্রভাতী সুর দিয়েছেন, যেমন দিয়েছেন সন্ধ্যার গানে সান্ধ্য সুর। কিন্তু এগুলোও যে ঠিক সাঙ্গীত-ব্যাকরণ অনুসরণ করে তা নয়; সকালের শান্তরস ও সন্ধ্যার করুণতার অভিব্যক্তি এই এই সুরে পেয়েছেন বলেই ভাবের দিক দিয়ে প্রচলিত সুর দেওয়ার ব্যতিক্রম করেছেন। নেওয়া যাক তাঁর বর্ষার গান। বর্ষার বহু গান মল্লারের বিভিন্ন শ্রেণীতে রচিত হলেও তার ব্যতিক্রমও ঘটেছে। মল্লার রাগিণীকেই তিনি বর্ষার একমাত্র ভাব প্রকাশক মনে করেন নি। বর্ষণমুখর শ্রাবণ সন্ধ্যা সব সময়েই তাঁর মনে বিষাদঘন ছায়াপাত করে নি, আনন্দের শতদলও বিকশিত করেছে। তাই আমরা দেখতে পাই বর্ষার গানে 'ইমন' প্রভৃতি অন্যান্য সুরও লেগেছে।—ঋতু-সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের কাছে বোধ হয় আমরা সব চেয়ে ঋণী। বিভিন্ন ঋতুর বিভিন্ন ভাবপুঞ্জের যে প্রতিক্রিয়া মানুষের মনে আনে তার প্রকাশের এত বিপুল ও বিচিত্র সঙ্গীত কোন যুগে কোন দেশে রচিত হ'য়েছে বলে জানা নেই। এ সঙ্গীত সম্ভব হ'য়েছে, তার কারণ এর স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ।

তাঁর নাট্যসঙ্গীত এক অপরূপ সৃষ্টি। 'নটির পূজা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা', 'চণ্ডালিকা' যে কী সৃষ্টি তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। নাট্যসঙ্গীতের রসাস্বাদন যদিও আমরা কীর্ত্তনে আগে পেয়েছি কিন্তু এগুলি কী সংহত, সংযত ও বিচিত্র! কেবল গানেই তিনি শেষ করেন নি—সঙ্গীতের আর এক অংশ নৃত্য, তাকেও অঙ্গীভূত করেছেন, নতুন রূপ দিয়েছেন। এ সমন্বয় সম্ভব হ'য়েছে তার একমাত্র কারণ রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা। তাঁর নৃত্যনাট্য সম্বন্ধে বলতে গেলে আর এক নতুন অধ্যায় এসে পড়ে। বারান্তরে সে বিষয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

নারীহিতৈষী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীশান্তা দেবী

প্রথম যৌবন হইতেই রামানন্দ বাংলা দেশের নারীদের দুঃখ বেদনা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। আমাদের দেশের নারী জাতির তখন শিক্ষার সহিত প্রায় কোনোই সম্পর্ক ছিল না। বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের পরের সংসারে লাঞ্ছনা ত ছিলই, সধবাদের অদৃষ্টও সর্বক্ষেত্রে ভাল ছিল না। দুর্ভাগ্য যত জনের অদৃষ্টে দেখা দিত, সৌভাগ্য তাহার তুলনায় অল্প মেয়ের কপালেই ঘটিত। কুমারী কন্যার বিবাহে পণ আদায় করার হৃদয়হীনতা আমাদের দেশে বহুদিনই শুরু হইয়াছে; তৎপূর্বে রামানন্দের বাল্যকাল ও প্রথম যৌবনে কুলীন কন্যাদের অশেষ নানা দুঃখও তিনি দেখিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিজ পরিবারেই এমন মহিলা ছিলেন, যাঁহাদের স্বামীরা একাধিক বিবাহ করিয়াছিলেন। স্ত্রীজাতির এই সকল নানা অবমাননা তাঁহাকে অল্প বয়স হইতেই বিচলিত করিত।

তিনি কিশোর বয়স হইতেই নানাদিকে সংস্কারমুখী ও আদর্শানুসারী মনের পরিচয় দিতে থাকেন। তিনি তখনই বুঝিতে পারেন যে, মানুষের একমুখী উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। পুরুষের উন্নতি জাতির উন্নতি নয়, তাহার সহিত স্ত্রীর ভাগ্য এমন ভাবে জড়িত যে, স্ত্রীর উন্নতি ভিন্ন জাতির কল্যাণ নাই। ব্রাহ্মসমাজ রামানন্দের শৈশবে ও বাল্যকালে এই নানামুখী সংস্কারের আদর্শের অগ্রদূত ছিল। সেই কারণে ব্রাহ্মসমাজই তাঁহাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। কলিকাতায় কলেজে পড়িতে আসার সময় হইতেই তিনি ব্রাহ্মসমাজ ও তাহার নানামুখী সংস্কারের আদর্শের কাজে বিশেষভাবে জড়িত হইয়া উঠেন।

তিনি যখন কলিকাতায় আসেন, তখন এদেশে নিরক্ষর দরিদ্র স্ত্রীলোকদের আর এক রকম দুর্গতির খুব আধিক্য ছিল। তখন নীলকরদের যুগ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু চা-করদের যুগ আসিয়াছে। চা-ব্যবসায়ীরা আড়কাঠি লাগাইয়া অশিক্ষিত স্ত্রী ও পুরুষদের নানা প্রলোভন দেখাইয়া চা বাগানের কুলি করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইত। চা-বাগানের কুলিদের সহিত মনিবদের চুক্তি এমন অপূর্ব ছিল যে, কুলিদের সহজে মুক্তি পাইবার উপায় ছিল না। কুলি-নারীদের উপর নানা প্রকার অত্যাচার হইত। ৺কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত "সঞ্জীবনী" পত্রে কুলিদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে যুগে দীর্ঘকাল আন্দোলন হইয়াছিল। সেই কার্যে প্রথমে রামকুমার বিদ্যারত্ন, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী এবং পরে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সহায় ছিলেন। রামানন্দ "সঞ্জীবনী"তে মাঝে মাঝে সম্পাদকীয় মন্তব্য এবং অন্যান্য লেখাও লিখিতেন, তাঁহার লেখায় এই সকল বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইত। তিনি ইংরাজী কুলি-পুস্তিকায় বাংলা অনুবাদ করেন এবং 'কুলি-সংরক্ষিণী-সভা' স্থাপনের চেষ্টা করেন। তিনি স্বয়ং বাঁকুড়ায় কোন কোন রমণীকে আড়কাঠির হাত হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন বিষধর সর্পকে মারিয়া ফেলিলে যেমন পাপ হয় না, তেমনই এই সকল আড়কাঠিকেও মারিয়া ফেলিলে বোধ হয় পাপ হয় না। নীলকরদের সময় যেমন নানারকম গ্রাম্য সঙ্গীতের সাহায্যে তাহাদের অমানুষিকতার কথা সাধারণ্যে প্রচারিত হইত, তেমনি করিয়া এই আড়কাঠিদের নামেও সঙ্গীত রচনা করিয়া গ্রামে গ্রামে গাহিয়া নরনারীকে তাহাদের দুরভিসন্ধি বিষয়ে সচেতন করার প্রস্তাব তিনি করেন।

রেলে পূর্বকালে নারী যাত্রীদের উপর অত্যাচার এখনকার অপেক্ষা বেশী হইত। "সঞ্জীবনী" এই প্রকার অত্যাচার দমনের অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে কার্যেও রামানন্দ একজন উদ্যোগী ছিলেন। তাহার কিছু সুফলও হইয়াছিল। বাল্যবিবাহ ও বাল্যমাতৃত্ব যে স্ত্রীলোকের অনেক ক্ষতি করে, একথা ঘরে ও বাহিরে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্যে তিনি জানিতেন বলিয়া আজীবন বাল্যবিবাহের বিরোধিতা তিনি করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ বলিতে সেকালে অনেকে ১২ (বার) বৎসরের ছোট ছেলেমেয়ের বিবাহ বুঝিতেন, সংস্কারপ্রয়াসীরা ১৪ বৎসরের নীচের বালকবালিকার বিবাহ পছন্দ করিতেন না, কিন্তু রামানন্দ ১৮ বৎসর বয়সের কমে মেয়েদের বিবাহ হওয়া উচিত নয় একথা চিরদিনই বলিয়াছেন। সহবাস সম্মতি আইনের সময় হইতে একথা তিনি বার বার বলিয়া আসিয়াছেন। ১৩৩১ সালেও তিনি বলিয়াছেন, "আইনে এরূপ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, একুশ বৎসর বয়স হইবার আগে মানুষ নিজের সম্পত্তির দান বিক্রয়াদি কোন ব্যবস্থা করিবার মত বুদ্ধির পরিপক্কতা লাভ করে না। কিন্তু বর্তমান (সহবাস সম্মতি) আইনে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, কাহাকেও নিজের দেহ সমর্পণ করিবার ফলাফল বুঝিবার পরিপক্কতা বার (১২) বৎসরের বালিকারও জন্মিয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় সিদ্ধান্ত কি হইতে পারে?"

তিনি মনে করিতেন নারীর সম্মতির আইনের বয়স স্বামীর পক্ষে ১৮ এবং অন্য পুরুষের পক্ষে ২১ হওয়া উচিত। 'সঞ্জীবনী' ও 'দাসীর' যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া 'প্রবাসী'র যুগে তাঁহার কর্মক্ষমতার অবসান পর্যন্ত এই জাতীয় কথা তিনি বহুবার বলিয়াছেন, তাহার ফলও আইনে না হউক, কাজে নিশ্চয় কিছু ফলিয়াছে, যদিও তাঁহার প্রাপ্য প্রশংসা তিনি পান নাই। নারীহিতৈষীরূপে তাঁহার নাম উল্লেখ কোথাও দেখি না।
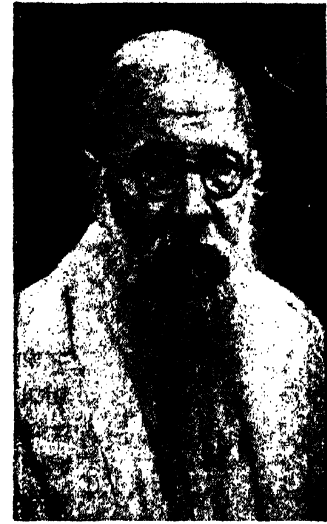
'দাসাশ্রম' ও 'দাসীর' যুগে পতিতা নারীদের কবল হইতে বালিকাদের উদ্ধার করিয়া সৎপথে রাখিবার জন্য তিনি অর্থব্যয়, দায়িত্ব গ্রহণ, সময়দান ও লেখনী চালনা প্রভৃতি নানা চেষ্টা করিয়াছেন। এই সময় এই জাতীয় কয়েকটি বালিকাকে বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখা ও শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা তাঁহারা করেন। আইনের মারপ্যাঁচে কাজটি বেশীদিন তাঁহারা চালাইতে পারেন নাই। কিন্তু পরে ফল হইবে এই আশায় তিনি বহু আইন উদ্ধার করিয়া 'দাসী'তে নানা প্রবন্ধ লেখেন। একটি এই শ্রেণীর বালিকাকে তিনি স্বয়ং ইংরেজী, বাংলা, ইতিহাস ইত্যাদি পড়াইয়া গড়িয়া তোলেন—তাঁহার ডায়েরী হইতে জানা যায়। অন্যদের কথা 'দাসী'তে কিছু কিছু আছে।

রাঢ় দেশীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের প্রবর্তনের জন্যই বিশেষ করিয়া 'দয়ার সাগর' নাম অর্জন করিয়া গিয়াছেন। বাংলা দেশে বিদ্যাসাগরের এই কীর্তিকে অবিনশ্বর করিবার জন্য রাঢ় দেশীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৫০ বৎসর ধরিয়া যত চেষ্টা করিয়াছেন, আর কোন বাঙালী তত করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। বৎসরে বৎসরে বার বার বাংলা দেশের হিন্দু ও মুসলমান নানা বয়সের বিধবাদের ষ্টাটিষ্টিক্সের তত্ত্ব 'প্রবাসী'র পাতায় যতবার দেখা দিয়াছে, এমন আর কোথায় দেখা গিয়াছে? ষ্টাটিষ্টিক্সের সাহায্যে দেশের নানা অবস্থার পরিচয় দেওয়ার প্রচলন বাংলা দেশে বোধ হয় তিনিই প্রথম করেন।

পণপ্রথার বিরুদ্ধে প্রথম যৌবনে "সঞ্জীবনী"তে তিনি 'জ্যান্তপেয়েনজে বর' বিষয়ে একটি নক্সা লেখেন। সেই নক্সাটিকে অবলম্বন করিয়া বাংলা ১৩০৮-এ প্রথম বৎসরের 'প্রবাসী'তে কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন লিখিয়াছিলেন:—

"পাশে ছিল বসি তথা সাহিত্য-আনন্দ,
'প্রবাসী'র সম্পাদক, বন্ধু রামানন্দ,
তাহারে বলিনু আমি এতদিন পরে

(১২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পাঁচুদা'র বিশ্বরূপ দর্শন (With apologies)

কাফী খাঁ

দেশের এই
দুর্দিনে
টাকা সঞ্চয়
করতে
শিখুন
MILITARY CONTRACTOR
দেশের কথা
চিন্তা করুন
বৃথা পয়সা
নষ্ট
করিবেন না
DESH CINEMA
HOUSE FULL

নীলিমা দেবী

পৃথিবীর সব সভ্য দেশের মেয়েরাই স্বীকার করে যে, গৃহস্থালী করাই তাদের প্রধান কাজ; কিন্তু তারা এ দাবীও করে যে, অন্তঃপুরের বাইরেও তাদের স্থান আছে, আর করবার মতো কাজও অনেক আছে। এ দাবী করবার যে তাদের অধিকার আছে তার প্রমাণ তারা দিচ্ছে এই পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের দিনে। যুদ্ধরত দেশগুলির মেয়েরা আজ এমন সব কাজে নিযুক্ত, যে সব কাজ মেয়েদের দ্বারা যে সম্ভব তা এমনকি আধুনিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোকেরাও কল্পনা করতে পারত না। চীনের মেয়েরা তাদের মৃত পিতা, ভ্রাতা বা স্বামীর অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে বীরাঙ্গনার মতো যুদ্ধযাত্রা করে দেশরক্ষা ব্রত পালন করছে এ দৃষ্টান্ত আজ চীনদেশে মোটেই বিরল নয়। আর সোভিয়েট রাশিয়ার মেয়েরা? তারা এ যুদ্ধের পূর্বেই পুরুষের সঙ্গে সকল কর্মক্ষেত্রে, সামাজিক ও নাগরিক জীবনের পূর্ণ অধিকার পেয়েছিল। কাজেই এই যুদ্ধের সময় যে তারা বাপ, ভাই, স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবে, সমস্ত যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সমানভাবে যোগদান করবে তাতে আর আশ্চর্য কি? শুধু দেশরক্ষার কারণেই নয়—যে নতুন সমাজ ও আদর্শ-নীতির আওতায় তারা গড়ে উঠেছে, নতুন এক স্বাধীনতা ও সার্থকতার স্বাদ পেয়েছে, সেই সমাজ ও আদর্শবাদ রক্ষা করবার আকাঙ্ক্ষাও তাদের এই কঠোর ব্রতপালনে কম উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগায়নি। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মেয়েরাও আজ নানারকম কাজ—যা এতদিন শুধু পুরুষের কাজ বলেই গণ্য হত—হাতে তুলে নিয়েছে। কাজেই দেখা যায় যে, প্রয়োজনের দিনে কাজ শুধু কাজই—এটা মেয়েদের কাজ, ওটা পুরুষদের কাজ বলে কাজের কোনো পংক্তি বিভাগ থাকে না।

আমাদের দেশে কিন্তু বেশীর ভাগ লোকের ধারণা এবং আশঙ্কা যে, যদি মেয়েরা একবার অন্তঃপুরের গণ্ডীর বাইরে কোনো কর্মক্ষেত্রে নামবার সুযোগ পায়, তাহলে তারা ঘর গৃহস্থালীর দায়িত্ব নিতে আর রাজী হবে না। এ ধরণের চিন্তাধারার সম্বন্ধে যেসব যুক্তি সচরাচর শোনা যায় তার পিছনে যুক্তির চেয়ে মানসিক সঙ্কীর্ণতাই আছে বেশি।

যতদিন যৌথপরিবার প্রথার প্রচলন ছিল, এ প্রথার দোষ যাই থাক না কেন, সে সব পরিবারভুক্তদের মধ্যে যারা উপার্জনে অক্ষম তাদের ভাত-কাপড় জোটায় ত্রুটি হত না। কাজেই মেয়েদের স্বোপার্জনের তাগিদ ছিল কম। কিন্তু যৌথপরিবার প্রথায় ভাঙন ধরেছে অনেকদিন। তার উপর আজ দেশের লোকের, বিশেষ করে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, অনেক মেয়েরই—কি কুমারী, কি স্বামী পরিত্যক্তা, কি বিধবা—এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, স্বোপার্জনের পথ না পেলে তাদের ভরণ-পোষণই মেলা ভার হয়ে উঠেছে। অথচ একদিকে আমাদের দেশের মেয়েদের জন্য যেমন স্বোপার্জনের দ্বারও মুক্ত নয়, অপরদিকে পারিবারিক আপত্তি ও বাধাদানের ফলে স্বোপার্জনের কোনো প্রচেষ্টা করবারও তাদের উপায় থাকে না। এ অবস্থার জন্য কতক পরিমাণে দায়ী লোকাচারগত সামাজিক ব্যবস্থা আর কতক পরিমাণে দায়ী বেশির ভাগ মেয়ের মনে গতানুগতিকতার গণ্ডী অতিক্রম করবার ভীতি। তাছাড়া আমাদের দেশে আত্মনির্ভরশীল হতে সত্যিই ইচ্ছুক এমন মেয়ের সংখ্যা এখনো এত মুষ্টিমেয় যে, এপর্যন্ত তারা প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থার উপর কোনো প্রভাবই বিস্তার করতে পারেনি।

অবশ্য যেদেশে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পুরুষদের ভিতরই ভদ্রতা খোয়াবার ভীতি বেকার সমস্যার সৃষ্টি করেছে, সেদেশে পরমুখাপেক্ষী স্ত্রীজাতির প্রয়োজনের দাবী উপেক্ষিত হবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? কিন্তু দরিদ্র কৃষকের স্ত্রী তার স্বামীর কাজে ভাগ নিতে কোনো লজ্জাবোধ করে না, কলকারখানার মজুর ও তার স্ত্রীও একসঙ্গে কাজ করতে যাওয়াকে অপমানজনক মনে করে না, আর ঘরসংসার এসব মেয়েরাও করে। অন্তঃপুর আর বাইরের ব্যবধানটা বড় হয়ে দাঁড়ায় শুধু তথাকথিত ভদ্রসমাজের মেয়েদের সম্পর্কেই।

•

উন্নতিশীল দেশের যেসব মেয়েরা বাইরের কর্মক্ষেত্রে নিজেদের কার্যদক্ষতা ও উপার্জন ক্ষমতা প্রমাণ করছে, তারাও পরিবার-পরিচর্যার কর্তব্যকে নারীর শ্রেষ্ঠ কাজ বলে স্বীকার করে, কিন্তু শুধু গৃহ-ধর্ম পালনের মধ্যেই তাদের সব শক্তি সব আশা পর্যবসিত হয় না। তবে আমরাই বা এত ভয় পাই কেন? তার কারণ গৃহস্থালীর কাজে মেয়েদের আজীবন লিপ্ততার চিত্র দেখে দেখে আমাদের এমনই অভ্যাস ও মনোবৃত্তি গড়ে উঠেছে যে, মেয়েদের ঘরের গণ্ডীর বাইরে দেখার কথা ভাবলেই আমাদের সন্ত্রস্ত মন আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। চিরাভ্যস্ত ব্যবস্থায় কোথাও একটু ব্যতিক্রম দেখলেই আমরা খুঁজি বিধি-নিষেধের নজির—মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার যৌক্তিকতাকে নাকচ করি নারী ধর্মের অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিয়ে।

সুযোগের অভাব, চেষ্টার অভাব, আর ইচ্ছার অভাব—এই তিন অভাবের কারণে এদেশের মেয়েরা আজও হয়ে আছে পর-ভাগ্যোপজীবী। এ অবস্থার প্রতিকার কি এবং হবে কেমন করে? কয়েক বছর আগে "ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি" বা জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির উদ্যোগে ভারতের অর্থনৈতিক জীবন ও সমাজের একটা সমগ্র চিত্র সৃষ্টি করার চেষ্টা যতদূর হয়েছিল, তাতে এদেশের মেয়েদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণেরও একটা সুস্পষ্ট সঙ্কেত পাওয়া গিয়েছিল। দেশের অন্যান্য সমস্যার মতো এ দেশের মেয়েদের নানা সমস্যাগুলিকে জাতির সমষ্টিগত কল্যাণের দৃষ্টিপথে ফেলে পরিবীক্ষণ করার জন্য যে সহ-সমিতি নিযুক্ত করা হয়, সেই সমিতির তদন্ত ও গবেষণার ফলে ভারতের ভবিষ্যৎ সমাজে মেয়েদের স্থান যেভাবে নির্দেশ করা হয়েছিল তার মোটামুটি পরিকল্পনা এই:

ঐ ভাবী সমাজের ভিত্তি যাই হোক না কেন, সে সমাজে মেয়ে-পুরুষের স্থান সমান, দু'জনেরই মর্যাদা, সুযোগ, সুবিধা ও দায়িত্ব সমান। যেহেতু সে মেয়ে, এই কারণে কোনো মেয়েকে কোনো কর্মক্ষেত্র থেকে বাদ দেওয়া হবে না। শুধু বিবাহের দাবীর উপর ভিত্তি করে পুরবাসী হিসাবে পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের সমান স্থান ও মর্যাদা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ক্ষুণ্ণ থাকবে না।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, মেয়েদের এসব অধিকার স্বীকার করে নিতে পারে একমাত্র সেই সমাজ—যে সমাজের মূলনীতি স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যক্তিকেই একটি সামাজিক ইউনিট বা 'একক' বলে গ্রহণ করে, আর সেই নীতি অনুসারেই তাদের চিন্তা, কর্ম ও জনসেবার ধারা নির্ধারিত হয়। এ বিষয়ে জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি নির্ভীকভাবে রায় দিয়েছিলেন যে, তাঁদের সঙ্কল্পিত ভারতীয় নববিধানে নারী পুরুষের মতোই একটি সামাজিক একক হিসাবে গণ্য হবে।

এই নীতি যে সমাজ মেনে চলবে সে সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে জীবনের সব

(১৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নিরুদ্দেশ

পুঁটুরানীর আচরণে সকলেই মর্মাহত হইয়াছে। ঐ এক ফোঁটা মেয়ে, দেখিলে মনে হয় ভাজা মাছটি উল্টাইয়া খাইতে জানে না, তার পেটে এই জিলিপির প্যাঁচ! এত বড় একটা কূট-চাল চালিয়া বসিল!

ত্রিলোচন বলিল—"চাল এক্ষুণি ভেঙে দিতে পারা যায়, গণশা ইচ্ছে করছে না তাই।"

বোধ হয় ইচ্ছা করাইবার জন্যই গণেশের পানে চাহিল। গণেশ বলিল—"এসা শিক্ষা দিতে পারি যে…"

গোরাচাঁদ বলিল—"তাই দে গণশা, যেন চিরকাল মনে থাকে—হাঁ। এক জনের পাল্লায় পড়ে ছিলাম বটে।"

গণেশ তাচ্ছিল্যভাবে নাসিকা একটু কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"গ-গ গণশা মশা মেরে হাত ময়লা করে না।"

খানিকক্ষণ সকলে চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে রাজেন বলিল—"গরীব রাজেনের একটা কথা কানে তুলবে কি?"

সকলে স-প্রশ্ন দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল, ত্রিলোচন জিজ্ঞাসা করিল—"কথাটা কি শুনি?"

রাজেন বলিল—"পুঁটুরাণী গণেশকে ভালবাসে বলেই জব্দ করতে চেয়েছে।"

কে-গুপ্ত কি বলিতে যাইতে ছিল, রাজেন একটু বিরক্তভাবে ডান হাতটা উঁচু করিয়া বলিল—"আপনি দয়া করে থামুন মশাই একটু,—সায়েন্সের ছাত্র এ সব বুঝবেন না।"

কে-গুপ্ত একটু অপ্রতিভভাবে বলিল—"না, বলছিলাম…"

গণশা বলিল—"প-প্লয়ে বল বেন 'খন।"

রাজেন চুপ করিয়া রহিল ভাবিয়া ভাবিয়া বেশ একটি মনোজ্ঞ লেকচার দাঁড় করাইয়া ছিল, বাধা পাইয়া মনটা অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, ত্রিলোচন তাগাদা দিতে কে-গুপ্তকেই প্রশ্ন করিল—"ফল্গু নদী দেখেছেন?"

কে-গুপ্ত জানাইল—না, দেখে নাই।

"অথচ বেহারে থাকেন!"

খোঁচাটুকু দিয়া বোধ হয় একটু তৃপ্তি পাইল, ত্রিলোচনের দিকে চাহিয়া বলিল—"ওপরে দেখো—ধু ধু করছে বালি—এক ফোঁটা জল নেই কোনখানে, পা দাও পুড়ে ফোস্কা হয়ে যাবে, হাত দিয়ে ওপরের বালি একটুখানি সরিয়ে ফেল, তর তর করে জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। তাইত ফল্গু নাম।"

আর কিছু বলিল না। গোরাচাঁদ তাৎপর্যটা একেবারেই বোঝে নাই এবং বোঝে নাই বলিয়াই মনে করিল কোন একটা কথা না বলিলে খারাপ দেখায়, একবার রাজেনের দিকে চাহিয়া লইয়া কে-গুপ্তকে বলিল—"তখন হাত-পা দু'ই ঠাণ্ডা ক'রে নিন্ না।"

বোধ হয় এক গণেশই উপমাটা ঠিকমত বুঝিয়া থাকিবে; কে গুপ্ত আর ত্রিলোচন ব্যস্ত না হইয়া টীকাস্বরূপ আরও কিছু রাজেনের মুখে শুনিবার প্রত্যাশা করিতেছে এমন সময় ঘোঁৎনা আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রায় দুই সপ্তাহ ছিল না। একে পুঁটুরাণীকে লইয়া এই দারুণ সমস্যা, তায় ঘোঁৎনা নাই, তাহাকে পাইয়া সকলে উল্লসিত হইয়া উঠিল। রাজেনের ফল্গুর ধাঁধাটা চাপা পড়িবার আশায় গোরাচাঁদের উল্লাসটা বোধ হয় সব চেয়ে বেশি, দূর হইতেই বলিয়া উঠিল—"কোথায় ছিলেন মশাই? আমরা এখানে এক সমিস্যে নিয়ে সারা হচ্ছি, দেখেও গেলেন, তারপর একেবারে দু'হপ্তা নিরুদ্দেশ!"

ঘোঁৎনা একটা সিগারেট টানিতে টানিতে আসিতেছিল, সেটা গণশার হাতে দিয়া সামনে বসিয়া এক লম্বা গল্প সুরু করিয়া দিল।—সেদিন গণেশদের ওখান থেকে ফিরিতেই বাড়ির সকলে যেন হাঁউ-মাউ খাঁউ করিয়া ঘিরিয়া ফেলিল, কাকা বলিল—'কোথায় থাকিস চোপোর দিন? নে, কাপড়-জামা বদলে নে, আর এক মিনিট সময় নেই।'…ব্যাপার কি?—না, যে দাদাশ্বশুর হইবে সে মর-মর, কি রকম নাৎজামাই হইবে একবার দেখিতে চায়, টেলিগ্রাম আসিয়াছে।…কাছে পিঠের কথা তো নয়—সেই মুরশিদাবাদ।…কখনও হয় দেখা?—বাড়ি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই হরিবোল ধ্বনি উঠিল।…একটা লোক দেখিতে চাহিয়াছিল অথচ দেখিতে না পাইয়া মনে একটা আপশোষ লইয়া মরিল, তাহার শ্রাদ্ধটা পর্যন্ত না থাকিলে ভালো দেখায়? সেটা যদি শেষ হইল তো একদিন বাদ দিয়া জ্ঞাত ভোজন।…একটা লোকের সঙ্গে দু'দিন পরেই একটা কুটুম্বিতার সম্বন্ধ দাঁড়াইতেছে—কখনও ছাড়িতে পারে তাহারা?…সব চুকাইয়া—এই পাঁচটার ট্রেনে নামিয়াছে, বাড়ি আসিতে যাহে পাঁচটা—সুটকেসটা রাখিয়াই সোজা চলিয়া আসিতেছে।

গল্পটা খুঁটিনাটির সহিত শেষ করিলে গোরা ফোঁস করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল—প্রশ্ন করিল—"লোক কি রকম ছিল?…ভালো লোকেরা থাকে না, আর এই দেখ না পুঁটুরাণীর ঠাকুরদাদাকে,—বাঁচী আগলে মার্কণ্ডের পরমায়ু নিয়ে বসে আছে…"

ঘোঁৎনা একটু হাসিয়া বলিল,—"গিন্নীর দাদাশ্বশুর—সে কি রকম লোক

হ'ত আন্দাজ করতেই তো পার।…কিরে তিনু, বল না।"

ত্রিলোচন রগ দুইটা টিপিয়া—মাথা নীচু করিয়া বসিয়াছিল, যেন নিদ্রা থেকে উঠিয়াছে এইভাবে মাথাটা তুলিয়া বলিল—"কি বলছিস?—এক বর্ণও শুনিনি আমি।"

গণশা বলিল—"শুনিনি মানে? ঘুমুচ্ছিলি নাকি?"

ত্রিলোচন আবেগের চোটে দাঁড়াইয়া পড়িল, গণশার পানে চাহিয়া বলিল—"নিরুদ্দেশ!…গোরা বললে না?—আমার তখন থেকে কথাটা কানে লেগে গেছে।—তুই নিরুদ্দেশ হ' গণশা!…"

সকলে তাহার আকস্মিক ভাব-পরিবর্ত্তনে বিস্মিতভাবে তাহার পানে চাহিয়া রহিল, ঘোঁৎনা বলিল—"লোকটা ক্ষেপে গেল নাকি?—নিরুদ্দেশ হবে কি?"

ত্রিলোচন সত্যই নিজের খেয়ালে মাতিয়া গিয়াছিল, সেইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়াই বলিল—"হ্যাঁ, নিরুদ্দেশ হতে হবে, বাঃ, এমন আইডিয়া গোরা মাথায় সাঁদ করিয়ে দিয়েছে! হ' নিরুদ্দেশ, এক ঢিলে দুই পাখি যদি না মারতে পারি…তোরা বাজে কথা কইছিস, এদিকে আমার সমস্ত প্ল্যান ঠিক…"

গণশা বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, ত্রিলোচনের ডান হাতটা ধরিয়া একটা টান দিয়া বলিল—"তুই বোস দিকিন ঠাণ্ডা হয়ে, তোর ঢি-ঢ ঢিলই বা কি আর পাখিই বা কাকে বলছিস শুনি। সেবারে পাকা দেখার প্ল্যান করে তো প্রায় জেলে টেনে তুলেছিল।"

(২)

ত্রিলোচন বলিল—"এক পাখি তোমার মাতুল;—ঘোঁৎনার মতন অতদিনও গা ঢাকা দিতে হবে না, মেরেকেটে একটি হপ্তা কোথাও ঘুপচি মেরে বসে থাকো—'বাপ' বলে ডেকে যদি বিয়ে না দেয় তো ত্রিলোচনের নামে একটা কুকুর পুষো। দ্বিতীয় পাখি—তোমার প্রাণ-পাখি শ্রীমতী পুঁটুরাণী, ওরুফে মৃণালিনী দেবী।—যদি রাজেন যেমন বলছে, ভালোবাসে বলেই জব্দ করবার ফিকির করেছিল তো নিরুদ্দেশের নামেই ফিকির-ফন্দি যে কোথায় চলে যাবে!…সাতদিনও লাগবে না, তিন দিনেই যদি বাড়িতে মরা-কান্না না তোলে তো তখন বোল' ত্রিলোচনকে, বিরহের মতন কোৎকা আর দ্বিতীয়টি নেই বাবা,—বাপের নাম ভুলিয়ে দেয়! দেখতেই তো পাচ্ছি—মেয়েদের পক্ষে তো আরও!"

সকলে চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে ঘোঁৎনা বলিল—"নিরুদ্দেশ হয়ে যাবেটা কোথায়? খাবেই বা কি?"

গণশা বলিল—"এ তো আর ঘোঁৎনার নি-নিরুদ্দেশ নয়, দাদাশ্বশুর ফৌৎ হয়ে দু'হপ্তার চর্ব্য-চোষ্যের ব্যাবস্থা করে দিয়ে গেল…"

ত্রিলোচন উত্তর করিল—গরীবের সব প্ল্যানটা শোনই আগে দয়া করে।"

ঘোঁৎনা বলিল—"বলই না শুনি।"

—"খিদিরপুর মনসাতলায় আমার এক দূর সম্পর্কের মামা-শ্বশুর আছে, নাম বিনোদ বেহারী। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, গণশা গিয়ে সেখানে উঠুক। ভাগ্নীজামায়ের বন্ধু, আদরেই থাকবে। দিব্যি খাক দাক, সমস্ত দিন ডক্, চিড়িয়াখানা দেখে ঘুরে বেড়াক। ইচ্ছে হোল সাতটা দশের ষ্টীমারটায় এসে আমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে এখানকার হালচাল মালুম করে আবার আটটা ছাব্বিশেরটাতে ফিরে গেল। আমরা মুখ চুণ করে মাঝে মাঝে ওর মামার কাছে যাই, মামা, মামীমা জিগেস করছে—জানো তোমরা কোথায় উধাও হোল সে ছোঁড়া?…আমরা কি জানি মশাই। শিবপুর থেকে নিয়ে কলকাতা পর্য্যন্ত তামাম জায়গা চষে ফেললাম পাঁচজনে মিলে, এতল্লাটে থাকলে একদিন না একদিন পড়তই চোখে; বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গেল না তো? এদানি যেন সেই ধরণেরই মতিগতি হয়ে আসছিল—কথা-বার্ত্তায় এই রকমটা মনে হত।…মানে, একটু একটু করে মন ভিজিয়ে আনা আর কি, তারপর ঘোঁৎনা গিয়ে না হয় কথাটা তুলুক—বলুক গণশার ফটো দিয়ে একটা বিজ্ঞাপন বের করে দিতে—'মামা নিদারুণ উদ্বিগ্ন, মামী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শয্যা গ্রহণ করিয়াছে—গণেশ তুমি কোথায় আছ সত্বর ফিরিয়া আইস। এই কি তোমার কর্ত্তব্যজ্ঞান? এই কি তোমার পিতৃতুল্য মাতুল-মাতুলানীর প্রতি ভক্তি?'…এই রকম বানিয়ে বানিয়ে—সে রাজেন রয়েছে, লিখে দেবে'খন। এলে তাড়াতাড়ি গণশার বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারী করে ফেলার পরামর্শ দেওয়া। এদিকে গোরা

গিয়ে তার মাসীর বাড়িতে রটিয়ে দিক কথাটা, এ কাণ সে-কাণ হ'তে হ'তে সেটা পুঁটুরাণীর কাণে উঠুক। যদি দেখা গেল, রাজেন যা বলছে তাই ঠিক, মানে বিরহটা পুঁটুরাণীর শক্তিশেলের মতন লেগেছে তো তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা পাকা করে ফেলবার ব্যবস্থা করতে হবে, নয়তো গণশার জন্তে অমন কতশত পুঁটুরাণী হা-পিত্যেশ করে আছে, কোন না কোন এক জায়গায় লাগিয়ে দিলেই হবে।…এই আমার প্ল্যান, দেখ ভেবে।"—বলিয়া আস্তে আস্তে পকেট থেকে একটা সিগারেটের ডিবা বাহির করিল।

সকলে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ত্রিলোচন দেশলাই জ্বালিয়া সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিল, ঠোঁটের এক পাশ দিয়া খানিকটা ধুঁয়া ছাড়িয়া বলিল—"বলবে, মামা যে রাজি হবে তার গ্যারাণ্টি কি? ঐ তো মামা—না দেবায়, না ধর্ম্মায়।…বেশ, মামী রয়েছে, তাকে শয্যা-শায়ী করে তোলা শক্ত হবে না, তখন ভাগ্নের জন্তে না হোক, পরিবারের জন্তেও তো…"

রাজেন বলিল—"আমার মত যদি জিগ্যেস কর তো মামাকেও নেমে আসতে হবে। যতক্ষণ চোখের সামনে রয়েছে ততক্ষণ যাই বলুক, যাই করুক, নিরুদ্দেশের নাম শুনে কি নিজের কোট ধরে বসে থাকতে পারে? গায়ে মানুষের চামড়া আছে তো? বোনের ছেলে, সে বোনও নেই আবার—রাগ করে ভাত না খাওয়া নয়, একেবারে নিরুদ্দেশ!…শুনলেও শিউড়ে উঠতে হয়!"

ঘোঁৎনা বলিল—"আরও একটা ভেবে দেখবার কথা,—ওয়ারিশান তো এই গণশা, সে নিরুদ্দেশ হলে এতবড় সম্পত্তিটা জামাইয়ের পেটে যাবে, সেটা কি বোঝে না ওর মামা?…দেখি সিগারেটটা!"

একটা টান দিয়া তাহার হাতে সিগারেটটা দিয়া ত্রিলোচন বলিল—

—"এখন গণেশ কি বলে শোনা যাক। কি রে গণশা?"

গণশা সংক্ষেপে বলিল—"ওদিকেও সেই মা-মামা তো?"

এ সাদৃশ্যটা কেহ অতটা মিলাইয়া দেখে নাই, প্ল্যানের মধ্যে এত বড় একটা খুঁৎ রহিয়াছে দেখিয়া সবাই যেন একটু নিরুৎসাহ হইয়া চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে ত্রিলোচনই কথা কহিল। বলিল—"তাহ'লে পরিচয়টা আর একটু খোলসা করে দিই, দেখবে কি রকম আট-ঘাট বেঁধে এগুচ্ছি আমি। খিদিরপুর-আলিপুরের মধ্যে বিনোদ মামার মতন খালিফা লোক আর দ্বিতীয়টি নেই। একা মানুষ, এই লিকলিকে চেহারা, কিন্তু এমন কাজ নেই যাতে বিনু মামার মাথা খেলে না। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত যে-কোন কাজে লাগিয়ে দাও না কেন—পরিপাটি করে সেরে দেবে। অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ আছে, হোমিওপ্যাথি, ইনসিওরেন্সের দালালি, কনট্রাকটারি, দরকার দেখলে খিদিরপুরের কুলিদের ক্ষেপিয়ে ধর্ম্মঘট করিয়ে দিলে; ঘটকালিও করে মাঝে মাঝে, কালীঘাটে যাত্রীদের একটা হোটেলও আছে, আর মকদ্দমার মাথা!—আলিপুরের 'তা বড় 'তা-বড় কৌঁসিলিতে যে-সব মকদ্দমায় হদিস পায় না, বিনু মামা একবার শুনে গিয়ে…"

নিরুদ্দেশ

পুঁটুরানীর আচরণে সকলেই মর্মাহত হইয়াছে। ঐ এক ফোঁটা মেয়ে, দেখিলে মনে হয় ভাজা মাছটি উল্টাইয়া খাইতে জানে না, তারপেটে এই জিলিপির প্যাঁচ। এত বড় একটা কূট-চাল চালিয়া বসিল।

ত্রিলোচন বলিল—"চাল এক্ষুণি ভেঙে দিতে পারা যায়, গণশা ইচ্ছে করছে না তাই।"

বোধ হয় ইচ্ছা করাইবার জন্যই গণেশের পানে চাহিল। গণেশ বলিল—"এসো শিক্ষা দিতে পারি যে…"

গোরাচাঁদ বলিল—"তাই দে গণশা, যেন চিরকাল মনে থাকে—হাঁ। এক জনের পাল্লায় পড়ে ছিলাম বটে।"

গণেশ তাচ্ছিল্যভাবে নাসিকা একটু কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"প-প গণশা মশা মেরে হাত ময়লা করে না।"

খানিকক্ষণ সকলে চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে রাজেন বলিল—"গরীব রাজেনের একটা কথা কাণে তুলবে কি?"

সকলে স-প্রশ্ন দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল, ত্রিলোচন জিজ্ঞাসা করিল—"কথাটা কি শুনি?"

রাজেন বলিল—"পুঁটুরাণী গণেশকে ভালবাসে বলেই জব্দ করতে চেয়েছে।"

কে-গুপ্ত কি বলিতে যাইতে ছিল, রাজেন একটু বিরক্তভাবে ডান হাতটা উঁচু করিয়া বলিল—"আপনি দয়া করে থামুন মশাই একটু,—সায়েন্সের ছাত্র এ সব বুঝবেন না।"

কে-গুপ্ত একটু অপ্রতিভভাবে বলিল—"না, বলছিলাম…"

গণশা বলিল—"প-প্রশ্নে বল বেন 'খন।"

রাজেন চুপ করিয়া রহিল, ভাবিয়া ভাবিয়া বেশ একটি মনোজ্ঞ লেকচার দাঁড় করাইয়া ছিল, বাধা পাইয়া মনটা অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, ত্রিলোচন তাগাদা দিতে কে-গুপ্তকেই প্রশ্ন করিল—"ফল্গু নদী দেখেছেন?"

কে-গুপ্ত জানাইল—না, দেখে নাই।

"অথচ বেহারে থাকেন!"

খোঁচাটুকু দিয়া বোধ হয় একটু তৃপ্তি পাইল, ত্রিলোচনের দিকে চাহিয়া বলিল—"ওপরে দেখো—ধু ধু করছে বালি—এক ফোঁটা জল নেই কোনখানে, পা দাও পুড়ে ফোস্কা হয়ে যাবে, হাত দিয়ে ওপরের বালি একটুখানি সরিয়ে ফেল, তর তর করে জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। তাইত ফল্গু নাম।

আর কিছু বলিল না। গোরাচাঁদ তাৎপর্যটা একেবারেই বোঝে নাই এবং বোঝে নাই বলিয়াই মনে করিল কোন একটা কথা না বলিলে খারাপ দেখায়, একবার রাজেনের দিকে চাহিয়া লইয়া কে-গুপ্তকে বলিল—"তখন হাত-পা দু'ই ঠাণ্ডা ক'রে নিন না।"

বোধ হয় এক গণেশই উপমাটা ঠিকমত বুঝিয়া থাকিবে; কে গুপ্ত আর ত্রিলোচন ব্যস্ত না হইয়া টীকাস্বরূপ আরও কিছু রাজেনের মুখে শুনিবার প্রত্যাশা করিতেছে এমন সময় ঘোঁৎনা আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রায় দুই সপ্তাহ ছিল না। একে পুঁটুরাণীকে লইয়া এই দারুণ সমস্যা, তায় ঘোঁৎনা নাই, তাহাকে পাইয়া সকলে উল্লসিত হইয়া উঠিল। রাজেনের কসুর ধাঁধাটা চাপা পড়িবার আশায় গোরাচাঁদের উল্লাসটা বোধ হয় সব চেয়ে বেশি, দূর হইতেই বলিয়া উঠিল—"কোথায় ছিলেন মশাই? আমরা এখানে এক সমিস্যে নিয়ে সারা হচ্ছি, দেখেও গেলেন, তারপর একেবারে দু'হপ্তা নিরুদ্দেশ!"

ঘোঁৎনা একটা সিগারেট টানিতে টানিতে আসিতেছিল, সেটা গণশার হাতে দিয়া সামনে বসিয়া এক লম্বা গল্প সুরু করিয়া দিল।—সেদিন গণেশদের ওখান থেকে ফিরিতেই বাড়ির সকলে যেন হাঁউ-মাউ-খাঁউ করিয়া ঘিরিয়া ফেলিল, কাকা বলিল—'কোথায় থাকিস চোপোর দিন? নে, কাপড়-জামা বদলে নে, আর এক মিনিট সময় নেই।'…ব্যাপার কি?—না, যে দাদাশ্বশুর হইবে সে মর-মর, কি রকম নাৎজামাই হইবে একবার দেখিতে চায়, টেলিগ্রাম আসিয়াছে।…কাছে পিঠের কথা তো নয়—সেই মুর্শিদাবাদ।…কখনও হয় দেখা?—বাড়ি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই হরিবোল ধ্বনি উঠিল।…একটা লোক দেখিতে চাহিয়াছিল অথচ দেখিতে না পাইয়া মনে একটা আপশোষ লইয়া মরিল, তাহার শ্রাদ্ধটা পর্যন্ত না থাকিলে ভালো দেখায়? সেটা যদি শেষ হইল তো একদিন বাদ দিয়া ভাত ভোজন।…একটা লোকের সঙ্গে দু'দিন পরেই একটা কুটুম্বিতার সম্বন্ধ দাঁড়াইতেছে—কখনও ছাড়িতে পারে তাহারা?…সব চুকাইয়া—এই পাঁচটার ট্রেণে নামিয়াছে, বাড়ি আসিতে সাড়ে পাঁচটা—সুটকেসটা রাখিয়াই সোজা চলিয়া আসিতেছে।

গল্পটা খুঁটিনাটির সহিত শেষ করিলে গোরা ফোঁস করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল—প্রশ্ন করিল—"লোক কি রকম ছিল?…ভালো লোকেরা থাকে না, আর এই দেখ না পুঁটুরাণীর ঠাকুরদাদাকে,—বাগে মার্কণ্ডের পরমায়ু নিয়ে বসে আছে…"

ঘোঁৎনা একটু হাসিয়া বলিল,—"গিন্নীর দাদাশ্বশুর—সে কি রকম লোক

হ'ত আন্দাজ করতেই তো পার।···কিরে তিনু, বল না।"

ত্রিলোচন মগ দুইটা টিপিয়া—মাথা নীচু করিয়া বসিয়াছিল, যেন নিদ্রা থেকে উঠিয়াছে এইভাবে মাথাটা তুলিয়া বলিল—"কি বলছিস?—এক বর্ণও শুনিনি আমি।"

গণশা বলিল—"শুনিনি মানে? ঘুমুচ্ছিলি নাকি?"

ত্রিলোচন আবেগের চোটে দাঁড়াইয়া পড়িল, গণশার পানে চাহিয়া বলিল—"নিরুদ্দেশ!···গোরা বললে না?—আমার তখন থেকে কথাটা কানে লেগে গেছে।—তুই নিরুদ্দেশ হ' গণশা!···"

সকলে তাহার আকস্মিক ভাব-পরিবর্ত্তনে বিস্মিতভাবে তাহার পানে চাহিয়া রহিল, ঘোঁৎনা বলিল—"লোকটা ক্ষেপে গেল নাকি?—নিরুদ্দেশ হবে কি?"

ত্রিলোচন সত্যই নিজের খেয়ালে মাতিয়া গিয়াছিল, সেইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়াই বলিল—"হাঁ, নিরুদ্দেশ হতে হবে, বাঃ, এমন আইডিয়া গোরা মাথায় গাঁদ করিয়ে দিয়েছে! হ' নিরুদ্দেশ, এক ঢিলে দুই পাখি যদি না মারতে পারি···তোরা বাজে কথা কইছিস, এদিকে আমার সমস্ত প্ল্যান ঠিক···"

গণশা বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, ত্রিলোচনের ডান হাতটা ধরিয়া একটা টান দিয়া বলিল—"তুই বোস দিকিন ঠান্ডা হয়ে, তোর চি-চ ঢিলই বা কি আর প-পাখিই বা কাকে বলছিস শুনি। সেবারে পাকা-দেখার প্ল্যান করে তো প্রায় জে জেলে টেনে তুলেছিলি।"

(২)

ত্রিলোচন বলিল—"এক পাখি তোমার মাতুল;—ঘোঁৎনার মতন অন্তদিনও গা ঢাকা দিতে হবে না, মেরেকেটে একটি হপ্তা কোথাও ঘুপচী মেরে বসে থাকো—'বাপ' বলে ডেকে যদি বিয়ে না দেয় তো ত্রিলোচনের নামে একটা কুকুর পুষো। দ্বিতীয় পাখি—তোমার প্রাণ-পাখি শ্রীমতী পুঁটুরাণী, ওরফে মৃণালিনী দেবী।—যদি রাজেন যেমন বলছে, ভালোবাসে বলেই জব্দ করবার ফিকির করেছিল তো নিরুদ্দেশের নামেই ফিকির-ফন্দি যে কোথায় চলে যাবে!···সাতদিনও লাগবে না, তিন দিনেই যদি খাড়িতে মরা-কান্না না তোলে তো তখন বোল' ত্রিলোচনকে, খিরছের মতন কোৎকা আর দ্বিতীয়টি নেই বাবা, —বাপের নাম ভুলিয়ে দেয়! দেখতেই তো পাচ্ছি—মেয়েদের পক্ষে তো আরও।"

সকলে চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে ঘোঁৎনা বলিল—"নিরুদ্দেশ হয়ে যাবেটা কোথায়? খাবেই বা কি?"

গণশা বলিল—"এ তো আর ঘোঁৎনার নি-নিরুদ্দেশ নয়, দাদাশ্বশুর কোৎ হয়ে দু'হপ্তার চব্য-চোষ্যের ব্যা-ব্যাবস্থা করে দিয়ে গেল···"

ত্রিলোচন উত্তর করিল—"গরীবের সব প্ল্যানটা শোনই আগে দয়া করে।"

ঘোঁৎনা বলিল—"বলই না শুনি।"

—"খিদিরপুর মনসাতলায় আমার এক দূর সম্পর্কের মামা-শ্বশুর আছে, নাম বিনোদ বেহারী। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, গণশা গিয়ে সেখানে উঠুক। ভাগীজামায়ের বন্ধু, আদরেই থাকবে। দিব্যি খাক দাক, সমস্ত দিন ঘুরুক, চিড়িয়াখানা দেখে ঘুরে বেড়াক। ইচ্ছে হোল সাতটা দশের স্টীমারটায় এসে আমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে এখানকার হালচাল মালুম করে আবার আটটা ডাক্তিশেরটাতে ফিরে গেল। আমরা মুখ চুপ করে মাঝে মাঝে ওর মামার কাছে যাই, মামা, মামীমা জিগ্যেস করছে—জানো তোমরা কোথায় উধাও হোল সে ছোঁড়া?···আমরা কি জানি মশাই। শিবপুর থেকে নিয়ে কলকাতা পর্য্যন্ত তামাম জায়গা চষে ফেললাম পাঁচজনে মিলে, এতল্লাটে থাকলে একদিন না একদিন পড়তই চোখে; বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গেল না তো? এদানি যেন সেই ধরণেরই মতিগতি হয়ে আসছিল—কথা-বার্ত্তায় এই রকমটা মনে হ'ত!···মানে, একটু একটু করে মন ভিজিয়ে আনা আর কি, তারপর ঘোঁৎনা গিয়ে না হয় কথাটা তুলুক—বলুক গণশার ফটো দিয়ে একটা বিজ্ঞাপন বের করে দিতে—'মামা নিদারুণ উদ্বিগ্ন, মামী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শয্যা গ্রহণ করিয়াছে—গণেশ তুমি কোথায় আছ সত্বর ফিরিয়া আইস। এই কি তোমার কর্ত্তব্যজ্ঞান? এই কি তোমার পিতৃতুল্য মাতুল মাতুলানীর প্রতি ভক্তি?'··· এই রকম বানিয়ে বানিয়ে—সে রাজেন রয়েছে, লিখে দেবে'খন। এলে তাড়াতাড়ি গণশার বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারী করে ফেলার পরামর্শ দেওয়া। এদিকে গোড়া

গিয়ে তার মাসীর বাড়িতে রটিয়ে দিক কথাটা, এ কাণ সে-কাণ হ'তে হ'তে সেটা পুঁটুরাণীর কানে উঠুক। যদি দেখা গেল, রাজেন যা বলছে তাই ঠিক, মানে বিরহটা পুঁটুরাণীর শক্তিশেলের মতন লেগেছে তো তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা পাকা করে ফেলবার ব্যবস্থা করতে হবে, নয়তো গণশার জন্যে অমন কতশত পুঁটুরাণী হা-পিত্যেশ করে আছে, কোন না কোন এক জায়গায় লাগিয়ে দিলেই হবে।···এই আমার প্ল্যান, দেখ ভেবে।"—বলিয়া আস্তে আস্তে পকেট থেকে একটা সিগারেটের ডিবা বাহির করিল।

সকলে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ত্রিলোচন দেশলাই জ্বালিয়া সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিল, ঠোঁটের এক পাশ দিয়া খানিকটা ধূঁয়া ছাড়িয়া বলিল—"বলবে, মামা যে রাজি হবে তার গ্যারান্টি কি? ঐ তো মামা—না দেবার, না থোবার।···বেশ, মামী রয়েছে, তাকে শয্যা-শায়ী করে তোলা শক্ত হবে না, তখন তাদের জন্যে না হোক, পরিবারের জন্যেও তো···"

রাজেন বলিল—"আমার মত যদি জিগ্যেস কর তো মামাকেও নেমে আসতে হবে। যতক্ষণ চোখের সামনে রয়েছে ততক্ষণ যাই বলুক, যাই করুক, নিরুদ্দেশের নাম শুনে কি নিজের কোর্ট ধরে বসে থাকতে পারে? গায়ে মানুষের চামড়া আছে তো? বোনের ছেলে, সে বোনও নেই আবার—রাগ করে ভাত না খাওয়া নয়, একেবারে নিরুদ্দেশ!···শুনলেও শিউরে উঠতে হয়!"

ঘোঁৎনা বলিল—"আরও একটা ভেবে দেখবার কথা,—ওয়ারিসান তো এই গণশা, সে নিরুদ্দেশ হলে এতবড় সম্পত্তিটা জামাইয়ের পেটে যাবে, সেটা কি খেয়াল না ওর মামা?···দেখি সিগারেটটা!" একটা টান দিয়া তাহার হাতে সিগারেটটা দিয়া ত্রিলোচন বলিল—

—"এখন গণেশ কি বলে শোনা যাক। কি রে গণশা?"

গণশা সংক্ষেপে বলিল—"ওদিকেও সেই মা-মামা তো?"

এ সামুক্তটা কেহ অতটা মিলাইয়া দেখে নাই, প্ল্যানের মধ্যে এত বড় একটা খুঁৎ রহিয়াছে দেখিয়া সবাই যেন একটু নিরুৎসাহ হইয়া চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে ত্রিলোচনই কথা কহিল। বলিল—"তাহ'লে পরিচয়টা আর একটু খোলসা করে দিই, দেখবে কি রকম আট-ঘাট বেঁধে এগুচ্ছি আমি। খিদিরপুর-আলিপুরের মধ্যে বিনোদ মামার মতন খালিফা লোক আর দ্বিতীয়টি নেই। একা মানুষ, এই লিকলিকে চেহারা, কিন্তু এমন কাজ নেই যাতে বিনু মামার মাথা খেলে না। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত যে-কোন কাজে লাগিয়ে দাও না কেন—পরিপাটি করে সেরে দেবে। অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ আছে, হোমিওপ্যাথি, ইনসিওরেন্সের দালালি, কনট্রাক্টারি, দরকার দেখলে খিদিরপুরের কুলিদের ক্ষেপিয়ে ধর্ম্মঘট করিয়ে দিলে; ঘটকালিও করে মাঝে মাঝে, কালীঘাটে যাত্রীদের একটা হোটেলও আছে; আর মকদ্দমায় মাথা!—আলিপুরের 'তা বড় 'তা-বড় কৌঁসুলিতে যে-সব মকদ্দমায় হদিস প্রায় না, বিনু মামা একবার শুনে গিয়ে···"

ঘোঁৎনা বলিল—"আমার একটা কথা মনে হচ্ছে, ঐ-মামা হচ্ছে এই মামার দাবাই, কণ্টকেনৈব কণ্টকম্‌···"

কে-গুপ্ত এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, প্রশ্ন করিল—"তিলুবাবু দেখছেন তাঁকে, কি তাঁর বাড়ি গেছেন?"

ঘোঁৎনা সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করিল—"আপনি জর্জ দি ফিফ্‌থ, কি প্রেসিডেণ্ট উইলসনকে দেখেছেন? তাদের বাড়ি গেছেন?···তারা নেই তা হলে—বাড়িঘর দোরও নেই তাদের?—রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে বেড়ায়?" দলের মধ্যে গণেশের পরেই ঘোঁৎনার স্থান, তাহার কাছে এতবড় একটা সমর্থন পাইয়া ত্রিলোচন উৎসাহিত হইয়া উঠিল, একটু নড়িয়া চড়িয়া বলিল—"আমিও তো সেই কথা ভেবে রেখেছি,—মা লুকিয়ে একটি একটি করে বিনোদ মামাকে আমাদের সব কথা বলা, বলে ধরে পড়া—আপনি একটা বিহিত করে দিন···দেবেই, এদিকে যে বড্ড পরোপকারী আবার—"

রাজেন বলিল—"তায় কুটুমের বন্ধু···"

কে-গুপ্ত ভয়ে ভয়ে বলিল—"আমার একটা কথা মনে হচ্ছে—মানে—দিন চার পাঁচ কি হপ্তাখানেক থাকা কিছু নয়; কিন্তু ধরুন যদি মামার মন ভিজতে দেরি হোল, মাসখানেক থাকতে হোল—খরচা না দিয়ে থাকা—আর যে রকম লোক শুনছি···"

রাজেন, গোরাচাঁদ, ত্রিলোচন একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—"নেয় কখনও খরচ মশাই! কুটুমের বন্ধু—আর অভাবই বা কিসের তার?"

গণশা নির্লিপ্তভাব আনিবার চেষ্টা করিয়া একটু বিরক্তভাবে বলিল—"আর শুনছেন প-প-পরোপকারী।"

আরও অনেক রাত্রি পর্যন্ত আলোচনা হইয়া অবশেষে নিরুদ্দেশ হওয়াই সাব্যস্ত হইল।

(৩)

পরদিন আর হইয়া উঠিল না। চৌধুরীদের বাড়ি একটা বড় কাজ ছিল, পরিবেষণটা সামলাইয়া দিবার জন্য আগে থাকিতে গণশাকে বলা ছিল। তাহার পরদিনও নয়,—গোরাচাঁদকে সামলাইতে গেল।

তৃতীয় দিন বেলা আন্দাজ দুইটার সময় সকলে কালীঘাট ট্রাম ডিপোয় আসিয়া নামিল,—এক কে-গুপ্ত ছাড়া; তাহার কলেজ, আসিতে পারিল না। গলিটা খুঁজিয়া বাহির করিতে এবং তাহার পর সেই নানা কিক্‌ বির গলিতে বাড়িটা বাহির করিতে ঘণ্টা দেড়েক লাগিয়া গেল। শীতকাল, সঙ্গে একটি মাঝারি গোছের বিছানার মোট আছে,— ত্রিলোচনের বাড়ি থেকে সংগ্রহ করা,—পারাপারি করিয়া সকলে বহন করিতেছে। প্রায় সাড়ে তিনটার সময় সকলে ৭৭।১।১ক এর সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল। গলির অবস্থা দেখিয়া যেটুকু বা উৎসাহ অবশিষ্ট ছিল, বাড়ি দেখিয়া একেবারে উবিয়া গেল।—

একটানা খানিকটা টিনের চালের উপর খাপড়া বসান,— ভিতরে বোধ হয় খানতিনেক ঘর আছে। একপাশে একটা অপেক্ষাকৃত ছোট টিনের চাল, তাহার উপর খাপড়া নাই, মনে হয় রান্নাঘর। তাহার পাশেই, উঠানের একটা কোণ ঘেঁষিয়া একটা ছোট বিচালির গাদা, মাথাটা দেখা যাইতেছে। সামনে, গলির উপর একটা ঘর, টিনের চাল, ছাঁচাবেড়ার দেয়াল, মাটি দিয়া পরিষ্কার করিয়া লেপা, বাহিরের দিকে একটা দরজা আছে, বন্ধ। এই ঘরের বাহিরের দিকের দেয়ালের সঙ্গে টানা বাড়ির ইটের দেয়ালটা, খুব নীচু, মাঝখানে একটা দরজা, তার প্যানেলগুলার মধ্যে খানতিনেক দেবদারু কাঠের, খানতিনেক ক্যারোসিন তেলের টিনের। বাইরের ঘরের দরজার এক পাশে একটা ঝকঝকে সাইন বোর্ড, লেখা আছে বিনোদবিহারী গাঙ্গুলী, এইচ-এম বি, কনট্র্যাকটার, অর্ডার সাপ্লায়ার, জেনারেল মার্চেণ্ট, এট্‌সেটরা, এট্‌সেটরা। ম্যারেজ সেটেল্‌ড বাই পোষ্ট। এন্‌কোয়ার উইদিন।

চারজনে খুব চুপ করিয়া পরস্পরের পানে চাহিল, ত্রিলোচন কাঁচা গলিটাতে প্রবেশ করা অবধি কাহারও মুখের পানে চাহিতে পারে নাই, সদর ঘরের দরজায় দুইটা আঘাত দিয়া ডাকিল—"মামা! বিনোদ মামা!"

উত্তর না পাইয়া আবার ডাকিল,—"গাঙ্গুলী মশাই!"

কোন উত্তর নাই।

ঘোঁৎনা বলিল—"ফিরে চল, ভালোই হোল।"

ত্রিলোচন ফিরে যাওয়ার কথায় জিজ্ঞাসু নেত্রে গণশার পানে চাহিল। গণশা বলিল—"ফ-ফ-ফুরৎ থাকলে তো দেখা করবে; মার্টিনের ব-বড় সায়েবের বাড়ি এনে তুলেছিস!"

ফিরিয়া যাইবার জন্য সকলে ঘুরিয়াছে, গোরাচাঁদ বিছানার গাঁঠরিটা কাঁধে তুলিয়াছে, একটি মাঝবয়সী ভদ্রলোক আসিয়া সামনে দাঁড়াইল, প্রশ্ন করিল—"কাকে চাও?"

অত্যন্ত রোগা, গাল, রগ তোবড়ান; হ্রস্ব, খর্বাকৃতি নাক, মাথার চুল খুব পাৎলা এবং দীর্ঘ, বাঁ দিকে একজোড়া জটা। পরনে রক্তাম্বর, গায়ে একটা ফতুয়া, ঐ রঙেই ছোবান। ডান হাতের অনামিকায় একটা কুশের আংটি।

ত্রিলোচন বলিল—"বিনোদ গাঙ্গুলী মশাইকে।"

—"সামনেই দাঁড়িয়ে, কি দরকার?"

ত্রিলোচন একটু ভ্যাবাচাকা খাইয়া চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর আমতা আমতা করিয়া বলিল—"আমি হচ্ছি, কালসিটের গোবিন্দ চক্রবর্তীর মধ্যম জামাতা।"

—"উত্তম কথা।"

ত্রিলোচন বোধহয় অভ্যর্থনার আশায় একবার বন্ধদুয়ার সদর ঘরটার পানে আড়ে চাহিয়া লইল, কথার কোন যুৎ না পাইয়া বলিল—"আমি মধ্যম জামাতা আর এ-হচ্ছে শিবপুরের গণেশ, নাম শুনেছেন নিশ্চয়।"

(১২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

"সামনেই দাঁড়িয়ে; কি দরকার?"

আলো
যা' আজও জ্বলে
যে সব মানব মানবীকে অবলম্বন ক'রে গল্প পর্য্যন্ত গ'ড়ে উঠেছে, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গল্ সেই দুর্লভদের মধ্যে একজন। তার কারণ তাঁর অপূর্ব্ব সেবাব্রত, ইতিহাসে যার তুলনা বিরল। তিনি যে আলো জ্বালিয়েছিলেন তা আজও আমাদের পথ দেখায়। আজ যখন আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোক ওষুধের অভাবে অকথ্য কষ্ট পাচ্ছে, তাঁর আদর্শ আমাদের কাছে আসে জীবন্ত প্রেরণার মত। এই অভাব দূর করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করব ব'লে আমরা পণ করেছি। পথে বিঘ্নের শেষ ছিল না; কিন্তু আজ সানন্দে ব'লতে পারি সে বাধা আমরা অতিক্রম করেছি। আজ তাই নিঃসঙ্কোচে দেশবাসীর হাতে আমাদের তৈরী ওষুধ তুলে দিতে অগ্রসর হয়েছি।

নারীহিতৈষী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

(১০৯ পৃষ্ঠার পর)

তোমার ভবিষ্য বাণী অক্ষরে অক্ষরে
ফলিয়াছে। তুমি যারে 'সঞ্জীবনী' পত্রে
কল্পনায় হেরেছিলে এ প্রয়াগক্ষেত্রে
এই দেখ আসিয়াছে সত্যই সে বর
ভি, পি, পার্শ্বেলেতে মরি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।"

'প্রদীপে' এবং প্রথমদিকের 'প্রবাসী'তে তিনি বাঙালী যুবকদিগকে প্রেমের কবিতা লিখিয়া মাসিকপত্রে প্রেরণ করিতে নিষেধ করিতেন। যাঁহারা শ্বশুরের রক্ত শোষণ করিয়া বিবাহ করেন, তাঁহাদের লেখা প্রেমের কবিতা ছাপাইবার উৎসাহ সম্পাদকের ছিল না। বাংলা ১৩২০-তে স্নেহলতার আত্মহত্যার পর 'প্রবাসী'তে দেবেন্দ্রনাথ সেনের উপরি-উক্ত সচিত্র কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হয় এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া সম্পাদক বরপণ ও কন্যার অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ মন্তব্য ও নিবন্ধাদি লেখেন। এই সময়ই তিনি লিখিয়াছিলেন, "শুনিয়াছি, বঙ্গসাহিত্য প্রেমের কবিতার জন্য বিখ্যাত। তবে, বাঙালী যুবক বিবাহ বিষয়ে এমন অপ্রেমিক, অর্থপিচাশ, কাপুরুষ কেন?...যিনি কেবল প্রেমের পাত্রীকেই চান, টাকা মান সম্পদাদি আর কিছুর দিকে দৃক্‌পাত করেন না, তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রেমিক। নতুবা কেহ যদি প্রেমের কবিতা লিখিয়া বঙ্গের সমুদয় সম্পাদককে হয়রাণ করিয়া ফেলেন এবং বিবাহের সময় দরিদ্র শ্বশুরের নিকট হইতেও বাপমাকে টাকা লইতে দেন, তাহা-হইলে তাঁহাকে পুরুষাধম, কাপুরুষ, অপ্রেমিক বলা ভিন্ন উপায় কি?"

দক্ষিণ আফ্রিকায় কোন কোন স্থানে একশত পুরুষের মধ্যে মাত্র ত্রিশটি নারীর স্থান হওয়াতে নারীর যে দুর্গতি সে সব স্থানে হইয়াছে, যে ঈর্ষা, অপবিত্রতা ও হত্যাদি গুরুতর পাপ পর্য্যন্ত ছড়াইয়াছে, ভারতীয় বিবাহকে বিবাহ বলিয়া অস্বীকার করাতে ভারতীয়দের স্ত্রী ও সন্তানদের আইনের চক্ষে যে হীনতা এবং কার্য্যক্ষেত্রে যে অকথ্য নির্য্যাতন ও অপমান সহিতে হইয়াছে, তাহার প্রতিকারের জন্য তিনি প্রথম দিন হইতে যেন এই অত্যাচারিতা ও উৎপীড়িতাদের পাশে দাঁড়াইয়া লড়িয়াছেন।

কলিকাতায় দক্ষিণ আফ্রিকা ও ফিজির ভারতীয় নারীদের দুর্গতির প্রতিকারকল্পে প্রথম যে নারী-সভা হয়, রামানন্দই তাহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি।

তিনি মনে করিতেন, যে-দেশে নারী কেরোসিনে কাপড় ভিজাইয়া পুড়িয়া মরে, যে-দেশে বধূকে তপ্তলোহার ছেঁকা দেয়, যে-দেশে রাজারাজড়ারা বহু রাণী ও দাসী-দ্বারা পরিবৃত, সে দেশ অধঃপতিত থাকিবে ইহা বিচিত্র নয়।

স্বামী ও শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা যে বধূদের উপর অত্যাচার করে ইহা বাঙালী সমাজেরই বিশেষ কলঙ্ক বলিয়া তিনি লজ্জা অনুভব করিতেন এবং এ বিষয়ে দেশবাসী পুরুষ-দের বারে বারে কঠোর কথা শুনাইতেন।

১৩৩১-এ রামানন্দ লিখিয়াছিলেন, "নারীর উপর অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব বাংলা দেশে অত্যন্ত বাড়িয়াছে।...বাঙালীর ইহা অপেক্ষা কলঙ্ক আর নাই। যুবকেরা এই কলঙ্ক মোচন করুন। নতুবা বাঙালী জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হউক।" আর একবার তিনি লেখেন, "সমুদয় পৃথিবীতে নরমাংস ভোজনের বিরুদ্ধে যেমন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্কার ও লোকমত জন্মিয়াছে, নারীর উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধেও তেমনি একটি প্রবল সংস্কার ও লোকমত বদ্ধমূল হইলে বুঝিব যে, পৃথিবীর লোক সভ্য হইয়াছে।"

নারীর প্রতি পিশাচপ্রকৃতি মানুষের অমানুষিক অত্যাচার নিবারণ এবং অনেক শ্বশুরবাড়ীর আত্মীয়দের অত্যাচার নিবারণের জন্যও রামানন্দ যত চিন্তা করিয়াছিলেন এবং যতদিন ধরিয়া লেখনী চালনা প্রভৃতি করিয়াছিলেন, দাসত্বপ্রথা দূর করিবার জন্য বড় বড় মানব-হিতৈষীদের আন্দোলনের তুলনায় এবং স্বাধীনতালাভ-চেষ্টায় দেশ-প্রেমিকদের আন্দোলনের তুলনায় তাহা কম বলিয়া মনে হয় না। কোন কোন সময় 'প্রবাসী'তে নারী নির্য্যাতন প্রসঙ্গে তিনি বত্রিশ পৃষ্ঠা ধরিয়া প্রতিকারের নানাকথা আলোচনা করিয়াছেন।

রামানন্দ নারীকে কেবল নারী বলিয়া সম্মান করিতেন না, আত্মা বলিয়াই করিতেন। তিনি মনে করিতেন, "পুরুষ যেমন আত্মা, নারীও তেমনি আত্মা। নারীর মাতৃত্ব তাঁহার একটি প্রধান বৃত্তি, ধর্ম্ম ও স্বরূপ, কিন্তু তাহাই তাঁহার একমাত্র বৃত্তি, ধর্ম্ম ও স্বরূপ নহে।" তিনি চাহিতেন যে, নারী নারীপ্রকৃতির সমুদয় সদ্‌গুণে ভূষিত হউন। কিন্তু এই আশাও করিতেন যে, "নারী মহৎ মানুষ হইবেন, শ্রেষ্ঠ মানুষ হইবেন, সেই সব গুণ ও শক্তির বিকাশ নারীতে হইবে, যাহা নারী ও পুরুষ উভয়েরই সাধারণ সম্পত্তি। সেই সব কাজ নারী করিবেন যাহা লোকশ্রেয়ঃসাধনার্থ ও জগতের ঋণ পরিশোধনার্থ পুরুষ ও নারী উভয়েই করিতে পারেন এবং উভয়েরই কর্ত্তব্য। সেই সব আধ্যাত্মিক সাধনা ও সিদ্ধি তাঁহার হইবে যাহা মহিলা ও পুরুষ উভয়েরই হয় ও হইতে পারে।"

নারী ও পুরুষকে ভিন্নভাবে বিচার তিনি করিতেন না, কিন্তু নারীরা বহু-কাল তাঁদের স্বাভাবিক অধিকার হইতে বঞ্চিত বলিয়া তাঁহাদের সব ছোট বড় কৃতিত্ব, সাফল্য ও দাবীদাওয়া, সকল বিষয়ের প্রচারের জন্যই তিনি যত দীর্ঘ দিন ধরিয়া যত চেষ্টা করিয়াছেন, পুরুষের জন্য হয়ত তত করেন নাই। বাংলা দেশে বা ভারতবর্ষে আর কোনও দুইটি মাসিকপত্র একত্রে এত-কাল ধরিয়া নারীর অধিকার প্রচার করিতে এবং নারীর ক্ষুদ্রতম কৃতিত্বের ঘোষণা করিতে এত চেষ্টা ও এমন প্রচুর অর্থব্যয় করেন নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস। কে কোথায় গান করিয়াছে, অভিনয় করিয়াছে, ছোট বড় কিছু একটা পাশ করিয়াছে, বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছে, ভাল সেলাই করিয়াছে কি চিত্রিত বড়ি দিয়াছে, কিম্বা পিঁড়ি আঁকিয়াছে, যৎটকু নৈপুণ্য এবং কৃতিত্বই সে দেখাক না কেন, 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' তাহার ছবি ছাপিতে, কাগজ ও ব্লকে অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত। ইহাতে সম্পাদকের ত কোন লাভ নাই, মেয়েদের উৎসাহ দিয়া কাজে নামানোই তাঁহার আনন্দ ছিল, উদ্দেশ্যও ছিল। 'প্রবাসী'র চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর রামানন্দ দুঃখ করিয়া বলিয়া-ছিলেন, "প্রবাসী' চল্লিশ বৎসরে মেয়েদের জন্য কি করিয়াছে, এ বিষয়ে কেহ কিছুই লিখিল না।" যেখানে মেয়েরা বড় বড় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, সেখানে তাঁহাদের প্রশংসা লোকে করে, কিন্তু ছোটবড় শিশু হইতে বৃদ্ধা পর্য্যন্ত নারীদের সকল কাজের এত বিজ্ঞাপন আর কে দিয়াছে? স্ত্রীজাতিকে প্রগতিতে উৎসাহী করিবার সময় তিনি শুধু বাংলা দেশের মেয়েদের কৃতিত্বের কথাই প্রকাশ করিতেন না, সারা ভারতবর্ষের মেয়েদের কথাই লিখিতেন এবং তাঁহাদের চিত্রাদি প্রকাশ করিতেন। অধ্যাপক কার্ভের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় হউক, কি বিশ্বভারতীর নারী বিভাগই হউক, সকলেরই তিনি সমান উৎসাহদাতা ছিলেন। ভারতবর্ষের বাহিরের বহু মনস্বিনী ও নানাগুণশালিনী নারীর কথা 'দাসী'র যুগ হইতে 'প্রবাসী'র ও 'মডার্ণ রিভিউ'এর যুগ পর্য্যন্ত রামানন্দ লিখিয়া ও প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। পাশ্চাত্য জগতের মহীয়সী নারীদের আদর্শে আমাদের দেশের নারীরা উদ্বুদ্ধ হইবেন এই ইচ্ছার সহিত তাঁহার গুণগ্রাহিতা মিলিত হওয়ায় এই সকল নারীর কথা তাঁহার পত্রিকায় এত উচ্চ স্থান পাইয়াছে। নারীকে তিনি পুরুষের চেয়ে ছোট মনে করিতেন না, অধিকন্তু তাঁহাদের মমতাপূ হৃদয়ের গুণে তাঁহারা জনসেবার নানা দিকে অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ মনে করিয়াই এই সকল নারীর কথা তিনি লিখিতেন।

ভগিনী ডোরা, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, বাঁকুড়ার পতিতা রমণীর মাতৃভাব, কুমারী ডীন, গ্রেস ডার্লিং, কারাসংশোধন কার্য্যে সারা মার্টিন, কুষ্ঠরোগীর সেবায় কেট মার্সডেন, মেরী কার্পেনটার, ডোরোথী লিগু ডিক্স, অহল্যাবাই প্রভৃতি প্রবন্ধে 'দাসী'র যুগেই স্বদেশ ও বিদেশের নারীদের মহত্ত্বের কথা তিনি প্রচার করিতেন।

নারীর উপর পৈশাচিক অত্যাচারের কথা শুনিয়া রামানন্দ যেরূপ বিচলিত হইতেন, সেরূপ প্রায় কোন কারণেই হইতেন না। তিনি বলিতেন, "এরূপ ঘটনার কথা পড়িলে মুমূর্ষু বৃদ্ধেরও রক্ত গরম হইয়া উঠে, মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে এবং

(১৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সাগুর

রবীন চৌধুরী

একদা এখানে তিন-পাহাড়ের কোলে
শাল আর বাড়ী সারি-বাঁধা জঙ্গলে
খোড়ো-চাল হ'তে ছোটো-পাখী কুটো এনে
খোড়ো-চালে ফের ঠোঁট দিয়ে বাসা বোনে।
এখানে পাহাড় ওঠেনি যখন আগে
গাছেরা জাগেনি কঠিন-লাঙল লেগে।

আমাদের দেশে দীঘি ছিল শাল ঘেরা
শাল-আগাদের বর্ষা-মেঘের বেড়া,
মেঘ ভেঙে ভেঙে ফোঁটা ফোঁটা মাঠে পোড়ে
বাঁধা-ঘাট দীঘি ছবি হ'য়ে যেত দূরে।
এর আগে সে
জল আর জল জলপরীদের দেশে
এল এই দ্বীপ বাড়ী-বাঁধা অবশেষে।
এবং এখানে অনেক দিন ত শুনেছ কানে
রোদ্দুর নিয়ে নেমেছে আকাশ ধানের বনে।

আজ অন্তর তুরুনার মাঝখান
এক মহাদেশ—নদী-গিরি ব্যবধান।
তবুও একদা প্রতি বিষ্যুদ্বারে
ফটক পেরিয়ে, ছোট-বিল সাঁকো ছেড়ে
বাঁক কাঁধে আসে হাটুরের সার
আলি-পথে ডানে বাঁয়ে বহু গাঁয়ে ফেলে
দীঘি-পশ্চিমে হাটেতে সকাল হ'লে।
ওদের ঝাঁকার ফসলেরা সব চরের-কাহিনী হ'য়ে
জানি একদিন নদী-পারে ছিল শুয়ে।
সেই নদী-চরা তরমুজ-বন হাজার মাঠের দূর
কিন্তু সে-দূর নদী-দেশ হ'তে শালিকেরা উড়ে এসে
অনায়াসে ধান খুঁটে খেয়েছিল উঠোনেরি ধানে বসে।

হে সুস্মিতা,
দ্বীপ মরে যায়—দ্বীপবাসীরাই জেনেছি কি তা।
দ্বীপ মরে গেল—তবু তারি আগে, দ্বীপে জঙ্গলে আগে
সাগরে হাজার ঢেউ-সার বাঁধা, বাড়ী-বাঁধা অনুরাগে
উঠোনের নিমে নীচের ছায়ায় গিয়েছে অনেক কাল:
হয়েছে ফসল হয় নাই বহু সাল
তথাপি চোখের চোখ জুড়ানিতে মাথায় ডেকেছে পাখী
বুঝেছি সঠিক, রাত আর নেই বাকী।
তখন চোখেতে দেখতাম চেয়ে উনন ছেড়ে
চাল ছেড়ে ধোঁয়া
উঠত ওপরে বাতাস ধরে
সেই ধোঁয়া দিত দ্বীপের মাথায় স্বর্গ গড়ে।

সমুদ্র দেশে পাথর-পাহাড়ে পলি-পড়া মাটি জমে
দ্বীপ উঠেছিল চালে-চাল বেঁধে সহস্র পরিশ্রমে।
অবশেষে শালে শালের পাতায়
হলুদ পাখীতে হলুদ কাটায়
মরে এল কি যে ক'রে,
অজস্র-নীড়ে ঝোড়ো ডাকাডাকি চুপ হ'ল চুপ করে।

সাত ভাই চম্পা

বিষ্ণু দে

চম্পা। তোমার মায়ার অন্ত নেই,
কতো না পারুলবাঙানো রাজকুমার
কতো সমুদ্র কতো নদী হয় পার,
বিরাট বাংলাদেশের কতো না ছেলে
অবহেলে সয় সকল যন্ত্রণাই—
চম্পা কখন জাগবে নয়ন মেলে।

চম্পা তোমার প্রেমেই বাংলাদেশ
কতো না শাঙন রজনী পোড়ায় বলো।
গৌরীশৃঙ্গ মাথা হেঁট টলোমলো,
নিষিদ্ধ দেশে দীপঙ্করের শিখা
চীনে জ্বলে হয় মঙ্গোলিয়ায় লেখা,
চম্পা তোমায় চিনেছিল সিংহলও।

তোমাকে খুঁজেছে জানো কি কৃষকে নৃপে
অশ্বের খুরে, লাঙলের ফলা টেনে,
হাতুড়ির ঘায়ে, কাস্তের বাঁকা শানে
ভাটিয়ালী গানে, কপিল মুনির দ্বীপে;
কলিঙ্গে আর কঙ্কণে গুর্জরে
চম্পা তোমার সাতভাই গান করে।

শ্যামকাম্বোজে তারা বুঝি টানে দাঁড়,
নীল কমলের দেশে রেখে আসে হাড়
বহু চাঁদ বহু শ্রীমন্ত সদাগর
চম্পা তোমারই পারুল মায়ার লোভে
বাহিরকে ঘর আপনকে করে পর,
বলী হাসে, আসে যবদ্বীপের সাড়।

তোমার বাহুর নির্দ্দেশ দেখে ক্ষোভে
কতো প্রাণ গেল, কতোজনা নিশি ডেকে
অন্ধ আবেগে বৈতরণীতে ডোবে।
চম্পা তোমার অবিনশ্বর প্রাণ
এ কোন্ হিরণ মায়ায় রেখেছ ঢেকে
খুলে দাও মুখ, রৌদ্রে জ্বলুক গান।

কড়ির পাহাড়ে চম্পা তুমি তো নেই,
কাঞ্চনমালা জানে না তোমার খেই;
তবুও তোমায় খুঁজে মরে সারা দেশ
ঘোচাও চম্পা ঘোমটা ছদ্মবেশ,
এ মাহ ভাদরে ভরা বাদরের শেষে
চকিতে দেখাও জনগণমনে মুখ,
মুক্তি মুক্তি চিনি সে তীব্র সুখ,
সাতভাই জাগে নন্দিত দেশ দেশ।

জ্যৈষ্ঠের শেষ। বৃষ্টি হচ্ছে, চাষবাসের অবস্থা ভাল। এই সময় বাপের বাড়াবাড়ি অসুখ শুনে রূপদাসী বাপের বাড়ি ছুটল।

গিয়ে দেখে বাপ মারা গিয়েছে। শ্রাদ্ধশান্তিও চুকল। মাগ্যিগণ্ডার বাজারে কতদিন পরের সংসারে পড়ে থাকবে? আর থাকবেই বা কেন—নিজের ঘরে তিন আউড়ি ধান। মেয়ে আর বাপ কি রকম সংসার করছে, সেজন্য মন ভারি উতলা হয়েছে।

আসবার দিন পাগল হয়ে এসেছিল—খানিক পথ হেঁটে, খানিকটা হাটুরে নৌকার এক পাশে বসে। সে উত্তেজনা নেই এখন। ছোট ভাই মুক্ত নেড়া মাথায় পাড়ার মাতব্বরদের বাড়ি বাড়ি ঘুরছে, বড় ভাইটা নাকি জাহা ফাঁকি দিচ্ছে, পৃথক না হলে আর চলে না। রূপদাসী বলে, যা করবার করিস গে ভাই, আগে আমায় রেখে আয়।

এখনো বিয়ে হয়নি, তাই বোনের কথা মুক্তই যা একটু-আধটু শোনে। ঘাটে নৌকো নেই। এমন কি কাটাখালি অবধি একদিন ঘুরে এল, সেখানে যদি কোন নৌকো ভাড়ায় যায়। ঝুপ-ঝুপ করে বৃষ্টি হচ্ছে, রূপদাসী পথ তাকিয়ে আছে, সেই সময় ভিজতে ভিজতে মুক্ত ফিরে এল। বলে, না দিদি, দেড় টাকা কবুল করলাম, তবু শালারা ঘাড় নাড়ে।

লাট সাহেব হয়ে গেল নাকি সব?

ক্ষেতে যে বড্ড গোল। ধান-চারা খওয়াবয়ি করছে, বাঁধের মাটি আনছে। নৌকো আজকাল কেউ ছাড়বে না।

রূপদাসী সভয়ে বলে, হাঁটতে হবে নাকি? ওরে বাবা!

হাঁটবে কোথা? আলপথ সব জলের নিচে। সাঁতরে যাওয়া ছাড়া উপায় দেখিনে।

কি করা যায়? নিঃসীম বিলের দিকে চেয়ে চেয়ে রূপদাসীর কাঁদতে ইচ্ছে করে। কি করবে এখন?

মুক্ত বলল, হতে পারে এক তালের ডোঙা। চড়তে পারবে? বড্ড টলে কিন্তু।

ডুবে যাবে না তো?

পিঁড়ি পেতে দেব। নড়াচড়া কোরো না, বসে থাকবে পুতুলের মতো।

এ ছাড়া উপায়ই বা কি? একটা সুবিধা, নৌকোর আধাআধি সময়ে ডোঙা পৌঁছে যাবে।

রূপদাসী বলে, অথই জলে নিয়ে যাসনে কিন্তু। খবরদার। খালের কিনারে কিনারে যাবি।

মুক্ত বলে, বয়ে গেছে খাল ঘুরতে। ধানবনের ভিতর দিয়ে কোণাকুণি চালিয়ে দিচ্ছি দেখ না।

প্রাণপণে মুক্ত লগি ঠেলছে। ধানগাছ কাত হয়ে পথ দিচ্ছে। ডোঙার গায়ে খসখস আওয়াজ। ধারাল ধান পাতা লাগছে রূপদাসীর গায়ে, নিটোল কালো বাহুর উপর সাদা সাদা দাগ ফুটে উঠেছে। বলেছে ঠিক, তীরের মতো চলেছে ডোঙা।

সারি সারি কয়েকটা শোলার ঝাড়—বিলের একটানা চেহারার মধ্যে রকমফের দেখা দিল—ঠিক সামনে বাঁশের খুঁটি দিয়ে মাচা বাঁধা হয়েছে, তার উপর হাত দুই-তিন উঁচু খড়ের কুঁড়ি। জায়গাটাকে বলে নাককাটির বাঁধাল। শোলার ঝাড়ের ধারে ধারে বিস্তর কুয়া। আর দিনকতক পরে জলে টান ধরলে জেলেরা বাঁশের পাটা দিয়ে মাছ আটকাবে, ঐ ঘরে থেকে রাত জেগে পাহারা দেবে। অগুনতি মাছ এখানে, কই মাগুর সিঙি।

প্রলুব্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে মুক্ত লগি ঠেলছে। বলে, কুয়োর মুখে চারো পেতেছে দিদি। মাছ পড়েছে—মাছ পড়েছে—ঘাসবন নড়ছে ঐ দেখ। রোসো!

লগির মাথায় চারো উঁচু করে তোলবার চেষ্টা করে। হয় না। তখন ডোঙা সেই খানটায় ঠেলে নিয়ে নিচু হয়ে তুলছে। সহজে ওঠে না—ধানের পাতায় পাতায় গিঁঠ দিয়ে বাঁধা, উপরে শেয়াকুলের কাঁটা। চারো একটু উঁচু হতেই খলবল করে ওঠে ভিতরের মাছ। প্রকাণ্ড একটা শোল। মনের উল্লাসে লগি ফেলে দু'হাতে মাছ সমেত চারো জাপটে ধরতে যায়। হঠাৎ ডোঙা কাত হয়ে জল উঠল। রূপদাসী চেঁচিয়ে ওঠে, কুয়োর পাড়ে লাফাতে গিয়ে পড়ে গেল জলের মধ্যে।

কারা ওখানে?

মানুষের গলা, খুব কাছেই মানুষ। নূতন বর্ষায় উল্লসিত ঘন সতেজ ধানচারা এক একটা দিনে আকাশের দিকে যেন এক এক বিঘত মাথা তুলছে। তোমার কাছ থেকে এক হাত দূরেও যদি কেউ থাকে, কথা না বলা পর্যন্ত টের পাবে না। কসাড় ধানবন বেমালুম ঢেকে রাখে।

শোলার ঝাড়ের আড়ালে খটাখট আওয়াজ, ডিঙি বেয়ে দ্রুত আসছে। এসে পড়ল—জোয়ান যুবা লোহার মতো শরীর। ভর সন্ধ্যা। লোকটা হাঁক দেয়, তাইতো বলি—এত মাছ আকালি করে বেড়ায়, চারোয় আমার মাছ ঢোকে না কেন? থারে থারে ঘুঘু তুমি।

রাগের বশে হাতের বৈঠা উঁচিয়েছে মুক্তর মাথার উপর। তখনও হাতে চারো—বমাল সুদ্ধ ধরা পড়ে গেছে, কি আর বলবে মুক্ত, বাঁ হাতখানা উঁচুতে তুলেছে, বৈঠার বাড়িতে মাথাটা দু'ফাঁক করে না দেয়। আর ওদিকে রূপদাসী চেঁচাচ্ছে, পাঁকে পা বসে যাচ্ছে বাবা, তলিয়ে যাচ্ছি, বাঁচাও গো বাঁচাও।

লোকটা ফিরেও তাকাল না, মুক্তর হাত থেকে একটানে চারো নিয়ে যথাস্থানে বসাতে লাগল। রূপদাসী ক্রমাগত কাঁদছে, মরে যাই যে।

মরবার অবশ্য কোন সম্ভাবনা নেই এরকম জায়গায়। খুব বেশি হলে কোমর জল। চারোর উপর কাঁটা সাজিয়ে দিতে দিতে নিস্পৃহভাবে লোকটা বলে, দু'পা এগিয়ে কুয়োর পাড়ে উঠে যাক কাঁদোগে ঠাকরুণ। বড় বড় জোঁক এখানটায়।

জোঁকের ভয়ে উঠি পড়ি করে রূপদাসী উঠল পাড়ের উপর। ডিঙির দিকে আর লোকটার দিকে চেয়ে চেয়ে মুক্ত বলে উঠল, তুমি কার্তিক না? ধারিক সর্দারের ছেলে। বাঁকাবড়শি তোমার বাড়ি।

মুক্তর কথা কানে না নিয়ে লোকটা রূপদাসীকে প্রশ্ন করে, কোথায় যাচ্ছিলে তোমরা?

সোনাকুড়। আমাদের বাড়ি সেখানে।

এসো আমার নৌকোয়।

মুক্ত তাড়াতাড়ি খাতির জমাবার চেষ্টা করে। তা নৌকো একখানা বটে! দেখেই বুঝেছি, এ হল তোমার নীলমণি। কি গড়ন, কি রকম চলন! শখ করে নৌকোর নামখানা যা দিয়েছ একেবারে খোক্কস।

বলে সে-ও এগিয়ে আসছিল। কার্তিক সঙিনের মতো বৈঠা উঁচিয়ে বলে, খবরদার! এক নম্বর হারামজাদা তুমি—আমার চারো ঝাড়ছিলে। নৌকো চড়তে হবে না, জল ভেঙে বাড়ি যাও। শামুকে পা কাটবে, সাপেও ঠুকতে পারে। বেশ হবে, অতি চমৎকার হবে।

কুয়োর পাড়ে—রূপদাসী যেখানটা দাঁড়িয়েছে, সেইখানে নৌকো লাগাল। মুক্ত হতাশ হয়ে বলে, তা তুমি তাহলে চলে যাও দিদি। আমি দেখি, ডোঙাটা তোলা যায় কিনা।

নীলরঙের ছোট নৌকো, পরিষ্কার ঝকঝক করছে। জল ছোঁয় কি না ছোঁয়—

পাখীর মতো উড়ে চলল। দেখতে দেখতে অনেক দূরে গেল। মুক্ত তখন চিৎকার করে বলে, ভারি আমার নেয়ে রে! তিনখানা গাঁয়ের মানুষ নৌকো নৌকো করে মরছে—আর বাবু বেড়াচ্ছেন চারো পেতে মাছ ধরে ফুর্তি মেরে। হুও—হুও—।

সোনাকুড়ের ঘাট অনেক দূর থেকে নজর পড়ে। সারি সারি তালগাছ। ঘাটে নেমে রূপদাসী বলে, এসো বাবা।

কার্তিক ঘাড় নাড়ে, উঁহু।

বাড়ি তো ঐ দেখা যাচ্ছে।

তাহলে চলে যাও না গুটিগুটি। আমার কাজ আছে।

এত কষ্ট করে পৌঁছে দিলে। না বাবা, সে হবে না। রূপদাসী খপ করে তার হাত ধরল।

মুখ বেজার করে কার্তিক পিছু-পিছু চলে। বলে, ভাল করতে গেলে হয় এই রকম। কলিকালে ভাল করতে নেই।

উঠোনে পা দিয়েই রূপদাসী কেদারকে বলে, যা বোঠে উঠিয়েছিল ছেলে—মাথা ভেঙে ছাতু-ছাতু হয়ে যেত।

কার্তিক অপ্রতিভ হয়ে মুখ ফেরাল। দাওয়ার উপর থেকে খিল খিল করে হেসে উঠল কেদার নয়—মেয়ে যামিনী।

রূপদাসীর খুশি যেন উপচে পড়ছে। কেদারের কানে কানে বলে, সেই কার্তিক গো। চার বচ্ছর ঘোরাচ্ছে ওরা, আশায় আশায় মেয়ে ধুবড়ো করছি। বাগে পেয়ে আজকে বাড়ি নিয়ে এলাম।

কার্তিক তখন বলছে, চলি এবার, কি বলেন?

কি রকম? এক হাঁটু কাদা—হাত পা ধোও, নেহাত দুটো নারকেল সন্দেশ মুখে দিয়ে যাও।

না, না—আজ থাক, আর একদিন আসব।

কেদারের কাছে গিয়ে বলে, কলকেটা দেন বরং, দু'টান টেনে যাই।

কার্তিক কলকে টানছে। যামিনী তখন দাওয়ার ওধারে পিঁড়ি পেতে জলের গ্লাস এনে জল ছিটোচ্ছে।

কার্তিক বিরক্ত হয়ে বলে, বললাম যে খাব না। গরু মাঠে বাঁধা। বসে বসে খাই কখন?

গরুর কথা মনে পড়তে শিউরে ওঠে। রাত হয়েছে, এখনো মাঠে পড়ে। এই বিল পাড়ি দিয়ে গাঁয়ে পৌঁছতে আরও কত রাত্রি হবে! সে উঠানে নেমে পড়ল। শব্দ শুনে পিছনে চেয়ে দেখে, যামিনী পিঁড়ি তুলে নিয়েছে, গেলাসের জলটা ছড়াৎ করে ঢেলে ফেলে দিল।

আসবে বলেছিল, তা কথা রেখেছে কার্তিক। ক'দিন পরে ঠিক দুপুরবেলা আপনি এসে উপস্থিত। রূপদাসী গামছা আর জলের ঘটি আনছিল। কার্তিক বলে, লাগবে না মা। ঘাট থেকে ভাল করে হাত পা ধুয়ে এলাম।

আবার আমতা আমতা করে কৈফিয়ত দেয়, কুশখালির হাটে যাচ্ছিলাম। তা মনে হল, কেমন আছেন সব দেখে যাই।

কেদার বলে, হাটে আমিও যাচ্ছি। ওঠো তাহলে, কথাবার্তায় যাওয়া যাবে।

রূপদাসী বলে, ছেড়ে দিও না কিন্তু আজকে, সঙ্গে করে এনো। রাত্রে থাকতে হবে বাবা, বুঝেছ?

যেতে যেতে কার্তিকেরই গ্রামের রতন মোড়লের সঙ্গে দেখা।

হাটে চললে কার্তিকদা, তোমার বাপ যে ওদিকে কুরুক্ষেত্তোর লাগিয়েছে।

কার্তিক বলে, বাবাই তো পাঠালে হাটে। কালোবরেরা ধানের বীজ পাতা কিনতে যাচ্ছি।

আর খানিকটা গিয়ে পথের ধারের এক জিওলগাছে ভর দিয়ে কার্তিক দাঁড়িয়ে পড়ল। মাথা ঘুরছে কি রকম।

কেদার চিন্তিত হয়ে উঠল, তাইতো!

একটু পরে সামলে নিয়ে কার্তিক বলে, ও কিছু না। মাঝে মাঝে হয় এই রকম। আপনি হাটে যান। আমি ফিরি।

কেদার বলে, যাচ্ছ আমাদের ওখানে তো? না গেলে যামিনীর মা রাগ করবে।

তাই যাব আজ্ঞে। কাছাকাছি আছে, গিয়েই শুয়ে পড়ব।

হাট থেকে কেদার বেলাবেলি ফিরল। পরের ছেলেটার জন্য মনে উদ্বেগ রয়েছে। এসে দেখে, ভালই আছে, দাওয়ায় মাদুর পেতে শুয়ে ভুড়ুক-ভুড়ুক করে কার্তিক হুঁকো টানছে। রান্নার ভারি আয়োজন। রূপদাসী রাঁধছে, যামিনী বাটনা করে দিচ্ছে, টেমি ধরিয়ে পুকুর থেকে ঘন ঘন জল বয়ে আনছে।

কলসি নিয়ে যেতে যেতে একবার শুনতে পায়, কথা হচ্ছে কেদার আর কার্তিকের মধ্যে—কেদার কার্তিকের বাড়ি-ঘর-দোর জোতজমি বিষয়-আশয়ের খবরা-খবর নিচ্ছে।

টেমিটা রান্নাঘরে রেখে এসে আঁধারে আঁধারে যামিনী দাওয়ার পাশে দাঁড়াল। টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়ছে, আঁচলটা তুলে দিল মাথায়। শুনছে—।

সীমাহীন বিল, বাদলার বাতাস আসছে হু-হু করে, গাছপালার ব্যবধান নেই। আঁধার ধানবনে অনেকগুলো আলো ঘুর-ঘুর করছে। কি, ও সমস্ত কি? আলচোরা (অর্থাৎ আলেয়া) নাকি? গাঁয়ের এত কাছাকাছি আসে কি আলচোরা? উঁহু—আলোর মাছ-মারার মরশুম এটা, গ্রামের মানুষ মাছ মারতে এসেছে।

কার্তিক লাফিয়ে ওঠে। চল্লেন না কেন?

বলো কি? বিকেলবেলা তোমার অসুখ হল—।

কেদারের কথা কার্তিক কানেই নেয় না। ডাক দেয়, ও যামিনী, দা-টা আনো দিকি। আর লণ্ঠন একটা। আহা, আপনি কেন—বুড়োমানুষ, আপনাকে যেতে হবে না—

কিন্তু সর্দার-বাড়ির ছেলে, একটা রাতের অতিথি, সে একলা বিলে যাবে এই বা কেমন করে হয়? আর মেয়েটা তেমনি—মুখের কথা না বেরোতে খেজুরগাছ-কাটা ধারাল দা দিয়ে গেল, কাচে-ঘেরা লণ্ঠনের মধ্যে টেমি জ্বেলে রেখে গেল।

বিস্তর মানুষ ধানবনে। এক হাতে দা এক হাতে আলো, আর পিছনে চলেছে আর একজন খালুই নিয়ে—এই রকম দু'জনে এক একটা দল। ধানবনের আড়ালে আবডালে সন্তর্পণে যাচ্ছে, কখন বা আলো ধরে থমকে দাঁড়াচ্ছে জলের উপর। আলো দেখে ফুর্তিতে মাছ কাছে চলে আসে, আলোয় সম্মোহিত হয়ে চুপচাপ মাথা ভাসান দিয়ে থাকে। তখন দা দিয়ে দাও' কোপ ঝেড়ে। জল রক্তাক্ত হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি মাছটা ধরে খালুইতে পুরে ফেলে।

হোগলাবনের নিচে এদিকে সেদিকে ওরা ঘুরল অনেকক্ষণ। একটা কই আর দু'তিনটে শিঙি মাত্র শিকার হয়েছে। জুত হচ্ছে না, মাছ সব সেয়ানা হয়ে গেছে, জলের উপর এত আলো নাড়ছে—মাছ আসে কই?

কেদার বিরক্ত হয়ে বলে, চার গ্রামের মানুষ জুটেছে, মাছ তো মাছ—বাঘ অবধি ভয় পেয়ে যায়। চলো, উঠে পড়ি।

বহু দূরের কাঁটা সঞ্চরণশীল আলোর দিকে আঙুল বাড়িয়ে কার্তিক বলে, ওদিকে হৈ-চৈ নেই। ওরা বুদ্ধির কাজ করেছে। নৌকো নিয়ে গেছে বুঝি?

কেদার ঘৃণার ভাবে বলে, যাক্‌গে, অমন খাওয়া কারো যেতে না হয়। হাঘরে মানুষ—ইটে নেই ভিটে নেই। চাষার কি নৌকো নিয়ে মাছ ধরার সময় এখন?

এমন সময় ধানবনের মধ্য থেকে ডাকছে, কোন্‌ গ্রাম এটা? উদ্বিগ্ন ব্যাকুল কণ্ঠে বার-বার চিৎকার করছে।

কেদার হাঁক দেয়, কারা গো?

এটা কি গড়ভাঙায় এলাম ভাই?

গড়ভাঙা যাবে, তবেই হয়েছে। দিকভুল হয়ে গেছে। ঘাটে এসো। সমস্ত রাত চললেও গড়ভাঙা পৌঁছবে না।

লণ্ঠন উঁচু করে দাঁড়াল ঘাটের উপর। একখানা পান্‌সি এসে লাগল। সওয়ারি একজন বুড়ো মানুষ—আর একটি মেয়ে।

আশ্চর্য হয়ে কেদার বলে, আ আমার কপাল! বিলাত আলি মাঝি—তোমার এই কাণ্ড? যাবে উত্তরে, চলেছ সটান দক্ষিণ মুখো—

বিলাত আলি লজ্জা পায়। এ অঞ্চলের নাড়ি-নক্ষত্র তার চেনা, তবু এই অবস্থা। দিনের বেলাতেই ধানবন পথ ভুলিয়ে দেয়; মাঝ-বিলে গিয়ে যেদিকে তাকাও এক চেহারা—তাল গাছ, আম গাছ, খেজুর গাছ, বাঁশঝাড়, হয়তো খড়ের চালায় একটুকু। যেটা দেখছ, সেইটাই মনে হবে তোমার গ্রাম। রাত্রে আরও মুশ্‌কিল, আলো দেখে বসতি অনুমান করতে হয়। সে আলো আলেয়া হতে পারে, ক্ষেতে জ্বালানো আগুন হতে পারে—অন্ধের পথ চলার অবস্থা আর কি!

বুড়া ভদ্রলোক বললেন, সেই সন্ধ্যে থেকে ঘুরে মরছি, রাস্তাটা একবার ভাল করে বাতলে দাওতো বাপু।

কেদার বলল, নেমে আসুন কর্তা। কোন বেখেপে গিয়ে পড়বেন, সমস্ত রাত কষ্ট পাবেন। মাঝির কাছে শুনে দেখুন, এ তল্লাটে সবাই চেনে আমায়।

পান্‌সির ঠিক সামনে এসে হাতজোড় করে দাঁড়াল। বলে, যখন আসা হয়েছে, পায়ের ধুলো দিতেই হবে। আমার বাপ-ঠাকুরদার কিরে দেওয়া আছে। আসুন কর্তা মশায়, আসুন খুকী ঠাকরুণ।

বিলাত আলি চুপি-চুপি ভদ্রলোকের পরিচয় বলল, শুনে কেদার তাজ্জব হয়ে যায়। গড়ভাঙার হরিহর রায় ও তাঁর মেয়ে। চালের কারবার করে হরিহর লক্ষপতি হয়েছেন। বছর পনর গ্রামে আসেননি, তাহলেও মস্ত বড় ধনী বলে সকলে নাম জানে। সেই মানুষ আর তাঁর পরীর মতো পরমাসুন্দরী মেয়ে অজ পাড়াগাঁয়ে এই বিলের মধ্যে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন।

কেদারের দোচালা ঘরের ভিতর হরিহর রায় জাঁকিয়ে বসেছেন, পাশে সুপ্রিয়া। খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে চিঁড়া ভেজানো, পাকা কলা আর দুধ। ভাত হল না, বাপ মেয়ে কেউ রাঁধতে জানেন না।

হরিহর বলছিলেন, দেখছ কি, কলি ওল্টাচ্ছে এবার। মহাপ্রলয়! রেঙ্গুন আর পেগুতে আমার চারটে আড়ত কড়কড়ে বোঝাই, আর এক তাঁকি চাল জোগাড় করতে গিয়ে পথের মধ্যে মেরে ফেলেছিল আর কি!

ভাগ্য ভাল যে, মেয়েরা কলকাতায় ছিল, বর্মায় তিনি ছিলেন একা। পাহাড়-জঙ্গল অতিক্রম করে লুণ্ঠক মগদের হাত থেকে আধমরা অবস্থায় দেশে এসে পৌঁচেছেন। এ এক নূতন জন্ম বললে হয়।

এরা শুনে যাচ্ছে, চমৎকার লাগছে, লোকে রূপকথা যেমন নির্লিপ্ত আগ্রহে শোনে, তেমনি একটা ভাব চোখে মুখে। রেঙ্গুন নামটা শোনা আছে, কোথায় কেউ জানে না—রেঙ্গুন থেকে চাল আসে, একেবারে স্বাদহীন সাদা রঙের চাল, নিতান্ত অপারগ না হলে কেউ তা খায় না। আর জাপানি বোমাও জানে সকলে। একবার কালীপুজোর সময় নকড়ি দফাদার কি কি জাপানি মসলায় বোমা বেঁধেছিল, পয়সা পয়সা বিক্রি করত। শেষ পর্যন্ত কোন বোমা ফাটল, কোনটা ফাটল না। নকড়ি বলত, তোমাদের কপাল বাপু, আমি কি করব? সেই বোমায় নাকি রেঙ্গুন সহর তোলপাড় করে তুলছে, বোমাওয়ালারাও এসে পড়েছে সেখানে।

কার্তিক কেবল মাছ মারে না, বুনো শুয়োর, ক্ষেপা কুকুর এমন কি কেঁদো বাঘও কতবার সড়কির ফলায় গেঁথেছে। তার বীর-হৃদয় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। বলে, মানুষ নেই সে দেশে? রুখতে পারে না?

সুপ্রিয়া কথা বলল এই প্রথম।

দেশটা তাদের—তাই কি ভাবতে পারছে তারা?

ভালরে ভাল! তাদের নয়—কার তাহলে? এই যে বাঁকাবড়শি মাদারডাঙা—এ আমাদের হল না, হবে কি বিলপারের সাতু চক্কোত্তির?

সুপ্রিয়া জবাব দেয় না। হরিহর বললেন, মনে যাচ্ছেতাই ভাবুকগে, কাজটা কি এগুচ্ছে তাতে? সবাই যে ঠুঁটো জগন্নাথ। শুধু-হাতে লড়াই চলে?

বড্ড হাসি পায় কার্তিকের। এই সব এঁরা ঘরে বসে গলাবাজি করেন, একটা আরশুলা উড়ে এলে কিন্তু এখনি চেঁচিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধাবেন। মারামারি লড়াই দাঙ্গার কি জানেন? বলে, দেখেননি কর্তামশায়, রোখের মুখে বেড়াল কি রকম লাথি মারে কুকুরের মুখে? গায়ের জোরের হিসাব করে লড়াই হয় না। আসুক দিকিনি সেই তারা আমাদের এ তল্লাটে। ধানবনে নাকানি-চুবানি খাইয়ে মারব না?

তা সত্যি—বলে হরিহর ঘাড় নাড়লেন। ধানবনের মহিমা বিকাল থেকে তিনি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। বললেন, এ সব জায়গায় আসা বাস্তবিক বড় মুশ্‌কিল বাইরের লোকের পক্ষে। কলকাতায় আমার তিন তিনটে বাড়ি, সমস্ত ছেড়ে তাইতো গাঁয়ে যাচ্ছি। থাকব কিছুদিন—হাঙ্গাম-হুজ্জুত যদ্দিন না মিটছে।

কার্তিকের ধরণ-ধারণ সুপ্রিয়ার বড় ভাল লাগল, জোয়ান মরদ—তেজ আছে। অনেক রাত হয়েছে। সঙ্গে বিছানা ছিল—মেজেয় বিছিয়ে হরিহর শুয়ে পড়েছেন। সুপ্রিয়া এখনও গল্প করছে। এদের মাঝখানে এই রকম জায়গায় রাত কাটছে, এ তার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। গেরিলা-যুদ্ধের গল্প হচ্ছে—সর্বস্ব হারিয়ে তবু মানুষ সবলের হুমকি মেনে নিচ্ছে না, কেমন করে পথ ভুলিয়ে নিজেদের খপ্পরে নিয়ে ফেলছে, শত্রু মারছে, নিজেরাও মরছে।

কার্তিককে বলে, এই সব কায়দা শেখাবার বন্দোবস্ত করছি। মাস্টার নিয়ে আসব আমাদের গ্রামে। খবর দেব, তুমি যেও।

কার্তিকের মাথায় ঢোকে না, এর মধ্যে শেখবার আছে কোন্‌টা? বুনো শুয়োরে একবার তাদের মানকচু-বন তছনছ করেছিল। সড়কি নিয়ে সে ছুটেছিল বাঁধাঘাট অবধি শুয়োরের আড্ডায়। কায়দা কানুন শিখে আগে ভাগে তালিম দিতে হয়েছিল কি সে সময়?

শুয়ে শুয়েও কার্তিকের মনের মধ্যে তোলপাড় করছে ঐ সব। এই গ্রাম কি তার নয়? তার এবং আর যারা আছে এই অঞ্চলে? ঝাপার বাঁওড়, কুশখালির হাট, ধানক্ষেত, লাউমাচা, মাঠে বাঁধা গরু-ছাগল, বিলে শাপলা ফুলের রাশি,—কে আসবে জবরদস্তি করে এই সকলের মাঝে? আসুক দিকিনি। চাঁদ উঠেছে, দাওয়ার উপর জ্যোৎস্না তেরছা হয়ে পড়েছে, চাঁদটাকেও মনে হচ্ছে একেবারে নিজস্ব। সমস্ত মিলিয়ে যেন একখানা সাজানো বাগান। সে তার বাবা তার পিতামহ আর এমনি হাজার হাজার মানুষ রোদে পুড়ে বৃষ্টি আর ঘামে ভিজে বাগান সাজিয়ে রেখেছে, লণ্ডভণ্ড করতে এলে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবে নাকি তারা? নিঃসীম ধানবন—নৌকো নিয়ে এক হাত দূরে ওঁৎ পেতে থাকলেও নজরে আসে না—ধানবনের ঐ গোলক-ধাঁধায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মেরে ফেলবে। তার নীলমণির নীল রং রাঙা হয়ে যাবে রক্তের ছোপে।...

অনেক মানুষ বাড়িতে। মা আর মেয়ে রান্নাঘরে শুয়েছিল। শেষরাতের দিকে যামিনী ঘুম ভেঙে দেখে, একটা লণ্ঠন যেন চলেছে উঠান পার হয়ে—হ্যাঁ লণ্ঠনই। কার্তিক যাচ্ছে। কৌতূহলী হয়ে ঝাঁপ খুলে সে ঠাহর করে করে দেখে। যাচ্ছে হোগলা-বনের দিকে। জঙ্গলের মধ্যে অবাধে ঢুকে পড়ল। আস্ত ডাকাত—সাপের ভয়ও করে না!

সকালবেলা হরিহরেরা চলে গেলেন। কার্তিক পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। উঠোনে পুরো এক থালুই মাছ। সন্ধ্যার দিকে জুড় জ্বালি,

(১৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নিরুদ্দেশ

(১১৮ পৃষ্ঠার পর)

"নিশ্চয় শুনে থাকব, কিন্তু মনে পড়ছে না। কাজটা কি?"

ত্রিলোচন যেন বিশ বাঁও জলে পড়িয়াছে, ঘন ঘন ঠোঁট ভিজাইতে লাগিল। গোরাচাঁদ তাহাকে একটু ঠেলিয়া সামনে আসিয়া বলিল—"কাজ মানে—গণেশ নিরুদ্দেশ হ'য়েছে…"

বিনোদ গাঙ্গুলীকে বিস্মিত দৃষ্টিতে গণেশের পানে চাহিতে দেখিয়া সামলাইয়া লইয়া বলিল—"মানে—কোন একটা বিশেষ কারণে—নিরুদ্দেশ হওয়া ঠিক করেছে। তাই ত্রিলোচন বললে—তবে মামা শ্বশুরের ওখানে চল……"

"মামাশ্বশুরটা কে?"

গোরাচাঁদ ত্রিলোচনের পানে চাহিল। তাহার পর বিনোদ গাঙ্গুলীর পানে চাহিয়া বলিল—"তিনু আপনার সম্পর্কে ভাগনি জামাই হয়, তাই…"

"নতুন শুনলাম। হলেও ফেরারী আসামী ঘাড়ে চাপিয়ে জেলে পাঠাবার মতলবে আছে নাকি?"

ক্ষিপ্রতার সহিত যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া বলিল—"মাফ কর, আমি ও-সবের মধ্যে নেই। পুলিশ ডাকবার আগেই সরে পড় সব। না-কি—ডাকব?"

সকলে আবার ঘুরিয়া পা বাড়াইল। গোরাচাঁদ মোট ছাড়িয়াই হন হন করিয়া খানিকটা আগাইয়া পড়িয়া ফিরিয়া তাকাইল।

ঘোঁৎনা ত্রিলোচনের কাঁধটা চাপিয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া বলিল—"একটা মস্তবড় ফাঁসাদের ঘর হয়ে রইল যে; যদি ঐ বলে পরে পুলিশে খবর দেয়!…দাঁড়া!"

বিনোদ গাঙ্গুলী আগাইয়া গিয়া বাড়ির দরজার কড়া নাড়িতেছিল, গিয়া মিনতিস্বরে বলিল—"আমাদের সব কথা আপনাকে একটু শুনতে হবে দয়া করে, খুনীও নয়, ফেরারীও নয়।…একবার বাইরের ঘরটা খুলুন। শুনে তারপর…"

একটি ছোট মেয়ে দোরটা খুলিয়া দিল। "আচ্ছা দাঁড়াও সদর দরজার সামনে"—বলিয়া বিনোদ গাঙ্গুলী ভিতরে গিয়া অর্গল বন্ধ করিয়া দিল। ঘোঁৎনা চাপা গলায় এদের বলি[illegible]এখন সব কথা না বলে উপায় নেই, একটা ভুল খেয়াল নিয়ে রইল যে—এমন সাইনবোর্ড দেখছি—ফাঁসাদে ফেলতে পারে। অন্যরকম কারবার নিয়ে থাকে—এরা [illegible]ই…"

এমন সময় গাঙ্গুলী সদর ঘর খুলিয়া বলিল—"এস,…কিন্তু চটপট—আমার আবার সময় নেই…"

গণশা আর গেল না, বাকি সবাই ভিতরে গিয়া একটা চৌকির উপর বসিল।

ঘোঁৎনা গণেশকে যতদূর সম্ভব নিরীহ এবং গোলোক চাটুজ্জেকে অবিচারীভাবে চিত্রিত করিয়া প্ল্যানটা আগাগোড়া বলিয়া গেল। বিবাহের কথাটা অবশ্য চাপিয়া গেল, বলিল—"গণশা বেচারি চায় চাকরি করিয়া ভদ্রভাবে জীবন ধারণ করিতে, মামা বলে—'তুই বসে বসে আমার চুণের গোলার খাতা লেখ'—এই লইয়া মতবৈষম্য। এই ভাগ্নেটিই গোলোক চাটুজ্জের একমাত্র ওয়ারিসান,—যদি কয়েকদিন নিরুদ্দেশ হইয়া মামার মতিগতি বদলান যায়, তাই এই মতলবটুকু করা হইয়াছে।"

শুনিতে শুনিতেই বিনোদ গাঙ্গুলীর মুখের ভাব বদলাইয়া আসিতেছিল, ঘোঁৎনা যখন মানানসই উপসংহার দিয়া শেষ করিল—একটা ধূর্ত হাসিতে তাহার গাল দুইটি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে মানুষই নয় যেন; চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া প্রশ্ন করিল—"কার মামা?"

ঘোঁৎনা জানাইয়া দিতে ত্রিলোচন বিনয়ভরে ঈষৎ হাসিয়া মাথা নত করিল। "বেশ, বেশ, কালসিটের চক্রবর্তী মশাই!—তিনি কি না-বুঝে সুঝেই জামাই করেছেন?…বড় আনন্দ পেলাম, তা, এবার তোমরা এস।"

উৎসাহের মুখেই দমিয়া গিয়া সকলে আবার মুখ চাওয়া চাওয়ি করিল। ঘোঁৎনা একটু আমতা আমতা করিয়া বলিল—"তাহলে গণেশের থাকার ব্যবস্থাটা…"

গাঙ্গুলীর মুখের ভাবটা আবার বদলাইয়া গেল, "থাকা!"—বলিয়া বিস্মিতভাবে একটু চাহিয়া রহিল। ঐভাবেই কি যেন একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"তাইতো!…তা বেশ, থাকবে,—মামা বলে এসেছ—নিজের কাজের জন্যে নয়, বন্ধুর একটা উপকার—তবে কি জানো বাবাজি, আমার তো আর এ ব্যবসা নয়, এমন অবস্থাও নয় যে, জামাইয়ের বন্ধু এল, না হয় মাসখানেক বসিয়ে খাওয়াই…নিজেরা চারটি প্রাণী, কোন রকমে মায়ের সেবা করে দিন গুজরান হয়"—মুখ সবার নীচু হইয়া গেছে,—আড়চোখে একবার চাহিয়া লইয়া বলিল—"এদিকে আর এক বিপদ, বাড়িওয়ালা পাশেই থাকে, চারজনের বেশী যদি পাঁচজন দেখে তো মনে করে বুঝি তাদের ঘর ভাড়া খাটাচ্ছি…অমনি আমায় বখরা দাও—দিন এক টাকা হিসেবে।"

ঘোঁৎনা নীচু মুখেই আড়চোখে ত্রিলোচনের পানে চাহিল, দেখিল সেও ঠিক সেইভাবেই তাহার দিকে চাহিয়া আছে। খরটা একটু নিস্তব্ধ থাকার পর রাজেন বলিল—"এক মাস তো নয়, এই দশ হপ্তা-খানেক—তাও লাগে কি না লাগে—কি বলিস রে তিনু?"

ঘোঁৎনা বলিল—"দিন তিনেকের মধ্যেই গোলোক চাটুজ্জের চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যাবে।"

ত্রিলোচন বলিল—"জামাই যেমন তে-রাত্তির কাটিয়ে যায় সেই রকম আর কি—আমরা কাল থেকেই লেগে পড়ব কিনা।"

গাঙ্গুলী একটু ব্যথিতভাবে হাসিয়া বলিল—"যত কম দিন, ভাড়ার তত বেশী রেট বেঁধে বসে।…কলির চার পো হয়ে এল, আর বল কেন?"

আবার খানিকটা চুপ-চাপ গেল, তাহার পর ঘোঁৎনা হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া ত্রিলোচনকে বলিল—"একবার বাইরে আয়।"

গণশাকে লইয়া তিনজনে কি পরামর্শ করিয়া আবার ফিরিয়া আসিল এবার গণশা শুদ্ধ আসিয়া এক পাশে বসিল।

ঘোঁৎনা একটু মুরুব্বি চালে বলিল—"ওটা আমরা ঠিক করে ফেললাম গাঙ্গুলী-মশাই—সত্যিই তো ত্রিলোচনের মামাশ্বশুর বলে আমরা আপনার ওপর অত্যাচার করি কেন—কি বল গণেশ?"

গণশা বলিল—"তা একদিনই হোক্ বা এক হপ্তাই হোক বা এক মা-মাসই হোক।"

গাঙ্গুলী একবার আড়চোখে গণশার পানে চাহিল।

ঘোঁৎনা বলিল—"আমরা ঠিক করলাম, বিজ্ঞাপনটাতে একটা লাইন বসিয়ে দোব—যিনি সন্ধান দিতে পারিবেন তাঁহাকে নগদ ২০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।…বাকি থাকে আপনার শুধু গণশাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া—এই নিন আপনার ভাগনে মশাই, টাকাটা দয়া করে বের করুন…"

একটু হাসিয়া গাঙ্গুলীর পানে চাহিল। ত্রিলোচন বলিল—"আর ও টাকায় আমরা হাত দিতে যাই কেন?"

গণশা বলিল—"একটি প য়সাও নয়।"

গাঙ্গুলী একটু সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে গণশার পানে চাহিল, তাহার পর একটু চোখ টিপিয়া প্রশ্ন করিল—"এ-বুদ্ধিটুকুও বাবাজির মাথা থেকেই বেরুল নাকি?"

ত্রিলোচন বলিল—"না, গণেশ পরামর্শ দিলে।"

গাঙ্গুলী আবার একটু হাসিয়া গণেশের পানে চাহিল।"

কিন্তু কম করিয়া ধরিলেও দশরকম মতলব খাটাইয়া খায়—তাহাতে প্রত্যহ অন্ততঃ একশ' রকম মানুষের মাথায় হাত বুলাইতে হয়—গোটা মানুষের, আর ইহারা তো শিশু। এ-ধরণের নগদ দিয়া ভুলান গেল না। গাঙ্গুলী যুক্তকর মাথায় ঠেকাইয়া বলিল—"না, বাবাজি; তাহলে তোমরা এস, কবে সাত মণ তেল জোগাড় হবে, তারপর রাধা নাচবে, এ ব্যবস্থায় গাঙ্গুলী নেই। আর থাকবই বা কোথা থেকে? একদিনই থাক বা দু'দিনই থাক,' ও বুড়ো তো আমার কাছে সাতদিনের আগাম হিসেবে সাতটি টাকা গুণে নেবে। তারপর আমার নিজের খরচ আছে—জামাইয়ের বন্ধু, নিজে শাক-ভাত যাই খাই—দুবেলা অন্ততঃ তিনটে টাকাতো যাবেই…চা রে, জল-খাবার-রে, এটা রে, সেটা রে। ঐ সাত আর এই তিন সাত্তে একুশ…সব মিলিয়ে ত্রিশটে টাকাই ধর—কোথায় পাব বাবাজি?—গরীব মানুষ—একটা টাকার যুগ্যি নেই।"

(১৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রস্তাব

বেঁটে ছাতা, ‘বাটিক’ ছাই রঙা হাই হীল সু, শান্তিনিকেতনী ভ্যানিটি ব্যাগ, আর বিদঘুটে রঙচঙা ছাপা শাড়ী, সব মিলিয়ে মিস অণিমা ঘোষ। অণিমা ঘোষ আছেন—অথচ এসব নেই এ দেখবেন না আপনি।

প্রমাণ পেতে চান?—পার্কের ওই উত্তর পূর্ব্ব কোণটায় নজর করুন—লোহার বেঞ্চে হেলান দিয়ে বসে আছেন মিস ঘোষ, কোলের উপর পোষা বিড়াল ছানাটির মত সযত্নে শোয়ানো আছে ‘বাটিকের’ কাজ করা ভ্যানিটি ব্যাগটা, বেঁটে ছাতাটা আছে রেলিংয়ের গায়ে হেলানো, আর অদ্ভুত রংদার ছাপা শাড়ীখানা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জড়িয়ে আছে অণিমা ঘোষের খাটো খাটো নিটোল দেহখানিকে।

সন্ধ্যা ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে—যে কোনদিন ইচ্ছে—দেখে আসতে পারেন। প্রত্যহ অফিস ফেরৎ এক ঘণ্টা করে হাওয়া খেয়ে যাবেন তিনি, এই নিয়ম। আগে বোধকরি কোন মেয়ে স্কুলের ‘দিদিমণি’ ছিলেন—যখন ‘দিদিমণি’ হওয়া ছাড়া জীবিকাই আর গতি ছিল না মেয়েদের, এখন চাকরী নিয়েছেন—‘বেকারের বান্ধবী’ সাহায্য ডিপার্টমেন্টে।

মিস অণিমা ঘোষের বয়স জানতে চান? ওটা চাইবেন না, ভারী চটে যান ভদ্রমহিলা, আর রাগ করেই বলে ফেলেন,—“তিরিশ পার হতে চললো যে—” নিন্দুকে কিন্তু অন্য কথা বলে।

একটি ঝি আর একটি ভাইঝি এই তাঁর সংসার। আজীবন এই রকম নিঃসঙ্গ কাটালেন বেচারা।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই তার জন্যে মুসড়ে পড়েন নি কোনদিন। চোখের কোলে আর জ্রর উপর সরু তুলির একটু আঁচড়, ফ্যাকাসে ঠোঁটে একটু লালিমার প্রলেপ, স্নো ক্রীম আর পাউডারের সুরুচিসম্মত নির্ভুল ব্যবহার কৌশল, এর ব্যতিক্রম ঘটে না কোনদিন—দিনের পর দিন বছরের পর বছর।

বেশ চলছিল—হঠাৎ বাচ্চা ভাইঝিটা বাধিয়েছে গোল। ও নাকি কিছুতেই আর ফ্রক পরতে রাজী নয়—শাড়ী না ধরে ছাড়বে না। কিন্তু শাড়ী ধরালে ‘চৌদ্দর গণ্ডীর’ ভিতর আটকে রাখা চলে কি করে? সত্যি—মা বাপ মরা মেয়ে, যাকে তিনিই হাতে করে মানুষ করলেন সে হঠাৎ সাবালিকা হয়ে উঠলে তিনি কোথায় গিয়ে ঠেকেন? প্রায় চার বছর ধরে যাকে ‘চোদ্দ’ বলে চালিয়ে আসছেন—খাটো ফ্রক আর আঁটো বডিসের দৌলতে—শাড়ী ব্লাউস দিলে যে সে একদিনেই আঠারো বছরের হয়ে বসবে—এও তো কম ভাবনার কথা নয়!

কেন যে এই অদ্ভুত সখ!

মিস অণিমা ঘোষ ভাবেন—আরো কিছুদিন করুক না ছুটোছুটি লাফালাফি ফ্রক পরে আর ‘বো’ বেঁধে। বড় হওয়ার সাধ! আশ্চর্য্য! মেয়েদের এই পাকামী দু'চক্ষের বিষ। হঠাৎ একটু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসেন মিস ঘোষ।

সামনের বেঞ্চে সেই ছোকরা এসে বসেছে।

কিছুদিন থেকেই তিনি লক্ষ্য করছেন এটা, ঠিক এই সময় সামনের ওই বেঞ্চে এসে বসবে ছোকরা, ঘন ঘন তাকাবে মিস ঘোষের দিকে, উসখুস করবে, নড়বে, রুমাল নিয়ে হাওয়া খাবে অথচ শেষ পর্যন্ত উঠে যাবে কিছু না বলে।

প্রথম প্রথম তিনি আমলে আনেন নি এটা—কিন্তু এখন ক্রমশঃ এমন দাঁড়িয়েছে যে, ব্যাপারটা অগ্রাহ্য করা চলে না। লক্ষ্যবস্তু যে মিস ঘোষ, সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নেই। পর পর কয়েক দিন মিস অণিমা বাড়ী ফিরেই আয়নার সামনে দাঁড়ালেন...নিটোল গোলগাল মুখ, বয়সের রেখা পড়েনি কোথাও, যতটা পথ পার হয়ে এসেছেন তার চিহ্ন নেই কোনোখানে।

আশাপূর্ণা দেবী

আজ একটু অবহিত হয়ে বসলেন মিস ঘোষ, অসম্ভবই বা কি? পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কথাটা সত্যিই আছে নাকি? ঠোঁটের কোণে একটু হাসির আভাষ—চোখের কোণে একটু সলজ্জ প্রশ্রয়—ক্ষতি কি তাতে?

লীলাচ্ছলে রুমালটা নেড়ে বাতাস খাবার একটা অভিনয় করে সশব্দ মন্তব্য করলেন—উঃ কী গরম।

ও পক্ষ নীরব।

আরো কিছুক্ষণ কাটলো।

উসখুসনি আরম্ভ হয়েছে ছোকরার, মুখে চোখে কিছু একটা ‘বলি বলি’ ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হ্যাঁ, আজই সে বলে ফেলবে যা থাকে কপালে, প্রেমের ক্ষেত্রে ভয় আর লজ্জা করে কে কবে জয়ী হয়েছে? উঠে দাঁড়িয়ে—একটু কেসে, একটু পা ঘসে এগিয়ে এল মিস ঘোষের কাছে।

দাঁড়ালো মুখোমুখি।

—কয়েক দিন থেকে আমি এখানে আসছি...।

—যা গরম বাড়ীতে টেঁকা দায়—কথাটা বলে—নিজে বেঞ্চের এক পাশে সরে বসে—পাশে বসতে বলার প্রায় স্পষ্ট ইঙ্গিত করেন অণিমা ঘোষ।

ছোকরা একটু ইতস্ততঃ করে বসেই পড়ে।

মিস অণিমা ঘোষের আটত্রিশ বৎসরের পাকা হার্টও একটু কেঁপে ওঠে।

—আপনাকে রোজই দেখি।

—আমিও তো দেখি—অণিমা ঘোষ খিলখিল করে হেসে ওঠেন।

ছোকরা অপ্রতিভ হয়ে হেসে ফেলে।

হাসিটি চমৎকার। অণিমা ঘোষ ভাবেন।

—আপনার ব্যাগটা চমৎকার তো।

—হাঁ আমার একটি বন্ধু—মানে বান্ধবী আমার জন্মদিনে প্রেজেণ্ট করেছিল।

কথাটা অবশ্য কাল্পনিক হওয়া বিচিত্র নয়—কিন্তু যাক।

—আপনার বন্ধুর—মানে বান্ধবীর টেষ্ট আছে। মেয়েদের যে কোন জিনিষটা কাজে লাগে মেয়েরাই বোঝে—আমরাই পড়ি মুস্কিলে উপহার নির্ব্বাচনের সময়।

—ওর আর কি—মিস ঘোষ আশান্বিত হয়ে ওঠেন—কীই বা কাজে লাগে না মেয়েদের? ধরুন শাড়ী? সবচেয়ে সোজা।

—তা' বটে—আপনি বুঝি ‘এইট-এ’তে আসেন?

—হাঁ—এতেই আমার সুবিধে।

কি চমৎকার লাজুক ছেলে—মিস অণিমা ঘোষ মনে মনে ভাবেন—আজে-বাজে কথা কইছে, অথচ—।

—রূপার ষ্ট্রীটের মোড়ের ওই সাদা বাড়ীটার দোতলার ফ্ল্যাটে থাকেন তো আপনি?

এবার চমৎকৃত হ'ন অণিমা ঘোষ নিজেই। এতদূর?

—কী আশ্চর্য্য! আপনি জানলেন কি করে?

ঈষৎ অন্তরঙ্গ হয়ে বসেন তিনি।

ছোকরা কিন্তু সঙ্কুচিত হয়ে কোণ ঠেসে বসে।

—প্রায়ই দেখি কিনা—ওই বাড়ী থেকে বেরোন। একলাই থাকেন বুঝি?

—একরকম একলাই।

মুখখানি করুণ করে তোলেন মিস অণিমা ঘোষ—শুধু একটা বাচ্চা ভাইঝি—নেহাৎই বাচ্চা—মাত্র সেইটুকুই আমার জীবনের অবলম্বন। এত শিশু আর মিষ্টি মেয়েটা—ও যদি না থাকতো—উঃ।

—ও—ইয়ে মানে—কিছুদিন থেকেই ভাবছি আপনার সঙ্গে আলাপ করবো কিন্তু সাহস সঞ্চয় করতে পারছি না।

(১৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বন-বেড়াল

[বালীগঞ্জের একটি সমৃদ্ধ গৃহস্থের বাড়ী। ফুলবাগানের সংলগ্ন বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুরুট মুখে রায়বাহাদুর শশী দত্ত—সামনে জটাজুটধারী সন্ন্যাসী আত্মানন্দস্বামী। পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বের এক সকাল।]

রায়বাহাদুর। হাঁ। তুমি—আপনি—আপনি কে?

আত্মানন্দ। আমি? কেউ না—পথিক।

রায়বাহাদুর। বেশ, তা পথ থাকতে ঘরে কেন?

আত্মানন্দ। সবই তাঁর লীলা। তিনি পথও সৃষ্টি করেছেন, আবার সেই পথের বাঁকে বাঁকে ঘরও বসিয়েছেন। যখন যেখান থেকে ডাক আসে…।

রায়বাহাদুর। খুব ভালো কথা। কিন্তু নিজের ঘর ছেড়ে পরের ঘরে চড়াও করার বুদ্ধিটা কেন, শুনতে পাই কি?

আত্মানন্দ। যতদিন নিজেকে নিয়ে পড়েছিলাম, ততদিনই ছিল আত্মপর। যখনি তাঁর হাতে সঁপে দিলাম নিজেকে, তখনি সমস্ত দুনিয়া আপনার হয়ে গেল।

রায়বাহাদুর। বুঝলাম। তা শোনো বাবাজী, দুনিয়া কথাটা ছোট হলেও জিনিষটা খুব ছোট নয়। চেষ্টা করলে কোথাও না কোথাও দিব্যি আসর জাঁকিয়ে বসতে পারবে তুমি। ঢের আহম্মক আছে, যারা মনে করে, যোগেযাগে একবার তোমাদের কাছাটা ধরতে পারলেই এক হেঁচকা টানে সরাসরি বৈকুণ্ঠে গিয়ে উঠবে। সেই ভরসাতেই তারা তোমাদের মতো বকধার্মিকদের গুরু বানিয়ে…।

আত্মানন্দ। অর্থাৎ…।

রায়বাহাদুর। অর্থাৎ সোজা বাংলায়, তোমায় পত্রপাঠ এখান থেকে বিদায় নিতে হবে। যদি ভালোয় ভালোয় না যাও, তাহলে তার জন্যে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে।

আত্মানন্দ। কিন্তু আপনার পুত্র ও পুত্রবধূ আমার মন্ত্র-শিষ্য—আর পৌত্রী আমার…।

রায়বাহাদুর। তাই নাকি? ক-দিন বাড়ী ছিলাম না এর মধ্যেই এত কাণ্ড হয়ে গেছে! আচ্ছা করছি তার ব্যবস্থা। কিন্তু তুমি বাছা আর দেরী করো না। চটপট সরে পড়ো তল্পিতল্পা গুটিয়ে!

আত্মানন্দ। ওঁদের সঙ্গে দেখা না করে ত আমি যেতে পারি না। গুরু হিসাবে আমারও ত একটা কর্ত্তব্য আছে।

রায়বাহাদুর। ওঃ আচ্ছা। এই বাসুদেব, বৌমাকে ডাক ত একবার শীগ্‌গীর।

আত্মানন্দ। আর শ্রীমানকেও…।

রায়বাহাদুর। কিছু দরকার নেই, কান এলে তার সঙ্গে মাথা আপনিই আসবে।

[মিলির প্রবেশ]

মিলি। কি বলছেন বাবা? কফি তৈরি করছিলাম আপনার।

রায়বাহাদুর। কফির চেয়ে কফিনের দরকারই আমার বোধ হয় বেশী হয়ে উঠেছে বৌমা! তা এই কুর্ম্মাবতারটিকে রাতারাতি বাড়ীর ভেতরে বহাল করার স্বাধীনতা তোমাদের কে দিলে শুনি?

আত্মানন্দ। বলো মা, বলো, ক্ষোভের কিছু নেই। অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার প্রথমাবস্থায় প্রতিকূলতাই ত প্রত্যাশিত। আমি আশা করছি, অচিরেই ওঁকেও আমার শিষ্য শ্রেণীভুক্ত করতে পারবো।

রায়বাহাদুর। দেখা যাক বাবাজীর বৈরাগ্যের দৌড়টা! কিন্তু আমি যা জিজ্ঞাসা করছিলাম…।

মিলি। ভেতরে আসুন বলছি।

আত্মানন্দ। আচ্ছা আমিই না হয় তফাতে যাচ্ছি মা—এখনো কীর্ত্তনটা বাকী রয়েছে, সেটা সেরে নিয়ে তারপর স্নানে মনোনিবেশ করবো।

[প্রস্থান]

মিলি। উনি একজন সিদ্ধ পুরুষ। মস্ত বড় জমিদারের ছেলে—বেদান্তের স্কলার, দু-তিনবার ইউরোপ গেছেন, তারপর সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে চলে এসেছেন…।

রায়বাহাদুর। যেহেতু অন্যভাবে অন্ন-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হল না! কিন্তু তোমরা ঐ চীজটি জোটালে কোত্থেকে?

মিলি। মাঝখানে কি হয়েছিল বলি আপনাকে বাবা। আপনি ত ছিলেন না—হঠাৎ খুকু একদিন আমাকে বললে—সে নাকি ঈশান মাষ্টারকে ভালোবাসে! শুনে আমি ত লজ্জায় মরে যাই…বললাম, সে কি রে? এতবড় বাড়ীর মেয়ে তুই, এত লেখাপড়া শিখেছিস, তুই কি না শেষকালে একটা চালচুলোহীন প্রাইভেট মাষ্টারকে বিয়ে করবি? মেয়ের সেই ভীষ্মের পণ।

উনি ত শুনে রেগেই আগুন…দিলেন সেদিনই সন্ধ্যাবেলা ঈশানকে বিদায় করে। মেয়ে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিলে…।

রায়বাহাদুর। ননসেন্স! ওবয়সে ওরকম হয়ই। কিন্তু এই গেরুয়া পরা গন্ধারটা এলো কি করে তার ভেতর?

মিলি। বলছি বাবা। মেয়ের ভাব-গতিক দেখে উনি ভয়ানক মনোকষ্টে ছিলেন—সেই সময় একদিন মিঃ মজুমদারের বাড়ীতে হল বাবার সঙ্গে দেখা। আশ্চর্য্য যে বাবা ওঁকে দেখেই গড়গড় করে নাম-ধাম সব বলে দিলেন—এমন কি মেয়ের কাণ্ড-কারখানা পর্য্যন্ত।

রায়বাহাদুর। আর তাতেই তোমরা একেবারে হাতেগোড় জেড়ে গড়িয়ে পড়লে বাবার শ্রীচরণে…না?

মিলি। মেয়ের মন থেকে ঐ পাপ দূর করার আর ত কোন উপায় ছিল না বাবা! আপনি দেখলে অবাক হয়ে যাবেন, উনি ক-দিনের মধ্যেই খুকুকে একেবারে অন্য মানুষ করে দিয়েছেন—দিনরাত্রি পূজো-আচ্চা, গীতা পাঠ, আর গান-কীর্ত্তন নিয়েই মেতে আছে সে।

রায়বাহাদুর। সর্ব্বনাশ করেছো আর কি মেয়েটার। এর চেয়ে লোফার ঈশান মাষ্টারের সঙ্গে বিয়ে হলেও ওর মঙ্গল হত—ঈশান আর যাই হক ভদ্রসন্তান ত, আর লেখাপড়াও জানে। যাকগে, এখনো শোধরাও মেয়েকে, নইলে কিন্তু…।

মিলি। না বাবা, ধর্ম্মের পথে যাচ্ছে মেয়ে…মা-বাবা হয়ে কি আমরা তাতে বাধা দিতে পারি কখনো?

[উত্তেজিতভাবে নৃপেনের প্রবেশ।]

নৃপেন। মিলি, শীগ্‌গীর এসো ত একবার…।

মিলি। কেন, কেন? হয়েছে কি?

নৃপেন। খুকুকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না…ঘরে না, ছাদে না, বাথরুমে না…। কালীর মা'র মুখে শুনে সারা বাড়ী তোল-পাড় করে এলাম…। এখন উপায়?

মিলি। সে কি? সকাল বেলা ত কোথাও যাবার কথা নয়। যায়ও না ত কোন দিন! গাড়ী আছে ত গ্যারাজে?

নৃপেন। তা বোধ হয় আছে…।

রায় বাহাদুর। ধর্ম্ম-চর্চ্চার ফলটা তাহলে হাতে-হাতেই ফলে গেছে—অ্যাঁ? তা সেই দাড়িয়ালটা গেল কোথায়? শীগ্‌গীর আটকাও সেটাকে—সেটাই নির্ঘাৎ আছে এর ভেতর। বাসুদেব!

নৃপেন। বাবা যেন কি! মহাপুরুষকে হাতে পেয়ে অপমান করার মতো মহাপাপ আর নেই। সেই ঈশান ব্যাটাই তলায় তলায় একটা কিছু করেছে…।

রায়বাহাদুর। আরে হ্যাঁ—তাই ত বলছি আমি। তা বাসুদেব…কোথায় গেলিরে হারামজাদা!

[বাসুদেবের প্রবেশ।]

বাসুদেব। গাড়ী ত রয়েছে বাবু, লোকনাথ নেই। তার কাঠের বাক্সটাও উধাও হয়েছে গ্যারাজ থেকে।

মিলি। যা তুই এখান থেকে।

রায়বাহাদুর। হ্যাঁ যা তুই, আর যাবার পথে স্বামীজীর ঘরে ছেকল তুলে দিয়ে যাস। যেন না পালায় সেটা।

নৃপেন। বাসু…।

রায়বাহাদুর। খবরদার! যা শীগ্‌গী, ছেকল তুলে দিগে।

[বাসুদেবের প্রস্থান]

মিলি। হায় হায় আমি কোথায় যাবো গো? শেষটা ড্রাইভারের সঙ্গে…। ছি ছি এমন মেয়েও হয়েছিল আমার পেটে গো? এর চেয়ে যে ঈশান মাষ্টারও ভালো ছিল গো?

রায়বাহাদুর। সেই ঈশানই তোমার ঘাড় ভেঙেছে গো—আর মড়া কান্না কেঁদে কি হবে গো!

নৃপেন। একটা ডায়েরি করে আসবো পুলিশে?

রায়বাহাদুর। কিছু করতে হবে না—ঐ বিটকেলটাকে ধরে আনো এখানে, আমিই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি সব।

[সক্রোধে আত্মানন্দের প্রবেশ।]

আত্মানন্দ। নৃপেন্দ্র, আমি কি তোমার ভৃত্যের হাতে লাঞ্ছিত হতে এসেছি এখানে? সে কিনা আমায় ঘরে তালা দিয়ে রাখতে চায়!

নৃপেন। বাসু…।

রায়বাহাদুর। চুপ…। হ্যাঁ, এদিকে এসো ত তুমি। আমার নাৎনী কোথায়… বলো শীগ্‌গী।

আত্মানন্দ। ব্যস্ত হবেন না। আত্মিক শক্তি বলে ভাবে আমি সবই জানতে পেরেছি—গত রাত্রে প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় তিনি কোন কৃষ্ণবর্ণ মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে গৃহ থেকে বেরিয়ে গেছেন এবং তার অল্প পরেই এক গৌরাঙ্গ ভদ্রবংশজাত শিক্ষিত যুবকের সঙ্গে তাঁর পরিণয় হয়েছে—এই সহরেরই কোন সম্ভ্রান্ত পল্লীর একটি নিভৃত গৃহে।

নৃপেন। বিয়ে হয়েছে…আঁ! প্রভুর দৃষ্টি ত মিথ্যে হবার নয়। মিলি, তাহলে নিশ্চয় ঈশানই লোকনাথকে ঘুষ দিয়ে…

রায়বাহাদুর। নিশ্চয়। হারামজাদা শুওর কোথাকার! বের কর কোথায় রেখেছিস খুকুকে, নইলে এখুনি জুতিয়ে…।

নৃপেন। আঃ, বাবা…! ঈশান ত আর সামনে নেই যে…।

[রায়বাহাদুর তড়াক করে উঠেই আত্মানন্দের দাড়ি ধরে দিলেন এক টান—সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম চুলদাড়ি খসে গেল—লোকটা আর কেউ নয়, স্বয়ং ঈশান।]

মিলি। অ্যাঁ?

নৃপেন। বাবা ত ঠিকই ধরেছেন…। দাঁড়াও, সায়েস্তা করছি তোমায়!

রায়বাহাদুর। চুপ কর নেপা, জামাইয়ের সঙ্গে বুঝি ঐ রকম করে কথা বলে কেউ?

আত্মানন্দ। দাদা মশায়, আমি গোড়াতেই বুঝেছিলাম, তোমার দয়ার শরীর। আমায় তুমি রক্ষা করো—ওঁরা নিশ্চয় আমায় পুলিশে দেবার চেষ্টা করবেন।

রায়বাহাদুর। ভয় নেই রে শালা—তোকেই আমি পুলিশের চাকরি দোব বরং। কিন্তু সে শালীকে লুকিয়ে রেখেছিস কোথায়?

আত্মানন্দ। এই বাড়ীতেই—তেতলায় চিলে-কোঠায় আছেন। ভোরের মুখেই দু-জনে চলে এসেছি বিয়ে সেরে। তিনি আগে এসেছেন, তারপর আমি…।

রায়বাহাদুর। লোকনাথ কোথায় গেল? তাকে একটা মোটা বখশিস দিতে হবে দেখছি।

আত্মানন্দ। লোকনাথ? বখশিস?

রায়বাহাদুর। হ্যাঁ রে শালা, তোর গোয়েন্দা লোকনাথ। তার কাছেই ত সব জানলাম ভোরবেলা। সে হাতে না থাকলে কি আর এত সহজে চোর ধরতে পারতাম? তা আর কি? যা তুইও তেতলায়, সে শালী হয়ত মরছে একা একা পেট ফুলে…।

[আত্মানন্দের প্রস্থান]

নৃপেন। বাবা এ বিয়েতে তোমার মত আছে?

রায়বাহাদুর। আমাদের মতামতের অপেক্ষা রেখেছে না কি ওরা? এখন ভালো মানুষের মতো একটা হিন্দুমতে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে ফেলো গে, তাহলেই…।

মিলি। একটা কোথাকার কে…।

রায়বাহাদুর। ওরে বেটী, জামাই করতে এর চেয়ে ভালো পাত্র আর পেতিস কোথায়? বুদ্ধিটা ত দেখলিই। বিদ্যেও কম নেই—কেমিষ্ট্রির খলায়। মেয়ে পড়াতে পড়াতে প্রেমে পড়ার তালে ছিল—সুযোগ বুঝেই খুকু লম্বা কাটায় গেঁথে তুলেছে শালাকে।

নৃপেন। রক্ষে হক বাবা।

মিলি। ভাগ্যিস, আর কিছু বলে বসো নি তুমি। যাহক, খুকুর কপালের জোর আছে। বলতো বটে সকলেই, ওর ভালো বিয়ে হবে।

রায়বাহাদুর। খুকুর কপালের চেয়ে ও শালার বুদ্ধির জোরটাই বেশী, নইলে কি আর ঐ বন বেড়াল এত সহজে বাঘের নাৎনীকে বের করে নিয়ে যেতে পারতো, তার খোঁয়াড় থেকে? ঐযে এদিকেই আসছেন দু-জনে। আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞা হক—ওরে কে আছিস, উলু দে—উলু দে।

নৃপেন। বাবার কাণ্ড! চলো গিন্নী, আমরা সরে পড়ি এখান থেকে।

— শঙ্কা —

প্রস্তাব

(১৩২ পৃষ্ঠার পর)

—এতে আর সাহসের প্রশ্ন কেন? আমি তো ভয়ঙ্কর একটা কিছু নই? কি বলেন, ভয়ঙ্কর নাকি?

—না না, সে কি, আপনাকে আমার খুব ভাল—মানে বেশ লাগে।

নাঃ সন্দেহের আর কিছু নেই।

মিস অণিমার কুমারী হৃদয় আবেগে দুলে ওঠে। হয়তো বা গালের ওপর দেখা দেয় ঈষৎ লালের ছোপ।

—আপনাকে একটা কথা বলবো—মানে বলতে চেষ্টা করছি—যদি আপনি ভরসা দেন—মানে একটা প্রস্তাব—।

এবার অণিমা ঘোষও ঘেমে ওঠেন।

একেবারেই বিবাহের প্রস্তাব। কি সুন্দর আবেগপ্রবণ সরল হৃদয়।

আচ্ছা পড়ন্ত বেলার সোনালী আলোটা ঠিক মুখের ওপরই পড়েছে বোধ হয়? বাঁকা সিঁথিতে—আঁকা ভুরুতে—আর রাঙানো অধরে?

ছাপা শাড়ীগুলো চমৎকার জিনিষ—পরলে অন্ততঃ পনের বছর বয়স কম লাগে।

ছোকরা কোঁচার খুঁটটা তুলে নিয়ে আঙুলে জড়াতে সুরু করেছে। কি মিষ্টি এই লজ্জার ভঙ্গিটুকু। সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন মিস।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষায় কাটলো।

—কি মুস্কিল, কি বলতে চান বলুন না? অপাঙ্গে একটু হেসে শিথিল ভঙ্গিতে ডান হাতখানা সামান্য এগিয়ে দিলেন মিস অণিমা। বুকের ভিতর দস্তুরমত 'ঢিপ ঢিপ' সুরু করেছে।

কবিরা বোধ করি একেই 'পুলক নর্তন' বলে থাকেন।

কিন্তু আশ্চর্য্য লজ্জা ছেলেটার, পুরুষ-মানুষ হয়ে। কোনো নভেলে ও কি কখনো পড়েনি এক্ষেত্রে কি বলা উচিত অথবা কি করা? করপল্লবের সাদর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে উঠেই দাঁড়ালো? মিস অণিমা ঘোষকেই কি ফরোয়ার্ড হ'তে হবে?

—আপনার মত লাজুক তো দেখিনি।

—না লজ্জা নয়—মানে লজ্জা আর কিসের—আপনি যখন ভরসা দিচ্ছেন। বলেই ফেলছি—ইয়ে মানে আপনি—মানে আপনাকে অর্থাৎ আপনার কাছে একটা—।

—কি? বিয়ের প্রস্তাব করতে চান—এই তো?

বিলম্বিত প্রতীক্ষায় আর থাকতে পারেন না মিস অণিমা ঘোষ, এই সুদীর্ঘকাল প্রতীক্ষার শেষে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ—খুসীতে উপচে পড়ে ছোকরা—আপনার ভাইঝি ঠিকই বলেছিল যে, "পিসিমা কক্ষনো অমত করবেন না—" মিনাকে—মানে আপনার ভাইঝিকে আমি—মানে তার সঙ্গে আমার—।

—থাক মানে—ব'লে বেঁটে ছাতাটা তুলে নিয়ে—না, মেরে দিলেন না) গট্ গট্ করে চলে যান মিস ঘোষ, ভ্যানিটি-ব্যাগটা ফুলে ফেলে রেখে।

—

উইল্‌সনের
ফায়ারপ্রুফ সিন্দুক

উইল্‌সনের
ইস্পাতের আলমারী

গুণে
শ্রেষ্ঠ

ইণ্ডিয়ান মেটাল এণ্ড ষ্টীল প্রোডাক্টস্

শো-রুম— (১) ১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
(২) ৯৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

শাখা— চাঁদনী চক, দিল্লী (ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের পশ্চাৎভাগে)

সত্বর উৎকৃষ্টরূপে আপনার রেডিও মেরামত করিতে হইলে আমাদের নিকট দিন। সর্বপ্রকার রেডিও ও এ্যামপ্লিফায়ার আমাদের নিকট সর্বদাই মজুত থাকে।

রেডিও রিসার্চ কর্ণার

ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ঃ
গ্যাষ্টিন এণ্ড কোং
২০/১, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রক্ত!

চলাচলের উপর নজর রাখুন।

শরীরের রক্ত দূষিত হইলে যেকোনওপ্রকার রোগের আক্রমণে অচল হইয়া পড়িবেন। এই অনিবার্য্য কুফল হইতে মুক্তি পাইতে হইলে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী

কবিরাজ—আর, এন্, চক্রবর্ত্তীর

রক্তসঞ্জীবনী

আয়ুর্ব্বেদোক্ত বহুবিধ ভেষজ ও তেজস্কর রাসায়নিক সংমিশ্রণে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে প্রস্তুত অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন রক্ত পরিশোধক টনিক ব্যবহারে দূষিত রক্ত পরিষ্কার করিয়া সবল ও সতেজ করে। রক্তদুষ্টি জনিত সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি—বাত, চর্ম্মরোগ, চুলকানি, রক্তশূন্যতা, রক্তের চাপ কম বা বৃদ্ধি এবং পাকাশয় ও অন্ত্র-প্রদেশের উপর ইহার ক্রিয়া আশ্চর্য্যজনক।

মূল্য মাত্র ২৲ টাকা, মাঃ ৫/০

স্ত্রী পুরুষ সকলেই সকল ঋতুতে ব্যবহার করিতে পারেন।

হরিহর আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়
২৪, দেবেন্দ্র ঘোষ রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। প্রোঃ রাইমার, এল,এম, মুখার্জ্জী

GOLD MOHUR BRAND
THE ALUMINIUM MANUFACTURING Co. LTD. CALCUTTA

এলুমিনিয়াম

এলুমিনিয়ামের বাসনপত্র ব্যবহারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

- দেখিতে উজ্জ্বল, ব্যবহারে সুবিধাজনক। সাবান কিম্বা নরম মাটি অথবা ছাইদ্বারা অনায়াসেই পরিষ্কার করা যায়।
- দামে সস্তা এবং অপরিহার্য্য কারণ ওজন হালকা, কলাই খরচা নাই; অল্প আঁচে কম সময়ে রান্না হয়।
- স্বাস্থ্যের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ, ইহাতে রন্ধন করিলে 'ভিটামিন' অধিক পরিমাণে বজায় থাকে।
- সমস্ত ভাঙ্গা ধাতু অপেক্ষা পুরান ও ভাঙ্গা এলুমিনিয়াম বেশী মূল্য পাওয়া যায়।
- সাবধান!! সস্তা দামের এলুমিনিয়াম কিনিবেন না কারণ তাহা বিশুদ্ধ নহে এবং রন্ধনকার্য্যের পক্ষে ক্ষতিকর এবং অনুপযোগী।

JEEWANLAL (1929) LIMITED

Manufacturers of **'CROWN'** Brand Aluminium Ware

SOLE SELLING AGENTS OF THE UTENSILS OF

THE ALUMINIUM MANUFACTURING Co. LTD.

কলিকাতা : বোম্বাই : মাদ্রাজ : রাজমহেন্দ্রী : দিল্লী : এডেন : রেঙ্গুন।

কফির তৃষ্ণাই কফি হাউসে ঢুকবার একমাত্র কারণ নয়, অন্তত: সবার কাছে নয়।

আমি অবশ্যি নিছক কফিতৃষ্ণা নিয়েই ঢুকেছিলাম, তবু চারধার একবার ভালো করে নিরীক্ষণ ক'রে নিলাম। অপরূপ কিছু কিম্বা রূপবতী কেউ আমার চোখে পড়ল না, তবে নিবারণকে দেখতে পাওয়া গেল। আমার অনেককেলে বন্ধু নিবারণ কফি হাউসের এক কোণ আলো করে' বসে আছে নজরে পড়ল।

আমি তার পাল্লায় গিয়ে পড়লাম। তার কফি ইত্যাদির দাম আমার ঘাড়ে চাপবার নিদারুণ সম্ভাবনা নিশ্চিতই ছিল, তবু পতঙ্গ যেমন আলোর আওতা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে না, নিবারণের সান্নিধ্য থেকে আমাকে নিবারণ করাও তেমনি দুঃসাধ্য।

বসতেই নিবারণ বলে' উঠল: "আইল অফ ম্যান্ কোথায় জানো কি?"

আমি ঘাড় নাড়তেই সঙ্গে সঙ্গে তার দ্বিতীয়বার আমাকে পাড়বার চেষ্টা: "আইল অফ ম্যান্ কি করে' হোলো তোমার জানা আছে?"

"কোনো ভূমিকম্প হয়েই বোধ হয়? না কি—আমাদের বঙ্গোপসাগরের মোহনায় যেমন করে' বদ্বীপ গজায় তেমনি করে'—"

"তোমার মাথা!" নিবারণ ঘন ঘন নিজের মাথা নাড়ে: "ওর ভূগোল ইতিহাস কিছু তোমার জানা নেই দেখছি। কিছু তুমি জানো না। সাহিদের সঙ্গে আজ আমার দেখা!"

আমার অজ্ঞানতার সঙ্গে সাহিদ-দর্শনের কী সম্পর্ক—নিবারণের দুটি ঘোষণার যোগসূত্র কোথায় তার কিছুই আমি আঁচ পাই না। ওর মাথার সম্পর্কেই আমার সন্দেহ জাগতে থাকে। কিছু আশ্চর্য নয়! অনেকে যেমন আশী বছরের ঢের আগে, এমন কি আট বছরেই নাবালক হয়ে ওঠে, তেমনি নিবারণের পক্ষে অযথা সময়ে ভীমরতি লাভ করা বিচিত্র না!

"শোনো তবে।" শুরু করল নিবারণ: "সাহিদের কত পুরুষ আগে কেউ জানে না, সাহিদ্ নিজেও নয়, ওদের বংশে হাকিম ওয়াহিদ্ খাঁ বলে এক হাকিম ছিলেন। খুব সম্ভব জেঠা জোলাই আসল হবে। উক্ত খাঁসাহেব একবার হজ করতে গিয়ে আর ফিরলেন না। পীড়িত মানুষের সেবা করাই তাঁর একমাত্র ধর্ম ছিল; তিনি দেখলেন পৃথিবীর কোথাও পীড়িত লোক দুর্লভ নয়—দেশে দেশে কলগ্রাণির মত ছড়িয়ে রয়েছে। রোগপীড়ার অভাব নেই কোথাও। অতএব রোগীর অন্বেষণে স্বদেশে ফেরার কোনো মানে হয় না। এই কথা তাঁর মনে হোলো। মক্কা মদিনা থেকে শুরু করে' তাদের সারাতে সারাতে এবং বেশির ভাগ সরাতে সরাতে এবং সেই সঙ্গে নিজেও সরতে সরতে অবশেষে তিনি ইংলণ্ডের উপকূলে গিয়ে ঠেকলেন। লিভার পুল্ বন্দরের কাছাকাছি এক দ্বীপে গিয়ে তিনি আশ্রয় নিলেন। সেই তাঁর শেষ আস্তানা, যতদূর জানা যায়।"

"এখানে এসে শেষ পর্য্য কেন যে তিনি টিকে গেলেন তার মূলে কোনো রহস্য ছিল না। এই দ্বীপে তিনি হাকিমরূপে দর্শন দেননি, এই কারণেই অতঃ কিম এর প্রশ্ন আর তাঁকে বিচলিত করল না। বলেছি তো, সারাতে গিয়ে বেশির ভাগ তিনি সরিয়ে ফেলতেন, একেবারে দুনিয়া থেকেই—যেমনতর এখনকার ডাক্তারদেরও দস্তুর। আর তার ফলেই, তাঁকে নিজেকেও সরতে হোতো। রোগীকে কবর দিয়ে ফিরে তার আত্মীয়রা, খুব সম্ভব দর্শনী দেবার মানসেই তাঁর খোঁজে আসত। কিন্তু আর তাঁর দর্শন পেত না। তিনি তখন অন্য কোনো মুলুকে গিয়ে নিজের চিকিৎসা-নৈপুণ্য প্রদর্শন করছেন। কিন্তু করলে কি হবে, শেষে একদা তিনি দেখলেন যে, এভাবে অসম্ভব। এইভাবে আর্তের সেবা করা আর তো চলে না। বয়সও গড়িয়ে আসছে, কাঁহাতক দৌড় ঝাঁপ পোষায়? এদিকে নিজের হাকিমি না করায় ভুঁড়িও তাঁর ভূরি ভূরি জন্মেছিল। এই সব কারণে এই দ্বীপে এসে সারাই খানার বদলে তিনি একটা সরাইখানা খুল্লেন।

শিবরাম চক্রবর্তী

"সরাইখানা হচ্ছে এযুগের রেস্তরাঁর আদিম সংস্করণ। সারাইখানার থেকে অবশ্যি খুব বেশি ওর তফাৎ নেই—কেবল এক আ-কারের / া-কারের পার্থক্য। দুটোর মূল উদ্দেশ্য এক—ভুতাহরণ। মোটামাট দুক্ষেত্র আর কি। সারাইখানার উদ্দেশ্য হচ্ছে রোগ সারানো আর সরাইখানার উদ্দেশ্য হচ্ছে রোগের সৃষ্টি করা। কিন্তু আশ্চর্য মানুষের স্বভাব, অসুখ হলে মানুষ নিজেকে দায়ী করে, সারাতে না পারলে চিকিৎসককে দায়ী করে, মারা গেলে ভাগ্যকে দায়ী করে,—কিন্তু খাদ্যাখাদ্যদের কখনো না। অতএব ওয়াহিদ খাঁ দেখলেন এই পথই উত্তম। উত্তম এবং উপাদেয়—খাদ্য-খাদক আর খাদ্য-দাতা সবার দিক থেকেই। রোগ সৃষ্টি করে' তার পরে ডাক্তারের হাতে ছেড়ে দিলেই তাঁর ছুটি—রোগী কবরে গেলেও খাঁ-সাহেবের কোনো ঝুঁকি নেই। মাঝখানে ডাক্তারের হাতফেরতা হয়ে যাচ্ছে তো! অতএব লোক যদি সরাতেই হয় তো সরাই-খানার পন্থাই শ্রেয়ঃ। সহজ আর নিরাপদ। হাকিমি ওস্তাদিও রইলো, দাবুদ্ধির বিকল্পে বজায় থাকলো, অথচ কারো হাঁকডাকের পরোয়া নেই!

"তাঁর সরাইখানার থেকে কিছু দূরে এক মুদীর দোকান ছিল। মুদীর নাম রইসম্যান্। আমাদের সরকারী দপ্তরের রইসম্যান্ মুদী-ম্যানের পূর্ব্বপুরুষ কিনা তা বলতে পারব না। তা সে যাই হোক, তার দোকান থেকেই সরাইখানার আটা ইত্যাদি সরবরাহ হোতো। এই মুদীর অনেক পচা আটা খাঁসাহেব পাচার করেছিলেন—তার থেকে কতো যে আপাতমনোরম কেক রুটি বানিয়েছিলেন তার ইয়ত্তা হয় না। এই কারণে, খাঁসাহেবের কার্য্যকারিতা এবং কৃত-কার্যতার ওপরে রইসম্যানের শ্রদ্ধা ছিল অগাধ।

"রইসম্যানের প্রতি খাঁসাহেবেরও একটু 'স্নেহ' জন্মেছিল বই কি! তাকেই একমাত্র তিনি প্রাক্তন জীবনের হাকিমির কথা জানিয়েছিলেন। তাঁর দাবাইখানাও দেখিয়েছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয়, রইস্-ম্যানের কোনো ব্যাধি ছিল না।

"কিন্তু ব্যারাম না থাকলেও রইসম্যানের ইদানীং এক উপসর্গ দেখা দিয়েছিল। ইঁদুর। ইঁদুররা তার আটা ময়দার বস্তা-কে-বস্তা ফাঁক করে দিচ্ছিল—তাদের পচবার তেমন ফুরসৎ দিচ্ছিল না। লাভের স্বর্গপথে অন্তরায় হয়ে এই সব উপদ্রবরা দ্রব্যাদের উপযুক্ত পরিণতি লাভে বাধা সৃষ্টি করছিল—দিনের পর দিন।

"কোনো রকমে ওদের সরাতে না পেরে রইসম্যান্ সরাইওলায় শরণাপন্ন হোলো। হাকিমি মতে এমন কোনো দাবাই হয়ত

থাকতে পারে যার দ্বারা ইঁদুরদের দাবানো যায়। সূচিকিৎসায় তারা একেবারে মারা পড়লেও তার কোনো দুঃখ নেই।

"ওয়াহিদ্ খাঁই একবার রইসম্যানকে বলেছিলেন হাকিমি দ্রব্যগুণে হয়না দুনিয়ায় এমন কিছু নেই। এমন দাবাইও নাকি আছে যা তিল পরিমাণ হাতে রাখলে যার কথা ভাবা যায় সে পায়ে এসে লুটিয়ে পড়ে। হাতে রাখলেই হয়, খাবার দরকার করে না, তিল পরিমাণ মাত্র। কিন্তু তার তাল সামলানোই দায়।

"ইঁদুরদের বশীভূত করবার এমন কিছু কি সরাইওলার দাবাইখানায় নেই? তাহলে সে-ওষুধ রইসম্যান্ নিজের হাতে ধারণ করতে প্রস্তুত। তারপর তিলোত্তমার আকর্ষণে ইঁদুররা হাতের নাগালে এলেই, তাক্ করে' তাদের গলগণ্ডের ওপরে একটি করে' কাষ্ঠদণ্ড। এক ঘা, ব্যস্, অমনি খতম্।"

প্রস্তাব শুনে খাঁসাহেবের হাসি আর থামে না। হাসতে হাসতে তাঁর হেঁচকি উঠে গেল। "শোনো কথা!" তিনি বল্লেন: "হাকিমি শাস্ত্রে এমন জিনিস নেই একথা আমি বলছিনে, কিন্তু হাকিমি দাবাই বানাতে আর আমার উৎসাহ হয় না। ওকাজ আমি তোবা করেছি। ওতে আর আমি হাত দোব না।"

"তাহলে আমিই এক হাত দেখি।" বল্ল রইসম্যান্: "আমায় তোমার দাবাইখানায় ছেড়ে দাও। তোমার দশ বিশটা বোতলের থেকে একটু একটু নিয়ে আমি নিজেই একটা কিছু বানাবার চেষ্টা করি। দেখা যাক্ কী দাঁড়ায়!"

এই কথা শুনে খাঁ সাহেবের দাঁড়ানো শক্ত হোতো, আবার তিনি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়তেন, কিন্তু হাসির ধাক্কা বেশি হলেই তাঁর হেঁচকি ওঠে, আর হেঁচকিদের প্রতি তাঁর মোটেই কোনো আসক্তি ছিল না। আর হ্যাঁচকাবার তাঁর শক্তিও ছিল না তেমন।

"তাই যদি তোমার মর্জ্জি হয়, আমি বাধা দিতে চাই না। তোমার যা খুসি বানাও গে।" আত্মসম্বরণ করে' এই বল্লেন তিনি রইসম্যানকে।

রইসম্যান্‌তো মহোৎসাহে লাগল। এ-আলমারির থেকে কিছু, ও-আলমারির থেকে কিঞ্চিৎ, এ-বোতলের খানিক, ও-বোতলের খানিক নিয়ে মিলিয়ে মিশিয়ে একটা কিছু তো খাড়া করল। একসঙ্গে মাখানো তালগোল পাকানো সবুজ রঙের সেই জিনিষটা হস্তগত করে' তারপর সে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

রইসম্যান্ পা বাড়াতেই একটি মেয়ে ঘুরে দাঁড়াল। সে পিছু নিল রইসম্যানের। তারপরে একটি সুন্দরী ললনারও তদ্রূপ আচরণ দেখা গেল। এই দৃশ্যে সে খুব উৎসাহিত বোধ করল। উইঁ আর ইঁদুরের ব্যবহার প্রায় একরকম শোনা যায় এবং হয়ত উইমেনকেও তাদের মধ্যে ফেলা যেতে পারে—অতএব যে ওষুধ মেয়েদের ধরেছে তা ইঁদুরকেও না কাবু করে' ছাড়বে না। এই বোধ হয় তার উৎসাহের কারণ। সে হন্‌হন্ করে পা চালালো তার দোকানের দিকে।

কিন্তু হাসপাতালের পাশ দিয়ে যাবার সময় তার উৎসাহ আতঙ্ক হয়ে উঠল। হাসপাতালের যতো নার্স রুগীদের ফেলে, তাদের জীবনমরণ সঙ্কটের কথা খেয়াল না করে এক ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এল। তারাও নিল রইসম্যানের পিছু। দু'পাশের বাড়ীর বৌঝিরাও সব বেরিয়ে আস্‌তে লাগল—হুড়মুড় করে'।

এতক্ষণে রইসম্যানের হৃৎকম্প হতে আরম্ভ হয়েছে। যে মেয়েরই পাশ দিয়ে যায় সেই তক্ষুণি ঘুরে দাঁড়ায় আর তার পিছু নেয়। এই মায়াপাশ ছিন্ন করবার কোনো উপায় সে দেখতে পায় না।

ভারী মুস্কিল হোলো তার এক জায়গায় এসে। সেখানে একদল ঝাড়ুদারণী রাস্তা ঝাঁটাচ্ছিল। তারা ঝাঁটাসমেত রইসম্যানের পিছনে লাগল। ঝাঁটার খোঁচা লাগতে লাগল তার পাঁজরায়। অগত্যা, খোঁচ লাগলেই বেচারাকে লাফাতে হচ্ছিল। আর তার লাফানির অনুকরণে সেই বিরাট শোভাযাত্রাও লাফ মারতে অন্যথা করছিল না। আশ্চর্য্য বাধ্যবাধকতা!

এইভাবে লাফাতে লাফাতে যেতে যেতে মাঝে মাঝে সে পিছন ফিরে তাকাচ্ছিল। নারীদের গতিবিধি দেখে তার নাড়ীর গতি যতই মন্দ হয়ে আসছিল পায়ের গতি ততই উদ্দাম হয়ে উঠছিল তার। পেছনের অভিসারিকারাও পেছপা ছিল না। তাদেরও উদ্যম কম ছিল না কিছু।

আর কে ছিল না সেই দলে? গেরস্থ ঘরের বৌ-ঝি থেকে সুরু করে' চাকরাণী, মাথরাণী, নার্স, ধোপানী, দাই, লেডি ডাক্তার, আর্টিষ্টের মডেল, থিয়েটারের অভিনেত্রী, নর্ত্তকী, গায়িকা, এমন কি ডাইনিরা পর্য্যন্ত। সুশ্রী, কুৎসিত, কানা, খোঁড়া, কুঁজো, নুলো সব রকমের। বালিকা, নাবালিকা, কিশোরী, তরুণী, যুবতী, আধাবয়সী, অশীতিপর বৃদ্ধা—কেউ বাদ না। মানে যত প্রকারের রমণী আছে তারা সবাই সেই মিছিলে ছিল, আর রইসম্যান্ যতই এগোচ্ছিল ততই দলে ভারী হচ্ছিল তারা।

রইসম্যান তো কাহিল হয়ে পড়ল। পরিত্রাণ পাবার মতলবে সে ছুট মারল এইবার। কিন্তু মারলে কি হবে, মেয়েরাও নাছোড়বান্দা। তারাও তাড়া করে' চল্ল। এপথ ওপথ দিয়ে, এগলি ওগলি গলে' তাদের এড়াবার যত কায়দাই ও করুক না কেন, ওরা ঠিক তার পেছনে আছে। অবশেষে দৌড়তে দৌড়তে আবার সে ওয়াহিদ খাঁর সরাইখানায় ফিরে এল। তার কাছে যদি এর প্রতিষেধক কোনো ওষুধ থাকে। যদি সে বাঁচায়!

ওয়াহিদ খাঁ সমুদ্র গর্জ্জনের মত তেড়ে আসা একটা আওয়াজ আগেই পেয়েছিলেন। উঁকি মেরে যখন তিনি রইসম্যান্ আর তার ছায়াসঙ্গিনীদের দেখতে পেলেন তক্ষুণি ভেতরে ঢুকে বাড়ীর দরজায় তিনি হুড়কো লাগিয়ে দিলেন। ঐ দৃশ্যের প্রতি ফিরে তাকাবারও তাঁর সাহস হোলো না। যদি তাকাতেন, তাহলে আজীবন গ্যালপিং হেঁচকির ধাক্কায় তাঁকে যায় যায় হয়ে থাকতে হোতো।

"ফিরে তাকাও!" কাতর চীৎকার ছাড়তে লাগল রইসম্যান্: "একবারটি ছাখো আমার দিকে। তোমার সেই দাবাই। আমার তৈরী করা সেই হাকিমি দাবাই। একটা ইঁদুরও টানতে পারেনি, কিন্তু এই সব ভদ্র মহিলাদের টেনে এনেছে। কি করব বলো এখন?"

"চলে যাও। চলে যাও এখান থেকে। পালিয়ে যাও।" ভেতর থেকে ওয়াহিদ খাঁর চীৎকার শোনা যায়: "যেদিকে তোমার দু' চক্ষু যায় দূর হয়ে যাও। তোমার আওরৎদেরও নিয়ে যাও, আর থেকো না।"

"কিন্তু যাবো কোথায় বাৎলে দাও আগে।" রইসম্যান্ এবার কাঁদতে থাকে: "জীবনে তেমন মেয়ে পাইনি বলে' আমার দুঃখ ছিল। কতোবার মেরী মাতার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি, মা মনের মত একটি মেয়ে অন্ততঃ দাও আমায়। তার কি এই প্রতিফল? আমার পায়ে খা হয়ে গেল ছুটে ছুটে। ছুটবার আর ক্ষমতা নেই আমার। একটা বুদ্ধি বাৎলে দাও বন্ধু! আমি কথা দিচ্ছি, এক মাস ধরে' বিনামূল্যে তোমাকে পচা ময়দার যোগান দেব।"

"তোমার হাতের ঐ তাল আর কাউকে গছিয়ে দাও গে।" বুদ্ধি দিলেন ওয়াহিদ: "দেরি কোরোনা, চট্‌পট।"

শোনবামাত্র রইসম্যানের মনে হোলো এ যুক্তি মন্দ নয়। তৎক্ষণাৎ সে শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। ছুট লাগাল আরেকবার। একজন নাবিক পড়ল তার পথে—সে দ্বিধা না করে' সেই দণ্ডে তার পকেটের মধ্যে সেই সবুজ তাল চালিয়ে দিল।

নাবিকটি নিজের জাহাজে উঠতে যাচ্ছিল। তক্ষুণি তার জাহাজ ছাড়বার কথা। সে গিয়ে তার জাহাজে উঠল। আর তার পিছু পিছু মেয়েরাও উঠে পড়ল জাহাজে। তার সঙ্গে পাড়ি দিল সবাই।"

আমি এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত নিবারণের উপাখ্যান শুনছিলাম। ওর হুঙ্কার থেমে এলেও আমার হাঁ কার আর বুজছিল না।

"বুঝলে! এইভাবে রইসম্যানের দৌলতে সেই দ্বীপে শুধু পুরুষরাই কেবল রয়ে গেল। এই হোলো আইল্ অফ ম্যানের উৎপত্তির কাহিনী। কালকে মাত্র এই কাহিনী জেনেছে সাহিদ। বিলেত থেকে আন্তর্জাতিক এক কমিশন এসেছে, তারাই সাহিদকে খুঁজে বার করে' জানিয়েছে এই কথা।" বল্ল নিবারণ।

"কেন?" আবার আমাকে হাঁ হতে হয়।

"এ একটা খুব গোপনীয় কমিশন—চুপচাপ এসেছে। এখনো কেউ জানে না। তোমাকে প্রাইভেটলি বলছি। এর মতলব আইল্ অফ ম্যানে গিয়ে ভূতপূর্ব্ব হাকিম

(১৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এবার পূজায় বাজে খরচ করবেন না

পূজা যখন আসে, তখন মধ্যবিত্তও নিজকে লাখপতি মনে করে। কারণ, যে সব উৎসব বাংলার ঘরে দেখা দেয়, তার মধ্যে দুর্গাপূজাই নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বড়। এই সময় মানুষ সারা বছরের সঞ্চয় খরচ করে। কিন্তু এ বছরটা বিশেষ করে খারাপ সময়: দুর্ভিক্ষ, অর্থ নৈতিক অসময়, যুদ্ধ আর মহামারী---এ বছরের দুর্ঘটনার যেন শেষ নাই। পূজার আনন্দ করুন কিন্তু বাজে খরচ করবেন না। যতটুকু পারেন সঞ্চয় করুন - আগামী কাল কপালে কি আছে তাও আপনি জানেন না। দুর্ঘটনার জন্য সঞ্চয় প্রয়োজন। সুদিনকে ঘনিয়ে আন্‌তে আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করব, তখন বাজে খরচ করা হয়ত সম্ভব হবে। সুদিন আসবে জাতীয় শিল্প উন্নতির মধ্যে দিয়ে। জাতীয় শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা করুন। জাতীয় শিল্প গড়ে তোলবার জন্যে যতটা পারেন সঞ্চয় করুন।

সঞ্চয় এবং জাতীয় শিল্প গড়ে তোলা উভয় কাজেই সিভিল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। উভয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্যে শ্রীযুক্ত এস আর রাহা, বি-এল এর নেতৃত্বে এক দল সুযোগ্য কর্মী মেতে উঠেছেন। সুদিন দুর্দিন---সব সময়ই এঁরা আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

Plan your future

সিভিল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

৩ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

৯-এ, শ্যামনগর রোড, কালীঘাট।

নারীহিতৈষী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

(১২১ পৃষ্ঠার পর)

বুদ্ধদেব প্রভৃতি জগতের সাধু শিরোমণিগণের অহিংসার উপদেশ ভুলিয়া যাইতে হয়।"

এই জন্য বাল্যকাল হইতে নারীদের দৈহিক ও মানসিক শক্তির উন্নতি সাধন প্রয়োজন এবং পুরুষদের বিপন্নার রক্ষায় সমর্থ হওয়া অবশ্য প্রয়োজন—তিনি মনে করিতেন। কিন্তু তাহার চেয়েও বড় কথা এই যে, যে দেশে অরক্ষিত অবস্থাতেও নারী নিরাপদে বিচরণ করিতে পারে না সে দেশকে তিনি সভ্য মনে করিতেন না। তিনি বলিতেন, "জগতের সভ্যতম দেশ সকলেও মানুষ অনেক বিষয়ে বর্ব্বরতার অবস্থা অতিক্রম করিতে পারে নাই। একটি বিষয় এই যে, দুই জাতির মধ্যে যুদ্ধ হইলে উভয় পক্ষের সৈন্যরা সুবিধা পাইলেই শত্রুজাতির স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার করে। যুদ্ধের সময়েই হউক কিম্বা শান্তির সময়েই হউক, নারীর উপর এইরূপ অত্যাচার যখন আর হইবে না তখন বুঝা যাইবে যে, মানুষ পশুত্বের অবস্থা অতিক্রম করিয়া মানবত্ব লাভ করিয়াছে।...নারীর নিঃশঙ্ক অবস্থায় কাল যাপন সভ্যতার একটি মাপকাঠি।"

অত্যাচারী পিশাচদের বিশেষ কঠোর শাস্তি দিবার জন্য তিনি ব্যবস্থাপক সভায় অনুরোধ করেন।

তিনি বাঙালী হিন্দুর সামাজিক সমস্যা প্রধানতঃ দুইটি মনে করিতেন। তাহার ভিতর প্রথমটি নারীর অবস্থা ও অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে। একথা তিনি হিন্দু মহাসভা, বঙ্গীয় হিন্দু সম্মেলন প্রভৃতি নানা স্থানে বলিয়াছেন। বাংলা দেশে পুরুষ অপেক্ষা নারীর জন্ম কম হয়, অথচ বাংলা দেশেই পুরুষদের তুলনায় নারী আত্মহত্যা করে বেশী, অন্যান্য দেশে হয় উল্টা। প্রসূতিরাও বাংলা দেশেই মৃত্যুমুখে পড়ে বেশী। তাই রামানন্দ বলিতেন, "যে জাতির নারীর এই অবস্থা, সেই জাতি বর্দ্ধিষ্ণু হইবে কি করিয়া?"

যে জাতি স্বাধীন হইতে ও থাকিতে চায়, তাহাকে সামাজিক প্রথার পরিবর্ত্তন করিয়া এবং শিক্ষার দ্বারা নারীর কার্য্যক্ষেত্র ও কর্ম্মদক্ষতা বাড়াইয়া নারীশক্তিরও সম্পূর্ণ সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে এই ছিল তাঁহার মত।

দেশবিদেশে যখন তিনি কাজে যাইতেন, তখন সেখানকার নানা প্রতিষ্ঠান দর্শন তাঁহার একটি কাজ ছিল। বালিকা বিদ্যালয়, বিধবাশ্রম প্রভৃতি যত ছোটই হউক, তাহা দর্শনে তাঁহার ক্লান্তি ছিল না। ছোটখাট গণ্ডগ্রামে ছোট ছোট বালিকা বিদ্যালয়ও যদি তাঁহাকে তাহাদের কোন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিতে ডাকিত, তিনি বড় বড় জায়গার কাজ ফেলিয়াও সেখানে যাইতেন। এইরূপ ছোট একটি বিদ্যালয়ের মন্তব্য পুস্তকে রামানন্দ লিখিয়াছিলেন, "...বাঙালী পুরুষদের মানসিক শক্তিতেই প্রধানতঃ বাঙালী জাতি যশস্বী হইয়াছে। কিন্তু অর্দ্ধেক যশ এখনও আমাদের পাওনা আছে। নারীরা শিক্ষিতা হইলে তাহা আমরা পাইব।..."

১৩২৮-এ রামানন্দ বলেন, "পুরুষ যেমন দেশের লোক, নারীও তেমনি দেশের লোক এবং নারীরা সমুদয় অধিবাসীর অর্দ্ধেক। (আমাদের) দেশের নারীদের মধ্যে শতকরা একজনকেও শিক্ষিতা বলা যায় কিনা সন্দেহ। গৃহস্থালীর বাহিরের খবর নারীদের কাছে পুস্তক ও খবরের কাগজের সাহায্যে পৌঁছিতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই নিরক্ষর বলিয়া, এই উপায়ে দেশ সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান জন্মে না।"

আমাদের দেশের মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ কম বলিয়া রামানন্দের ইচ্ছা ছিল বাংলা ভাষায় নানা বিষয়ক জ্ঞান অর্জ্জনের উপযোগী সহজ সহজ পুস্তক রচনা করাইয়া এবং অন্তঃপুরে তাহার প্রচার করিয়া মেয়েদের জন্য বাংলায় কতকগুলি পরীক্ষা লওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই কার্য্যে তিনি রবীন্দ্র-নাথকে অগ্রণী হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া-ছিলেন।

নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকারের দাবী সমর্থন করিতে রামানন্দ অগ্রগণ্য ছিলেন। ইংরাজী ১৯২১-এ যখন নারীর অধিকার বিষয়ক আন্দোলন হয়, তখন তিনি নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার, বঙ্গে হিন্দুনারীর অবস্থা, বঙ্গীয় সরকারী শিক্ষা বিভাগে নারীদের বেতন ইত্যাদি বহু বিষয়ে একই সঙ্গে লিখিতেন; ঐ বৎসর আশ্বিন মাসে নারীর ভোটের অধিকার বিষয়ে সকল বিরুদ্ধ মত তিনি খণ্ডন করেন। আবার ফাল্গুনে নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার, নারীকে আঘাত, নারীধর্ম্ম রক্ষা, নারীশিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে এক মাসেই লেখেন। ফর্দ্দ দিয়া যাওয়া চলে না, তবে বলা যায় যে, নারীর অধিকার বিষয়ক এইরূপ লেখা তাঁহার আকস্মিক লেখা ছিল না, ইহা নিত্য ও নৈমিত্তিক ছিল।

'প্রবাসী'তে কিছুদিন 'মহিলা মজলিস' নামক একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হয়; তাহাতে কেবল নারীদের বিষয়ই লেখা থাকিত। নারীযোগ্য ব্যবসায়, নারীদের কর্ম্মক্ষেত্র, বঙ্গের অন্তঃপুরশিল্প, কৃতী ও মহীয়সী নারীদের জীবনী, নানা দেশের নারীদের উন্নতির কথা ইত্যাদি বহু বিষয় আলোচিত হইত। সেই সঙ্গে ছবিও থাকিত।

বাংলা ১৩৩৯ সালে সুলতানা মুয়াজ্জিদ জাদা যখন বি-এল পড়েন, তখন রামানন্দ বলেন যে, পর্দানশীন মহিলাও যখন আইনজ্ঞ হইতে পারেন, তখন রাজনীতিজ্ঞও হইতে পারেন এবং সেইজন্যও মেয়েদের ভোট পাওয়া উচিত। তখনও ভোটের অধিকার এদেশে হয় নাই।

ডক্টর ভগবান দাস যখন, অসবর্ণ বিবাহ করিয়াও বিবাহিত পুরুষ যাহাতে একান্নবর্ত্তী থাকিতে পারে, এই চেষ্টায় একটি বিল ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করেন, তখন রামানন্দ বলেন, "সমাজ-সংস্কারকদের ইহার বিরুদ্ধে কেবল একটি আপত্তি আছে। ইহা এক-পত্নীক বিবাহকে আবশ্যিক করে নাই। এক বা একাধিক স্ত্রী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেহ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের একাধিক নারীকে এরূপ আইন অনুসারে বিবাহ করিতে পারিবে, তাহা বাঞ্ছনীয় নহে।" ভাল বিলের মধ্যে কোন খুঁত তিনি থাকা পছন্দ করিতেন না।

তিনি শিক্ষিতা মহিলাদিগকে বালিকা-দের ও নারীদের অজ্ঞতা দূর করিবার এবং মানসিক ও দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি করিবার কাজে অন্য নানা কাজ ফেলিয়া আত্ম-নিয়োগ করিতে বলিতেন। নারী সমাজের অজ্ঞতা তাহা না হইলে দূর হইবে না এবং অজ্ঞতা দূর না হইলে তাঁহাদের মানসিক ও দৈহিক শক্তিও বাড়িবে না, ইহা তিনি মনে করিতেন। এবং তাই বলিতেন যে, নারীদের অজ্ঞতা দূর না হইলে তাঁহারা রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে বিশেষ সাহায্য করিতে পারিবেন না।

তিনি নারীদের পক্ষেও স্বাবলম্বন মঙ্গল-জনক মনে করিতেন। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত নারীকে যে পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়, তাহা ভাল মনে করিতেন না। অবশ্য তিনি বুঝিতেন যে, নারীর পুরুষ অভিভাবকেরা নারীদের অনুগ্রহ করিয়া ভরণপোষণ করেন না। কিন্তু তিনি ইহাও জানিতেন যে, সকল পুরুষ প্রকৃতিস্থ ও আদর্শস্থানীয় নহেন। অনেকে মনে করেন সংসারে আজীবন উদয়াস্ত খাটিয়া এবং স্বামী পুত্র কন্যা ভ্রাতাদের সেবাযত্ন ও মঙ্গল চেষ্টা করিয়াও নারীরা পুরুষের অনুগ্রহের অন্ন খান। এই কারণে রামানন্দ মনে করিতেন, "নারীর স্বাবলম্বিনী হইবার জন্য তাঁহার উপার্জ্জনের ক্ষেত্র বিস্তৃততর হওয়া ভাল।"

বিধবা স্ত্রী, বিধবা পুত্রবধূ ও কন্যাদেরও যে হিন্দুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবার ন্যায্য অধিকার আছে এবং আইনতঃ তাহাই যে হওয়া উচিত, ইহাও তিনি স্বীকার করিতেন এবং বহুস্থলে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

এক কথায় বলা যায়, স্ত্রীজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য রামানন্দ চিরদিন চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সকল ন্যায্য দাবীর তিনি সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার চিন্তার ক্ষেত্রে মানুষ বলিতে পুরুষ কখনও একক দেখা দেন নাই। *

---

* 'রামানন্দ ও অর্দ্ধশতাব্দীর বাংলা' নামক বৃহৎ পুস্তক হইতে সঙ্কলিত। তাঁহার মৃত্যুর সাংবৎসরিক দিবস ৩০শে সেপ্টেম্বর স্মরণে প্রকাশিত।

নৌকা

(১২৬ পৃষ্ঠার পর)

কার্তিক তাই আবার নিশুতি রাত্রে গিয়ে জলের সাথে মাছ মেরে এনেছে। কার্তিক বটে!

ভাল করে রোদ না উঠতে কার্তিকের বাপ দ্বারিক সর্দার এসে হাজির। রতন মোড়ল খোঁজ দিয়েছে, এতটা পথ ছুটতে ছুটতে এসেছে। পা হড়কে পথে পড়ে গিয়েছিল, সর্বাঙ্গে কাদা। এসেই—ঘুমন্ত মানুষ বলে করুণা নেই—কার্তিকের পিঠের উপর দমাদম ঘুষি। লাফিয়ে উঠে কার্তিক হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়াল।

মর্, মর্—মরিসনে কেন তুই? মুখ দেখাবার জো থাকল না। হুঁকো-নাপিত বন্ধ হবে তোর জন্যে।

কার্তিক তাই বটে। বর্ষা চেপে পড়েছে, দিনরাত্রি খবর হচ্ছে—এই এখানে বাঁধ ভাঙল, ওখানে ভাঙো-ভাঙো। বৃষ্টি-বাতাস আলো-আঁধার নেই, দু-চারজন ঘুরছেই। আশঙ্কার কিছু দেখলে তখনই হাঁক ছাড়বে, এ-এ-এ- -হৈ···। ভয়ঙ্কর আওয়াজ। দিনমানে হোক রাতদুপুরে হোক—সে ডাক শুনে কারও ঘরে থাকবার জো নেই। তোমার ধানজমি এককাঠাও যদি না থাকে, যেতে হবে দশজনের কাজে। ঘাটে যে নৌকা থাক—হোক তালুকদার বাড়ির কিম্বা বিদেশি গুড়ের ব্যাপারির তখনি বিলে নিয়ে ছুটবে। ক্রোশের পর ক্রোশ ধানবন, এক ঝুড়ি মাটি আনতে হলে যেতে হবে গ্রাম অবধি। তার জন্য চাই নৌকো—দশ, বিশ, পঞ্চাশ—গোণাগুনতি নেই, যেখানে যত আছে সমস্ত। এহেন সময়ে হাঁ-পর কার্তিক কিনা তার নীলমণি নিয়ে এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে!

কার্তিক আকাশ থেকে পড়ল। আমি এসেছি, তা বলে নৌকো আনলাম কখন? জিজ্ঞাসা করে দেখ না এই এঁদের সব।

কেদারও প্রবল কণ্ঠে সায় দিল, হাঁ—সত্যি কথা। নৌকো-টৌকো নেই তো—আপনার কার্তিক এমনি চলে এসেছে। আমরা কেন মিছে কথা বলতে যাব?

অপ্রত্যয়ের সুরে দ্বারিক বলে, নৌকো হল ওর প্রাণ—নৌকো রেখে আসবে? কি জানি! কার্তিককে বলে, নিয়ে আসিস নি তবে কোথায় রেখে এলি, দেখিয়ে যা এসে হারামজাদা।

হাত ধরে এক রকম হিড়-হিড় করে তাকে টেনে নিয়ে চলল। ঘাট অবধি গিয়ে দ্বারিক আগুন হয়ে আবার ফিরে আসে। কেদারকে বলে, মিছে কথা বলেন না যে আপনি! নৌকো নাকি আসে নি?

কেদার অবাক হয়ে বলে, এসেছে? কই আমরা তো—

দেখেন নি তো, দেখে যান। আপনি না দেখে থাকেন, আপনার মেয়ে কিন্তু দেখেছে।

ঘাটে এদিকে খণ্ডপ্রলয় বেধেছে। হোগলা বনে নীলমণি লুকানো ছিল, যামিনী টের পেয়ে অনেক কষ্টে বের করে এনেছে। এ সময় কারও এদিকে আসবার কথা নয়—লগি ঠেলছিল, শাপলা তুলে আনবে এই মতলবে। দ্বারিক সরে যেতে কার্তিক মেয়েটাকে কান ধরে নামিয়ে দিয়েছে, কষে দিয়েছে এক চড়।

আহ্লাদে মেয়ে যামিনী। চোখে জল টলটল করছে, বলছে, নৌকো কি খেয়ে ফেলেছি? কেন মারবে আমায় তুমি? কেন? কেন?

দ্বারিক আর কেদার আসছে। কি না জানি ব্যাপার—রূপদাসীও খানিকটা পিছনে। কার্তিক উচ্চকণ্ঠে নালিশ জানায়, দেখেন তো—কাদা মাখিয়ে ছিরকুটি করেছে। বলতে বলতে স্বরটা ভারি হয়ে ওঠে। কেঁদে ফেলবে নাকি? বলে, সবাই নিন্দে করে, বাবা দু'বেলা গাল-মন্দ করেন, তবু আমি এক কোদাল মাটি তুলতে দিইনে। দু'বেলা ধুই, ছায়ায় ছায়ায় রাখি, রঙ মাখাই। দেখেন তো কি করেছে?—

তখনো মেয়ের গালে পাঁচটা আঙুলের দাগ ফুটে রয়েছে, রূপদাসী কিন্তু মেয়ের হয়ে কিছু বলে না, উল্টে গালি দেয়। মদ্দ মেয়ে—লজ্জা করে না নৌকো বাইতে? আবার ঝগড়া করছে দেখ না!

দ্বারিক এসে চোখ মুছে দিল যামিনীর। স্নিগ্ধকণ্ঠে বলে, কাঁদিসনে—কাঁদিসনে মা। হারামজাদাটাকে নিয়ে কি যে করি! কাজকর্ম করবে না—এই এক জিদ হয়েছে, খালি টহল দিয়ে বেড়াবে।···উঁহু, আর নয়—এই শ্রাবণেই চুকিয়ে ফেলতে হবে।

কেদারকে ডেকে বলে, বুঝলেন বেহাই, আর দেরি করব না, দেরি করে অন্যায় করেছি। এই শ্রাবণেই—

যাক—পাকা কথা পাওয়া গেল এতদিনে। যামিনী মুখ ঢাকে। রূপদাসী কেদারকে ডেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, বেহাইকে বলো—ছেলে মাছ মেরে এনেছে, দুপুরে দুটো খেয়ে যেতে হবে।

দ্বারিক ফিরল। বেলা হয়ে গেছে, এমন অবস্থায় 'না' বললে ভাল দেখায় না। আর বিয়ের কথাবার্তাও খানিকটা এগিয়ে রাখা যাবে।

যামিনীকে একবার আড়ালে পেয়ে কার্তিক বলে, চড়টা একটু বে-আন্দাজি হয়ে গেছে রে!

অনুতপ্ত হয়ে প্রকারান্তরে সে মাপ চাইছে আর কি! বলে, মুখ ভার করে থাকিসনে। নৌকোর হেনস্থা দেখলে আমার কেমন মাথা খারাপ হয়ে যায়। তা শোন্—একদিন তোকে নৌকো চড়িয়ে অনেক দূর ঘুরিয়ে আনব।

যামিনী মুখ ঘুরিয়ে বলে, বয়ে গেছে তোমার নৌকোয় উঠতে।

অনেক—অনেক দূর। বাঁধাঘাটে গিয়ে ছিস কখনো?

বাঁধাঘাটের নামে যামিনীর চোখের তারা জ্বল-জ্বল করে ওঠে। জায়গাটার নাম শুনেছে। বলে, নিয়ে যাবে? সেখানে নাকি মস্ত পদ্মবন—অনেক পদ্ম ফুটে থাকে?

কার্তিক ঘাড় নেড়ে বলে, আর বেতবাগান, বাঁশঝাড়, ভাঙা ইটের পাঁজা। কত ঘুরোর মেরেছি। তোকে নিয়ে গিয়ে পদ্মের চাক তুলে দেব এই এমন এক বোঝা।

যে ক'টা কথা বলল যামিনীকে তার চেয়ে অনেক বেশি মনে মনে ভাবছে, সে সব মুখ ফুটে বলা যায় না। নিঃশব্দ রাত্রে যামিনীকে নিয়ে সে বেরুবে। পাখির মতো তার নীলমণি—কেউ টের পাবে না, রাতের মধ্যেই নূতন বউকে নিয়ে ফিরবে। কিন্তু তার আগেও তো একবার যেতে হচ্ছে বাঁধাঘাটে পদ্ম তুলতে। পদ্মফুলে সাজাবে নীলমণির এ-মাথা থেকে ও-মাথা। বাজনা বাজবে ঢোল কাঁসি সানাই, ধানবন আলোড়িত হবে। ফুলের সাজে সাজানো নীলমণি ধানবন ফুঁড়ে সগর্বে আসবে এই গ্রামে তার বউ নিয়ে যেতে।

বিকালবেলা বাপ আর ছেলে বাড়ি যাচ্ছে, পথে শুনল দুঃসংবাদটা। নিমাই মোড়ল ক্ষেতে কাজ করছিল। বলে, থানায় গিয়েছিলে নাকি দাদা? না যাচ্ছ?

কেন—থানায় কেন? চোর না ডাকাত—থানায় যাবার গরজটা কি হল?

নৌকো মাইকেল যার যা আছে, থানায় লিখিয়ে দিতে হবে। ঢোল পিটিয়ে বলে গেছে। নৌকো নাকি নিয়ে যাবে থানাওয়ালারা।

থানার বড়বাবুর মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছিল বটে। তাই হয় তো সাব্যস্ত হয়ে গেছে। হাটবাজার করতে দু-চারটে লাগতে পারে—কিন্তু সারা অঞ্চলের এত নৌকো কি করবে তারা?

লোকের মুখে মুখে মিত্য নূতন গুজব রটে। একগুণ খবর দশগুণ হয়ে ছড়িয়ে যায়। দু'জন চাষী এক জায়গায় হলেই ঐ কথা। উপায় কি আমাদের? বাঁধে মাটি আনব কিসে? যখন ধান পাকবে, ক্ষেতে তখনো এক বুক জল—নৌকোয় করে পাকা শীষ কেটে আনি, এবার ধান কাটা হবে কি? আর হাটবাজার, লোক-লৌকতা?

সেই ফূর্তিবাজ কার্তিক কেঁদিয়ে আধখানা হয়ে গেছে। নাচ নাচে না, ভাল করে কথা বলে না কারও সঙ্গে। নীলমণি নিয়ে ডগডগ করে খালে বিলে [illegible] ঘুরে বেড়ায়।

বিয়ের কথা নিয়ে রতন মোড়ল রসিকতা করতে গিয়েছিল। কার্তিক আগুন হয়ে ওঠে। বিয়ে না হাতী। না—না—না— বেঁটে যাব কি বিয়ে করতে? সাত বছর বয়সে বোঠে ধরেছি, তারপর কি বেঁটেছি কখনো? নীলমণি আমার পা। [illegible] দু'খানাই কেটে দিয়ে যাচ্ছে, [illegible] দিয়ে।

খালের উপরে বাড়ি। জোয়ার [illegible] গুড়ের নৌকো, তামাকের নৌকো [illegible] বালায় চালের নৌকো খালে ঢোকে, [illegible]

(১৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নিরুদ্দেশ

(১৩১ পৃষ্ঠার পর)

ডিপানিটা বাড়িয়া গেছে, আরও জোর লাগাইবার জন্ম বলিল—"তাহলেই তো সর্বনাশ কি না !"

উৎসুক দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া রহিল, গোলোক চাটুজ্জে মুঠাটা ঢিলা করিয়া দিয়া সহজ কণ্ঠে বলিলেন—"না, তেমন সর্বনাশ আর কি ?—ভুল করে যদি করেই আত্মহত্যা তো একটা প্রাণ—বিয়ে তো দেওয়া হয় নি ।"

এক সময় হাতের হুঁকাটা নামাইয়া রাখিবার জন্ম গোলোক চাটুজ্জে যখন চৌকির ওদিকে ঝুঁকিয়াছেন, ত্রিলোচন নিঃশব্দে উঠিয়া আসিল ।

এদিকে শিবপুর ষ্টীমার ঘাটে অন্য এক ব্যাপার চলিতেছে ।

সাতটা দশের ষ্টীমার আসিয়া জেটিতে ভিড়িল । ত্রিলোচন ছাড়া আর সবাই গেটের বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল, পাঞ্জাবীর পকেট হইতে হাত দিয়া একটু কাঁপিতে কাঁপিতেই গণশা ধীরে ধীরে পণ্টুন বাহিয়া উঠিয়া আসিল । টিকিট কলেক্টারকে টিকিটটা দিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া অগ্রসর হইল, বোধ হয় পাছে কেহ চিনিয়া ফেলে এই জন্য প্রায় সমস্ত মুখটা একটা বাদামী রঙের কম্ফোর্টারে জড়ান, যেটুকু বা খালি আছে সেটুকু অন্ধকার ।

টিকিট ঘরের একটু দূরে ইট-ওয়ালাদের একটি ছোট্ট চালাঘর ছিল, গণশার পিছনে পিছনে সকলে সেইটাতে প্রবেশ করিল । ...কনকনে উত্তুরে বাতাস দিতেছে ।

খাবার জন্য সেই যে দৈনিক তিনটাকার হিসাব ধরা হইয়াছে সেই থেকে গোরা-চাঁদের মনটা আনচান করিতেছিল, গণশার মেজাজের কথা না ভাবিয়া আগে সেই কথা কহিল, জিজ্ঞাসা করিল—"তিন টাকায় কি কি আইটেম..."

বারুদে যেন অগ্নিকণা পড়িল । "তুই যা, যা না, খে-খ খেয়ে আয় !...তি-ত্রিলো কোথায় ? আমার তার সঙ্গে বো-বোঝাপড়া আছে ।...মামাশ্বশুর ! মা-মামাশ্বশুর তো নিজের ঘরে তুলে রাখুক...আর কাল সকোর তোরা আসিস্ নি কেন রে ? সমস্ত দিনে গোটা চারেক পু-পুর ইডাটা আর একবাটি ক-কড়াইয়ের ডাল খেয়ে একটা লোক যে শী-শীতে হি হি করতে করতে এলে কি-কি করে গেল—গ-গ-গঙ্গার হাওয়া খে-খে খে..."

শীতের সঙ্গে রাগে কাঁপুনি আরও বাড়িয়া গেছে—তোৎলামিও । সকলে হতভম্ব হইয়া চাহিয়া রহিল, রাজেন একটু কুণ্ঠিতভাবে বলিল—"আসছিলাম সবাই—তিনু বললে—আজ নিরুদ্দেশের প্রথম দিন—ওর মামা গঙ্গার ঘাটে খোঁজ নিতে পারে, তাই..."

"নি-নি-নিরুদ্দেশ ! এক ব্যাটা জল্লাদের হাতে তু-তুলে দিয়ে সব তামাসা দেখছেন । সকালে গ-গ-গজান-কাঠের চা এক কাপ, দুপুরে কড়াইয়ের ডালের সঙ্গে দুসো চিংড়ির চচ্চড়ির ব্যবস্থা করে সমস্ত দিন দেখা নেই । বি-বিকেলের দিকে যদি একবার এলো তো বাড়িতে গোটাকতক ধমক-ধামক দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল ।...একটা ভ-ভ-ভদ্রলোককে রেখেছিস—ট-টাকা খেয়েছিস্ —তা-তার দুঃখটা শোন্-না..."

গোবরা চিন্তিতভাবে বলিল—"যখুনি অত ফোঁটা চন্দন আর লাল কাপড়ের ঘটা দেখেছি, তখনই আমার খোকা লেগেছিল। কি করবি, চলে আসবি ?"

"না, চ-চ-চলে এসে কাজ কি—অমন জা-জামাই আদরে রয়েছি !...চায়ের নমুনা পাবার পরই জামা গায়ে দিয়ে বেরুব, দেখি বিছানাটা কখন সরিয়ে রেখেছে । মেয়েটাকে ডেকে বের করে দিতে বললাম—বললে—"বা-বাবা মানা করে গেছে—কু-কুটুম মানুষ রাগ করে চলে গেলে আমাদের তি-তিন জনকে কচুকাটা করে ফেলবে..."

রাজেন পকেট থেকে একটা বিড়ি বাহির করিয়া গণশার হাতে দিয়া বলিল —"ধরা, শীতে কাঁপিয়ে গেছিস । এসে উল্টো সমস্যায় পড়া গেল ! এখন উপায় ?"

দেশলাইটা জ্বালিয়া গণশা উগ্র দৃষ্টিতে রাজেনের পানে চাহিল, বলিল—"উপায় ? —উপায় মা শ্যালী-মক চারটেকেই খুন করে সত্যিকার নিরুদ্দেশ ।—সে সে আমি ঠিক করে রেখেছি, দেখেনিস্ ।" হাওয়ায় দেশলাইটা নিভিয়া গিয়াছিল আর একটা জ্বালিয়া বিড়িটা ধরাইল । বোধ হয় চরম সঙ্কল্পের কথাটা বলিয়া মনটা একটু হালকা হইয়াছে, কয়েকটান খাইল । তাহার পর আবার হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া বলিল—"এক-রকম সে গুছিয়ে বলব ? বি-বিজ্ঞাপনের কি হোল ? টাকে পয়সা নেই একে, সাতখানা কাগজ কিনে এমুড়ো-ওমুড়ো পড়ে গেলাম—বো-বোধ হয় সাতবার করে..."

খোৎনা বলিল—"তিনু কাল তোর মামার দেখা পায় নি, আজ আবার গেছে, এই এল বলে ।"

কে-গুপ্ত বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল, বলিল—"ত্রিলোচনবাবুই বোধ হয় আসছেন ঐ ।"

রাগে, নিরাশায়, অপমানে মুখটা এমন করিয়া ত্রিলোচন অবসন্ন ভাবে একটা ইটের উপর বসিয়া পড়িল যে, গণশা পর্যন্ত বোঝা-পড়া করার কথা ভাবিতে পারিল না । সকলে খানিকক্ষণ নীরবে প্রতীক্ষা করিবার পর গোরাচাঁদ বিজ্ঞাপনের কি হইল জিজ্ঞাসা করিতে যাইবে, ত্রিলোচন একেবারে উগ্রভাবে হুঙ্কার করিয়া উঠিল—"আমি এর মধ্যে একেবারে নেই আর, আমায় কোন কথা জিগ্যেস করিস নি কেউ, মেজাজ ঠিক রাখতে পারব না ।...সাবালক তো তার নিরুদ্দেশ হলেও ক্ষতি নেই, আত্মঘাতী হলেও ক্ষতি নেই !...সাবালক !—সাবালক হয়েছে—কৈ, বিয়ে দেবার বেলা তো সে কথা মনে থাকে না !—তার বেলা চুল দাড়ি পেকে গেলেও নাবালকই থাকবে !...আবার যদি আমায় কখনও..."

রাজেন ধীরভাবে বলিল—"একদম একটা বিপদ ঘাড়ে—এদিকে গণশা ক্ষেপে থাক, ওদিকে তুই ক্ষেপে থাক, তাহলেই হবে !... স্থিরভাবে সব কথা বল, শোনা যাক—একটা যুক্তি করা যাক—দু'দিকে প্রবল শত্রু..."

আরও একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ত্রিলোচন সাক্ষাৎকারের বিবরণটা দিয়া গেল ; প্রথমে রাগিয়া তাহার পর একটু ঠাণ্ডাভাবেই । খিদিরপুরের অবস্থাটাও মোটামুটি শুনিল । এই করিতেই আটটা ত্রিশের ষ্টীমারটা আসিয়া পড়ায় আর বেশি কথা হইল না । গণশার হাত খালি —তাড়াতাড়ি ঠিক হইল, যে যাহা সংগ্রহ করিতে পারে লইয়া কাল বৈকালে খিদির-পুরে আসিবে । আবার বিনোদ গাঙ্গুলীর সহিত দেখা করিয়া একটা হেস্ত-নেস্ত করিতে হইবে ।

(৫)

বিনোদ গাঙ্গুলী বলিল—"সে অনেক কথা বাবাজিরা, তোমরা ছেলেমানুষ সব বুঝবে না । খাওয়া দাওয়ার বোধ হয় একটু অসুবিধে হচ্ছে বাবাজির, নিজে দেখতে পাচ্ছি না কিনা...ভয়ানক এক ফ্যাসাদে পড়ে গেছি যে এদিকে ।"

(১৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এদেশের মেয়েদের ভবিষ্যৎ কি ?

(১১৫ পৃষ্ঠার পর)

ক্ষেত্রেই সমান অধিকার বজায় থাকবে । এ সমাজনীতিকে স্বীকার করার আগে জাৎপাত কি তা একটু তলিয়ে দেখা দরকার । এদেশের যুগযুগব্যাপী মনুর ক্ষমা-হীন বিধানে ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকাচারে এ-নীতির কোনো স্বপ্ন ছায়াও মেলে না । কাজেই ভারতের ঐ পরম্পরাগত সামাজিক ঐতিহ্য এবং নারীকে ব্যক্তি বলে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে শুধু যে প্রাচীন যুগ ও বর্তমান যুগেরই ব্যবধান আছে তা নয়— আছে সমাজনীতির ক্ষেত্রে প্রাচীন ও বর্তমানের মধ্যে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ । এ সত্যটি স্বীকার করা প্রয়োজন ।

সামাজিক জগতে মেয়েদের ব্যক্তিগত সত্তা স্বীকার করার অর্থই জীবনের সব দিকে তার সব অধিকার ও মর্যাদার প্রতিষ্ঠা । জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি এদেশের মেয়েদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে স্বাধীনতার ছাড়পত্র দিয়ে রেখেছেন । আজকে আমাদের ভাগ্যাকাশ যতই মেঘাচ্ছন্ন থাকুক না কেন, জাতীয় স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ও সংস্কৃতি, বিবাহ ও ও মাতৃত্ব, জীবিকা ও নাগরিক অধিকার, উত্তরাধিকার ও আইনগত সাম্য— জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই মেয়েদের যথাযোগ্য স্থান লাভ করা অবশ্যম্ভাবী ।

নৌকা

(১৪১ পৃষ্ঠার পর)

হাল বেয়ে বেয়ে যায়—তার মচমচানি, খর-স্রোতে নৌকোর চারিপাশে জলে কলহাস্য। ভাঁটার টানে জেলে-ডিঙি বড় গাঙে নেমে যায়, বৈঠার আঘাত লাগে জলে আর ডিঙির গায়ে—সে আওয়াজ আর এক রকম—একেবারে আলাদা। রাত্রিবেলা ঘরে শুয়ে শুয়ে জানতে পারে কখন জোয়ার এল, কখন ভাঁটা সরছে। নৌকো কথা বলতে পারে; গাঙ আর নৌকোর মধ্যে কথাবার্তা হয়, গাঙ-কিনারে যাদের বাড়ি এ ভাষা বুঝতে পারে তারা।

নদী-খাল এখন নিরাভরণ বিধবার মতো। ঘাটে ঘাটে এত ঠেলাঠেলি, মোটে জায়গা হত না, এখন যেন ভেল্কিতে উড়ে গেছে—নৌকো জমা দিয়েছে, কিম্বা সরিয়ে ফেলেছে। দু-একজনের থাকেও যদি, তারা নৌকো বায় না, মনমরা হয়ে ঘরে শুয়ে থাকে। ধরণীর স্নায়ু-শিরার মতো গাঙে খালে ভরা এই অঞ্চল এই ক'দিনে শ্মশানভূমি হয়েছে।

কার্তিক একদিন খুব গোপনে নিমাই মোড়লকে জিজ্ঞাসা করল, এত যে নৌকো আটকেছে থানাওয়ালারা—নজর রাখে? যত্ন করে?

খুব, খু-উ-ব। দিন ভোর চান করাচ্ছে তোর মতো। গর্জন তেল মাখিয়ে চাটাই মুড়ে রাখছে।

হো-হো করে নিমাই হেসে উঠল। হাসি অথবা কান্না।

কার্তিক বলে, জলে রাখছে, না ডাঙায়?

ইস্কুলের যে মাঠটা আছে না—দেখগে রয়েছে সেখানে। যেন কুমীর মেরে মেরে এনে ফেলছে।

কার্তিকের নীলমণি কিন্তু কুমীর নয়—চঞ্চল কোমল একটি নীলপাখী। তাকেও হয়তো নিয়ে ফেলবে ওর মধ্যে। আলগোছে জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে বেড়ায়, তার নিষ্প্রাণ কাষ্ঠদেহ শুকনো ডাঙায় পড়ে রইবে।

গড়দা থেকে সেইদিন সুপ্রিয়ার লোক এল। তাকে ডেকে পাঠিয়েছে—খুব জরুরি।

কার্তিক গিয়ে দাঁড়াতে সুপ্রিয়া বলল, সেই যে বলে এসেছিলাম। গেরিলা যুদ্ধ শিখবে তো?

কার্তিক হাহাকার করে উঠল। নৌকো নষ্ট করেছে, হাত দু'খানাই কেটে নিয়েছে দিদি। যুদ্ধ আমরা করব কি দিয়ে?

শত্রু এসে নৌকো যদি কেড়েকুড়ে নেয়? কিম্বা এমনও হতে পারে, এদেরই কেউ কেউ যদি দিয়ে দেয় তাদের? পরাধীন অজ্ঞ জাতি—আস্থা করে ঠকবেন কি কর্তারা? সারা পৃথিবী মেতে উঠেছে—কেউ নিজের ঘর ঠেকাতে, কেউ বা পরের ঘর ভাঙতে। আমরা সে সময় লড়াইয়ে নয়—মন্বন্তরে হাত-পা গুটিয়ে মারা পড়ি।

বীরপুরুষ কার্তিক ছেলেমানুষের মতো দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকে। সন্ধ্যাবেলা মন্থর পায়ে গ্রামে ফিরল।

হেঁটে এলি যে কার্তিক? নৌকো জমা দিয়েছিস?

উঁহু—ডুবে গেছে।

কেউ বিশ্বাস করে না। সাত বছর বয়স থেকে নৌকো বাইছে। ঝড় নেই, বাতাস নেই, ডুবলেই হল। ডুবিয়ে দিয়েছে হয়তো। তার নীলমণি জলতৃষ্ণায় আকাশের দিকে হাঁ করে থাকবে—তার চেয়ে জল-শয্যায় তাকে শুইয়ে রেখে এল। কাদা লাগবে এই ভয়ে কত সতর্কতা—সবাই ছি-ছি করেছে, বাপ ধরে মেরেছে পর্যন্ত—এখন কোনখানে পাতাল-তলে নীলমণির নীল রং চটে যাচ্ছে, গুঁদি কচ্ছপেরা বাসা করছে, শেওলা আর বালি জমছে খোলের মধ্যে।......

—

কাঠ খোদাই শিল্পী : আনওয়ার উল হক

মেয়ে ধরা ফাঁদ

(১৩৮ পৃষ্ঠার পর)

ওয়াহিদ খাঁর ঠিকুজি ঘেঁটে ভারতবর্ষে তার বংশের ঠিকানা পায়। প্রায় ৯ মাস ধরে তারা সারা ভূভারতে ওয়াহিদের বংশের খোঁজাখুঁজি করে' অবশেষে ক'দিন হোলো সাহিদের পাত্তা পেয়েছে। সাহিদের কাছে সেই হাকিমি দাওয়াইয়ের সন্ধান করছে তারা।"

"কেন? মেয়ের তাদের অভাব কি? বিলেতে আবার মেয়ের অভাব?" বলতে বলতে আমি আঁৎকে উঠি: "আমাদের সরলা কুললনাদের ভাগিয়ে নিয়ে যাবার মতলব নাতো?"

"ঠিক তার উল্টো।" নিবারণ জানায়: "সেই কমিশনের মধ্যে মিত্রশক্তির প্রতিনিধিরা তো আছেই, এমন কি স্পেনীয় ছদ্মবেশে নাৎসীদের চর আছে বলেও সাহিদের সন্দেহ। থাকবেই, জানা কথা। এ সমস্যা দারুণ সমস্যা। এ বড় কঠিন ঠাঁই, শত্রু মিত্র ভেদ নাই!"

নিবারণের বক্তব্যের বিন্দুবিসর্গও আমার মাথায় সেঁধয় না।—"তার মানে? একটু খোলসা করেই বলো।"

"এর আর খোলসা করা কি? যা খোল্ তাই নল্চে। মিত্রশক্তি আর চক্র-শক্তি উভয়ে মিলে চক্রান্ত করে' আর লড়াই করে' নিজের নিজের দেশের পুরুষ তো আর বিশেষ রাখেনি। পরস্পরের সহায়তায় প্রায় সব মেরে শেষ করেছে। রয়ে গেছে কেবল মেয়েগুলো। এখন শান্তি আসন্ন! কিন্তু সত্যিই কি শান্তি আসবে? গান্ধীজী থেকে, ওয়েনডেল উইল্‌কি থেকে সবার মুখে ঐ এক কথা—এক প্রশ্ন। সব মনিষী আর সব মনস্বীই মাথা ঘামাচ্ছে ওই নিয়ে। দেশে এত মেয়ে থাকলে কখনো শান্তি আসে? এক যুদ্ধ কাটিয়ে এসে পাছে আবার নতুন করে' আরেক গৃহযুদ্ধে আনকোরা অশান্তি গজিয়ে ওঠে—প্রত্যেক দেশেই বুড়োহাবরা যে সব পলিটিসিয়ানরা এখনো বেঁচে আছে তাদের সেই ভাবনা। দেশের মেয়েদের ভুলিয়ে ভালিয়ে অন্য কোথাও—মানে মনে করো এই ভারতবর্ষেই—পাচার করার অভিপ্রায়ে—এখন বুঝতে পারছ?"

আমি বুঝতে পারি। হাতের কফির পেয়ালাটাও বোঝে। আমার হাত থেকে খসে পড়ে তৎক্ষণাৎ।

—

নগেন্দ্রনাথের—
হিমকল্যাণ
শরৎ আসে তার রূপ সম্ভার নিয়ে, প্রকৃতিদেবী সাজে
এক অপরূপ সাজে, শরৎ সুষমার এই স্নিগ্ধ আবেষ্টনীর
মাঝে আপনার গৃহকে আনন্দ-মুখর করে তুলুক—
ভেষজ-বিশারদ নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর স্নিগ্ধ
হি ম ক ল্যা ণ।
HIMKALYAN
HAIR OIL
হিমকল্যাণ
UPCO
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস • কলিকাতা

যা-তা

জ্যোতির্ময় রায়

যা-তা লেখা যেমনই সহজ, যা-তা নিয়ে লেখা তেমনি কঠিন।

প্রথমতঃ, তুচ্ছ বস্তুর অঙ্গে তাচ্ছিল্যের আমন্ত্রণটা জড়ানো থাকে; দ্বিতীয়তঃ, যা-তা স্বধর্মের স্বাভাবিক গতিতে যা-তা হয়ে উঠতে চায়। আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। আচার্য্য ফ্রয়েড বলেছেন, পৌনঃপুনিকতা অর্থাৎ নিজের চরিত্র বজায় রাখার চেষ্টা বস্তুসত্তার ধর্ম। বস্তু থেকেই প্রাণের উদ্ভব। প্রাণ চায় বস্তু আঁকড়ে প্রাণী হয়ে থাকতে, বস্তু চায় প্রাণ ঝেড়েপুছে বস্তুত্ব ফিরে পেতে। যার ফলে জন্ম-মৃত্যুর এই টানা-হেঁচড়া। তেমনি যা-তাকে শিল্পপ্রাণে সঞ্জীবিত করে চলাও দুরূহ ব্যাপার—যা-তার প্রতি-মুহূর্তের প্রয়াস যা-তা হয়ে থাকার।

এখানে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক, যা-তা বলতে কি বুঝায়। বুঝায় না কিছুই। বিশেষণটা আপেক্ষিক। একজন মদ্যপের কাছে মদ অতি প্রয়োজনীয়, শুদ্ধাচারীর চোখে তা নেহাৎই যা-তা। ধূম্রপায়ীর ছাইদান একটা চাই-ই, অপায়ী সেটা অনাদর ক'রে ঠেলে দিতে পারে। লড়াইয়ের ক্ষেত্রে কামানের মান যতই থাক, প্রেমের ব্যাপারে তার উপস্থিতি অপ্রাসঙ্গিক,—সেখানে ওটা যা-তা। তেমনি প্রবন্ধ ক'রে আলোচনার যোগ্য বলে যাঁরা মর্য্যাদা পেয়ে এসেছেন, তাঁরা হলেন মানবজীবনের মহা প্রয়োজনীয় গুরুত্তম সব বিষয়বস্তু। দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, নারীসমস্যা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি, ইত্যাদি, নৈর্ব্যক্তিক বিষয়বস্তুগুলোই প্রবন্ধ-জগতের কুলীন; জুতো-ছাতা টুকিটাকি নিয়ে আপনার নিজের মনের কথা সেখানে অপাংক্তেয়। অবিশ্যি জুতো বা ছাতার সূত্র ধরে যদি দর্শনে চলে যান অথবা অর্থ-নীতির আলোচনা করেন তো ভিন্ন কথা। কিন্তু ও-সব তুচ্ছ বস্তু নিয়ে আপনার নিজের ভালো লাগা না লাগার বা আপনার নিজস্ব কোনো ভঙ্গীতে এদের দেখে আনন্দ পাও-য়ার, প্রবন্ধের পরিসরে বিষয়বস্তু হিসাবে কোনো সম্মান নেই—এরাই সেখানকার যা-তা।

এই যা-তা নিয়ে শিল্প রচনার প্রয়াস শিল্পরসিকদের বাইরে বড় একটা সমাদর পেত না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি। ব্যবসায় পরিচালিত সাময়িক-পত্রের সম্পাদকদের অনেককে অবহেলার সুরে বলতে শুনেছি, 'লেখা তো ভালোই, কিন্তু এত হাল্কা রচনা আমাদের কাগজে চলবে না।' অর্থাৎ তাঁরা অতি ভারি চালে চলে থাকেন। কিন্তু সাহিত্যিক বা সাহিত্যরসিক সম্পাদিত গুরুগম্ভীর সব পত্রিকা যখন এ-জাতীয় রচনা সসম্মানে অঙ্গীভূত করতে লাগলো, তখন তিন-চার বছরের মধ্যেই দেখা গেল, হাওয়া বদলে গেছে। অধুনা অধিকাংশ কাগজের সম্পা-দকরা প্রবন্ধ চাইতে এসে বলতে সুরু করে-ছেন, ভারির চেয়েও যা-তার ওপর একটি হাল্কা প্রবন্ধ পেলেই তাঁরা খুসি হবেন বেশি। ভরসার কথা। বোঝা যাচ্ছে অলঙ্কার কিনতে বেরিয়ে শুধু সোনাই তাঁরা খুঁজে বেড়াচ্ছেন না—তুষ্টির দৃষ্টিটা তাঁদের নিক্তি থেকে ছড়কে গিয়ে কারুকলার ওপরেই বড় হয়ে পড়েছে। তাঁদের বক্তব্যে এ-কথাটা স্পষ্ট, সাহিত্যের সরস আসরে গুরুমশাইদের উৎকট ধমক তাঁরা অনেক সয়েছেন, এখন কেউ পার তো খুসি করে দু'চার কথা শোনাও। এমন কি বনেদি বিষয়বস্তুগুলি এড়িয়ে চলো, ওদের অঙ্গে ধমক যেন শিং উঁচিয়ে আছে। গুরুমশাই বোনাই হলে মাঝে থেকে সম্পর্কের মাধুর্য্য-টুকু মারা পড়ে।

ভালো। অন্তরে হয়তো ভারি কিছু জমেছে, তাই ভারির ভান ছেড়ে হাল্কা কথা শুনতে আর শোনাতে আমরা সাহস পাচ্ছি। অহেতুক গাম্ভীর্য্যে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল জীবনের দিক-বিদিক—রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশের বাসিন্দে সব। অবশ্য গুরু-চালও দরকার, কিন্তু সেটা দরকারের গুরুত্ব বুঝে। পেঁচকের মৌখিক গাম্ভীর্য্য অবয়ব মাত্র, অভিব্যক্তি নয়। পেঁচার এই দিবা-গাম্ভীর্য্যও হয়তো ঝরে পড়ে অনেকখানি হাল্কা হয়ে যায় রাতের অন্ধকারে—কারণ, তখন সে চোখে দেখতে পায়। আদিম মানুষের উৎকট গাম্ভীর্য্য ভীতিপ্রদ—জানতে আর বুঝতে শিখে সে হাসল আর হাল্কা হলো।

আমার কিন্তু মনে হয়, চরিত্রে একটানা থমথমে গাম্ভীর্য্য আদিমতারই একটা পরিচয়। লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, অধিকাংশ পশুরই হালচাল খুব গম্ভীর, বিশেষ করে হিংস্র পশুর। মানুষের মধ্যেও সেই হিংস্রতা স্থূল বা সূক্ষ্ম যে-ভাবেই থাক, তার অস্তিত্বের পরিমাণ অনুযায়ী উৎকট একটা গাম্ভীর্য্য সে আনে। এর প্রমাণ পাবেন নির্মম সৈনিক-জননায়ক বা নিষ্ঠুর জল্লাদ-অপরাধীর মুখে। বলতে পারেন, দার্শ-নিকরাও তো গম্ভীর—দার্শনিকের অভি-ব্যক্তি গাম্ভীর্য্য নয়, প্রশান্তি বা উন্মনতা। দার্শনিক, বিজ্ঞানী, শিল্পীর তো কথাই নেই, এঁরা যেমন হাসতে আর হাল্কা হতে পারেন, এমনকি ব্যবসায়ীরাও তা পারেন না। কারণ, ব্যবসায়েরও শিরা উপশিরায় সূক্ষ্ম একটা নিষ্ঠুরতা জড়িয়ে আছে। তাই যত বড়ো ব্যবসায়ী দেখা যায়, তারই মুখে তত জমাট গাম্ভীর্য্য। গাম্ভীর্য্যের পেছনে এ সত্য লুকিয়ে থাকে ব'লেই শিশুর সহজবোধে তা শঙ্কা জাগায়, বয়স্করাও তার সামনে সহজ হতে ভরসা পায় না। অজ্ঞতা বা হিংস্রতা অতিক্রম ক'রে ক্ষমতা যখন সম্পূর্ণ মানবীয়, তখন গাম্ভীর্য্যের অনাবিল হাস্যে তা আলোকিত।

এ কথাটাও ব'লে নেওয়া দরকার, হাল্কা বলতে চটুলতা বুঝায় না। চটুলতা হলো হাল্কা হবার প্রাথমিক প্রয়াস। গুরুত্বের আনুষঙ্গিক উপাদান অব্যাহত রেখে লঘুচালে সহজগ্রাহ্য করাই সত্যিকারের হাল্কা রূপ।

বোঝা গেল হাল্কার রূপ কি—জানা গেল যা-তা কাকে বলে। কিন্তু এর চেয়েও বড়ো জানার রয়েছে; সে হলো, আজকের দিনে খাঁটি যা-তা এবং অবিমিশ্র হাল্কা কাকে বলা যায়।—বলা যায় একমাত্র সাহিত্যকে। সাহিত্যমাত্রেই তুচ্ছতম যা-তা, সাহিত্য বা সাহিত্যের আলোচনাই হাওয়াদপি হাল্কা।

এমনিতেই এ মাটিতে সাহিত্য করা সম্পর্কে লোকের উৎসাহটা পরের ছেলের স্বদেশী করার উৎসাহের মতো। বড় ঠাকুরেরা সাহিত্যিকদের দেখে থাকেন কৃপার চক্ষে, ব্যবসায়ীরা অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে অদ্ভুত এই জীবগুলোর দিকে—যারা এমন অকাজ নিয়ে মেতে থাকতে পারে, রাজ-নীতিকদের অবহেলা অপরিসীম। অজ্ঞাতদের তবু ক্লিষ্ট সাহিত্যিকদের পুষ্ট খ্যাতিটির ওপর থাকে লুব্ধ একটা অপাঙ্গ দৃষ্টি, রাজ-নীতিকদের তা-ও নেই—অন্য উপায়ে সেটা তারা নামগত ক'রে ফেলেছে।

সূক্ষ্মের ওপর স্থূলের এই অত্যাচার চলছিলোই, হঠাৎ পৃথিবীর মুখটা উৎকট গাম্ভীর্য্যে থমথমে হয়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই বিষয়টা আরো গুরুতর হলো। দেশের সমস্ত শ্রম ও বস্তুর তলব পড়লো সেই গম্ভীর প্রয়োজনে—যা-তার পেছনে শ্রম আর বস্তু ব্যয় চলবে না; জীবনধারণের মতো তুচ্ছ ব্যাপারে অপরিহার্য্য নিম্নতম চাহিদাটুকু মিটিয়ে অন্ন-বস্ত্র লোহালক্কর সব ঢেলে দিতে হবে মহাযজ্ঞের কোপানলে। কাগজের মতো এমন একটা সহজদাহ্য বস্তু অকর্মণ্য একদল লোক সয়েহে আঁকড়ে রয়েছে, পৃথিবীর এ দুর্দিনে এ ছেলেমানুষী আব্দার চলতে পারে না। অপরাধী শিশুর কাছে ছুটে যাবার মতো ক'রেই নিয়ন্ত্রণশক্তি সাহিত্যিকদের কাছে ছুটে এসে হাত চেপে ধরলো, কড়া ঝাঁকুনি দিয়ে বললো—অত কাগজ বরবাদ করা চলবে না, হিজিবিজি আঁকতে চাও এই দিচ্ছি দু'চারখানা, তার বেশী পাবে না।

না পাওয়াই তো উচিত। যখন দেশ-দেশান্তরে আলাপন চলছে কামানের মুখে, তখন কলমের মুখে কিচিরমিচির করতেই যদি হয় তো সেই নিনাদি কণ্ঠের ধুয়ো ধ'রেই করতে হবে। সভ্যতা যখন থমকে দাঁড়িয়েছে, এমনকি পিছু হঠছে, তখন অগ্রগামী চারণরা চলছে এগিয়ে—তাই পেছন থেকে হুঙ্কার উঠলো, 'হল্ট!'

রবীন্দ্রনাথের মহাভাগ্য আজ তিনি বেঁচে নেই, থাকলে পেতেন এবার টেরটা। অমন বেমাত্রার যা-তা অভ্যাস নিয়ে কি বিপদেই না পড়তেন! আমাদের না হয় আঁকিবুকি করার ক্ষমতাটাই কম—দু'দশ পাতায় ঘুরপাক খেয়েই মাথার পোকা ঝিমিয়ে

(১৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জোয়ার

তিনটি প্রাণী। স্বামী, স্ত্রী আর একটি বছর চারেকের মেয়ে।

উহাদের দেখিলে ভয় করে। মানুষের মতই হাত আছে, পা আছে, চোখ আছে, মুখ আছে—কিন্তু তবুও মানুষ নয় যেন। মাটির গর্ভান্তরালের কোনও প্রেতলোক হইতে যেন কোনও অদৃশ্য আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের ফলে উহারা বাহির হইয়া আসিয়াছে। অনির্বাণ অগ্নিকুণ্ডের লেলিহান অগ্নিশিখার মত জ্বালাময়ী ক্ষুধার সর্বগ্রাসী ছায়া উহাদের চোখে, জীর্ণ প্রাচীন মন্দিরের মত শুষ্ক কালো ও অস্থিচর্মসার উহাদের দেহ।

দিনকয়েক আগে গ্রামেতে একটি লঙ্গর খানা খোলা হইয়াছিল। কয়েকদিন উহারা একপ্রকার তরল ও স্বাদহীন খিচুড়ির স্বাদও গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু সে দ্রব্য দেবতাদের ভাগ্যেও বোধ হয় বিরল, তাই বেশীদিন তাহারা আর তাহা পাইল না। গ্রামেতে খাদ্য নাই, বন্দুক আছে; প্রাণ নাই, মৃত্যু আছে। তাই মহা-নগরীর রাজপথকে উহারা ধন্য করিতে আসিয়াছে।

কিন্তু মহানগরীর রাজপথ ত' গ্রামের পথ নয়। গ্রামের পথ মাটির। মাটির প্রাণ আছে, তাহাতে বীজ বপন করিলে অঙ্কুরোদ্গম হয়, মাটির প্রাণরসে সে অঙ্কুর সঞ্জীবিত হয়। মহানগরীর রাজপথ প্রস্তর নির্মিত। সেখানে প্রাণ কই? উহাদের ক্ষুধার জ্বালা সেইজন্য কমিল না, সহস্র-মুখ বৃশ্চিকের দংশন জ্বালার মত তাই নিরন্তর উহাদের শূন্য জঠরের মর্মকোষ অনাহারের জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইতে লাগিল।

অভ্যাস নাই তাই ঠিক-ভাবে ভিক্ষা করিতে পারে না। ফুটপাথে বসিয়া বসিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া উহারা শুধু চারিদিকে তাকায়। মেয়েটা কাঁদে।

তিনদিন পর।

স্ত্রীলোকটি বলিল, "ওগো আর ত' পারি না।"

কোলের মেয়েটা নির্জীবের মত পড়িয়া আছে।

পুরুষটি প্রশ্ন করিল, "কি করব, এঁ্যা?"

"চাও ভাল করে ভিক্ষে চাও।"—

"আচ্ছা।"—

মহানগরীর জনসমুদ্রে জোয়ার আসিয়াছে। সেই জোয়ারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুই শূন্য করতলকে প্রসারিত করিয়া লোকটি ভিক্ষা চায়।

"দয়া করুন বাবু—মরে গেলাম বাবু।"

স্ত্রীলোকটি কোলের মেয়েটির দিকে তাকায়। শেষ সম্বল। মনে পড়ে— আরো দুইটি সন্তান ছিল। ছয় বছরের একটি ছেলে আর সাত বছরের একটি মেয়ে। মেয়েটি কুখাদ্য খাইয়া কলেরায় মারা গিয়াছে। আর ছেলে—

"এই কোলের মেয়েটার দিকে তাকান—দয়া করুন গো বাবু, দয়া করুন।"

স্ত্রীলোকটি ভাবে দিন সাতেক আগেকার কথা। সহরে আসার সময় একটি গ্রামের বাগানের ধারের পথের উপর সে স্বামী, পুত্র আর মেয়েকে লইয়া শুইয়াছিল। ছেলেটা অনাহারে অচৈতন্যের মত এক পাশে পড়িয়াছিল। মাঝ রাতে একদল শিয়ালের চীৎকারে একবার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। দূরে অন্ধকারে তাহারা কি যেন কামড়াকামড়ি করিয়া খাইতেছিল। ভোর হইলে জানা গেল যে, শিয়ালদের সেই খাদ্য আর কিছু নয়, আর কেহ নয়—তাহাদের ছেলে।

স্ত্রীলোকটি কাঁদে। শক্তিহীনের শব্দ-হীন কান্না।

"মরে গেলাম গো বাবু—একমুঠো খেতে দিন—একমুঠো"—লোকটি বলিয়া চলিয়াছে।

জনসমুদ্রে জোয়ার আসিয়াছে—তাহার গতিরোধ করা কি সহজ?

হঠাৎ স্ত্রীলোকটি কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

"উঠছিস ক্যানে?"

"চল—"

"কোথায়?"

"বাঁচার চেষ্টা করতে—এই মেয়েটাকে বাঁচাতেই হবে—নাও, ওঠ।"—

"চল্"—হঠাৎ লোকটি থমকিয়া দাঁড়াইল "তুই কাঁদছিস?"

"হুঁ।"—

মস্তোচারী বিমানের চক্রধ্বনিতে উপরের আকাশ মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

অক্ষয়বাবু একটু আগে পূজা আহ্নিক সারিয়াছেন। বাহিরের ঘরে বসিয়া খবরের কাগজের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে তিনি চা'য়ের কাপে চুমুক দিতেছিলেন। এমন সময় দ্বারপ্রান্তে তিনটি ক্ষুধার্ত প্রেতের মুখ দেখা গেল।

"কি চাই এখেনে, এঁ্যা! যা—যা।"

লোকটি বলিল—"একমুঠো খেতে দিন্ বাবু মরে—" সে কথা আর শেষ করিতে পারিল না।

সেই পুরাতন কথা।

অক্ষয়বাবু খেঁকাইয়া উঠিলেন, "তা মরলে আমি কি করব হাঁ, এঁ্যা? আমি কি দানছত্র খুলেছি না দরিদ্রনারায়ণকে খাও-য়াবার ভার নিয়েছি? যা বেরিয়ে যা এখেন থেকে—" লোকটি আর কথা খুঁজিয়া পায় না।

এইবার স্ত্রীলোকটি আগাইয়া আসিল, মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "বাবা—" স্ত্রীলোকটির কণ্ঠে যেন কি ছিল তাই ওই 'বাবা' শব্দটি এমন মর্মস্পর্শী ও করুণ শোনাইল যে, অক্ষয়বাবু হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

"বাবা, আপনাদের বাড়ীতে দাসী চাকর হয়ে থাকব আমরা—আমাদের বাঁচান।" অক্ষয়বাবু তাহাদের দিকে তাকাইলেন। তাঁহার অন্তরের মধ্যে এইবার সহজে পুণ্য সঞ্চয়ের একটা দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল।

তিনি ডাকিলেন—"ওগো শুনছ, ওগো।"—

হেমাঙ্গিনী দেবী ডাক শুনিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন, "কি বলছ?"

"তুমি না বলেছিলে তোমার শরীরটা আজকাল একটু খারাপ যাচ্ছে, তাছাড়া বাড়ীর কাজকর্মও ত' আছে— রেখার ছেলে-মেয়েগুলো আর রাজুটাকে দেখাশোনা করার জন্যও তো লোক চাই। তুমি একা পেরে উঠবে কেন? এ্যাঁ?"

ভুরু কুঁচকাইয়া সন্দিগ্ধভাবে হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "ব্যাপারটা কি?"

"একজন লোক রাখ না কেন, মাইনে অল্পস্বল্পই দেবে, কি বলিস বাছা? রাজী?"

স্ত্রীলোকটি যেন প্রাণ পাইল, তাড়াতাড়ি মাথা নাড়িয়া দ্রুতকণ্ঠে সে বলিল,—"আজ্ঞে হাঁ বাবা।"

হেমাঙ্গিনী তাহাদের দিকে তাকাইলেন, "ওমা! এই এদের রাখব আমি—এই একপাল। এদের খাওয়াতে হলে যে আমি পথে দাঁড়াব গো।"

স্ত্রীলোকটি করুণ কণ্ঠে বলিল, "না মা, আমাদের দু'জনের মধ্যে একজনকেই রাখুন, আপনি আমাদের বাঁচান।"

"হ্যাঃ—একজনকে রাখব আর বাকী সব?"

"আমাদের মধ্যে একজন একটা চাকুরী যোগাড় করে নেবে, আর এটিত বাচ্চা মা।"—

"আমায় আর শেখাতে হবে না বাছা হাঃ—বাপ বাচ্চারা কি খেতে জানে না? একজনকে ত' রাখব, আর একজনের চাকুরী না হওয়া পর্য্যন্ত কি হবে?"

"ওই একজনের খাবারই সবাই ভাগ করে খাবো মা"—স্ত্রীলোকটির কণ্ঠে মিনতি।

অক্ষয়বাবুও বলিলেন, "রাখো গো গিন্নী মা, বাইরের ঘরটাতে ওরা পড়ে থাকবে 'খন—আহা! বড় মায়া হচ্ছে।"

"হয়েছে হয়েছে—আমাদের যেন পাথরের মন। কিন্তু রাখবে কাকে?"

"লোকটাকে।"

হেমাঙ্গিনী নাক সিঁটকাইলেন। লোকটির চেহারা শুষ্ক ও রসহীন আমড়ার আঁঠির মত—শিরাবহুল ও চর্ম্মাবৃত কঙ্কাল। মাথায় তাহার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল আর সারা মুখে একটা পশুর মত লোলুপতা।

"তোর নাম কিরে?" হেমাঙ্গিনী ধমকাইয়া প্রশ্ন করিলেন।

"আজ্ঞে মাণিক" — লোকটির কণ্ঠস্বর ভাঙ্গা রেকর্ডের শব্দের মত।

"ইস্—মা-ণি-ক—মাণিক না বলে জন্তু বল্লেই শোনাত ভাল।"

অক্ষয়বাবু উদারতাব্যঞ্জক হাসি হাসিলেন।

হেমাঙ্গিনী স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে তাকাইলেন। মেয়েটির বয়স বোধ হয় বছর চব্বিশেক। চরম অভাব ও নিদারুণ অনাহারেও তাহার শ্যামবর্ণ মুখের অন্তরালে কোথায় যেন একটা অদৃশ্য কমনীয়তা, মাদকতা লুকায়িত আছে—মনকে তাহা নাড়া দেয়।

"আর তোর নাম কি?"

"পার্ব্বতী।"

"তুই-ই কাজ করবি বাছা। তোর জন্তুটি যেন দু'একদিনের ভেতরেই কাজ বাগিয়ে নেয়, বুঝলি? মাইনেটাইনে কিন্তু এখন পাবি না বাপু। একজনকে খাওয়াতে চল্লিশটি করে টাকা লাগে, তা জানিস?"

পার্ব্বতী ঘাড় নাড়িল। "হ্যাঁ।"

মনে পড়ে। একটুকরা মাটির উপর তাহাদের একটি চালাঘর। ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে মাটির প্রাঙ্গণ, তরিতরকারীর বাগান, মাচার উপর লাউ গাছের সবুজ পাতার সমারোহ। ছেলেমেয়েদের কলরব, শ্বশুরের হাসি, স্বামীর মুখের যাত্রার দলের গান। ছোট্ট সংসারের সর্ব্বত্র চঞ্চলা লক্ষ্মী অঞ্চল উড়াইয়া বেড়াইত। হায়—! (পার্ব্বতী, তোমার সেই দিনগুলি কোথায় গেল?)

অক্ষয়বাবুর সংসারটি বৃহৎ। দুই বড় ছেলে, তাহাদের বৌ, ছোট ছেলেরা, মেয়ে, নাতি-নাতনী, স্ত্রী—সব মিলিয়া জনদশেক। ছেলেরা বাজার করে, মেয়েরা গৃহকর্ম্ম করে, তাই সামর্থ্য থাকিলেও আজকালকার বাজারের কথা ভাবিয়া কোনও চাকর রাখা হয় নাই।

মাণিক কাজকর্ম্মের খোঁজে বাহিরে গিয়াছে। কাজ অনেক। মেয়েটাকে কোলে লইয়া দুর্ব্বল শরীরে কাজ করিতে করিতে পার্ব্বতীর মাথা ঘোরে, দেহ কাঁপে।

হেমাঙ্গিনী ঝঙ্কার তুলিয়া বলিলেন, "মেয়েটাকে কোল থেকে নামিয়ে কাজ কর্ না বাপু—ভাত জোটে না যার, তার এত আদর কেন?"

পার্ব্বতী মেয়েকে উঠানে নামাইয়া দিল, "একটু বসে থাক মা—এখুনি আসছি, কেমন?"

মেয়েটা বোঝে না। অনাহারের অগ্নি-জ্বালা উহাকেও দগ্ধ করিয়াছে, সে জ্বালা হইতে মা-ই যে ওকে রক্ষা করিতেছে সেটা সে কেমন করিয়া যেন উপলব্ধি করিয়াছে, তাই মাকে ও এক মুহূর্ত্তের জন্যও ত্যাগ করিতে চায় না।

মাটিতে নামাইতেই মেয়েটি আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল। সমস্ত শক্তি দিয়া, গলার নীল শিরাগুলিকে স্ফীত করিয়া সে কাঁদে। ওইটুকু দেহে অতটা শব্দ যে কোথায় লুকাইয়াছিল তাহা ভাবিতে আশ্চর্য্য লাগে।

"না মা, কাঁদে না—থাম—থাম, লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার।"

তবু মেয়েটি থামে না।

হেমাঙ্গিনীর সাত বছরের ছোট ছেলে রাজু একটি নাসপাতিতে কামড় দিতে দিতে মেয়েটার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, "এই খবরদার—কাঁদিসনি—এই—!"

মেয়েটা আরও জোরে কাঁদে।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "ধাড়ি মেয়ে বাবা, কি গলাটাই করেছে—উঃ! নে বাপু, তুই কাজ করগে। আমার বাড়ীতে মেয়ে কাঁখে নিয়ে কাজ করা চলবে না—।"

পার্ব্বতী নিঃশব্দে কাজ করিয়া চলিল।

মেয়েটা কাঁদিতে কাঁদিতে অবশেষে ক্লান্ত হইয়া মাটির উপরেই ঘুমাইয়া পড়িল।

বেলা আড়াইটা নাগাদ একটি লোহার থালায় কয়েক মুঠি কড়কড়ে ঠাণ্ডা ভাত ও একটু ডাল লইয়া পার্ব্বতী বাহিরের ছোট্ট নোংরা ঘরটায় গেল।

মাণিক মেয়েকে কোলে লইয়া অবসন্ন হইয়া বসিয়াছিল, পার্ব্বতীকে দেখিয়া নড়িয়া উঠিল। ভাত! সঞ্জীবনী রসের বুদ্বুদ!

"ওমা—ও টুনু—ওঠ মা, নে, খা।"

মেয়েকে জাগাইয়া পরম যত্নের সহিত পার্ব্বতী তাহাকে খাওয়াইল। মেয়েটা গোগ্রাসে পরম উৎসাহের সহিত প্রতিটি গ্রাস গিলিল।

"কেমন লাগছে মা—এ্যাঁ?" মাণিকের জিহ্বা লালায় সিক্ত হইয়া উঠিল।

"অ্যাঁ"—মেয়েটা উত্তর দিল। ভাল লাগে, ভাল লাগে।

"তাই বলি, তুই এখেনে! আমি ভাবছ্ গেল কোথায় মাগী?" দ্বারপ্রান্তে হেমাঙ্গিনী আসিয়া উঁকি মারিলেন।

"কি মা?"

"তুই বুঝি খাবার এনে ওদের খাওয়াচ্ছিস, এসব চলবে না বাপু, আমি তিনজনকে পুষতে পারব না, বুঝলি?"

"না মা—আপনি যা দেবেন তাই তিনজনে খাব— বেশী চাইব না মা।"—

"হাঁ—মনে রেখো।"

হেমাঙ্গিনী চলিয়া গেলেন।

"নাও—খাও"— পার্ব্বতী স্বামীকে ডাকিল।

"তুই?"

"খাচ্ছি—তুমি আগে খাও।"

মাণিক একগ্রাস মুখে তুলিল। তাহার চর্ব্বণরত মুখে পরিতৃপ্তির ছায়া ক্রমশঃ পরি-ব্যাপ্ত হইতে দেখিয়া পার্ব্বতীর চোখে জল আসিল।

"নে"—মাণিক এক গ্রাস তাহার মুখের সামনে ধরিল।

"না।"—

"আমার মাথার দিব্যি—খা।"—

পার্ব্বতী কাঁদিয়া ফেলিল।

"আবার কানছিস?"

"হাঁ।"—

মনে পড়ে। ক্ষেতের ধানের মিষ্টিভাত, মাছের তরকারী, একটু দুধ, এসবের অভাব কোনওদিন ছিল না। পূজা পার্ব্বণে অতি-রিক্তের ব্যবস্থা, দু'একজন আত্মীয় বন্ধুরাও তাহাদের বাড়ীতে কতদিন খাইয়াছে। তাহার শ্বশুর তাহাকে ডাকিত 'অন্নপূর্ণা' বলিয়া। (অন্নপূর্ণা, আজ তোমার কে অন্ন দিবে?)

তিনদিন পর।

সামনেরই একটি বাড়ীতে মাণিক চাকুরী পাইল। ভদ্রলোক রিটায়ার্ড জজ। ফলে পার্ব্বতীর কাজ বাড়িল। স্বামী থাকিলে মেয়েটাকে তবু কোলে লইয়া থাকিত, এখন তাহাকেই রাখিতে হইবে। মেয়েটা কোল ছাড়া থাকিতে চায় না। মাটিকে ওর ভীষণ ভয়, স্থলের জীব যেমন জলকে ভয় করে।

তবু উপায় নাই। মেয়েটাকে মাটিতে ফেলিয়াই কাজ করিতে হয়। বলির পশুর মত পরিত্রাহি চীৎকার করিয়া মেয়েটা তার প্রতিশোধ নেয়।

হেমাঙ্গিনী বলেন, "আমার অমন মেয়ে হলে গলা টিপে মরতাম, বাপরে বাপ কি গলা ?"

অক্ষয়বাবু মাঝে মাঝে ভিতরে ছুটিয়া আসেন, "আমার মাথাটা ঝালাপালা করে দিলেরে বাবা —এই মেয়ে—এ্যাই— চোপ—চোপ !"

মেয়েটা আরো জোরে কাঁদিয়া উঠিল।

অসহায় হইয়া পার্ব্বতী মেয়ের পিঠে দুম দুম করিয়া কিল বসাইল, "মর হতভাগী মর !"

হেমাঙ্গিনী তাহাতেও খুশী হন না, "আবার রাগ করে মেয়েকে যে বড় মারা হচ্ছে। ওসব আমার বাড়ীতে চলবে না, বুঝলি ? মাটির মত মুখ বুজে কাজ করতে হবে, হাঁ।"—

পার্ব্বতী মেয়েকে লইয়া আড়ালে গেল। সেখানে মেয়েকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া আদর করিয়া কাঁদিয়া বলিল, "বড় লেগেছে, মা মা ? আহা -মা, কাঁদে না লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার।"—

স্তন্যপান করাইয়া মেয়েকে সে ঠাণ্ডা করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু মেয়েটার ক্ষুধাও পাইয়াছে, সে কান্না থামায় না।

বড়বো লুচি ভাজিতেছিল ছেলেমেয়েদের জন্য। পার্ব্বতী সেখানে গিয়া দাঁড়াইল।

"বৌদি।"

"কি চাস ?"

"আমার এই মেয়েটাকে একটা দাও না গো।"

"কি ?"

"একটা লুচি।"

"ও মা ! তোর সখ ত কম নয় লা। ওমা, শুনছেন ?"

"কি বৌমা ?"—হেমাঙ্গিনী আগাইয়া আসিলেন।

"পার্ব্বতী লুচি চাইছে মেয়ের জন্য।"

"বটে ! তোর মেয়ের নোলা ত' কম নয়। অত সখে কাজ নেই, বুঝলি ? কথা বলছিস না যে, বলি শুনলি ?"

"হ্যাঁ মা।"—

(পার্ব্বতী, তোমার মেয়ের ক্ষুধাটা না থাকিলে ভাল হইত, নয় ?)

মাস দেড়েক পরে বাড়ীতে একজন অতিথি আসিল। অক্ষয়বাবুর শ্যালক অনুপম। ছাব্বিশ সাতাশ বয়স, অত্যাধিক সৌখীন যুবক। পশ্চিমে কোথায় কাজ করিত, সেখান হইতে বদলী হইয়া আসিল।

দুপুর বেলায় সেদিন অনুপমের নজর পড়িল মাণিকের উপর।

"তুই কে রে ?"

"এজ্ঞে আমি পার্ব্বতীর সোয়ামী"।

অনুপম সকৌতুকে তাহার দিকে চাহিল। মাণিকের চেহারায় ইতিমধ্যে একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। গ্রামেতে যাত্রার দলে, কবির দলে সে প্রায়ই থাকিত, সখ তাহার কম ছিল না। বড়লোকের বাড়ীতে চারটি খাইতে পাইয়া তাহার চেহারায় একটু সুস্থতার চিহ্ন ফিরিয়া আসিয়াছে, আর সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন সখও মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। জজ-বাড়ীতে একটি পুরাতন পায়জামা ও একটি সার্ট পাইয়াছে সে—তাহাই বেশ পরিপাটি করিয়া সে পরিয়াছে। কর্ত্তাদের কাছ হইতে দু'এক আনা পয়সা চাহিয়া লইয়া সে দশ আনা ছয় আনা করিয়া চুলও ছাঁটাইয়াছে। এক পয়সার পানের রসে তাহার ওষ্ঠ রঞ্জিত—এক বিচিত্র চেহারা হইয়াছে তাহার।

"ও—তুই পার্ব্বতীর সোয়ামী, তোরই নাম জজ।"

"এজ্ঞে।"

"আচ্ছা, পা টেপ দেখি।"

"এজ্ঞে।"

"টেপ বেটা — টেপ।"

মাণিকের মুখের উপর একটা কাল ছায়া পড়িল, তবু সে আদেশ পালন করিতে বসিল। উপায় কি !

পার্ব্বতীর চেহারারও রূপান্তর ঘটিয়াছে। স্বামী-কন্যাকে নিজের আহারের অংশ দিয়া যেটুকু সে খায় তাহা বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু তাহাতেই তাহার দেহের শ্রী বদলাইয়াছে। তাহার রুগ্ন দেহের উপর মাংসের আস্তরণ পড়িয়াছে, স্নিগ্ধ শ্যামল সৌন্দর্য্যে তাহার যৌবন সরসী টলমল করিতেছে। মেয়েটারও গায়ে মাংস দেখা যায়।

হেমাঙ্গিনী অক্ষয়বাবুকে বলেন, "দেখছ গো —আমার বাড়ীতে খেয়ে খেয়ে কেমন মোটা হয়ে উঠছে ওরা, এ্যাঁ ?"

অক্ষয়বাবু মাথা নাড়েন।

পার্ব্বতী নিঃশব্দে কাজ করিয়া যায়। কাজের আর শেষ নাই তাহার। একজন ভাতের কাঙালকে বাড়ীতে পাইয়া সবাই তাহাকে প্রাণপণে খাটাইতেছে।

অনুপম আজকাল অন্দরমহলে একটু বেশী ঘোরাফেরা করে।

কি একটা কাজে তখন সে আসিয়াছিল।

হঠাৎ পার্ব্বতী একবার চাহিতেই দেখিতে পাইল যে, অনুপম তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ লেহন করিতেছে।

অনুপম হাসিল। পার্ব্বতী মাথা নীচু করিল।

অনুপমের দৃষ্টিতে কি একটা প্রার্থনা ছিল—পার্ব্বতী শিহরিয়া উঠিল।

মাণিকের লোলুপতা আজকাল বাড়িয়া গিয়াছে। প্রায়ই এটা সেটা ভালমন্দ মুখরোচক জিনিষ সে কোথা হইতে যেন লইয়া আসে আর খায়। বিড়ির বদলে মাঝে মাঝে তাহাকে সিগারেট টানিতেও দেখা যায়।

পার্ব্বতী একদিন জিজ্ঞাসা করিল, "এত সব ভালমন্দ কোথায় পাও ?"

"কেন—জজ-বাড়ী থেকে—তারা দেয় যে।"

পার্ব্বতী বিশ্বাস করিল না।

সেদিন রাত্রে রহস্যটা উদ্‌ঘাটিত হইল। মাণিকের চাকুরী গিয়াছে। সে চুরি করিয়া রোজ ঐসব খাবার আনিত। আজ রাত্রে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। কয়েকদিন কিছু পয়সাও চুরি গিয়াছিল, তাহার জন্যও তাহাকে ধরা হইয়াছে। বাবুরা ও অন্যান্য চাকরেরা চাঁদা করিয়া প্রহার দিয়া তাহাকে তাড়াইয়াছে।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে শুইয়া শুইয়া মাণিক গোঙায়।

পার্ব্বতী কাজ সারিয়া মেয়ে ও খাবার লইয়া ভিতরে আসিয়াই চমকিয়া উঠিল।

"কি হয়েছে গো ?" পার্ব্বতী সব শুনিয়াছিল হেমাঙ্গিনীর মুখে একটু আগেই। জজ-বাড়ী হইতে একজন আসিয়া বলিয়া গিয়াছে।

"শালারা বড় মেরেছে গো —উঃ, সারা শরীরটা টনটন করছে।"

পার্ব্বতী কাঁদিয়া বলিল, "চুরি করেছিলে—ছিঃ।"

মাণিক খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল, পরে বলিল, "চারটি খেতে দিবি ?"

"নাও—খাও।"

"উঠতে নারছি।"

পার্ব্বতী মেয়েকে শোওয়াইয়া স্বামীকে খাওয়াইয়া দেয়।

মনে পড়ে। সুন্দর, ছোট্ট গ্রামটি। শ্যামশোভায় ঝলমল করিতেছে অবারিত মাঠ—শ্বশুর সেখানে লাঙ্গল লইয়া গিয়াছে। শরতের নদীর মন্থর স্রোতে গা এলাইয়া জেলেডিঙ্গিগুলি কোথায় চলিয়াছে—কলসী কাঁখে পার্ব্বতী চলিয়াছে দুলোর বৌয়ের সঙ্গে স্নান করিতে। উপরে গোবরে নিকানো উঠোনের মত ঝকঝকে আকাশে শঙ্খচিলের প্রসারিত পক্ষ। আঃ—।

(পার্ব্বতী, অতীতকে কি ভোলা যায় না ?)

অনুপম অফিস যায় নাই। শরীর একটু অসুস্থ বলিয়া ছুটি লইয়াছে। ঘরে বসিয়া সে কি যেন একটা বই পড়িতেছিল।

পার্ব্বতী অক্ষয়বাবুর নাতিকে শোওয়াইতে পাশের ঘরে গেল।

অনুপম ডাকিল—"এই পার্ব্বতী—শোন্।"—

"বাবু ?"

"এদিকে আয় না।"—

পার্ব্বতী দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইল।

(১৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আধুনিক অলঙ্কার শিল্পের অপূর্ব্ব পারদর্শীতায়
"গিনি-হাউস" শ্রেষ্ঠতর
আমাদের অন্য কোন ব্রাঞ্চ দোকান নাই
ফোন: বি.বি. ৭০
গ্রাম: গিনিহোস
বি, সরকার এণ্ড সন্স লি:
একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মাতা
১৩১, বহুবাজার ষ্ট্রীট—কলিকাতা

প্রিয় হতেও প্রিয়তর
বিজন'স
তাল মিছরী
শিশুর খাদ্য ও
রোগীর পথ্য
প্রসিদ্ধ মিছরী বিক্রেতা
সোল ডিষ্ট্রিবিউটর: ভূত নাথ গরাই
১৯৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা

নিরুদ্দেশ

(১৪৫ পৃষ্ঠার পর)

ঘোঁৎনা ভিতরের রাগের উষ্ণ বাহিরে আরও বেশি বিনয় সহকারে বলিল—"তাহ'লে দয়া করে এক কাজ করুন, গণশার ব্যাপারটা ছাড়িয়ে এনে দিন দয়া করে, আমরা ওকে নিয়ে যাই—পাঁচ সাতটা টাকা যা খরচ হয়ে গেছে…"

বিনোদ গাঙ্গুলী যুক্তকর মাথায় ঠেকাইয়া বলিল—"এক্ষুণি—এক্ষুণি ;—কুটুমের বোঝা ঘাড় থেকে নেমে গেলে তো আমি পাঁচ সিকের পুজো দিই মায়ের চরণে।…কৈ, কি দেবে দেখি ?"

সবাই যাহা আনিয়াছিল একত্র করিয়া তেরটি টাকা হইল। গাঙ্গুলী হাত বাড়াইয়া লইয়া বলিল—"মোটে তেরোটি।… তাহ'লে তোমাদের সব কথাই বলতে হোল বাবাজি—ভেবেছিলাম ছেলেমানুষেরা হেসে খেলে বেড়াচ্ছে, বেড়াক ; নিজের বোঝা নিজেই সামলে নোব। তোমরা জোর করে যখন শুনবেই…থানা থেকে পঁয়ষট্টি টাকা দিতে হয়েছে ; কাশী পণ্ডিত করে একটু খাতির, তাই…"

"পঁয়ষট্টি !"—সকলে এক সঙ্গে বিস্মিত প্রশ্ন করিয়া উঠিল।

গাঙ্গুলী এক অদ্ভুত ধরণের হাসি হাসিয়া ধীরভাবে বলিল—"পঁয়ষট্টি।" সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর একেবারে নামাইয়া ভ্রু নাচাইয়া বলিল—"ওদের চোখে তো ধুলো দেবার জো নেই, কানাকানি হয়ে গেছে যে—ফেরারী আসামী।—পঞ্চাশটি টাকা দারোগাকে আর দশটা টাকা কনষ্টেবল করিমুদ্দিনকে দিয়ে ঠাণ্ডা করে রেখেছি…"

গলাটা আগাইয়া দিয়াছিল, আবার সোজা হইয়া বসিয়া একে একে সবার মুখের পানে চাহিয়া লইয়া দৃষ্টিটা দলপতি হিসাবে ঘোঁৎনার উপর একটু নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"না বাবাজি, নিয়ে যাও, তোমাদের জিনিষ, ও শিবপুর থানা থেকে যা হবার হবে, আমি কুটুম নিয়ে কেলেঙ্কারি থেকে বেঁচে যাব।…এই তেরো টাকা মজুদই রইল, আর কুলো বাহান্নটি টাকা—কিছুই নয়—যাও গিয়ে নিয়ে এস। কাল সকালেই আসবে, না ; আমি একটু বসব—কেউ গিয়ে নিয়ে আসবে এক্ষুণি ?"

পরদিন সন্ধ্যার পর ইটওয়ালাদের চালাটায় গণশা, ঘোঁৎনা, রাজেন, ত্রিলোচন আর কে-গুপ্ত একত্র হইয়াছে। গণশার চেহারাটা ঘোড়ো কাকের মতো—চুল উস্ক-খুস্ক, চোখ দুইটা বসিয়া গিয়াছে, জামায় বোতাম নাই, গলার আওয়াজ খসখসে হইয়া গিয়াছে। বলিতেছে কাল রাত্রে ঘুম হয় নাই। গাঙ্গুলী বলে লেপটার ব্যবস্থা দিয়া করিমুদ্দিনকে আরও পাঁচটা টাকা দিতে হইয়াছে—তারও বাড়িতে নাকি সকালে সময় হঠাৎ এক কুটুম আসিয়াছে। খাওয়ার অবস্থা আরও খারাপ—সমস্ত দিন পেটে অন্ন নাই বলিলেই চলে, দুপুরে একটু চোখ বুজিয়াছে কি না বুজিয়াছে, পকেট থেকে বিড়ি বাহির করিতে গিয়া দেখে—পাঞ্জাবীর গলায় বোতামের সেটটা নাই…এর উপর সমস্তদিন করিমুদ্দিনের ভাবনা।…গণশা শপথ গালিয়া বলিতেছে—"আর যদি আমি ও সম্বন্ধীর বাড়িতে ফিরে যাই তো"…

এমন সময় রাস্তায় গোরাচাঁদের গলা শোনা গেল—"গণশা এসেছেরে ?" অগ্রসর হইয়া চালার ছেঁচতলায় দাঁড়াইয়া একটু ক্লেশচার-পশ্চারের সঙ্গে রাজেনের অপ্রকাশিত নাটক থেকে উদ্ধৃত করিল—

"বিরহের অন্ধকার অপগত প্রায়
আর বৃথা কেন হায় হায় ?"…

তাহার পর বলিল—

"সব ঠিকঠাক, কাল সকালে ফটো তোলা, পরশুর কাগজে বিজ্ঞাপন, তারপর বন্ধুর মামাশ্বশুরের ভাত তেতো লাগে, নিজের দাদাশ্বশুরের লুচি।"…

গণশা ছাড়া সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল…"কি ব্যাপার ?…কে করলে ঠিক ?"…

একটা ইট টানিয়া লইয়া বসিতে বসিতে গোরাচাঁদ বলিল—"পুঁটুরাণী ;—ওরফে শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী।"

তাহাকে ঘিরিয়া সকলে ঘেঁসিয়া বসিল।

গোরাচাঁদ বলিতে লাগিল—"এখন একটু সংক্ষেপে সারি, আবার কাল সকালে হবে,—বোধ হয় খিদিরপুরের ষ্টীমারটা ভোঁ দিলে।…ধর্মের কল বাতাসে নড়ে,—কাল এখান থেকে ফিরেই মাসীর বাড়ি গেলাম—পোষ পার্বণের জন্যে ডেকেছিল। গিয়েই পুঁটুরাণীর সঙ্গে দেখা,—সে চেহারাই নেই ; জিগেস করতে যাব, সেই আগে কথা কইলে—"হ্যাঁ গোরাদা, তোমাদের দলের গণেশ নাকি নিরুদ্দেশ হ'য়েছে ?"…'তুই কোথা থেকে শুনলি ?' 'ওমা গণশার দলের গণেশ নিরুদ্দেশ হয়েছে শিবপুরের কে না জানে এ-কথা ?'—বলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমায় সব বললে—কবে থেকে গণেশ তোকে পাওয়া যাচ্ছে না, তিনুর সঙ্গে তোর মামার সঙ্গে কি কি কথা হয়েছিল—সব—একটি একটি করে…"

গণশা বলিল—"খেঁদ্-খেঁদির সঙ্গে ভাব হয়েছে যে এদিকে, এক স্কুলে পড়ে"…

রাজেন একটু ধমক দিয়াই বলিল—"খেঁদির স্কুলে দু'শো মেয়ে আছে—জিগেস করগে যা দিকিন, ক'জন খোঁজ রাখে তোর কথা ?…জানিস না, চুপ কর।"

গোরাচাঁদ বলিল—"সব একটি একটি করে বলে জিগেস করলে—তাহ'লে কি হবে গোরাদা' গণেশ আর ফিরে আসবে না ?'…আমি ভাবটা বোঝবার জন্যে বললাম—'ধর, যদি নাই আসে ? তোর কি তা'তে ?'…'আমার আর কি ?—পাত্তা ভাত দু'টি বেশি করে খাব।'—বলে খিল খিল করে হেসে ফেললে…"

গণশা একটু হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—"ন্যা-ক-আমি-ইবে তো !"

ত্রিলোচন বলিল—"ঐটিইতো লক্ষণ !"

গোরাচাঁদ বলিতে লাগিল—"বলেই কিন্তু আবার বলতে লাগল—'না গোরাদা', আহা ফিরে আসুক। বেশ ছিল, আমার বেশ লাগত, গণেশ না থাকলে আমাদের প্রাইজ ডিসট্রিবিউশন জমবেই না। আমার তো এত মন খারাপ হয়ে গেছে যেদিন থেকে শুনেছি…"

গোরাচাঁদ একটু থামিল, ঘোঁৎনার হাত থেকে বিড়িটা লইয়া গোটা চারেক টান দিয়া বলিল—"তখন ভাই, আমি একটু পাশে নিয়ে গিয়ে ভিতরের সব কথা বললাম।" সকলে বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিল—"সে কি !"

গণশা বলিল—"ফাঁ-ক-ফাঁস করে দিলি !—ঐ মেয়ের কাছে !"

গোরাচাঁদ একটু অপ্রতিভ হইয়াই তখনই আবার উল্টা রাগিয়া উঠিল, বলিল—"বলব না ?—দেখছি একটা মেয়ে ভাবনায় শুকিয়ে শুকিয়ে পাঁকাটি হয়ে গেছে—শেষকালে নারী হত্যার পাপে পড়ব ?… আর, খ্যাঁক্ করে উঠলে, সবটা শোনই আগে।" বিড়িতে আর একটা টান দিয়া ঘোঁৎনা ফেরৎ দিয়া বলিল—"অবিশ্যি বিয়ের কথাটা আর বললাম না।…শুনে সে কি ফূর্তি মেয়ের !—'কার বুদ্ধি গোরাদা ? কে ঠিক করেছে ?'…মওকা বুঝে আমি যশটা গণশাকেই দিলাম—যতটা টান বাড়ে। তারপর বললাম—'এখন সে নিরুদ্দেশ থেকে সামনে আসে কি করে ? কাগজে একটা বিজ্ঞাপন না দিলে তো আসতে পারছে না। অথচ ওর মামার একেবারেই গা নেই…' কি ভাবছিল শুনতে শুনতে, বললে—'বিজ্ঞাপন দিলেই ফিরে আসবে ?' বললাম, 'তা আসবে বইকি…যাদের ভালোবাসে তাদের দেখতে পাচ্ছে না—সে কি সুখে আছে সেখানে ?'…বললে—'আচ্ছা আমি গোলোক ঠাকুরদাদাকে রাজি করাব।' —বলে তক্ষুণি আমায় দাঁড়াতে বলে বাড়ি ছুটে গেল ; একটু পরে ছুটে এসে বললে—'ঠিক সময়ে পৌঁছেছিলাম গোরাদা', আজ দাদুর ওখানে পোষ-পার্বণের নেমন্তন্ন ছিল—বেরুচ্ছে, আমি গিয়ে পড়লাম। খুব করে বলে দিয়েছি, বলেছি—গোলোক ঠাকুর-দাদাকে রাজি না করাতে পারেন আমি কিছু খাব না কালকে…"

রাজেন গণশার পানে চাহিয়া বলিল—"কিরে, আমার কথা মিলছে ?" একবার কে-গুপ্তর পানে চাহিয়া বলিল—"কি মশাই ?'

গোরাচাঁদ বলিল—"আজ সকালে সেই জন্যেই তোদের সঙ্গে কালীঘাট যেতে পারলাম না। ঠিক হয়েছিল, সকালে গিয়ে মাসীর বাড়িতে পুঁটুরাণীর সঙ্গে দেখা করলাম। একটু বিমর্ষ, বললে—'গোলোক ঠাকুরদা তো রাজি গোরাদা', দাদু অনেক করে বলে কয়ে রাজি করেছে ; কিন্তু বললে ফটো না হলে তো বিজ্ঞাপন না কি—তার সুবিধে হবে না ; গণেশের ফটো নেই বাড়িতে।"

গণশা বলিল—"নেই যে এমন নয়, তবে গ্রুপে আছে।"

রাজেন বলিল—"তাতে তো সুবিধে হবে না।"

গোরাচাঁদ বলিল—"শেষে পুঁটুই অনেকক্ষণ ভেবে ভেবে বললে—'আমি এক সলা দোব, শুনবে গোরাদা'?'...বললায়—'শোনবার মত হলে নব শুনা কেন?" বললে—'চুপি চুপি একটা ফটো তুলিয়ে আমার হাতে দিয়ে দাও, আমি দাদুর হাতে দিয়ে দোব; বলব তোমার কাছে আগে থাকতেই ছিল।"

ত্রিলোচন প্রশংসায় চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া হাসিয়া বলিল—"একবার ফিচলেমি বুদ্ধিটা দেখো!"

গণশার পিছে একটা চাপড় দিয়া বলিল—"গণশা, নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরোবে, সাবধান কিন্তু!"

গণশা এবং আর আর সকলেও হাসিয়া উঠিল। গণশা বলিল—"যাঃ যাঃ, ফাজলামি করিস নি।"

গোরাচাঁদ বলিল—"কিন্তু একটা কথা ভাই, মানে, পুঁটুর একটা অনুরোধ"—

"কি, কি অনুরোধ?"—বলিয়া এক গণশা ছাড়া সকলেই উৎসুকভাবে গলা বাড়াইল। গোরাচাঁদ বলিল—"পুঁটু নেহাৎ কাঁচুমাচু করে বললে—'গোরাদা', একটা কথা আমার রাখবে?—আমাদের সেকেণ্ড মিসট্রেসের ভাই বাক্সে-শিবপুরে একটা নতুন ফটো তোলবার দোকান খুলেছে—নাম দিয়েছে মিত্র ব্রাদার্স; সেকেণ্ড মিসট্রেস সবাইকে বলে দিয়েছেন...তোমাদের গণেশকে ওঁর দোকানে তোলাতে বললে ফটোটা...এগজামিন আসছে, সেকেণ্ড মিসট্রেসের হাতে অঙ্ক, আমি আবার অঙ্কে কাঁচা..."

সকলে আবার হাসিয়া উঠিল, রাজেন বলিল—"কী ধড়িবাজ মেয়ে বাবা!" ত্রিলোচনকে বলিল—"এক ঢিলে দুই পাখি মারা কাকে বলে একবার শিখে নে তিনু!"

ঘোঁৎনা বলিল—"তা, ব্যবস্থাটা করছে, এ সামান্য কথাটা রাখবে না?...কাল ন'টার মধ্যে চলে আসবি গণশা, ঘুরে রামকেষ্টপুরের রাস্তা দিয়ে, আমরা ঐদিক দিয়ে কথাবার্তা ঠিক করে রাখতে যাচ্ছি।...তুইও বলে দিবি গোরা পুঁটুরাণীকে।"

গোরাচাঁদ বলিল—"আমি ভাই বলেই দিয়েছি—নিজের দায়িত্বে, জানি তোমরা পুঁটুর এ সামান্য কথাটুকু ঠেলতে পারবে না। বলেছি ঠিক ন'টার সময় ফটো তোলাবে গণশা। সে সময় যেন ওর দাদুকে বাড়িতেই আটকে রাখে—মানে নেহাৎ যদি কোথাও যাবার মুখে দেখে ফেললে...অবিশ্যি বুড়ো বেরোয় না বাগান ছেড়ে, তবু..."

ত্রিলোচন বলিল—"আমিও ঐ সময়টা গণশার মামার ওখানে গিয়ে আবার তুলব বিজ্ঞাপনের কথা—যেন কিছু জানি না।"

পরদিবস সকাল ঠিক সাড়ে আটটার সময় গণেশ একটা ঘোড়ার গাড়ি করিয়া, সীটের একটু কোণ ঘেঁসিয়া বসিয়া ফটো গ্রাফার মিত্র ব্রাদার্সের দোকানের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং একবার এদিক ওদিক দেখিয়া লইয়া সুরুৎ করিয়া দোকানের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। ত্রিলোচন ছাড়া আর সবাই ছিল, গায়ে আলোয়ানটা দেখিয়া ঘোঁৎনা প্রশ্ন করিল—"এটা কোথায় পেলি রে?"

গণশা বলিল—"সে অনেক কথা, সব বলব'খন; শেষ রাত্তিরে আগুন লেগে উদ্ধার হ'ল।"

দাঁতে দাঁত পিষিয়া খুব চাপা গলায় বলিল—"শা-শ-শালা!—করিমুদ্দিনের ভাঁওতা দিয়ে গ-গ-গণশাকে আটকে রাখবেন!

সকলে শিহরিয়া উঠিয়া, চাপা গলায় প্রশ্ন করিল—"আগুন?...ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলি নাকি?"

গণশা বলিল—"বি-বিবচুলির গাদায়। ধরে উঠলে চেঁচামেচি করে লোক জড় করলাম; গা-গাঙ্গুলীকে জল ঢালবার দিকে ঠেলে, আমরা ক'জন টেনে টেনে ঘরের জিনিষপত্র...সে অনেক কথা, বলব'খন... তিনুর বিছানার বদলে একটা রি-রি-রিষ্ট ওয়াচ এনেছি, কোথায় সে?" সকলে বোধহয় স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়াই উঠিত, ফটোগ্রাফার আসিয়া পড়ায় চাপিয়া গেল।

* * *

এতবড় আনন্দের ব্যাপারটা কিন্তু উপভোগ করিবার মোটেই অবসর পাওয়া গেল না।—

ফটোগ্রাফার দোকানের এক কোণে ফটো তুলিবার তোড়জোড় করিতেছিল, আসিয়া বলিল—"এঁরই ফটো? তা'হলে উঠুন, আমি তোয়ের।"

গণশা উঠিয়া গিয়া চেয়ারটিতে বসিয়াছে। মনে সবার খুব ফুর্তি—পোজটার সম্বন্ধে মতভেদ আর মিটিতে চাহিতেছে না—রাজেন বলিতেছে, "আরও একটু স্পষ্ট করে হাস—ই য়েস—আর একটু...।" এমন সময় আর একটি গাড়ি আসিয়া দোকানের সামনে দাঁড়াইল ও গায়ে ফতুয়া একজন বয়স্ক গোছের লোক ধীরে ধীরে নামিয়া দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিল। একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া

(১৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শিল্পী : জয়নুল আবেদিন
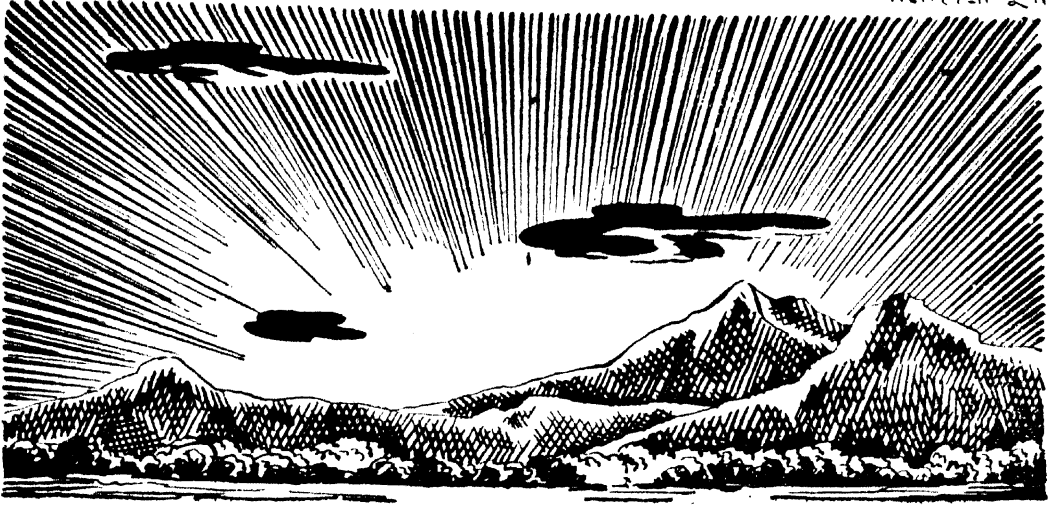
নতুন যুগের সূচনা

পৃথিবীকে উন্নত করবার সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আমরা প্রত্যহ এগিয়ে চলেছি—সে পৃথিবীতে বাঁচবার উন্নততর ব্যবস্থা। আমরা নিশ্চিত জানি যে আমাদের উদ্দেশ্য নিকটবর্তী হচ্ছে। এতদিন সভ্যতার প্রাচীন আশ্রয়—আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ—এক অকথ্য অন্ধকারের মধ্যে পড়ে ছিল। মাঝে মাঝে এই পুণ্যভূমির মহৎ সন্তানেরা আলোর জন্যে চীৎকার করেছেন। কিন্তু উৎসাহ যেহেতু মুষ্টিমেয়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, ভারতবর্ষ তার মৃত্যুর মতো ঘুম থেকে জেগে উঠে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমান আসন দাবী করতে পারেনি। কিন্তু এই বিরাট যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ তার অন্ধকার ও নিদ্রাতুর কর্মহীনতা থেকে জেগে উঠেছে। টাটার বিরাট ফার্ণেস্ থেকে শুরু করে ছোট্ট কামারশালা পর্যন্ত সর্বত্রই স্পষ্ট পরিবর্তন চোখে পড়ে এই পরিবর্তন দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় আমাদের দুর্ভাগা দেশের মধ্যে নতুন যুগের সূচনা দেখা দেবে। অন্ধকার এবং অব্যবস্থা থেকে ধীরে ধীরে এক নতুন ভারতবর্ষের নিশ্চিত উদয় হবে,—লক্ষ লক্ষ দুঃস্থ দেশবাসীর মুক্তি সেখানে। এই ঐতিহাসিক অগ্রগতিতে আমাদের জাতীয় ব্যাঙ্ক সুষ্ঠুতম ভারতের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবার বিরাট দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছে।

কথা-মন্ত্রী

সুবোধ বসু

বহু প্রাচীনকালের কথা। আর্য্যেরা সবে ভারতবর্ষে আসিয়া রাজ্য-বিস্তার শুরু করিয়াছে। অনার্য্যদের তাহারা রাক্ষস ইত্যাদি অসম্মানজনক নামে অভিহিত করিতেছে এবং নূতন সভ্যতা বিস্তারই যে তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, এইসব বুলি আওড়াইতেছে। বড় বড় বোলচাল ও কায়দা কানুনের চটকে ইতিমধ্যেই বহু অনার্য্যকে দলে ভেড়ান গিয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অনার্য্যদের বিরোধিতা দূর হয় নাই; দেশরক্ষার জন্য এই সকল অনার্য্যেরা তাহাদের স্বল্পতর কৌশল ও নিকৃষ্টতর অস্ত্র-শস্ত্রাদির সাহায্যে এখনও বহুস্থানে বাধা দান করিতেছে। তাহারা আর্য্যদের নাম দিয়াছে 'হুণ'।

আর্য্যরাজা যজ্ঞসেন যখন পাঞ্জাবের উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তে বিতস্তা নদীর পশ্চিম-প্রান্তে নবলব্ধ রাজ্য ফাঁদিয়া বসিয়াছেন, তখন পরিস্থিতিটা পূর্ব্বোল্লিখিত রকমের। সর্ব্বদাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হয়। দেশ হইতে অর্থাৎ মধ্য এশিয়া হইতে বেকার আর্য্য ছেলেদের চাকরির লোভ, ইজারার লোভ এবং অটুটযৌবনা অনার্য্য কুমারীদের লোভ দেখাইয়া আমদানি করা হইতেছে; অনার্য্যদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে দামাল দামাল যুবকের বিশেষ প্রয়োজন। অনার্য্যদের বিষাক্ত তীরগুলি বক্ষ পাতিয়া লওয়ার ও প্রত্যুত্তর বল্লমাদি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রাদি ছুঁড়িবার লোক না হইলে রাজ্য ভোগ করা সম্ভব নয়।

যজ্ঞসেন বার্দ্ধক্যের দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য তাঁহার অন্তর লালায়িত, অথচ অসভ্য অনার্য্যেরা শান্তি চাহে না, সভ্যতার মর্য্যাদা বুঝে না, যখন তখন আসিয়া তাহারা রাজ্যে হানা দেয়। তারপর গুঁতা খাইয়া বন-জঙ্গলে, পর্ব্বত-কন্দরে যাইয়া আশ্রয় লয়। আবার কিছু শক্তি-সংগ্রহ হইলেই হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় আগাইয়া আসে।

দূতমুখে সংবাদ শুনা গেল, এবার অনার্য্যেরা বহু সৈন্য ও শস্ত্র সংগ্রহ করিয়া, বহু পরিমাণ রসদ মজুদ করিয়া, বিদেশ হইতে ভাড়াটিয়া আর্য্য সৈন্যাধ্যক্ষ সংগ্রহ করিয়া অভিযান আরম্ভের উপক্রম করিয়াছে। শুনিয়া সপারিষদ আর্য্যরাজের মুখ শুকাইল। বুদ্ধি ও কৌশলের সাহায্যেই প্রধানতঃ আর্য্যেরা অনার্য্যদের পরাজিত করিয়া আসিয়াছে। আর্য্য সৈন্যাধ্যক্ষ ভাড়া করিয়া অনার্য্যেরা বুদ্ধি সংগ্রহেরও ব্যবস্থা করিয়া থাকিলেও বড়ই ভাবনার কথা! লোকবলে আর্য্যেরা প্রতিপক্ষের কাছেও দাঁড়াইতে পারে না। একমাত্র ভরসা ছিল উৎকৃষ্টতর এবং ভয়ঙ্করতর অস্ত্রশস্ত্র। রাক্ষসেরা যদি আর্য্য-বিশেষজ্ঞ সংগ্রহ করিয়া থাকে, তবে কি আর্য্য অস্ত্রশস্ত্রই আর আমদানি করে নাই?

সংবাদটা সারা রাজ্যময় রটিত হইয়া গেল। সংস্কৃত সংবাদপত্রগুলি বড় বড় হেড লাইনে বহু অনুস্বার ও বিসর্গ সহযোগে এই আসন্ন আক্রমণের সংবাদ ঘোষণা করিল। বড় বড় সম্পাদকীয় লিখিল। দেশের সর্ব্বত্র যুদ্ধের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু আলোচনা হইল। বহু গুজব রটিল। অনার্য্যেরা নাকি রাবণ রাজা কর্ত্তৃক চুরি করা পুষ্পক-রথের অনুরূপ আকাশযান তৈয়ারী করিয়াছে; তাহা হইতে অগ্নিবৃষ্টি করিয়া সমূলে সকল কিছু নিধন করিবে। এই গুজব সর্ব্বত্র গভীর আতঙ্কের সৃষ্টি করিল। গুজব একবার চালু হইলে তাহার সাথে প্রকৃত ঘটনার কিছুই তফাৎ থাকে না, এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। মরিয়া হইয়া আর্য্য-সাধারণ ফাঁকা জায়গা দেখিলেই গর্ত্ত খনন করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

এ অবস্থায় যাহা হওয়া স্বাভাবিক তাহাই হইল। জনসাধারণ দাবি করিল, যেমন করিয়াই হউক সর্ব্বনাশা যুদ্ধ আট-কাইতে হইবে। কতকগুলি সংবাদপত্রও বড় বড় সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া এই মনো-ভাবের সমর্থন করিল। দেখিতে দেখিতে রাজ্যে একদল প্যাসিফিষ্ট গড়িয়া উঠিল। তাহারা আলাপ আলোচনার দ্বারা প্রতি-পক্ষের সহিত একটা বুঝা-পড়া করার স্বপক্ষে বহু যুক্তি উপস্থিত করিল। যুদ্ধের দ্বারা কোনও মত-বিরোধই যে দূর হয় না, যুদ্ধ করিয়া লাভের চাইতে ক্ষতির পরিমাণই যে বেশী, স্বার্থপর না হইয়া প্রতিপক্ষের দৃষ্টিকোণ উপলব্ধির চেষ্টার মাহাত্ম্য প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলির অবতারণা করিল। আর্য্য-রাজ্যের প্রজারা নিরাশাবাদের শোচনীয় স্তরে আসিয়া পৌঁছাইল।

বৃদ্ধ প্রধানমন্ত্রী কহিলেন, 'মহারাজ, চরদিগের নিকট হইতে উহাদের রণসজ্জা সম্বন্ধে যে সকল গোপন সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে ভরসা করিবার মতো আর কিছুই পাইতেছি না। আমাদের লোকবল সামান্য, এ অবস্থায় উহারা যদি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও আর্য্য-বিশেষজ্ঞদের বুদ্ধি লইয়া উপস্থিত হয়।'

'শুনিয়াছি, মন্ত্রি, সবই শুনিয়াছি', বৃদ্ধ রাজা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, 'উহাদের অস্ত্রসজ্জার বর্ণনা শুনিয়া আমারও প্লীহা চমকিত হইয়াছে। ব্যোমযানের সাহায্যে যদি সত্য সত্যই···'

যুদ্ধ-মন্ত্রী খর্ব্বাকৃতি গয়াবল্লভ উঠিয়া কহিল, 'ওটা স্রেফ গাঁজা! মহারাজ, গুজবে বিশ্বাস করিবেন না, গুজবে বিশ্বাস করিলে ঠকিতে হয়। কতগুলি অনার্য্য অসভ্য ইতর রাক্ষস, তাহাদের ভয়ে আমরা সন্ধি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইব? বার্দ্ধক্য-বশতঃ প্রধানমন্ত্রীর ভীমরতি হইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু আমাদের শিরায় পূর্ণ যৌবনের রক্ত প্রধাবিত। আমার বিভাগের সকল পরিকল্পনা প্রস্তুত; সীমান্তে আমরা সৈন্য সন্নিবেশ আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। মহারাজ, আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া প্রাসাদে বিশ্রাম করুন, রাণীমাতাগণের সহিত বিশ্রম্ভালাপে সময়াতিপাত করুন, আমার সৈন্য ও সেনা-নায়কগণ অরাতিনিপাত কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া আসিয়া আপনার চরণবন্দনা করিবে। আপনি কোন ভাবনা করিবেন না।'

বৃদ্ধ প্রধানমন্ত্রী কহিলেন, 'পার তো ভাল। জয়লাভ সম্বন্ধে তোমার ও তোমার সৈন্যাধ্যক্ষদের ইহাই যদি দৃঢ় ধারণা হয়, তবে আমার কিছু বলিবার নাই। কিন্তু মনে রাখিও, শুধু মাত্র বড় বড় বোলচালে, চমকপ্রদ আশ্বাস ও সত্য-অসম্পর্কিত ঘটনা বিশ্লেষণে যুদ্ধজয় হয় না। সামান্য সুযোগেই তুমি কথার তোড় ছুটাও, কিন্তু স্মরণ রাখিও, কথা যুদ্ধের অস্ত্র নহে।'

'অস্ত্র নহে!' গয়াবল্লভ সদম্ভে কহিল, 'যুদ্ধের এত বড় অমোঘ অস্ত্র আর দু'টি নাই। মহারাজ, অনুমতি করুন, আজ হইতে যুদ্ধ-মন্ত্রিত্বের সাথে আমি কথা-মন্ত্রিত্ব নামে নতুন মন্ত্রিত্বের ভারও গ্রহণ করি। কথার প্রভাব কিরূপ, বুড়ো-হাবড়াদের একবার তাহা দেখাই। এটা খাঁটি আর্য্য আবিষ্কার।'

বৃদ্ধ রাজা যজ্ঞসেন দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, 'দেখ, যদি বাঁচাইতে পার। নহিলে যে সর্ব্বনাশ! বুড়ো বয়সে আবার

মধ্য-এশিয়ায় ফিরিয়া গিয়া চাষ-আবাদ সুরু করিতে হইবে নাকি।'

কিছুদিন পরে। সরকারী দপ্তরে কথা-মন্ত্রী বিভাগের মন্ত্রণাকক্ষে ফরমাস দিয়া উঁচু করিয়া তৈয়ারী কাষ্ঠাসনে খর্ব্বকায় গয়াবল্লভ সমুখের ডেস্কের উপর ঝুঁকিয়া আছেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে মসি-সম্পৃক্ত তীক্ষ্ণধার লেখনী, বাম হস্ত মুষ্টিবদ্ধ, ভ্রুযুগল ও গণ্ডের মাংসপেশী কুঞ্চিত, নিম্নের ওষ্ঠ উপর পাটির দন্ত-পংক্তির দ্বারা নিপীড়িত। চোখের সমুখে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ কর্তৃক প্রেরিত গোপন সংবাদলিপি মেলা:—'পূর্ব্ব পাঞ্জাবের মহীগঞ্জ সীমান্তের বিশুণ্ডা নদীর বাঁকের নিকট আমরা যে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলাম, শত্রুর প্রবল চাপে তাহা পিছু হটাইয়া আনিতে বাধ্য হইয়াছি।' কি ভয়ঙ্কর খবর! দিনের পর দিন শুধু এইরূপ খবরই আসিতেছে। পরাজয়, ছত্রভঙ্গ, পশ্চাদপসরণ, সমূলে নিশ্চিহ্ন! প্রথম ক'দিন জিতিবার পর একি সর্ব্বনাশ সুরু হইয়াছে! অথচ এই খবরগুলিকেই আশার রঙে রঙিন করিয়া সাধারণ্যে প্রচার করা যে কি কঠিন কর্ম্ম, একমাত্র তিনিই তাহা জানেন। আর বিলম্ব করা চলে না, পাশের ঘরে সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিদের অধৈর্য্য খড়মের শব্দগুলি অধৈর্য্যতর হইয়া উঠিতেছে। বিলম্ব করিলে উহাদের মনে সন্দেহ জাগ্রত হইতে পারে। ইতিমধ্যেই নগরে নানান্ ধরণের কথাবার্ত্তা সুরু হইয়াছে। আইনের কড়াকড়িতে প্রকাশ্য আলোচনা এবং সংবাদপত্রের আলোচনাই বন্ধ হইয়াছে; ফিস্ফিসানি বন্ধ করিতে হইলে অধিকাংশ লোকেরই মুণ্ড খসাইতে হয়। অথচ দৈনিক গড়ে দুই তিন ডজনের বেশী লোকের গর্দ্দানের ব্যবস্থা মহারাজ কিছুতেই অনুমোদন করিবেন না। বুড়ো-হাবড়াদের লইয়া কাজ চালাইতে কি কম অসুবিধা!

গয়াবল্লভ সহাস্যমুখে বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন, 'সংবাদপত্রের প্রতিনিধিবৃন্দ, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রেরিত আজিকার সর্ব্বশেষ সংবাদ অতিশয় আশ্বাসজনক। সর্ব্বত্রই আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সাফল্যলাভ হইতেছে। মহীগঞ্জের সীমান্তে বিশুণ্ডা নদীর বাঁকের নিকট শত্রুপক্ষ যে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিল, আমাদের প্রবল চাপে তাহা পিছু হটিতে বাধ্য হইয়াছে।'

দিনের পর দিন কথা-মন্ত্রীর দপ্তরের কার্য্য বাড়িয়া চলিল। গয়াবল্লভের আদেশে এক সের দুই সের হইতে কথার পরিমাণ দৈনিক দুই মণ আড়াই মণ তালপত্রে গিয়া দাঁড়াইল। এ সকল সংগ্রহ করিয়া সংবাদ-পত্রগুলি নিজ নিজ কাগজে বড় বড় শিরোনামা বাহির করিতে লাগিল: 'আমাদের সৈন্যদের অপ্রতিহত বিজয় অভিযান', 'অনার্য্যগণ কোণ ঠাসা', 'মূষিকের ন্যায় পিষ্ট হইবার অপেক্ষায় অরাতিকুল', 'শত্রুর মৃতদেহে আকীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে আর্য্য পতাকা', 'বাঞ্ছিত আক্রমণ আরম্ভের জন্য আমাদের পূর্ব্বপরিকল্পনানুযায়ী দুই পদ পশ্চাদপসরণ', 'বিজিত অনার্য্য অঞ্চলে আর্য্য-প্রীতি', 'আর্য্যদের গোপন অস্ত্রের ভয়ে ভটস্থ অনার্য্যগণ', 'অনার্য্যগণের সন্ধি-প্রস্তাব প্রেরণের সঙ্কল্প?' 'অনার্য্য রাজ্যে খাদ্যাভাব', 'ওলাউঠার কবলে শত্রুরাজা', 'তীরের ফলার জন্য লোহা পাইতে অনার্য্যগণের অসুবিধা', ইত্যাদি ইত্যাদি আশ্বাসজনক সংবাদে রাজধানীর লোকেরা আশ্বস্ত ও যুদ্ধজয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইল।

মহিষীগণ কর্তৃক পরিব্যাপ্ত হইয়া মহারাজ যজ্ঞসেন প্রাসাদের অন্তঃপুরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। বিশ্রম্ভালাপের ফাঁকে ফাঁকে তিনি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিলেন। তাহা লক্ষ্য করিয়া এক-সপ্ততিতমা রাণী কহিলেন, 'মহারাজ, যদি ক্ষণে ক্ষণে এইরূপ অন্যথাবৃত্তিচেতঃ হন, তবে আনন্দ করিব কাহার সাথে? আমরা আর্য্যকন্যা, পতি ভিন্ন অন্য চিন্তা নাই।'

মহারাজ যজ্ঞসেন লজ্জিত হইয়া কহিলেন, 'সত্যই, বড় অপরাধ হইয়াছে। হে করভোরু, ত্রুটি মার্জ্জনা কর। কিন্তু যুদ্ধ সম্পর্কে কিছুতেই উদ্বেগ বোধ না করিয়া পারিতেছি না।...'

'কেন, যুদ্ধ সম্পর্কে উদ্বেগের আবার কি আছে?' নবনবতীয়া রাণী কহিলেন, 'আজ দ্বিপ্রহরের যুদ্ধ ফিরিস্তি কি মহারাজ পাঠ

করেন নাই? উহা হইতে আশ্বাসজনক সংবাদ আর কি হইতে পারিত? মন্ত্রী গয়াবল্লভের দ্রুত সংবাদ দান ব্যবস্থার প্রশংসা না করিয়া পারিতেছি না।'

'তাহা সত্য।' মহারাজ স্বীকার করিলেন, 'এতদিনের মধ্যে গয়াবল্লভ একদিনও দুঃসংবাদ দিয়া আমাদের পীড়ার কারণ হন্ নাই। রোজই দেখিতেছি, আমরা অগ্রসর হইতেছি; হাজার হাজার শত্রু বিনাশ করিতেছি; শত্রু রাজা সন্ধির জল্পনা-কল্পনা করিতেছেন। কিন্তু তবু পূর্ণ জয়লাভ হইতেছে না কেন, তাহাই ভাবিতেছি।'

'কেন, শুধু ভাবিয়া মরিতেছ', কনিষ্ঠা সুয়োরাণী রাজার পক্ককেশে চম্পক অঙ্গুলি চালনা করিয়া কহিলেন, 'জয় আমাদের অনিবার্য্য। সকল সৈন্যাধ্যক্ষ এবং সকল সংবাদপত্রই কি তাহা একস্বরে ঘোষণা করিতেছে না? গয়াবল্লভের ন্যায় এমন কর্ম্মকুশল মন্ত্রী থাকিতে আর ভাবনা কি?'

এমন সময় তুরী, ভেরী, জগঝম্প প্রভৃতির আওয়াজের সাথে বহুসহস্র লোকের মিলিত হুহুঙ্কার শোনা গেল। সংস্কৃত শব্দ উচ্চারিত হইলে যেমন একটা মধুর রেশের সৃষ্টি হয়, এ-শব্দ মোটেই সেইরূপ নহে, এই কোলাহলে কর্কশতার সুস্পষ্ট আভাষ পাওয়া যাইতেছে। নিজ সৈন্যগণ জয়লাভ করিয়া আসিয়া সহসা অ-সংস্কৃত ভাষায় জয়োল্লাস করিবে কেন, রাজা যজ্ঞসেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া ক্ষণকালের জন্য ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেলেন। কোলাহল প্রবলতর হইয়া উঠিল। যজ্ঞসেন বুঝিলেন, দ্রাবিড়ী কোলাহলের ন্যায় মনে হইলেও তাঁহার নিজ সৈন্যগণই তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষা করিতেছে—একটা বাণী দিতে হইবে। কিন্তু বাণী তাঁহার আসে না। কথা-মন্ত্রীর দপ্তর সৃষ্টি হইবার পর হইতে সর্ব্ব অনুষ্ঠানের জন্যই গয়াবল্লভ তাঁহাকে বাণী সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। রাজনৈতিক, পারমার্থিক এবং যুদ্ধ সম্পর্কিত বিষয়ে যখনই তাঁহাকে কোনও বাণী দিতে হইয়াছে, তখনই তাহা কথা-মন্ত্রীর দপ্তর হইতে তালপত্রে লিখিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু গয়াবল্লভের আজ এ কি কর্ম্মকুশলতার অভাব! জয়োল্লাস-পরায়ণ সৈন্যেরা বাণী চাহিয়া যে তাঁহাকে অপ্রস্তুতের একশেষ করিবে! মহারাজা যজ্ঞসেন প্রতিহারীকে হাঁক দিয়া কহিলেন, 'ঝটিতি কথা-মন্ত্রী গয়াবল্লভকে খবর দাও। আসিতে বিলম্ব না হয়।'

বৃদ্ধ প্রধানমন্ত্রী ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন, 'মহারাজ, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমরা অবরুদ্ধ। আমাদের পলায়নেরও আর উপায় নাই!'

যজ্ঞসেন স্তম্ভিত হইয়া কহিলেন, 'বলো কি মন্ত্রি! এ যে অবিশ্বাস্য, সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য! আজ দ্বিপ্রহরের যুদ্ধ ফিরিস্তিতেও আমরা শতক্রোশ দূরে দুই সহস্র অনার্য্য সৈন্য হটাইয়া দিয়াছি এবং তিনশত শত্রুসৈন্য নিশ্চিত নিহত ও সম্ভবতঃ আরও পাঁচশত হতাহত করিয়াছি।'

'তার একবর্ণও বিশ্বাস করিবেন না, মহারাজ। তার একবর্ণও সত্য নয়। যুদ্ধ-সম্পর্কিত সকল সংবাদ কি করিয়া গয়াবল্লভের দপ্তরেই সৃষ্ট হইত, আমি মাত্র কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাহার প্রমাণ স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। পূর্ব্বেকার যুদ্ধসমূহে আমরা যে সকল জয়লাভ করিয়াছি, তাহা বদলাইয়া গয়াবল্লভ এবারে তাহাও খবর বলিয়া চালাইয়াছে। কিন্তু মহারাজকে সাবধান করিতে পারিবার পূর্ব্বেই এই বিপদ! আমরা চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ। টাকার লোভে বিদেশে আসিয়া শেষে প্রাণটা পর্য্যন্ত বুঝি খোয়াইলাম!'

যজ্ঞসেন কতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অতঃপর মুখ দিয়া কথা ফুটিলে প্রথমেই রাণীদের দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন, 'যাও, মহিষীগণ, আর বিলম্ব নয়। চিতাগ্নি প্রজ্বলিত কর। অনার্য্যগণ কর্তৃক অপমানিত হইবার পূর্ব্বে তোমরা সকলেই চিতারোহণ করিবে। পলাইবার কোনও উপায় থাকিলেও এত মেয়েমানুষ লইয়া পলায়ন সম্ভবপর নহে।'

(১৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সুশীল জানা

ভোরের প্রথম ম্লান আলোয় ঘুম ভেঙে গেল শৈলর। চোখ মেলে তাকালে ... খোলা জানালা দিয়ে উঁকি মারছে অপরিচিত এক জগৎ। বড় বড় টিনের চালা ... খাপ্‌ওলাপড়া কালো কালো চুণবালি- ... ঘরগুলোর পেছনে মাথা উঁচু ক'রে ... আছে বালির পাহাড়। বহু দূরে ... টিনের চালাগুলোর এক পাশে ঝিকঝিক ... মাঝে আসা কেনেলটার এক ফালি। ... এই অপরিচিত পরিবেশের দিকে ... তাকিয়ে রইল শৈল—আর শুনতে ... : গানের বিলম্বিত বিষণ্ণ সুর ... ভেসে আসছে কোথা থেকে। অনেক-একটি ... সরু-মোটা কণ্ঠের সম্মিলিত বিষণ্ণ একটি সুর।

ভোরের ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে দূরে থেকে ভেসে ... গানের সুরটি শুনতে ভারি ভালো লাগছিল ওর। শেষ পর্যন্ত শহরে এসেছে সে। এই শহরেরই কোথাও আছে সেই একটি লোক। খুব কাছাকাছি মনে হয় ...—আর সুনিবিড় পরিতৃপ্তিতে ভরে ওঠে শৈলর মন। গানের অস্পষ্ট একটা ... গুঞ্জন তার মনের গভীরের এক ... আকুতির সঙ্গে যেন এক হ'য়ে যায় ধীরে ধীরে। তার মনের সমস্ত পরিতৃপ্তির মাঝখানে একটা বেদনা যেন থর্‌থর্ ক'রে কাঁপতে থাকে।

তারপর সমস্ত ভালো-লাগা তার নিমেষে ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেল। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ার মতো গানের অস্পষ্ট শব্দগুলো সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠলো আর চমকে দিল শৈলকে।...

...বন্দে...মাতরম।...

বিছানায় উঠে ব'সলো শৈল।

গানের যে সামান্য অংশটুকু বুঝতে পেরেছে সে—সেইটেই যথেষ্ট। তার চোখের সুমুখে সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠলো ক্ষ্যাপা উচ্ছৃঙ্খল জনতা—ছুটে আসছে যেন তার দিকে। সহস্র কণ্ঠে সেই পরিচিত শব্দের আকাশ-ভাঙা চীৎকার। কোন এক সন্ধ্যার অন্ধকার রাঙা ক'রে জ্বলে উঠলো আগুন পোষ্ট অফিসের খড়ের চালায়, আর হল্লা হয় সরকারী কর্মশালায় জড় স্তূপের ওপরে।

গ্রাম থেকে নতুন এসেছে শৈল এই মফঃস্বল শহরে। জানালা দিয়ে বাইরের অনাস্বাদ অপরিচিত জগতের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অজ্ঞাত আশঙ্কায় বুক কাঁপে ওর: কারা ওরা!—

পাশের বিছানায় বিনোদিনী উঠে বসেছে—আড়মোড়া ভাঙছে ব'সে ব'সে। ঘুম-জড়িত কণ্ঠে ব'ললো, অমন ক'রে বাইরে কি দেখছিস লো?

দম যেন বন্ধ হ'য়ে আসছিল ভয়ে শৈলর। উচ্ছৃঙ্খল ক্ষ্যাপা দিনগুলো নিস্তরঙ্গ জীবনের ওপরে এসে আবার যেন ঝড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত। শৈল শঙ্কিত কণ্ঠে বল'লো: কোথায় যেন গান গাইছে বলতো বিনোদ?

বিনোদিনী হাই তুলে বল'লো, জেলখানায়।

—জেলখানায়! কারা গাইছে?

—যাদের ধরে ধরে জেলে পুরেছে।

শহরের মেয়ে বিনোদিনী—অনেক কিছু অভিজ্ঞতার পরম গাম্ভীর্যে বললো, কতো কাণ্ড হ'য়ে গেল চারদিকে—আগুন...ভাঙাভাঙি!...দেশের চাষাভুষো পর্যন্ত ছুটে এলো শাবল-কোদাল নিয়ে!...

—জানি। শৈল ব'ললো, আমাদের থানার ঘরদোরতো সব ভেঙে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

বিনোদিনী হেসে বললো, তাই বুঝি তোর বাবু পালিয়ে এসেছে এইখানে?

—সেখানে আর থাকবে কোথায়! যার নাম শুনে কাঁপতো সকলে, ছোট ছেলেমেয়েগুলোর মুখ শুকিয়ে যেত ভয়ে—সেই বিরাট রাশভারি লোকটা লুকিয়ে ছিল তিনদিন শৈলর ঘরে। তারপর এক-দিন ক্ষিপ্ত জনতার অলক্ষ্যে নদী পেরিয়ে চলে এসেছে শহরে। সে সব গল্প বলে শৈল। সে এক দিন গিয়েছে। একটুকু খাদ্যকণা পাওয়া যায় না কোথাও, সরকারী কর্ম-চারীদের জন্য হাটবাজার সব বন্ধ। তখন শৈল জুগিয়েছে সব কিছু রাত্রির অন্তরালে। তারপর আগুন আর ভাঙাভাঙি।

—মাঝখানে গিয়েছিল একবার সেপাই ফৌজ নিয়ে—ধরে নিয়ে এসেছিল কয়েক-জনাকে। হেসে বললো শৈল, চিনতামতো অনেককে—বলে দিয়েছিলাম সব নাম ধাম।

—আমার ঘরেও তো একজন লুকিয়ে-ছিল সাতদিন।

—ধরিয়ে দিয়েছিস?

—না। কলেজে পড়া ভদ্দর লোকের ছেলে। অতিথি—আশ্রয় নিয়েছিল এসে, ধরাই কি ক'রে। একদম কাঁচা বয়সের ছোকরা।...

শৈল মুচকি হেসে বললো, মনের মানুষ—তাই বল্। তারপর?

—তারপর কোথায় চলে গেল—জানিনে।

তারপর চুপ করে থাকে দু'জনেই। শৈল কান পেতে শোনে, গানের জড়িয়ে যাওয়া ভাষা গুমরে গুমরে বিষণ্ণ সুরে দূরের জেল-খানা থেকে ভেসে আসছে তখনো।

শৈল হঠাৎ বলে উঠলো, ওই গান গাইতে দেয় জেলখানার মধ্যে?

—রোজ ভোরেইতো গায়' বিনোদিনী বললো, রোজ ভোরে উঠে তুই যদি তোর মায়ের নাম করিস—দোষের নাকি?

সেই পরিচিত শব্দটির আকাশভাঙা চীৎকার আর ক্ষিপ্ত জনতা। মনে পড়ে শৈলর। বললো, ওই সর্বনেশে নাম—মায়ের নাম নাকি?

—দেশকে ওরা যে মা বলে। সেই দেশের গান গায়।

সুজলা সুফলা দেশের কথা বলে বিনোদিনী। আর তার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবে শৈল: কলেজে পড়া কাঁচা বয়সের ছেলে একটা লুকিয়ে ছিল ওর ঘরে। তাকে ভালো লেগেছিল বিনোদিনীর। কিন্তু শৈলর ভালো লাগে না।

—ঘরে ভাত নেই, মাঠে ধান নেই—হা অন্ন হা অন্ন ক'রে মরছে দেশের লোক। এখন জেলের মধ্যে বসে বসে সুজলা সুফলার গান। আমার ঘরে ওরা আগুন দিয়েছে পর্যন্ত, বাবুকে চাল-ডাল জুগিয়েছিলাম বলে। একটা লোক খেতে পায় না একমুঠো দু'দিন!...তার জন্য এই কাণ্ড। সর্বনাশ হবে ওদের—দেখিস, সর্বনাশ হবে। আমার মতো গরীব মানুষের ঘরে আগুন!...সর্বনাশ হবে!...

—তোর দারোগাবাবু তাই ব'লেছে বুঝি? তরল কণ্ঠে যেন চিমটি কেটে ব'ললো বিনোদিনী।

শৈল ক্ষেপে উঠে ব'ললো, দেখগে যা—তোর কলেজের বাবুটিও হয়তো এসে জুটেছে জেলখানায়। এই তো শেষ পর্যন্ত! ...মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকু পর্যন্ত আজ নেই আমার!...

বিনোদিনী চুপ ক'রে যায় শৈলর কথার ঝাঁজে।

বালির তরঙ্গায়িত পাহাড় আর দিগন্তলীন মাঠের মাঝখানে ছোট এই মফঃস্বলের শহরটি। গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি উঁচু উঁচু ঘরগুলোর সমষ্টি পেরিয়ে শহরের এক প্রান্তে সারি

সারি গুটি কয়েক চালাঘর। মাটির দেয়ালে একটি ক'রে টিন ঝোলানো প্রত্যেকটি ঘরে—তাতে আলকাৎরা দিয়ে কাঁচা বাঁকা অক্ষরে লেখা : 'প্রবাসী থাকিবার স্থান।' গ্রামীন ব্যবসা-বাণিজ্য আর মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে আসে গ্রামের লোকেরা, হল্লা পাকায়—থাকে কেউ কেউ দু-এক রাত্রি—তারপর চলে যায়। মেয়েরা পয়সা গোণে ঘর আর দেহ ভাড়ার। অসংখ্য লোক আসে—ভিড় করে সারাদিন, সন্ধ্যের দিকে শহরটা ভয়ানক জনবিরল মনে হয়।

সুমুখের পথ দিয়ে অসংখ্য লোক গিয়ে ঢোকে শহরে। কিন্তু একটি চেনামুখ চোখে পড়ে না শৈলর—শুধু একটি মুখ, একটি লোক। বিনোদিনীর ঘরের দাওয়ায় ব'সে সে সারাদিন প্রায় চেয়ে রইলো পথের দিকে—এক দুরন্ত প্রত্যাশায়।

লোক. গিস্‌গিস্ করে বিনোদিনীর ঘরে। প্রবাসীদের গোলমাল আর হল্লা, তাদের রান্নাবাড়ার আয়োজন, টাকার ঝঙ্কার আর দর কষাকষি। বিশ্রী লাগে শৈলর। মন যেন তার হাঁপিয়ে ওঠে। বিনোদিনী প্রবাসীর হিসেব নিয়ে ব্যস্ত সারাদিন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে চটুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে মাঝে মাঝে, কিলো, দেখতে পেলি তোর বাবুকে?

যেন চাবুক মারে বিনোদিনীর কথাগুলো।

উপায় নেই—পরিচিত বিনোদিনীর আশ্রয়ে এসে উঠেছে এই অনাত্মীয় অপরিচিত শহরে। চুপ ক'রে থাকে শৈল।

দুপুরের দিকে ভিড় কমে এলো প্রবাসীদের। বিনোদিনী পয়সা গুণে ঘরে বসে বসে।

শৈল বললো, থানায় গেলে হয়তো দেখা পেতুম বিনোদ।

পয়সা গুণতে গুণতে বিনোদিনী বললো, যা না তবে। আমার তো দেখছিস—মরবার ফুরসুৎ নেই লোকজনের হাঙ্গামে। ওই তো সোজা এক রাস্তা। খানিকটা গিয়ে কারুকে জিজ্ঞেস করলেই ব'লে দেবে। থানা, জেল, আদালত—সব পাশাপাশি।

ভয়ানক অসহায় মনে হয় নিজেকে শৈলর। বিনোদিনীর মুখের দিকে চুপ ক'রে চেয়ে রইলো।

বিনোদিনী বললো আবার, আর সেখানে গিয়েই বা কি হবে!

তবে কোথায় যাবে শৈল!

শৈল বললো, তোর যদি এমনি ঘরে কেউ আগুন লাগিয়ে দিত, এমনি যদি একটি ছেলে পেটে থাকতো তোর—কি করতিস?

বিনোদিনী মুখ তুলে তাকালো শৈলর দিকে। তারপর হেসে বললো, এখানে যারা আসে তাদের ছেলে পেটে ধরে জন্ম সার্থক করার কথা কোনো দিন ভাবিনি শৈল। শুধু জানি, ওদের ব্যবসা জুটোতে হবে। হেতে পাবো না। তার চেয়ে এই বেশ আছি। আবির বুড়ি আর তার জড়িবটি যতোদিন আছে—ততদিন ও ভয় নেই।

আবির বুড়ি আজ বলছিল তোর কথা। থাকবি তার কাছে?—এই তো পাশেই।

শৈল নিঃশব্দে চেয়ে রইলো বিনোদিনীর দিকে।

—ও পাপের বোঝা ব'য়ে বেড়াতে হবে না। মাসের পর মাস—সব ঠিকঠাক ক'রে দেবে বুড়ি। বুড়ো মানুষ—সব দেখতে শুনতে পারে না। প্রবাসীও জোটে না ভালো। তুই থাকলে ভালো হ'তো।

শৈলর স্বপ্নের জগৎ যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হ'য়ে যায় বিনোদিনীর আঘাতের পর আঘাতে। চারদিকে তার অপরিচিত জগৎ নিরবলম্ব শূন্যতায় খাঁ খাঁ ক'রছে।

শৈল শুধু ব'ললো, সে জন্যে তো আমি শহরে ছুটে আসিনি বিনোদ।

বিনোদ হেসে ব'ললো, ছুটে এসেছিস তোর বাবুর কাছে মানলুম। কিন্তু ও ছেলে যে তারই—তার তো কোনো প্রমাণ নেই।

আর ব'সে থাকা যায় না যেন বিনোদিনীর কাছে। ছুটে পালাতে ইচ্ছে করে তার বিনোদিনীর এই ঘর ছেড়ে, এই শহরের সীমানা ছেড়ে, এই অনাত্মীয় মর্মান্তিক জনতার ভিড় ছেড়ে। তার সমস্ত সমাজ-সম্পর্কহীন, লোকালয়-বিচ্ছিন্ন কেনেলের ধারে সেই বহুদিনের ছায়া-স্নিগ্ধ হাটের প্রান্তসীমা, তার ছোট খড়ের ঘরটুকু, প্রতিবেশী জবঘুরে জেলেদের বেদেদের বাঁধা গুটিতিনেক টং—তালপাতার ছাউনি—সে ঢের ভালো এর চেয়ে। দীর্ঘ চার মাস ধ'রে তার কুটিরের এক কোণে যে স্বপ্নের জগৎ একটি গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে, যাকে লালন ক'রে এসেছে সে এতদিন—মায়া-মমতাহীন অকরুণ আঘাতের পর আঘাতে, সে যেন চীৎকার ক'রে ওঠে তার মনের মাঝখানে। কান্না পায় শৈলর।

শৈল সেখান থেকে চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালো।

বিনোদিনী ব'ললো, পারুল পুলিশের লোকদের অনেককেই চেনে। সন্ধ্যের দিকে আসবে সে এখানে—খোঁজ নিস তখন তার কাছে।

একটুকু সমবেদনা নেই বিনোদিনীর কথায়। শৈল আবার বাইরের দাওয়ায় এসে ব'সলো। কত লোক চলে যায় সুমুখের পথ দিয়ে দূর থেকে ভেসে আসে কর্মমুখর শহরের অস্পষ্ট গুঞ্জন। এই জনতার মাঝখানে হঠাৎ যদি দেখা হ'য়ে যায় সেই বহুদিনের মনে করে রাখা লোকটিকে : ভাবে শৈল, কি ব'লবে তাকে। একটা কথা যেন বলার ছিল—বহুদিনের ভেবে রাখা একটি কথা, জনতার কোলাহলে সব যেন গোলমাল হ'য়ে গিয়েছে শৈলর।

তারপর অপরাহ্নের বিষণ্ণ ছায়া নামলো কর্মক্লান্ত শহরের ওপরে। দূরের অস্পষ্ট গুঞ্জন থেমে এলো—সন্ধ্যা এলো ঘন হয়ে। একটি দিন শেষ হ'য়ে গেল শৈলর।

সন্ধ্যের দিকে পারুল এলো, মোক্ষদা এলো—প্রতিবেশিনীরা আরও এলো অনেকে ওরা আলোচনা করে দিনের উপার্জন নিয়ে, রাত্রের প্রবাসী নিয়ে—আর গবেষণা করে কে কি রকম টাকাওয়ালা লোক। এক পাশে চুপ ক'রে ব'সে থাকে শৈল।

ওদের যাওয়ার সময় বিনোদিনী বললো, আমাদের শৈলর বাবুটিকে তোরা খুঁজে দে না কেউ। পেটে ছেলের বোঝা নিয়ে ছুটে এসেছে বেচারী শহরে খুঁজতে।

বিনোদিনীর কথায় হাসে সকলে।

বিনোদিনী ব'ললো, হাসি নয় পারুল, তুই তো চিনিস পুলিশের সকলকে। দে না ভাই খুঁজে। কি নাম—বল্‌না লো শৈল। হ্যাঁ হ্যাঁ—নরেন বাবু।

—নরেন বাবুতো নেই। আজ ক'দিন হলো চলে গিয়েছে বদলি হ'য়ে এখান থেকে।

বুক কাঁপে শৈলর। ওদের হালকা কথাগুলো নির্মম গুরুত্বে সোজা আঘাত দেয় এসে সেই কাঁপা বুকে। শুধু মনে হয় শৈলর, তার গ্রাম—তার গ্রামের লোক—এই শহর আর বিনোদিনী, পারুল, মোক্ষদা, আবির বুড়ি—সবাই যেন একটা গোপন ষড়যন্ত্রে, তীব্র প্রতিহিংসায় উদ্যত তার ওপরে। এর মাঝখানে—এই অনাত্মীয় শহরের মাঝখানে একটি লোক শুধু ছিল। এখন সেও নেই।

এখন কি যে ক'রবে শৈল, ভেবে পায় না। ঘর পুড়ে গিয়েছে তার, সর্বস্বান্ত সে।

রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে শৈল হঠাৎ কিছু টাকা চেয়ে ফেলল বিনোদিনীর কাছে।

বিনোদিনী হেসে ব'লো, টাকা কোথায় পাবো! এমনি এদিক ওদিক ক'রে রোজের পেট চালাতেই অস্থির। এই ছুঁড়িকে পুঁজি কি আর আছে কিছু?

তারপর আর একটি কথাও মুখে এলো না শৈলর।

বিনোদিনীর ঘরে লোক আছে আজ—চারজন প্রবাসী, বড়লোক—মামলা মোকদ্দমা নিয়ে এসেছে শহরে।

শৈল মাদুর পেতে ব'সে রইলো দাওয়ায়—অন্ধকারে হাত গুটিয়ে। নির্জন শহর—সেখানে আলোগুলি নিভে গেল একে একে—সবগুলি আলো নিভে গেল পাশাপাশি। দেয়ালে পিঠ দিয়ে শৈল নিঃশব্দে ব'সে রইলো অন্ধকারের দিকে চেয়ে। দৈত্যের মতো আকাশে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে শহরের চিল-কোঠাগুলো।

ব'সে ব'সে ভাবে শৈল : এরপর কি ক'রবে সে। গ্রাম থেকে এই শহর পর্যন্ত সকলে শুধু নিঃশব্দে আঙুল তুলে যেন দেখিয়ে দিচ্ছে—আবির বুড়ির জনবিরল ঘরটা। এছাড়া কোনো পথ নেই আর প্রাণ ধারণের—জীবন বহনের। এতদিনকার স্বপ্নলালিত এক ভিন্ন পরিবেশের মন না-না ক'রে ওঠে বিনোদিনীর বিরুদ্ধে—শহরের এই রুক্ষতার বিরুদ্ধে।

অন্ধকারের দিকে চেয়ে চেয়ে মাঝে মনে পড়ে শৈলর—তার অনাগত সন্তানের শৈশবের সঙ্গে তার নিজের সুদূর শৈশব মিশে যায় ধীরে ধীরে। মনে পড়ে কেনেলের ধারে ঘেঁষে হাটের একপ্রান্তে লোকালয় বিচ্ছিন্ন

(১৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সন্তান জাতির ভবিষ্যৎ

সন্তান-জনন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হ'ল উন্নত মানুষ। মেণ্ডিলিয়ন নিয়ম আবিষ্কারের পর জননশাস্ত্র বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। এই নিয়ম প্রমাণ ক'রেছে পিতামাতার শারীরিক ও মানসিক দোষগুণ সন্তানে দেখা দেয়। প্রাণীর চরিত্র নির্ভর করে দুটো জিনিসের উপর ঃ পারিপার্শ্বিক ও জন্মগত উত্তরাধিকার। জীবনের জন্যে উন্নত ব্যবস্থা করা মানেই উপস্থিত জনগণের স্বাস্থ্য উন্নতি। শিক্ষার সুবন্দোবস্ত মানেই মানসের সদ্ব্যবহার। কিন্তু স্থায়ী উন্নতি সম্ভব একমাত্র উপস্থিত বংশের স্বাস্থ্য ভাল হ'লে। রক্তে যদি দোষ থাকে তা' হ'লে শুধু পারিপার্শ্বিকের উন্নতি ক'রে বিশেষ কিছু লাভ নেই। স্বাস্থ্যের অভাব শুধু বস্তি নয়, ধনীদের ঘরেও চোখে পড়ে। প্রত্যেক নগরবাসীরই কর্তব্য—অসুস্থ, পঙ্গু প্রাণশক্তিহীন সন্তানের জন্ম না দেওয়া।

আপনার রক্ত পরীক্ষা করান ঃ সরকারী ভি, ডি, ক্লিনিকস্-এ বিনামূল্যে করা হয়।

অনুসন্ধানের জন্য ঃ—চিঠিপত্র লিখুন—ডাইরেক্টর, হাইজিন ইনস্টিটিউট, ১১০, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ। ডাইরেক্টর, ভি, ডি, ক্লিনিক্স্, ৮৮, কলেজ ষ্ট্রীট। ফোন করুন—বি, বি, ৫৯২১ অথবা পি, কে ১২০। দেখা করুন,—ডাইরেক্টর, মেডিকেল কলেজ হসপিট্যাল।

বিনামূল্যে ও গোপন ব্যবস্থাধীনে চিকিৎসা

পুরুষদের চিকিৎসাকেন্দ্র

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ, ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল, চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল।

মহিলাদের চিকিৎসাকেন্দ্র

লেডী ডাফরিণ হস্পিট্যাল, আলীপুর ভলাণ্টারী ভেনিরিয়েল হাসপাতাল

সমস্ত চিকিৎসাকেন্দ্র সকালে ও বিকালে খোলে।

চাকরিটা কিন্তু যুদ্ধের বাজারে জুটে গিয়েছিল অপ্রত্যাশিতভাবে। তার পূর্ব্বে তিন বৎসরে শুধু জুতোই ছিঁড়েছে জোড়া পাঁচেক, কিন্তু চাকরি জোটেনি মহেশের একটাও।

ত্রিশ টাকা মাইনের চাকরি। তার ওপর আবার যুদ্ধভাতা,—এখন বাসাটা জুটলেই মহেশের সব গোল একেবারে মিটে যায়। কিন্তু ঐটেই মহেশ কিছুতেই জোটাতে পারছে না।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে সেদিন বিপিন হন্তদন্ত হয়ে মহেশকে চেপে ধরেই বল্লে—"অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি ভাই মাত্র আট টাকা ভাড়া। কিন্তু ভাই, স্থানটা আগে একটা গরুর গোয়াল ছিল, অবশ্য বাড়ীওয়ালা সেটাকে বাসস্থানের উপযুক্ত করেই ভাড়া দিচ্ছে। ছাপ্পান্ন চার মির্জ্জা গিয়াসউদ্দীন ষ্ট্রীট দেখে এসো যদি পছন্দ হয়। আর তো খুঁজে পাওয়াই যাচ্ছে না।"

বিপিনের পিঠে প্রচণ্ড চাপড় মেরে মহেশ বল্লে,—"ঠিক আছে, আর দেখতে হবে না। কালকেই বাড়ীতে টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছি।"

—"কিন্তু তার পূর্ব্বে ওটাকে আগাম ভাড়া দিয়ে আগে এন্‌গেজ তো করো।"

—"সে আমি কালই করে ফেলবো। সেজন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। পুরস্কার-স্বরূপ তোমাকে আগে চা তো খাওয়াই তারপর আর অন্য কথা।"

বাসা ঠিক করে মহেশ তার পরদিনই বাড়ীতে টেলিগ্রাম করে দিল,—'Come sharp house is ready." কিন্তু বাড়ী-ওয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত হ'ল, ভেতর বাড়ীতে আরও সাতজন ভাড়াটে থাকে বলে জলের বাবস্থা তাকে রাস্তার টিউবওয়েল থেকেই করতে হবে। মহেশ তাতেই রাজী।

টেলিগ্রাম পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে দেশ থেকে মহেশের আত্মীয় এসে উপস্থিত হোলো তিনটী। বউ কুন্দকলি, তার এক ভাই, আর মা।

গোয়ালে ঢুকেই তো কুন্দকলির চক্ষু চড়কগাছ।—"এটা কি জায়গা গো? কলকাতার সহরে কি তুমি আর বাসা খুঁজে পেলে না? কোথায় জল। কোথায় পায়খানা,—শেষ কালে কি পেট ফুলে গলা শুকিয়ে মরবো নাকি? এটা আবার বাসা। কি ঘেন্নার কথা, এ যে দরজার ওপর দিয়ে মানুষের চলবার পথ দেখছি। এ তুমি নিয়ে এলে কোথায়?"

এক গ্লাস জল খেয়ে, একটা বিড়ি ধরিয়ে মহেশ বল্লে,—"অত ঘাবড়াচ্ছ কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে। কলকাতায় কি আজকাল বাসা মেলে? বড় বড় বাড়ীগুলো সব সোলজারে ভর্ত্তি। এই আস্তাকুঁড়ো যে পাওয়া গেছে তাই না কত ভাগ্যি। এখন যা বলছি তাই মন দিয়ে শোনো। দেখ ঠিক ভোর রাত চারটেয় উঠে পায়খানা শেষ করে নেবে সবাই। সাড়ে চারটে বেজেছে কি আর পায়খানা মিলবে না। আর ওই যে দেখছো কল? আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখছো কি? ঐদিকে তাকাও—ঐদিকে। ঐটে হচ্ছে করপোরেশনের টিউবওয়েল। দিন-রাত ওতে জল থাকবে—যত খুসী খাও, যত ইচ্ছে স্নান করো। কিন্তু দেখো যেন আবার অন্য লোকের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিও না।"

নিজের গালে একটা চড় মেরে কুন্দকলি ঘরের মেঝেতে বসে পড়ে বল্লে—"রাত চারটেতে পায়খানা? কি কুকীর্ত্তির কথা গো। যদি একদিন ভালো মন্দ কিছু হয়? মানুষ তো আর কলের পুতুল নয়, যদি দু-একদিন কারো পেট খারাপ হয়, তখন? আর ঐ যা কল দেখিয়ে দিলে, ওখানে গিয়ে এককাঁড়ি বেটাছেলের মাঝখানে গায়ের কাপড় খুলে ইচ্ছেমত নাইতে পারে কেউ? এতো দেখছি চব্বিশ ঘণ্টাই লোক চলছে। আমার এ সুখে কাজ নেই, তুমি বরং খরচ দাও, আমরা বাড়ীর বৌঝি বাড়ীতেই ফিরে যাই।"

হঠাৎ একটা হাতপাখা টেনে নিয়ে অকারণ বাতাসে বধূকে বিব্রত করতে করতে মহেশ সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে, "আ-হা-হা-অত চট কেন? অত চটলে কি চলে? এটা কলকাতা সহর। এখানে বাস করা কি যার তার কাজ। কত জন্ম জন্ম পুণ্যি করেছিলে তবে না আজ এ সহরে উঠতে পেরেছ। তুমিই কি শুধু একা নাকি? ঐ সব আশে পাশে দেখ দেখি চেয়ে, কি কষ্ট করে লোকগুলো বাস কচ্ছে এই সহরে। ওরা সব ভদ্দরলোক, খোঁজ করে দেখগে, ওরা অনেকেই তোমার আমার চাইতে ঢের ঢের বড়লোক। একবার বলে এসো দেখি?—'চলুন দেশে ফিরে যাই।' ওরা যদি পাগল বলে তোমাকে তেড়ে না মারতে আসে, তো আমার নাক কেটে দিয়ো। সব গুছিয়ে গাছিয়ে নাও। আমি অফিস থেকে ঘুরে আসি। পরে এসে সব বোলবো'খন—বায়স্কোপ, থিয়েটার, মিউজিয়ম, চিড়িয়া-খানা, মার্ব্বেল প্যালেস, গড়ের মাঠ, চৌরঙ্গী, লেক, তুমি কি যা তা জায়গা পেলে? রোববার দিন একবার তোমায় বেড়িয়ে নিয়ে আসবো যেদিন, তারপর দেখি—কেমন তুমি কলকাতা ছেড়ে দেশে যেতে চাও? এখন চল্লুম অফিসে, বুঝলে?"

মহেশ চলে গেল। কিন্তু তার শেষের কথাগুলো কুন্দকলির মনের ভেতরে এমন এক স্বপ্নাবেশ সৃষ্টি করল যে, তারই উত্তেজনায় সে এক দুপুরেই খেটেখুটে প্রায় সেই গোয়ালকে বাসস্থান বানিয়ে তবে ছাড়লো। অফিস থেকে ফিরে এসে মহেশ বল্লে,—"সাধে আর তোমার জন্যে মন কেমন করে? গৃহিণী মানেই গৃহলক্ষ্মী। বাঃ চমৎকার। দাও থলেটা দাও, বাজার নিয়ে আসি।"

তিন মাস না যেতেই শ্যালক জটাধর কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। খোঁজ খোঁজ,—থানা পুলিশ করে, মহেশ তো হেস্তনেস্ত হয়ে গেল। তারপর একদিন আসাম থেকে একটা চিঠি এসে হাজির।

জটাধর যুদ্ধের চাকরি নিয়ে মণিপুরের বর্ডারে আছে। ডিম, মাংস, আর মদের পিপের ভেতরে বসে সে মনের আনন্দে চাকরি করছে,—চাইতে না চাইতেই আমেরিকান একস্‌প্রেস,—আর ফাইভ ডবল ফাইভের সিগারেটের টীন তার হাতের পাশে এসে হাজির হয়; একটা মানুষ ফুলে নাকি এখন দুটো জটাধরে রূপান্তরিত হয়েছে। ইয়ংম্যান, আর চটপটে বলে আমেরিকান সাহেবরা তাকে বেদম ভালবাসে। সুতরাং তার জন্তে সবাইকেই সে দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করে দিয়েছে। চিঠির ভাষা শুনে মহেশের শ্বশ্রুমাতা একেবারে অন্তিমশয্যা নেবার ব্যবস্থা করে ফেললেন।

রেশনের চাল খেয়ে, বদহজম হতে হতে কুন্দকলির একদিন আমাশা ধরে গেল। তারপর turn নিল সেটা ব্যাসিলারী ডিসেন্‌ট্রীতে। মহেশের সোজা পিঠের মেরুদণ্ড হেল্‌তে হেল্‌তে একদিন দেখা গেল, সেটা দস্তুরমত ধনুকের আকার ধারণ করেছে। মানুষের বেফাঁস্ কথা কানে গেলেই আজকাল তার মাথায় রক্ত উঠতে সুরু করে।

প্রবল জ্বর আর বিকারের সঙ্গে, ঠিক—সাতদিন ধস্তাধস্তি করে, মহেশের শাশুড়ী তো চক্ষু বুজলেন,—কিন্তু বুড়ি মরেই কি কম শাস্তিটা মহেশকে দিয়ে গেল? কোথায় মানুষ, তার কোথায় খাটিয়া? আর কোথায় কাঠ আর কেবা যায় বিদেশে শ্মশানবন্ধু! বিরক্ত হয়ে শুকনো মুখে সে গিয়ে তখন বিপিনের বাড়ীতে উঠলো। বিপিন শেষ পর্য্যন্ত বন্ধুর হাতে দশটি টাকা গুঁজে দিয়ে বল্লে,—"ওর আর হাঙ্গামা করে লাভ নেই, হিন্দু সৎকার সমিতিতে একটা টেলিফোন করে লরি আনিয়ে বুড়ির শবটা তুমি তাতেই তুলে দিয়ে গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে এসো।"

অগত্যা দুপুর রাতে মহেশকে তাই করতে হ'ল। কিন্তু তাতেও কি কুন্দকলির কাতরাণি কমে? সে একেবারে মাতৃশোকে বিনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে চোখ মুখ ফুলিয়ে পাড়া মাথায় করে তুললো।

হঠাৎ একদিন দেখা গেল,—সপরিবারে কলকাতায় বাস করার শখ, আর কেরাণীগিরি চাকরির মোহ মহেশের সম্পূর্ণ ঘুচে গিয়েছে। সেদিন অফিসে বসে বসে সে হিসেব করছিল। কলকাতার পাষণ্ড জীবন বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে গত চার মাসে তার শালা যুদ্ধে গেছে, এক নম্বর। পুত্র শোকে আর জ্বরবিকারে শাশুড়ী এরি মধ্যে মরে তাকে নিষ্কৃতি দিয়েছে, দু নম্বর। আর এই সব রেশন, খাড়ীভাড়া, স্ত্রীর পোষাক প্রসাধন বজায় রাখতে মহেশের শেষ সম্বল কুন্দকলির গয়না ক'খানি জন্মের মত খোয়া গেছে, তিন নম্বর। আর চার নম্বর ধরলে এটাও বলা যায় যে, পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে মহেশের শরীর ধনুক হয়ে যাওয়া, কুন্দকলির ব্যাসিলারী ডিসেন্‌ট্রীর জন্ত ডাক্তার খরচের দেনা—আর বন্ধুবর বিপিনের কাছে একতাড়া টাকা ধার—ইত্যাদি মিলিয়ে তার মস্তিষ্কে অতি অকস্মাৎ এইটেই গজাল যে, এই সমস্ত ব্যাপারের জন্তই একমাত্র দায়ী হোলো এ দেশের নেতা মহিষার্ণবের দল। কিন্তু উপায় কি? দেশের আর সবাইকার মতই মহেশকেও বিনা অপরাধে পদে পদে মার খেতে হচ্ছে। এখন কুন্দকলি কোনও মতে বেঁচে যায় তো রক্ষে, নইলে মহেশকে বেমালুম পাগল হয়ে যেতে হবে।

অফিস ফিরতি ডাক্তারের বাড়ী ঢুকেই মহেশ আবার ভয়ানক চিন্তিত হয়ে উঠলো। তিনি বল্লেন,—চাট্টি সরু চালের ভাত আর তাজা মাছের ঝোল ওর ব্যবস্থা, মহেশকে যেমন করে হোক করতেই হবে। ওষুধ বেটে খাওয়ালে তো আর রোগী ভাল হবে না—। উপযুক্ত পথ্যও তো চাই। তার ব্যবস্থা সে কি করেছে? কালকেই যাহোক একটা কিছু ব্যবস্থা করবে বলে মহেশ তো বেরিয়ে এলো ডাক্তারের বাড়ী থেকে;—কিন্তু সরু চাল জুটবে কোথায়? রাক্ষোস ব্যাটারা কি আর রকমারী চাল দেবে মহেশের বউএর জন্তে? কিন্তু কুন্দকলিকে না বাঁচালেও যে তার কোনমতেই চলতে পারে না।

পরদিন রেশনের দোকানে ঢুকেই সরকারী কর্ম্মকর্ত্তাকে উদ্দেশ করে মহেশ বলে,—"চাল দিন মশাই, দাদখানি হোক, কাটারীভোগ হোক অথবা গোপালভোগ, সীতেশাল,—মোদ্দা সরু চাল আমার চাই-ই; কমসে কম অন্ততঃ এক সেরও দিতে হবে। কথা শুনে আশপাশের খদ্দেরের দল একেবারে বিস্ফারিত নেত্রে মহেশের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

রেশন সপের যুবক কর্ম্মচারী বলে,—"ঐ বাক্সের খোপে দেখুন চালের নমুনা সাজান রয়েছে, ওর যেটা খুসী বলুন—দিচ্ছি,—ও সব দাদখানি সীতেশাল-টাল এখানে মিলবে না, স্যার।"

—"তবে কোথায় মিলবে স্যার? বাক্সের খোপে যা চালের নমুনা রেখেচেন ও খেয়ে খেয়ে তো দেশশুদ্ধ লোকের পেটের ব্যামো ধরে গেল স্যার। ও দিয়ে তো আর রোগীর অন্নপথ্য চলতে পারে না। তার কি ব্যবস্থা করেছেন স্যার?" মুচকি হেসে কর্ম্মচারী উত্তর দেয়,—"সে কথা তো আমরা বোলতে পারবো না। আপনি বরং রেশনের হেড অফিসে খোঁজ নিন,—দেখুন, তাঁরা যদি কিছু করতে পারেন।"

মহেশ, মুখ খিঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো,—"হেড অফিসের নিকুচি করেছে। আজ মরে লক্ষণ—আর কাল ওষুধের ব্যবস্থা? ও সব চালাকী ছাড়ুন, চাল কোথায় রেখেছেন আগে বের করুন। রেশনের দোকান মানেই মুদিখানা। আমরা আজন্মকাল দেখে আসছি, সরু মোটা সব রকমের চাল মুদি দোকানেই বরাবর পাওয়া যায়। আর দামতো সে জন্ত বেশীই দোবো, আপনি চাল আমায় দিন।"

—"দেখুন এটা মুদিখানা নয়? এটা হচ্ছে গভর্ণমেণ্ট রেশন সপ। এখানে যা যা থাকবে তাই পাবেন, চোখ রাঙালে বিশেষ সুবিধে হবে না।"

—"চোখ রাঙালে সুবিধে হবে না মানে? মুরোদ যদি নেই—তোমাদের কে বলেছিল, দেশ থেকে মুদি-ব্যবসাটাকে জাহান্নামে দিতে? আর যদি তাদের হাত থেকে ব্যবসা কেড়ে নিয়ে নিজেরাই মাতব্বরি করবে তো রকমারী চালগুলো কোথায় পাচার করলে শুনি?"

—"সে আমরা বলতে পারবো না—আপনি হেড অফিসে খোঁজ করুন, এখানে অযথা বিরক্ত করবেন না।"

—"বিরক্ত করবো না মানে? উড়ে এসে জুড়ে বসে সরকারের নাম ভাঁড়িয়ে যত সব বস্তা-পচা রদ্দি চাল খাইয়ে দেশটাকে slow poison করে মারবার ব্যবস্থা করেছ—তার ওপর আবার কথা? চাল আমাকে আজ দিতেই হবে; ঘরে আমার সদ্য রোগমুক্ত রোগী, সরু চালের ভাত তাকে পথ্য না দিতে পারলে, সে নির্ঘাৎ মারা যাবে।"

—"সুজি নিয়ে যান না? ভাল সুজি আছে। রোগী আর কবে কোথায় ভাত খায় মশাই?"

কথা শুনে মহেশের পিত্তি জ্বলে গেল। দোকানস্থিত খরিদ্দারগণকে উপলক্ষ্য করে তখন সে বল্লে, "শুনছেন তো মশাই কথাগুলো আপনারা? মানে রোগী—সে হতভাগা বিছানায় বসেই একলাফে উঠে গিয়ে ট্রাম গাড়ীতে চড়বে; আর ওঁদের ঐ উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ রেশন কিনে নিয়ে গিয়ে গাণ্ডে পিণ্ডে তাই স্বচ্ছন্দে গিলে, পেটে কিল মেরে, কোদাল নিয়ে মাটি কাটতে থাকবে—শুনলেন তো? গিরগিটির মত চেয়ে আমার দিকে দেখছেন কি? এই হচ্ছে আমাদের দেশ, আর তার ভেতরে এই সব বিধানদাতা ব্যাটারা হচ্ছে গুঁইফোঁড় গুলিখোর। গাঁজায় আর এখন ওঁদের শানায় না বুঝলেন? এর পর ধরবে চণ্ডু আর চরস।"

উপস্থিত জনতার ভেতর থেকে এক ভদ্রলোক বল্লেন, "আহা, তা সে কথা এঁদের বলে আপনার কি হবে? তাই নিয়ে এজিটেশান করুন, বলুন না গিয়ে ওঁদের রেশনের হেড অফিসে? না হয় লোকজন জুটিয়ে একটা মিছিল বার করুন—"

একজন বলেন, "অমনিতেই জুটছে না, আপনি আবার চাইছেন দাদখানি চাল।"

একজন বল্লেন, "ভদ্রলোকের মাথায় একটু ছিট আছে নিশ্চয়।"

মহেশ আবার ক্ষেপে উঠলো। "মাথায় ছিট আছে আমার? না আপনাদের। আচ্ছা সত্যিই ভাবুন দেখি, কোথায় গেল সেই সব চালগুলো? সীতেশাল, ধান্যতুলসী, কাটারিভোগ—এ চালগুলো কোন্ মুদী দোকানটায় এক বছর আগেও ছিল না বলুন তো? আসুন না একবার এগিয়ে, আসুন, দেখুন দেখি, বস্তার এই চালগুলো? ও গুলো কি চাল, না চালের কুঁড়ি? যদি কুঁড়ি বলেও ধরে নেয়া হয়, তবে বলুন দেখি,

(১৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বন্দে মাতরম্

(১৬৪ পৃষ্ঠার পর)

ঘরটুকু তাদের। পাশাপাশি গ্রামের গুটি কয়েক লোকছাড়া কেউ আসতো না কখনো তাদের ঘরে। আর আসতো বিদেশী মাঝি মাল্লারা —বহুদূর থেকে নৌকো এনে নোঙর ক'রতো তাদের ঘরের বরাবর। লোকে বল্‌তো রূপসীর ঘাট—মায়ের নাম ছিল রূপসী। ঘরের দাওয়ায় বসে বসে গুলি খেত কয়েকটা লোক. কখনো কখনো শীতের দিনে খেজুর রসের তাড়ি খেয়ে তারা হল্লা ক'রতো মাঝি মাল্লাদের সঙ্গে। তাদের ঘর থেকে একটু তফাতে কখনো কখনো ভবঘুরে তেলেঙ্গি বেদেরা এসে টঙ বেঁধেছে—থেকে গিয়েছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঘরদোর বেঁধে। ছেলেমেয়ে হ'য়েছে তাদের, নামকরণ হ'য়েছে বাংলায়—বাংলা কথা ব'লতে শিখেছে তাদের ছেলে মেয়েরা। প্রতিবেশীর আত্মীয়তা একমাত্র সেই নতুন ঘরবাঁধা যাযাবরদের সঙ্গেই গড়ে উঠেছে দিনের পর দিন ধরে। গ্রামের সমাজ বন্ধনের কোনো অভাব বোধ স্পষ্ট হ'য়ে ছিল না কোনো দিন। রুক্ষতা ছিল না কোথাও। বাবাকে কখনো দেখেনি শৈল, মায়ের মুখে শুনেছে কোথায় নাকি পালিয়ে গিয়েছে কার সঙ্গে। এর বেশী অতীতের কোনো প্রশ্ন জাগেনি কোনো দিন তার মনে। মায়ের স্নেহে বড় হ'য়ে উঠেছে শৈল সেই ছোট ঘরে। তারপর অসুখ ক'রেছে মায়ের মারা গিয়েছে একদিন। গ্রামের শুধু ওই কয়েকটা গুলিখোর আর পুরাতন মাঝি মাল্লারা ছাড়া খোঁজ করেনি কেউ কোনোদিন। তবু গ্রামের একান্তে চলে গিয়েছে দিন। মায়ের সারা জীবনের উপার্জনে অর্জিত ঘরের কোলের ক্ষেতটুকুতে বর্ষার দিনে নিজে খেটেখুটে দু'একজন লোকের সাহায্যে চাষ আবাদ করেছে শৈল। আর এসেছে নতুন নতুন মাঝিমাল্লারা আর গ্রামের ছোকরা বুড়ো গুলিখোরের দল, ঝিমিয়েছে বছরের পর বছর ধরে, তাড়ি খেয়ে হল্লা করেছে শীতের দিনে। বিয়ে করতে কেউ আসেনি কোনোদিন তাকে—ঘর সংসার, ছেলেমেয়ে এসবের কোনো কথাই মনে হয়নি শৈলর কোনো দিন। কবে অজান্তে রূপসীর ঘাট শৈলির ঘাটে নামান্তরিত হয়ে গিয়েছে মুখে মুখে -তার মায়ের পরিত্যক্ত জীবনের ধারাকে অজান্তে স্বাভাবিক ভাবে তুলে নিয়েছে সে। তারপর হঠাৎ একদিন এলো বিপ্লব—নারী জীবনের প্রচণ্ড বিপ্লব শৈলর জীবনে।

বেদেদের বৌ মালতী—কচি ছেলেটাকে পিঠে বেঁধে আসতো নির্জন দুপুরে গল্পগুজব ক'রতে। সে এসে খুলে দিয়ে গেল শৈলর অজানা রুদ্ধ দুয়ার একটা। ভয় লাগে শৈলর—আসন্ন মৃত্যুর সহস্র আশঙ্কা পেয়ে বসে যেন তাকে।

মালতী আশ্বাস দিয়ে বলে, ও কিছু নয়—পেরথম পোয়াতীর অমন ভয় হয়। এখনো তোমার ছ'টি মাস বাকী। তবে একটু সাবধানে থেকো।

তবু ভয় হয়—নিশ্চয়ই মরে যাবে সে এবারে। ভীতার্ত্ত হ'য়ে বলে, তুই রোজ আসিস্ মালতী—আমার আর কে আছে বল্?…

মালতী হাসে—বলে, রোজই তো আসি। কই তুমি তো বলো নি এতদিন।

কি ব'লবে সে। তার অজ্ঞাতে তারই মধ্যে আর একটা জীবনের সূত্রপাত হ'য়েছে কবে—সমাজ শাসন বিচ্ছিন্ন মন তার কোনো খবরই জানতো না।

এ এক অজানা অচেনা জীবনের সুরুতে তার গতানুগতিক জীবনধারা বিপুল আলোড়নে বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে। দিনের পর দিন তার বর্দ্ধিত ভ্রূণের সঙ্গে সঙ্গে এক অনাগত জীবনকে ভয়ে আনন্দে আর শঙ্কায় লালন ক'রে চলে সে। ভয় করে তার সবল ওই মাঝি মাল্লাগুলোকে—গ্রামের গুলিখোর ছোকরাগুলোকে। ঘর ছেড়ে ভয়ে পালায় সে মালতীর কাছে আর দূর থেকে সভয়ে শোনে সে তাদের উন্মত্ত চীৎকার। দু'টি লোক শুধু ঝিমোয় এক কোণে বসে গুলি খেয়ে—বুড়ো হ'য়ে এসেছে তারা।

ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে মালতী, ঘেয়োনি এখন ওদের কাছে।

মালতীর কথা মনে পড়ে শৈলর—নিকষ কালো সেই সুন্দর বেঁটে মেয়েটি—একটি না একটি ছেলে তার পিঠে বাঁধা আছে সারা বছর। ভিক্ষে ক'রে আনে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে—স্বামী যায় তার সঙ্গে ভোজবাজীর ঝোলাটা কাঁধে ক'রে। ক'টি ছেলে মালতী?…একটি—দু'টি—তিনটি, মনে মনে গোণে শৈল—সবগুলিই ছেলে। তার যদি একটি ছেলে হয়!…দীর্ঘদিন সে লালন ক'রে এসেছে একটি চিন্তাকে—হে ভগবান, তারও যেন একটি ছেলে হয়। ঘরের সুমুখের ছোট ক্ষেতটুকুতে কাজ ক'রবে সে মায়ের সঙ্গে—যেমন ক'রে সে ক'রেছে তার মায়ের সঙ্গে, গোরু চরিয়েছে, ছাগল চরিয়েছে—হাঁস ভাসিয়েছে জলে ছোট বেলায়। মায়ের দিনের সেই ঘর—সেই নিস্তরঙ্গ সুদূর প্রশান্ত জীবনে নিজের শৈশবে দেখে সে তার অনাগত সন্তানের জীবনকে।

তারপর আর একটি মুখ ভেসে ওঠে। তার ছেলের মুখ আর সেই মুখটি এক হ'য়ে যায়। না, ছেলে তার সেই অসভ্য মাঝি-মাল্লাদের নয়, গ্রামের শীর্ণকায় গুলিখোর ছোকরাগুলোরও নয়. সে একটি ভদ্র লোকের ছেলে, একটি প্রচণ্ড প্রভাবশালী লোকের ঔরসজাত সন্তান সে সুন্দর—সে স্বাস্থ্যবান তার বিশ বছরের অগণিত চেনা-অচেনা মুখের ভিড়ের মাঝখানে একটি মুখই শুধু স্পষ্ট আর সুন্দর বহুদিনের ভাবা, বহু-দিনের মনে রাখা একটি মুখ। তাকে সে বিপদের দিনে জুগিয়েছে আহার, লুকিয়ে রেখেছে তার ঘরের ভেতরে। তার সেই ঘরেই একটি শিশু বড় হ'য়ে উঠবে একদিন।—যেখানে সে তার মায়ের মতো পা ছড়িয়ে ব'সবে দাওয়ায় আর গল্প ক'রবে তারার—চাঁদের। তার সেই শৈশবের ঘর—তার মায়ের ঘর, সেই ছায়া শীতল প্রাঙ্গণ, ক্যানেলে ধানবোঝাই নৌকোর ভিড়, প্রতিবেশিনী মালতী, ধানে ভরা মাঠের পর মাঠ—।

আর সেই গ্রামের আকাশ।…

ভোর হ'য়ে আসে, দূরের জেলখানা থেকে ভেসে আসে সেই বিষণ্ণ গুঞ্জরিত গান:

বন্দে…মাতরম।…

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং…

গ্রামের সেই পথ ঘাট-মাঠ আর আকাশ, একটি ঘর একটি প্রশান্ত জীবন, ছোট্ট একটি শিশু আর তার দূর শৈশবের সেই মা হু হু ক'রে ওঠে শৈলর মনে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে শৈল বিনোদিনীর ঘরের দাওয়ায়।

নিরুদ্দেশ

(১৫৬ পৃষ্ঠার পর)

ফটোগ্রাফারকে বলিল—"আপনি ব্যস্ত রয়েছেন?—তা হোক—হোক—সেরে নিন। …আমার নাতনীটির একটি ফটো নিতে হবে; আমি আবার এসব তেমন বুঝি না—তাই গোলোকদাদাকে ডেকে পাঠিয়েছি—বিচক্ষণ মানুষ। এই পড়লেন বলে এসে। উটি কে?—গোলোকদাদার ভাগ নে না?—আমার আবার চোখের যা অবস্থা হয়েছে… কৈ রে পুঁটু, নেমে আয় গাড়ি থেকে, অমন করে মুখ ঘুরিয়ে বসে রইলি যে?"

ওদিকে ফটোগ্রাফার গণেশকে বলি-তেছে—"নিন, এবার ফোকাস দিচ্ছি; হাসির ভাবটা টেনে রাখুন—হাসির—হাসির—এইমাত্র যেমন ছিল—হচ্ছে না মোটেই—খুব একটা হাসির কথা মনে করবার চেষ্টা করুন দিকিন।…"

কথা-মন্ত্রী

(১৬০ পৃষ্ঠার পর)

তোমরা আর্য্য সতী-নারী, সুতরাং পতির জীবন-রক্ষার জন্য আত্মত্যাগ করিতে পরাঙ্মুখ হইবে না। পলায়নের পূর্ব্বে আমি আমার অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় তোমাদেরও পুড়াইয়া দিয়া যাইব।—কি সংবাদ প্রতিহারী? তুমি একা ফিরিয়া আসিলে কেন? কোথায় সেই অপ্রাকৃতভাষী গয়াবল্লভ? এই দণ্ডে তাহাকে আমার চাই। কথা-মন্ত্রীর কথাটা আমি ঘুচাইতেছি। তাহাকে কি রাজ আজ্ঞা জ্ঞাপন কর নাই?' রাজা ক্রোধে দন্ত কিড়মিড় করিতে লাগিলেন।

প্রতিহারী দণ্ডবৎ হইয়া কহিল, 'করিয়াছি, প্রভু। কিন্তু তিনি বলিলেন, তাঁহার আসিতে কিছু বিলম্ব হইবে। রাজ্য ত্যাগের পূর্ব্বে মহারাজ প্রজাদের যে আশ্বাস-বাণী দিয়া যাইবেন, তিনি বর্ত্তমানে তাহা প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত আছেন।'

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

একটা বিশ্রী হৃদয়হীন জগতে আমরা বাস করছি। এই যন্ত্রযুগে বিজ্ঞানের দিক দিয়ে আমরা অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছি সত্য, কিন্তু হৃদয়ের দিক দিয়ে? জগৎ-জোড়া হানাহানির মধ্যে অনুদারতারই জয়জয়কার। আকাশ থেকে বোমা প'ড়ে শিশু মরছে, নারী মরছে হাজারে হাজারে। যুদ্ধের লোমহর্ষণ কাহিনী পড়ে এবং ছবি দেখে আমাদের মন আর বিচলিত হয় না। সুতরাং প্রগতির পথে জগৎ এগিয়ে চলেছে এমন কথা বলা যায় না। মানুষ যদি মানুষকে ভালোবাসতেই না শিখলো, তবে কেমন ক'রে বলতে পারি মানুষ আগের চেয়ে উন্নত হয়েছে?

দিগন্তব্যাপী একটা বর্ব্বরতার মধ্যে আমাদের জীবন কাটছে। হিংসার এই উন্মত্ত অভিযানকে ঠেকানো যায় কেমন ক'রে? কেমন ক'রে এই কদর্য্য সমাজকে রূপান্তরিত করা যাবে সেই আদর্শ সমাজে, যার ভিত্তি স্বাধীনতা এবং ন্যায়? একদিকে ক্ষমতাপ্রিয় হৃদয়হীন কতকগুলি ডিক্‌টেটর এবং অপর দিকে হাজার হাজার বিষয়াসক্ত ম্যাদাটে কাপুরুষ—এদের মধ্যে কেমন ক'রে আনা যাবে সেই পরিবর্ত্তন যার ফলে তারা নাম চাইবে না, খ্যাতি চাইবে না, অর্থের ক্রীতদাস হবে না? কারণ সমাজকে উপরের দিকে ওঠাতে হ'লে চাই নতুন ধরণের নরনারী, যাদের অল্‌ডাস্ হাক্সলি (Aldous Huxley) বলেছেন 'অনাসক্ত' (non-attached) এবং গীতা বলেছে স্থিতপ্রজ্ঞ।

এই সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন অল্‌ডাস্ হাক্সলি তাঁর Ends and Means বই-খানিতে। বইখানির মধ্যে ভাববার কথা অনেক আছে। হাক্সলির কথা হচ্ছে, জীবন অখণ্ড; রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, ধর্ম—এদের একটার সঙ্গে একটার যোগ ঘনিষ্ঠ; শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে অথবা শুধু অর্থনীতির ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারলে আমরা সমাজকে বদলাতে পারবো—এমন কথা হাক্সলি মনে করেন না। শাসনযন্ত্র বদলাতে না পারলে অর্থ-নৈতিক পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়। শিক্ষার দ্বারা নরনারীর মনে রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটাবার ইচ্ছাকে যতদিন উদ্‌বুদ্ধ করতে না পারছি, ততদিন শাসনযন্ত্রের পরিবর্ত্তনেরই বা আশা কোথায়? কিন্তু যে শিক্ষার দ্বারা মানুষের মনে রাষ্ট্রবিপ্লব সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা ... আর ব্যবস্থা ক'রে দেবে আধুনিক গবর্ণমেণ্টগুলি—এরকম আশা করা মূঢ়তা। অতএব হাক্সলির মতে বর্ত্তমান সমাজকে রূপান্তরিত করতে হ'লে, পৃথিবীতে নতুন ধরণের মানুষ আনতে গেলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন ঘটানো চাই। ছেলেমেয়েকে যত ভালোই শিক্ষা দিই না কেন—শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় ইস্কুলের শিক্ষা জীবনে আশানুরূপ ফসল ফলাতে পারে না—তারা সমাজের আবেষ্টনীর চাপে শেষ পর্য্যন্ত আর দশজনের মতো হ'য়ে যায়। সমাজের নিরানব্বুই জন লোক যেখানে টাকা জমিয়ে, মোটর কিনে, জজ সাহেবের নাতনী বিয়ে ক'রে, হালফ্যাশানের বাড়ী তুলে দশের একজন হওয়াটাকে পরম পুরুষার্থ বলে মনে করে এবং তার জন্য ভীড়ের মধ্যে ক্রমাগত ঠেলাঠেলি করতে করতে চলেছে, সেখানে মানুষের স্কুল-কলেজের শিক্ষা যতই ভালো হোক, শেষ পর্য্যন্ত সে নিজেকে দশের মনের মতো ক'রে গড়ে তুলবার দিকে দৃষ্টি দেয় এবং অনাসক্তির আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়। যে সমাজের মধ্যে প্রতিদিন চলতে হয় তার প্রভাবকে ছাড়িয়ে ওঠা মুস্কিল। শেষ পর্য্যন্ত দশের সঙ্গে নিজেকে খাপ না খাইয়ে কোন উপায় থাকে না। অতএব শিক্ষা শিক্ষা করে যারা পাগল, তাঁদের জানা উচিত শিক্ষার সমস্যাই একমাত্র সমস্যা নয়।

অনেকে আছেন যাঁরা খুব ভালো মানুষ। গীতার 'ক্লাশ' করেন, নৈশবিদ্যা-লয়ে ছেলে পড়ান, কামিনীকাঞ্চনে অনাসক্ত, কাগজে প্রবন্ধ লেখেন; কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে কোন কারবার করেন না; বলেন, মানুষ তৈরী হলে দেশ আপনি উন্নত হবে, রাজনৈতিক বিপ্লবের কোন দরকার নেই। এরা সাধু মানুষ, সরল মানুষ; কিন্তু একটু বোকাটে ধরণের। দৃষ্টি তাই ঝাপসা; সদিচ্ছা খুব ভালো, ঈশ্বরকে ভক্তি করা, লোকশিক্ষায় সময় দেওয়া, বিষয়ে আসক্ত না হওয়া প্রশংসনীয়; কিন্তু সমাজকে রূপান্তরিত করতে হলে লোকহিতৈষণা এবং কামিনীকাঞ্চনে অনাসক্তি যথেষ্ট নয়। সাধুদের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও জগৎ আজও নরকের সামিল হয়ে আছে। তার কারণ, ভালো মানুষ যারা, তারা প্রায়ই গোবেচারা হয়ে থাকে, বুদ্ধিশুদ্ধি তাদের অনেক সময়ে কম হয়, জগৎ সংসারের খোঁজ খবর প্রায়ই রাখে না। পক্ষান্তরে যাদের বুদ্ধি বেশ ধারালো, তারা অনেক সময়ে সকলের যাতে ভালো হয় সে দিকে মন দেয় না। দশজনকে যারা চালাবার মতো বুদ্ধি রাখে, তারা সময়ে সময়ে ক্ষমতাপ্রিয় হয়ে ওঠে। সমাজের রূপান্তর ঘটানো কেবল ভালো-মানুষীর কাজ নয়, কেবল বুদ্ধিরও কাজ নয়। এমন লোক চাই, যারা হৃদয়বান হবে এবং বুদ্ধিমানও হবে।

ঠাকুর বলতেন, খালিপেটে ধর্ম্ম হয় না। হাক্সলির কণ্ঠে ঠাকুরেরই প্রতিধ্বনি। হাক্সলি বলছেন, টাকা খুব বেশী থাকাও যেমন দুর্ভাগ্যের কথা, টাকা খুব কম থাকাও তেমনি দুর্ভাগ্যের কথা। টাকা খুব বেশী থাকলে মানুষ নিজের আসল সত্তাকে ভুলে যায়, টাকা শেষ পর্য্যন্ত তার ধ্যান জ্ঞান হয়ে ওঠে, তার চেতনায় সর্ব্বক্ষণের জন্য থাকে শুধু সোনার তাল। মানুষের চেতনার ক্ষেত্র টাকাতে সীমাবদ্ধ হওয়া মানে তার জীবনটাকে ক্ষুদ্র করে ফেলা। যে মানুষের পেটে নেই ভাত, কাল কি খাবো এই দুশ্চিন্তা যার মনের মধ্যে, সে ব্যক্তিও কখনো অনাসক্ত হতে পারে না। খাওয়ার চিন্তায় তার মন ভরা থাকে। তার চিত্ত উর্দ্ধে পাখা মেলে উড়বে কেমন করে? হাক্সলির মতে সব মানুষের আয় সমান হওয়া সম্ভব নয়, সমীচীনও নয়। কিন্তু আয়ের সমতার দিকে সকলের দৃষ্টি থাকা উচিত। ক্যাপিটালিষ্ট সমাজে লাভবান হওয়াটাই বড়ো কথা। সোস্যালিষ্ট সমাজের তোরণদ্বারে লেখা থাকবে সমষ্টির কল্যাণ। সমষ্টির কল্যাণ কখনো সম্ভব নয়, যতক্ষণ অর্থপাগল মুষ্টিমেয় লোকের হাতে বড়ো বড়ো শিল্পগুলির পরিচালনার ভার থাকবে। হাক্সলি শিল্প সংগঠনের ব্যাপারে বিকেন্দ্রীকরণের (decentralisation) পক্ষপাতী। অধিকাংশ কল-কারখানা এখন যেভাবে চলছে, তার দ্বারা শ্রমিকরা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হ'য়ে আছে। শ্রমিকেরা এখন শুধু ওভারসীয়ারদের হুকুম তামিল ক'রে যায়। তারা উদ্ধতন কর্ম্মচারীদের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। এই কর্ম্মচারীদিগকে তারা নির্ব্বাচিত করে না, কর্ম্মচারীরা উপর থেকে মনোনীত হয়ে আসে। শ্রমিকেরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রজা হ'তে পারে—কিন্তু সে নামে মাত্র; আসলে তাদের কর্ম্মজীবন অতিবাহিত হয় ফ্যাক্টরীতে ওভারসীয়ারদের বুড়ো আঙ্গুলের তলায়। হাক্সলির পরিকল্পিত কারখানায় শ্রমিকেরা এক এক দলে বিভক্ত থাকবে—ত্রিশজন নিয়ে এক একটি দল। দলের সঙ্গে দলের অবশ্যই সহযোগিতা থাকবে। প্রত্যেক দল তার নিজের প্রতিনিধি এবং দলপতি-দিগকে নির্ব্বাচিত করবে। কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের চরম কর্ত্তৃত্ব যার হাতেই থাকুক, মানুষ যেখানে জানে তার দলপতিকে সে নিজেই নির্ব্বাচিত করেছে, সে এবং তার দলের লোকেরা কত ক'রে নেবে তা স্থির করতে সে সহায়তা করেছে, সেখানে সে কলের একজন শ্রমিকমাত্র নয়, সে সেখানে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের একজন স্বাধীন দায়িত্বশীল প্রজা। এইজন্য হাক্সলির কাছে collective ownership of the means of production কথাটা মূল্যবান হলেও তাকে সবটুকু মূল্য তিনি দিতে নারাজ। শিল্প প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের সম্পত্তি হ'লেও সেই প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার যদি না থাকে, তবে তা নিয়ে তার উৎফুল্ল হবার কোন কারণ নেই। বিকেন্দ্রীকরণ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ—এই দুটো কথাকে হাক্সলি খুব মূল্য দিয়েছেন।

হাক্সলির মতে নতুনতর মানব-সমাজকে রচনা করতে হ'লে হিংসাত্মক পথে তা সম্ভব নয়। তাঁর মতে The end cannot

(২২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুনর্মূষিক

যতীন্দ্র মোহন বাগচী

কলেজের পড়া ছাড়িতেই হ'ল দুর্ভাগ্যের দোষে ;
বয়স তখন বাইশ, কেন না, বয়স ছিল না বসে'।
জগতে আমার মনের মতন কিছুই মিলে না চোখে,
ভাল যাহা-কিছু, বাস তার শুধু সুদূর কল্পলোকে !

স্বাস্থ্য বল বা অবস্থা বল, আমি নই তার দায়ী,
বিয়ের বয়স এসে চলে' যায়, যেহেতু ক্ষণস্থায়ী !
ধনবল বল, জনবল বল, অদৃষ্ট চাই পিছে ;
বিধবা-মায়ের এক ছেলে আমি, কা'রে দোষ দিব মিছে ?

গ্রাম্য বিবাহে মোটে রুচি নাই, সে যেন বিস্তি খেলা,—
মেয়ে পছন্দ, মায়ের কান্না—সব করি' তাই হেলা
সহরে চলেছি উঁচু আশা নিয়ে—কত-কিছু ভাবি মনে,
ধরা দিতে হয়, সেইখানে দিব, প্রণয়ের বন্ধনে।

মনটা আমার 'রোমান্স'-ভরা—মনের গড়নই তাই,
কত অপরূপ 'নভেল' পড়েছি তা ছাড়া যে সীমা নাই ;
ভয়-ভয় করে,—সাহসটা কম,—'রোম্যান্স'-এ যাহা লাগে ;
কল্পনা-জাল বুনি' মনে-মনে, তাই ভারী ভাল লাগে !

যাত্রার দিন রেলে যেতে-যেতে কুড়ায়ে পেলাম রাতে
একটি রুমাল ভাগ্যে আমার, নির্জ্জন কামরাতে !
গোটা চার-পাঁচ ষ্টেশন ছাড়িয়ে,—আসিল না যবে কেহ,
মালিকের খোঁজ নাই ভেবে চুকে গেল সব সন্দেহ।

—ধবধবে সাদা সদ্য আজই কে করিয়াছে ব্যবহার,
অতি মৃদু কোন্ পুষ্প-সুরভি অঙ্গে মাখানো তার !
দোলন চাঁপার পাঁপড়ির মতো পরশটি সুকোমল,
রাঙা সূতো দিয়ে "ক"-আখর লেখা, কোণে করে জ্বল্‌জ্বল্!

—নিশ্চয় নারী !—বোঝা যায় সোজা গন্ধের ব্যবহারে,
'ক'-এ কত নাম,—কমল কিম্বা কুন্দ হ'তেও পারে !
কল্পনা-পথে কত-না চিন্তা চপল পাখায় তার
ভ্রমরের মতো উড়ে-উড়ে বসে' নানা ফুলে বারবার !

যেমন হয়েছে রেল-কোম্পানী, সবই তার তাড়াতাড়ি,
ভুল হয়ে যায় উঠার সময় মেয়ে-পুরুষের গাড়ী !
এই কামরাতে প্রথমে মেয়েটি উঠেছিল মনে হয় ;
গাড়ী-বদলের তাড়াতেই এটা ফেলে গেছে নিশ্চয়।

—কত সুন্দরী হবে সে না জানি, এত ভাল লেখা যার !
কে বলিতে পারে—বিয়ে হয়েছে, কি আজও হয়নিক তার !
খুঁজিতে দোষ কি ? কিন্তু সে যদি নেমে গিয়ে থাকে পথে ?
ছিটে-গুলি যেন লাগিল আসিয়া উড়ন্ত মনোরথে !

—না, না, তা যায়নি, নিশ্চয় জানি। টাল-খাওয়া মনটাকে
সামালি লইনু,—কলিকাতাতেই লোক যায় ঝাঁকে-ঝাঁকে !
আর কোথা যাবে ? মস্ত সহর,—দেখিবার মতো ঠাঁই,
সেখানে না গিয়ে পথে নেমে যাবে ! কোনও কারণই তো নাই।

কিন্তু কি করে' সন্ধান করি ? দেখা যাক র'য়ে-সয়ে ;
ডিটেক্টিভেরা কি করে' করে তা', পড়েছি তো কত বই-এ !
কোন্ দোকানের রুমাল প্রথমে করিব অন্বেষণ,
'ক'-লেখা রুমাল কা'র বলি দিব কাগজে বিজ্ঞাপন !

—এই তো আমার মনের মতন,—এমনই তো হওয়া চাই,
'ক'-এর সূত্রে বাঁধা দিনু এই আস্ত জীবনটাই,
রুমালটি ভাঁজি' বুকের পকেটে রাখিলাম সযতনে,
মর্শ্মের মাঝে পরশ যেন-না হারাই ক্ষণে-ক্ষণে !

কমলকলির মালা গেঁথে-গেঁথে ভরে' তুলি ঘরদ্বার,
কেতকী কেশর বিছায়ে বিছানা পরশি বারম্বার,
কুন্দ-কুঁড়ির কান্তি নেহারি মনের নয়ন ভরি',
কামিনী কুসুম সাবধানে ধরি, পাছে যায় ভুঁয়ে ঝরি' !

এহেন সময় গাড়ীর মধ্যে সহসা পশিল 'ক্রু',—
নিমেষে নিবায় সন্ধানী আলো—প্রদীপে যেন-বা ফু !
চমকিয়া উঠি' শুধাইনু তারে—'হঠাৎ এ শেষ রাতে' ?
—"উত্তর এল,—সামান্য কথা ছিল ম'শায়ের সাথে !"

একঝাড় দাড়ি-গোঁফের মধ্যে চমকিল দাঁতগুলি—
বিজলীর আলো কে-যেন দেখাল বন্ধ জানালা খুলি' !
গেল, গেল বলি' মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল ভয়,
বুঝিনু চকিতে, সঞ্চিত ধন, সব বুঝি শেষ হয় !

মৃদু হেসে ফিরে' কহিলেন ধীরে,—"দেখুন, খানিক আগে,
ঐ বেঞ্চিতে রুমাল একটা,—বলিতে লজ্জা লাগে—
ভুলে ফেলে গেছি—তুচ্ছ জিনিষ,—উপহার কিনা ! তাই,
খুঁজিতে এসেছি ; চিহ্ন রয়েছে,—দেখি, যদি ফিরে' পাই !

"কিসের চিহ্ন ?" শুধাইনু, যেন তাহা এ জুয়াচুরি,
ধরিয়া ফেলেছি,—এমনই জেরার চূড়ান্ত বাহাদুরি।
—"পেয়েছেন বুঝি ? 'ক'-এর হরফ,—কতলু খাঁ মোর নাম !"
চোরাই মালটা ফিরায়ে সভয়ে নির্ব্বাক্ রহিলাম।

ভ্যাবাচ্যাকা-ভাব দেখিয়া আমার কহিলেন তিনি হেসে,
আপনারই কাছে আছে বুঝেছিনু প্রথম এখানে এসে,
জানেন আমার অধিকার বলে সার্চ্চ-এর নাহি বাধা,
যাহোক্ যখন মিটে গেল সব—গুড্ মর্ণিং দাদা !

কোথায় কমল, কোথায় কতলু ? স্বর্গ হইল মাটি !
প্রাণের গুপ্ত সেরা ধন যেন চোরে নিল সিঁধ কাটি !
ধাক্কা কাটায়ে ভাবিলাম মনে,—তখনও ঘুরিছে মাথা !—
গোড়াতেই যদি এহেন বিপদ,—দূত্তোর কল্‌কাতা।

কতলু যে আজ কোতল করেনি, এই বরাতের জোর,
পুলিশেও দিতে পারিত তখনই সাজায়ে রুমাল-চোর !
ফাঁড়া কেটে বড় বেঁচে গেছি বাবা,—দু'টাকা সেলামী দিয়ে
বাড়ীর টিকিট কাটিলাম ফিরে'—মারই কথা রাখি গিয়ে।

যে অদৃশ্যে অনিত্যের কল্পনায় ধ্যানে
সূর্য্যের বিকাশ, সেই সত্যে জাগরণে
জীবনের রূপান্তর ; আদিম সঙ্কল্প প্রাণনের
চেতনায় সঞ্জীবিত ; সেও অভিলাষী অমৃতের
কল্প কল্পান্তের অণু-পরমাণু অঙ্কে যার স্থিতি।

হে অজেয় যাত্রারথি,
মনে পড়ে বিস্মৃত লিখন !
সৃষ্টির মাহেন্দ্রক্ষণে যে নব সত্তার জাগরণ,—
—পরিচয় শঙ্কাহীন, রূপে রসে ছন্দে বিচিত্রিত
মুহূর্ত মিলায়, যবে মনোবন হয়েছে নন্দিত,—
হৃদয়ের সূক্ষ্ম সংবেদনে তার ঝঙ্কারিলো, নাম—প্রিয় নাম,
অমৃতের জ্যোতি নিকেতনে সেও পাঠায়েছে প্রথম প্রণাম ॥

বাঁকা তলোয়ার

(১৫২ পৃষ্ঠার পর)

অনুপম হাসিল, "অত লজ্জা কেন? ভেতরে আয় না"—বলিয়াই খপ করিয়া পার্ব্বতীর একটি হাত ধরিয়া টান দিল।

"ছিঃ"—পার্ব্বতী অবরুদ্ধ কণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া ছুটিয়া পালাইল। বাহিরে গিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সে বসিয়া পড়িল। ভগবান!

মাণিক তখনও ফেরে নাই, কাজের চেষ্টায় কোথায় যেন গিয়াছে। পার্ব্বতী খাবার লইয়া বসিয়া থাকে।

অনেকক্ষণ পরে মাণিক ফিরিল। চেহারা পাগলের মত।

"আজ খাবে না নাকি?"—পার্ব্বতী প্রশ্ন করিল।

"খাব কোত্থেকে? তোর কি, তুইত মেমস্তুর খাচ্ছিস—আমি শালা কি আর—"

পার্ব্বতী চীৎকার করিয়া উঠিল, "এই কথা বলতে পারছ তুমি—আমি মাথা খুড়ে মরব তবে"—বলিয়াই সে দুঃখে মেঝেতে মাথা ঠুকিতে লাগিল।

"হা-হা-কি করছিস—তোর পায়ে পড়ছি, আমি ঠাট্টা করছিলামরে"—সাতঙ্কে মাণিক পার্ব্বতীকে জড়াইয়া ধরিল।

মেয়েটা ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল, আর্ত্তকণ্ঠে।

অনুপমের গলা শোনা গেল "এই ব্যাটা জন্ত মেয়ের কান্না থামা।"

মাণিকের মেজাজ গরম হইয়া উঠিয়াছে, "বাচ্চা মেয়ে, কাঁদছে ত' কি করব? মেরে ফেলব নাকি?"

অনুপম ছুটিয়া আসিল, "রাস্কেল, মুখের ওপর কথা বলছিস্!" বলিয়াই ঠাস করিয়া মাণিকের গালে এক চড় কষাইয়া দিল।

মাণিকের চোখ দুইটি একবার দপ করিয়া জ্বলিয়াই নিভিয়া গেল। সে নিষ্ফল আক্রোশে কাঁপিতে লাগিল। অনুপম চলিয়া গেল।

পার্ব্বতী মেয়েকে স্তন্যপান করাইয়া ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করে।

খানিক পরে সে বলিল, "নাও খেয়ে নাও।"

মাণিক নড়িল না।

রাত্রে কাজের এক ফাঁকে পার্ব্বতী মেয়েকে ঘরে ঘুম পাড়াইতেছিল। হঠাৎ পিছন হইতে কে যেন তাহার দেহের উপর হাত রাখিল।

"কে?" পার্ব্বতী চমকিয়া উঠিল।

"আমি, চুপ।"

অনুপম!

"পালান শিগগীর পালান, নইলে চেঁচাব আমি।"

এমন সময়ে দ্বারপ্রান্তে মাণিককে দেখা গেল।

দুর্ব্বল স্বামীর চক্ষু আহত শ্বাপদের চক্ষুর মত জ্বলিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে সে হিংস্র পশুর মত অনুপমের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

কিন্তু বেশীক্ষণ যুদ্ধ চলে না। প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া মাণিক একপাশে পড়িয়া গোঙাইতে লাগিল।

পার্ব্বতীর চীৎকারে বাড়ীর মেয়েরা ছুটিয়া আসিল। পুরুষেরা আর কেউ ছিল না।

"কি-কি হয়েছে রে অনু?"—হেমাঙ্গিনী ক্রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন।

পকেট হইতে মণিব্যাগটি তুলিয়া ধরিয়া অনুপম—"এইটে এই ব্যাটা চুরি করেছিল।"

"মিথ্যাবাদী—তুমি আমার বৌয়ের গায়ে হাত দিয়ে কি বলছিলে তুমি—এ্যা? তুমি না ভদ্দরলোক।" মাণিক হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল।

"চোপরও—চোপ, ইষ্টুপিড, চোর কোথাকার—আবার আমার ভাইকে দোষ দিচ্ছে। বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে—বেরো—চোর-ছাঁচোর আমি রাখব না আমার বাড়ীতে, বেরো—" হেমাঙ্গিনী একেবারে ফাটিয়া পড়িলেন।

"মা"—পার্ব্বতীর চোখে জলের ধারা। কি যেন সে বলিতে চাহিল।

"মা-নিকালো—চুরি করবি আবার আমার ভাইয়ের বদনাম করবি—নিকালো হারামজাদী, গেট আউট।"

পার্ব্বতী একবার সকলের মুখের দিকে চাহিল। নিষ্করুণ হিংসায় সকলের মুখ কঠিন ও কুৎসিত হইয়া উঠিয়াছে।

মেয়েকে কোলে তুলিয়া, স্বামীর হাত ধরিয়া সে বলিল—"চল—ওঠ।"

তাহারা বাহির হইয়া গেল।

অনুপমের মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা।

রাজপথ। পাথরের প্রাণ নাই।

"দয়া করুন বাবু—বাবু গো।"

দয়া কি জিনিষ? কেহ জানে না।

মেয়েটা কাঁদে।

মাণিক ক্ষীণকণ্ঠে বলে, "মাই খাওয়া না শুনছিস?"

"দুধ কি ত কান নেই নাকি আমার—খা রাক্ষুসী।"

বুকে দুধ নাই তবু মেয়েটা লেহন করে। পশুশাবকের মত ধারালো, খসখসে ওর জিহ্বা।

পথ। গলি। পথ। ভিক্ষা। শূন্য জঠর। এক ইতিহাস। ইতিহাস বদলায় না।

চাকুরীর চেষ্টাও মাঝে হয়। কেউ চায় না।

মাঝে মাঝে ডাষ্টবিন দেখা যায়। তাহাতেও কিছু নাই।

ক্ষুধার্ত্তের মিছিল রাজপথে। সারি বাঁধিয়া প্রেতেরা গান গায়—অন্নং দেহি।

"আর পারি না"—পার্কের ধারে বসিয়া পড়িয়া মাণিক জোরে জোরে শ্বাস টানে।

"বাবুমশায়—দয়া করুন গো—এক মুঠো খেতে দিন গো।"

নাই, নাই। দেশে অন্ন নাই।

মাঝে মাঝে দুই একজন একটু দাঁড়াইয়া চোখের জ্যোতিকে প্রখর করিয়া পার্ব্বতীর সারাদেহ লেহন করে।

দিন কাটে। দিনের পর দিন কাটে।

মাণিক মরিতে চলিয়াছে। ওর আর ক্ষমতা নাই।

"চারটি ভাত খাওয়াবি পার্ব্বতী ও পার্ব্বতী।"—

পার্ব্বতী কটমট করিয়া তাহার দিকে তাকাইল, ক্ষণকাল কি যেন ভাবিল পরে বলিল, "হ্যাঁ খাওয়াব।"

"খাওয়া, আমি যে মরে যাচ্ছি পার্ব্বতী ও পার্ব্বতী"—মাণিক হাঁপায়।

"চুপ করে থাক কতক্ষণ, মেয়েটাকে দেখো, আমি খাবার নিয়ে আসছি, কেমন?"

"আচ্ছা"

প্রেতের মত লিকলিকে হাত দুইটি বাড়াইয়া অতি কষ্টে মেয়েটাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া মাণিক ঝিমায়। আসন্ন মৃত্যুর সুবিপুল অন্ধকারের ছায়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। প্রতি নিঃশ্বাসে তাহার সারা দেহ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে।

মেয়েটা কাঁদে। মা ছাড়া সে থাকিতে চায় না।

পার্ব্বতী সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

অনুপম চমকিয়া উঠিল।

জানালার ধারে কে যেন ডাকিতেছে—"বাবু—বাবু।"

"কে?"

"আমি—পার্ব্বতী।"

"পার্ব্বতী! কি চাস?"—অনুপম হাসিল।

"দরজা খোল, যা চাও তুমি তাই পাবে।"—দাঁতে দাঁত চাপিয়া পার্ব্বতী বলিল।

এদিক ওদিক চাহিয়া অনুপম বারান্দার দিকের দরজা খুলিল। পার্ব্বতী ভিতরে ঢুকিল। তাহার হাত ধরিয়া মৃদুকণ্ঠে অনুপম বলিল, "বড় রোগা হয়ে গেছিস্ তো!"

পার্ব্বতী ম্লান হাসিল, "কেন, পছন্দ হচ্ছে না?"

"না—না, তা নয় না:"—অনুপমের ললাটে স্বেদবিন্দু চকচক করে।

অন্ধকার।

টলিতে টলিতে পার্ব্বতী ফিরিয়া আসিল। আঁচলে কাগজের ঠোঙায় কিছু ভাত ও তরকারী।

"ওগো"—মাণিককে সে ঠেলা দিল।

মাণিক জবাব দেয় না।

"ওগো—এই—ও টুনুর বাপ।"

মাণিক মরিয়াছে।

পার্ব্বতীর হাত হইতে ভাতের ঠোঙা পড়িয়া গেল।

সে চারিদিকে চাহিল। মেয়েটা কই?

"টুনু—টুনু—ও মা।"

কোনও জবাব নাই।

পাগলের মত পার্ব্বতী পার্কের ভিতরে খুঁজিয়া আসিল, পথেতে খুঁজিল। কোথাও নেই। "হ্যাঁ গা, একটা ছোট মেয়েকে

(১৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ক্যাটলগের জন্য পত্র লিখুন।
কনট্রোল দরে বীজ বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে।

যা-তা

(১৪৯ পৃষ্ঠার পর)

পড়ে। সময়ের উপযুক্ত শিল্পী আমরা। ব্যক্তিগতভাবে তেমন ভাবিত হবার কারণ আমাদের নেই—অভাবটা আমরা পুষিয়ে নিয়েছিলাম সংখ্যায়, তাই দুর্ভাবনাটাও হয়েছে গুষ্টিগত।

মানলাম আমরা যা-তা বস্তুর ব্যাপারী। আমাদের উৎপাদন জাতির প্রাণ নয়, পরিচয় মাত্র। প্রাণ নিয়ে যখন চলছে হানাহানি, পরিচয়ের প্রশ্ন তখন অবান্তর—পরিচয় তো কার্য্যকলাপের ললাটে লেখা। আমরা ধারণা ক'রে ব'সেছিলাম সভ্যতার পক্ষে মনের খোরাকটা দেহের খোরাকের মতোই অপরিহার্য্য হয়ে এসেছে। দেখা গেল হিসেবে বাড়াবাড়ি হয়েছিলো। মনের খোরাক একেবারে মুলতুবী রেখেও সে চলতে পারে। তা চলুক। কিন্তু এ যা-তা বস্তু থেকে অপরের না হয় জোটে মনের খোরাক, এ ব্যাপারে যারা ব্যাপারী, তাদের পেটের খোরাক জোটানোর পথও যে এটি। তাদের উপায়টা হবে কি?

বিজ্ঞ ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই জবাব দেবেন, যুদ্ধের বাজারে রোজগারের নবোদ্ঘাটিত এবং নবযুক্ত সহস্র পন্থার একটিতেও পা বাড়াতে পারলো না যে হতভাগারা, তাদের নিয়ে ভেবে মরার মতো সময়ের অপমৃত্যু তাঁরা ঘটতে দিতে পারেন না।

লেখকরা অপদার্থ মানতেই হবে, কারণ, পদার্থবোধটা তাদের সত্যি কম। অভাব-অনটন, লাঞ্ছনা-বিড়ম্বনা সব স'য়েও প'ড়ে থাকবে ঐ যা-তা নিয়ে। এদিকে শ্রমবিমুখ মোটেই নয়। বাইরে থেকে শুয়ে ব'সে থাকতে দে'খে আলস্যের অপবাদটা লোকে অনায়াসেই দিয়ে বসে। কারণ, কায়িক শ্রমের মতো মানসিক শ্রমের বর্ণাঢ্য আঙ্গিক অভিব্যক্তি নেই। খাতাপত্র নিয়ে ঝুঁকে থাকলে তবু বা লোকে কিছুটা স্বীকার করে। এদিক দিয়েও যা-তা বস্তুর ব্যাপারীরা হদ্দ বোকা। পোষ্টাপিস বা রেলের কেরাণিরও সকাল-বিকেল রাত, ছুটিছাটা বা অসুখ-বিসুখ আছে, লেখকদের তা ও নেই, মন তার প্রতিমুহূর্ত্তেই খেটে মরছে। রবীন্দ্রনাথের মতো লোক 'রোগশয্যায়', আরোগ্যে' সমান খেটে মরলেন—ছুটি নেই।

তবু রবীন্দ্রনাথের বেলায় প্রতিটি প্রয়াস তাঁর ফুল হয়ে ফুটেছে। সাজানো বাগান দেখে লোকে বলেছে, হ্যাঁ হলো কিছু। বহু শ্রমের সার জুগিয়ে যারা সার্থকতার এক একটি ফুলকে ফুটিয়ে তোলে, তাদেরও শ্রমের মাত্রাটা কম নয়—তাদের আর যাই বলা যাক, ফুঁকে বলা চলে না।

এ সব ব'লে ক'য়ে আলস্যের অপবাদ না হয় ঘুচলো, কিন্তু বাজে শ্রমের বদনাম রয়েই গেল। এ যা-তা শ্রমের পেছনে উৎসাহটা ছিল একমাত্র অপ্রাপ্ত বাস্তব-বুদ্ধি ছাত্রদের। গম্ভীর জগৎ ওদের ছেড়েছে, সেটুকুও বন্ধ করছে। সাহিত্য-সেবা আজ আর চলবে না।। সাহিত্যের পায় ফুল দিলে সে ফুল প'ড়ে নিজের মাথায়, এমন মাথার প্রয়োজন আজ নেই।

অন্ন না পেয়ে যেমন ক'রে অসংখ্য লোক ইহলোক ত্যাগ করলো, তেমনি ক'রে কাগজ না পেয়ে সাহিত্য আর সংস্কৃতিও মানবলোক ছাড়তে বসেছে। ছোট ছোট সাময়িক পত্র সময়ের চাপে পিষ্ট হলো, বড়োরা হলো শীর্ণ, প্রাণ আছে কি নেই। বইপত্তর বন্ধপ্রায়। আত্মীয়-বন্ধুরা হাঁপ ছেড়ে বললেন, যা হবার ভালোই হলো। এখন মন দিয়ে কাজের মতো কোন একটা কাজে লেগে পড়ো। শুনি আর সেই চাষীর গল্প মনে পড়ে। হঠাৎ ঝড়ে বছরের চা'ল শুদ্ধ নৌকোখানা তার ডুবে গেল মাঝ দরিয়ায়। গালে হাত রেখে স্তব্ধ হ'য়ে সে ব'সে রইলো নদীর ধারে। স্ত্রী এসে সান্ত্বনা দিলো, 'ভাইব্যা করবি কি, আয় ঘরে আয়।' চাষী বললো, 'আরে—সেই কথা কি আর আমি বুঝি না। নাও ডুবছে—ডুবছে, চাউল গেছে—গেছে, হেয়ার লেইগ্যা আমি ভাবি না—আমি ভাবতাছি, কাণ্ডখান হইলো কি!'

বইপত্তর ডুবছে—ডুবুক, সাহিত্য মরছে মরুক, সেজন্য আমি ভাবছিনে—আমিও ভাবছি—'কাণ্ডখান হইলো কি!'

বাঁকা তলোয়ার

(১৭৬ পৃষ্ঠার পর)

দেখেছ ইদিকে, ছোট মেয়ে, লাল পিরান গায়ে—এঁ্যা ?"

না। কেউ জানে না মেয়েটা কোথায়। শেষ সম্বলটাও গেল। যাক্। শরীর অবশ হইয়া আসিতেছে।

অনেকক্ষণ পরে টলিতে টলিতে ক্লান্তপদে পার্ব্বতী আবার স্বামীর পাশে ফিরিয়া আসিল। তাহার বুকের কাপড় সরিয়া গিয়াছে, মাথার রুক্ষ খোলা চুল বিপর্য্যস্ত হইয়া পিঠে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। চোখে জ্বালাময়ী দৃষ্টি। অনেকটা ভৈরবীর মত দেখায় তাহাকে।

মৃত স্বামীর মুখের দিকে সে চাহিল। মাণিকের মুখে মাছি বসিয়াছে। ভাতের ঠোঙ্গায় ভাত নাই, কেহ লইয়া গিয়াছে।

পার্ব্বতী কাঁদে না, একটুও না।

গ্যাসের সেড দেওয়া আলোতে সে হাত মেলিয়া ধরিল। একটা এক টাকার নোট ও খুচরা কয়েক আনা পয়সা। পয়সাগুলি ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল অনুপম কথা দিয়াছে—তাহারা আবার বহাল হইবে।

সেই পয়সার দিকে চাহিয়া হঠাৎ পার্ব্বতীর ঠোঁট দুইটি কাঁপিয়া উঠিল—কিছু বলিতে চাহিল বোধ হয়। সে হাত মুষ্টিবদ্ধ করিল।

পার্ব্বতী হাতের দিকে চাহিয়া ভাবে—অতীতের কথা নয়, ভবিষ্যতের। নিজের মুষ্টিবদ্ধ হাতের মধ্যে সে যেন একটা বাঁকা তলোয়ার ধরিয়া আছে। দুই চক্ষু তাহার নির্ব্বাণোন্মুখ চিতাগ্নির মত জ্বল্‌জ্বল্ করিতে থাকে।

(পার্ব্বতী—ভয় নাই। বাঁকা তলোয়ারের দিন আসিয়াছে সৈনিকেরা তাহা জানে। তাহারা প্রস্তুত আছে।)

কুপোকাৎ

(১৬৮ পৃষ্ঠার পর)

গত দেড় বছর আগে এই ভুসি কারো বাড়ীর গরুর মুখে পর্য্যন্ত রুচেছে কিনা? অতদূরে যাবার দরকার কি! আসুন না, চলুন আমার সঙ্গে বাজারে, নিয়ে চলুন ঐ অড়হর ডালের নমুনা! তারপর বাজারের অড়হর ডালের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন দেখি, সেই ডালগুলোর কাছে এগুলো কি?"

আগ্রহান্বিত হয়ে একজন বল্লেন, "হ্যাঁ এটা যা বলেছেন যথার্থ কথা।"

অপর একজন তার প্রতিবাদ করে বল্লেন "কিন্তু তার দাম এর চাইতে বেশী সেটা জানেন তো?"

এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বক্তাকে প্রায় ধমকে উঠে বললেন—"বাজে কথা বলবেন না মশাই? পাঁচ পয়সা সেরের চাল যাদের কাছে সাড়ে ছয় আনা সেরে বেচে টেনে হেঁচড়ে দাম আদায় করা হচ্ছে, তারা কি ডালের জন্য আর দু' এক আনা বেশী পয়সা দিতে পারে না? অথচ তাঁদেরকেই সস্তার নামে ভুসি খাওয়াতে হবে, এটা কোন দেশী ধাপ্পাবাজী? ভদ্রলোক একটা কথাও মিথ্যে বলেন নি। শুধু কি চালগুলোই খারাপ? আটা যেটা দেয়া হচ্ছে ওর ভেতরে গম আছে ক'ছটাক বলতে পারেন? স্রেফ পাঁচ মিশেলি অখাদ্য খাইয়ে দেশশুদ্ধ লোক-গুলোকে আধমরা করে ফেল্লে। দেখুন না চেয়ে? দেয়ালে আবার বিজ্ঞাপন মারা হয়েছে, বাজরা দিয়ে কত রকমের পিণ্ড শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা হতে পারে তারই ফিরিস্তি। চলুন তো মশাই, আমিও যাবো আপনার সঙ্গে। দেখে আসি কোথায় ওদের রেশনের না শ্মশানের হেড অফিস?"

মহেশ অতিমাত্রায় উৎসাহিত হয়ে সেই ভদ্রলোককে নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লো। তখন যাঁরা কোনও কালে, কোনও আসরে কথা বলবার স্পর্দ্ধা করেন না, তাঁদেরই কেউ বল্লেন,—মহেশের দলকে 'পাগল', কেউ বল্লেন 'মাতাল', আর কেউ কেউ এমন উৎকট হাসি হাসতে সুরু করলেন যে, তার দাপটে একেবারে একমুহূর্ত্তে রাস্তার ওপরে লোক জমে উঠলো।

কিছুদিন আর মহেশের কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না—তারপর একদিন হঠাৎ দেখা কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের তাজা মাছের দোকানে। কড়ে আঙ্গুলের মত লিকলিকে কয়েকটা সিংগী মাছ, জেলের টিনের ঝাঁপতে অতি সামান্য জলের ভেতরেই চলে ফিরে বেড়াচ্ছে বড়জোর, তারই দাম জিজ্ঞেস্ করতেই যেই বলেছে জেলে তিন টাকা করে তার সের, আর অমনি মহেশের ব্রহ্মরন্ধ্রে একেবারে আগুন জ্বলে উঠলো। প্রচণ্ড হুঙ্কার

(১৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শিল্পী : জয়নুল আবেদীন

(১৭৯ পৃষ্ঠার পর)

আর দাঁত-খিঁচুনীর ধাক্কায় আশপাশের জেলেরা পর্য্যন্ত উঠে না এসে পারলো না। মহেশ বল্‌ছিল তার জেলেকে, "জোচ্চুরী করবার আর জায়গা পেলে না বুঝি, হতভাগা পঙ্গপালের দল ? ডোবার পোকা তোর ঐ মাছ, কোন্ পাগলে কোন্ দিন তিন টাকা সের দরে কিনেছে তোর ঝাঁপি থেকে,—হলপ' করে বল্ দেখি ?"

জেলেও হটবার পাত্র নয়,—বল্লে,—"তোমার না পোষায় নিও না, অত বাক্‌চাতুরী মাচ্ছ কেন চাকরেবাবু ? মোটা মায়নার চাকরী করতে পারো না ? ঢের ঢের সোলজার নিচ্ছে আউটরামে। সেইখেনে গিয়ে চাকরী নিয়ে তারপর বাজারে মাছ কিনতে এসো।"

একথা শোনার পর মহেশের বাঁ হাতখানা অতি অকস্মাৎ তার ডান পা থেকে সাতটা তালি দেওয়া জুতোখানাকে এমন সাঁৎ করে টেনে বাটা জেলের মাথায় ছুঁড়ে মারলো যে, তা দেখে আমরা অদূরবর্ত্তী দর্শকের দল অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদের কথাটা অতি অকস্মাৎ স্মরণ না করে পারলুম না। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই শেষ। হাতের ঢিল ছুঁড়ে মেরে মহেশ তখন তার অন্যায়ের মাত্রাটা উপলব্ধি করে ভয়ে এবং দুর্ভাবনায় একেবারে মুশড়ে পড়লো। মাছের বাজারে তখন হুলুস্থুল কাণ্ড। বাজারের কেরাণী এলো, দ্বারোয়ান এলো, শেষ পর্য্যন্ত মার্কেটের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কিছুতেই আর মহেশকে ছাড়ে না,—থানায় তাকে নিয়ে যাবেই। এমনি সময়ে বিপিন কোথা থেকে হন্তদন্ত হয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে 'মাতাল', পাগল' এবং 'আফিংখোর' ইত্যাদি নানারকমের মিথ্যা বিশেষণে মহেশকে বিভূষিত করে জেলেকে কিছুটা খেসারৎ দিয়ে কোনমতে বন্ধুবরকে নিয়ে বাজার থেকে বেরুল।

তারপর থেকে মহেশের প্রতাপ এবং দাপট দিন দিন নিস্তেজ হয়ে আসতে লাগলো। কুন্দকলি তো শয্যাশায়ী, তার সেবাশুশ্রূষা যা হোক এতদিন মহেশই চালাচ্ছিল। এখন তারও অবস্থা শোচনীয়। মাঝে মাঝেই পেটের ভেতরে কেমন যেন একটা চিন্‌চিনে ব্যথা করে। রেশনের পাঁচমিশেলী চাল এতদিনে মহেশের সুস্থ পেটে রীতিমত ডন বৈঠক দিতে সুরু করেছে। হোমিওপ্যাথিকের নাক্সভমিকা থেকে নাইট্রীক এ্যাসিড—সব ফেল মেরে গেল। বুক থেকে তলপেট পর্য্যন্ত সন্ধ্যার পর থেকেই মহেশের দেহমন্দিরে বিরাট ষ্টীম রোলার চালাতে সুরু করে; মাঝে মাঝে মহেশ গভীর রাত্রে চেঁচিয়ে ওঠে,—"জলে—গেল—সব জলে গেল।" সেই চীৎকারে কুন্দকলি রোগের ঘোরে চমকে উঠে মিনতি জানায়, "একটু আস্তে বলগো, বুকটায় আমার হাতুড়ি পিটছে। আমি আগে চক্ষু বুজি, তারপর যত খুশী চেঁচিও।"

অফিসের এক টেবিলের সহকর্ম্মী বিজনবাবু সেদিন মহেশের রুক্ষ শুষ্ক চেহারা দেখে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতে বলে উঠলেন—"খবর শুনেছ মহেশ ? উড়ন্ত বোমার দাপটে লণ্ডনে নাকি ঘণ্টায় সাতশো করে বাড়ী ক্রমাগত ভূমিসাৎ হয়ে যাচ্ছে! ভাবো দেখি, সেদেশের মানুষগুলোর ধৈর্য্য! আর তুমি একটু বদহজমের পেটের ব্যথাতেই চিঁ চিঁ করে মরছ ?" উদাস বিষণ্ণ চক্ষু মেলে মহেশ বিজনবাবুর সে কথার উত্তরে বল্লে—"ভোগের চূড়ান্ত না হলে কি ত্যাগ আসে বিজনদা ? আমাদের হচ্ছে নিত্য ভিক্ষেয় তনু রক্ষে, তা ধৈর্য্য আসবে কোথা থেকে বলুন ? তাতেই চিঁ চিঁ করে মরছি।" বিজনবাবু একটা ছোট্ট 'হুঁ' বলেই আলোচনার সেইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটালেন।

ছোটদের পাততাড়ি

নাম মাহাত্ম্য

শ্রী[illegible] বসু

ভৃঙ্গীশ্বর নন্দী এবং
ডিম্বেশ্বর জানা
তারকেশ্বর চলেছেন ব'লে
কথা বল্‌ছেন নানা।
আরোহীরা, যত সহযাত্রীরা
আলাপ সূত্রপাতে
নাম দু'টি শুনে নির্ব্বাক্ যেন
শায়িত মুষ্ট্যাঘাতে !
স্থান দেয় সবে সসম্ভ্রমেই,
পান দেয় ডিবে খুলে,
মুখস্থ করে নাম দু'টি, যেন
সহসা না যায় ভুলে !
কুঞ্জ যতীশ ধীরেন নকুড়
নিবারণ পূর্ণরা
কবিল স্বীকার শোনেনি এমন
অপূর্ব্ব নামযোড়া !

বেলুড়ে উঠিল নূতনযাত্রী.
ভিড় দেখে ভয়ে কাবু ;
কাছে গিয়ে তারে নামটি শোনান
ভৃঙ্গীশ্বর বাবু।

দমে না লোকটি ; ডিম্বেশ্বর
নামটি বলেন তাঁরো,
দেখা গেল হায় তবুও সে যেন
গম্ভীর হ'ল আরো !
নামটি কি তার প্রশ্ন করিতে,
প্রসারিয়া দুই বাহু
দন্ত বিকাশি বলে সে, 'আজ্ঞে
মেথরচন্দ্র সাহু।'
পরাজয় মানি' সরিয়া বসেন
মুখ ক'রে হাঁড়িপানা
ভৃঙ্গীশ্বর নন্দী এবং
ডিম্বেশ্বর জানা।

খাওয়ার জের
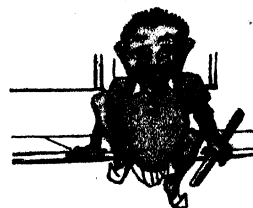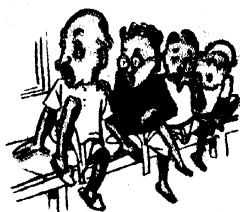
শ্রী সুনির্ম্মল বসু

বিশাল-বপু ব্রজেশ বাবু বিরাট রকম কারবারী,—
কলকাতাতে হাল্‌ফ্যাসানের মস্ত বড় তাঁর বাড়ী।
হাতীর মত শরীরখানা, ওজন বোধ হয় মণ কুড়ি,
দেখ্‌লে পরে অবাক্ হবে, বাস্‌রে কী ভীষণ ভুঁড়ি।
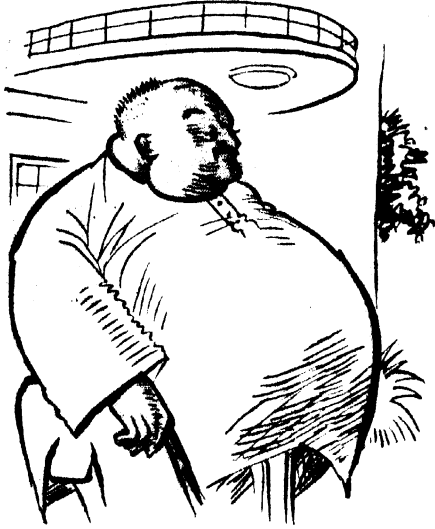
বেজায় পেটুক ব্রজেশ বাবু, খেতেও পারেন রাক্ষুসে,—
তোমরা যদি ইচ্ছা কর, দেখতে পারো চাক্ষুষ এ।
দাস-দাসীতে ভর্ত্তি বাড়ী, বাবুর্চ্চি আর খান্‌সামা—
হুকুম মত খাদ্য জোগায়, নইলে বাধে হাঙ্গামা।

ক্ষীর ও পায়েস, দই-সন্দেশ, পোলাও, লুচি, রাবড়ী হে,—
খাওয়ার বহর দেখ্‌লে তাঁহার তোমরা যাবে ঘাব্‌ড়িয়ে।
আস্ত পাঁঠা শানায় নাকো মস্ত তাঁহার ঐ লাসে,—
হার মেনে যায় সুবিখ্যাত 'আধ্‌মণী সে কৈলাসে।'

কেবল খাওয়া, কেবল খাওয়া, আর কিছু না ধার ধারে,—
খাবার হুকুম করতে তামিল্ ব্যস্ত সবাই চারধারে।

একদিন এই ব্রজেশ বাবু বৈকালেতে সখ্ করে—
রিক্‌সা করে' চলেন পথে, আমরা করি লক্ষ্য রে।
ল্যাংড়া আমের একটি ঝোড়া সাবাড় করেন রিক্‌সাতে;—
হ্যাংলা শরীর রিক্‌সাওলা চল্‌ছে ছুটে ঠিক সাথে।
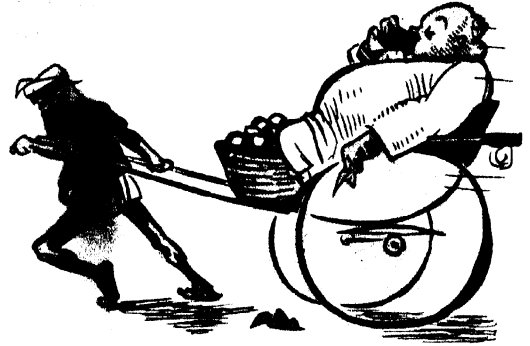
ব্রজেশ বাবু আম খেয়ে যান চোক্‌লা ফেলেন রাস্তাতে,—
আমের খোসা ছড়িয়ে পড়ে পথের চারি পাশটাতে।
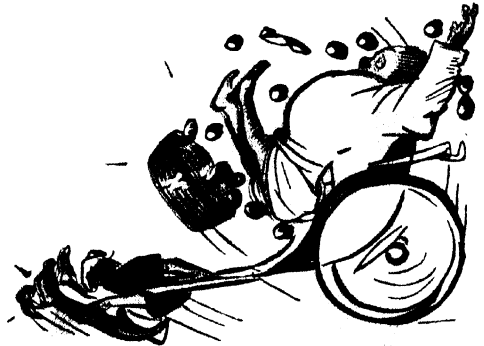
সদ্য-চোষা একটি খোসা পায়ের তলে যেই পড়ে—
হ্যাংলা চালক হুম্‌ড়ি খেয়ে পিছ্‌লে পড়ে সেই ত রে।
উল্টে গেল রিক্‌সাখানি, ছটুকে পড়ে আমগুলি,—
শূন্য মাঝে ডিগবাজি খান পেটুক ব্রজেশ গাঙ্গুলি।

অনেক খেয়ে পেট ভরে নাই, এবার খাবি খান তিনি,
হাত-পা ভেঙে চ্যাং-দোলাতে হাসপাতালে যান্ তিনি।

শেয়াল পণ্ডিতের সাজা

(শিশু কৌতুক-নাট্য)

শ্রীঅখিল নিয়োগী

[এই নাটকের আখ্যানভাগ প্রাচীন সংস্কৃত গল্প থেকে নেয়া হয়েছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অভিনয় করবার সময় মুখোস ব্যবহার করলে নাটক জমবে ভাল। গানগুলো ঐক্যতানের সঙ্গে ছড়ার মতো করে আবৃত্তি করতে হবে। এই লেখকের লেখা রেকর্ডে "স্বপন বুড়োর" কথা স্মরণীয়]

[দৃশ্য—বনের একাংশ]

কাক। কা—কা—কা! বলি ও আমার মনের হরিণ, ঘুম তোমার ভাঙলো?

হরিণ। কে? কালো-মাণিক ডাক নাকি? আড়মোড় ভেঙে শুয়েছিলাম। দেখ ত ভাই কালো-মাণিক গাছের উঁচু ডালে উঠে···সূর্যিমামার রথ এখন কত দূরে?

কাক। [সুরে]
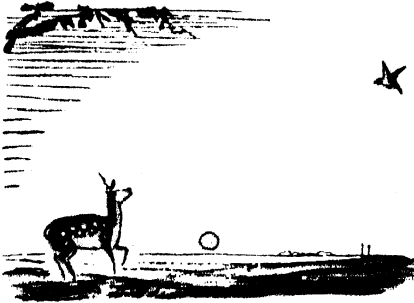
কা—কা—কা—কা!
সাত ঘোড়াতে সূর্যিমামা—ছুটে দেখে যা!
রঙের বাহার বলব কী ভাই—
আনন্দে আজ নৃত্য লাগাই
হেথায় হোথায় যাস্‌নে হরিণ, গাছের তলায় থা!
কা—কা—কা—কা!

হরিণ। যা বলেছিস ভাই কালো-মাণিক! তুই খাবার খুঁজতে উড়ে চলে যাস্ কতদূর! সেই সন্ধ্যেবেলায় ফিরিস! একা একা আমার সারাদিন বড় ভয় করে।

কাক। কা—কা! ভয় কিরে মনের হরিণ! আমাদের দিন কেমন আনন্দে কাটছে বলত? তুই থাকিস গাছের তলায় ঘুমিয়ে,
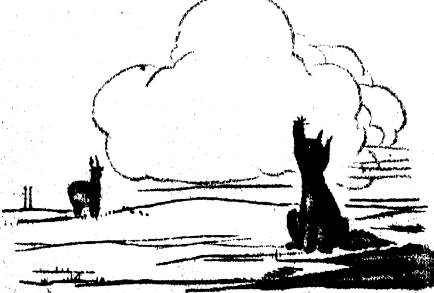
আর আমি থাকি গাছের ডালে। আমার ডাকে রোজ তোর ঘুম ভাঙে!

হরিণ। আর আমাদের দু'টির মনের মিল। সেটাও বল! তুই আমার ডাকিস মনের হরিণ, আর আমি তোকে ডাকি কালো-মাণিক! আমাদের মিতালি সবাই আড়চোখে তাকিয়ে দেখে।

কাক। শুধু দেখে নয়, হিংসেও করে। তাইত বলি, আমি না থাকলে কোথায়ও যাবি নে, বিদেশী লোকের সঙ্গে কথা বলবি নে বুঝলি?
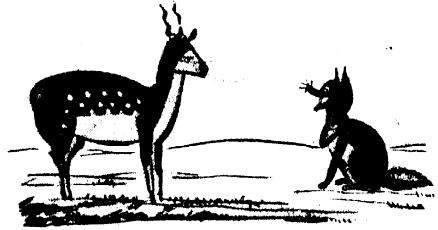
হরিণ। তুই বুঝি এবার উড়বি কালো-মাণিক?

কাক। হ্যাঁ ভাই, সন্ধ্যেবেলা আবার আমাদের দেখা হবে।

[উড়ে চলে গেল]

হরিণ। [আপন মনে] সারাটা দিন আমার বড় একলা কাটে। এই গাছতলার ঘাসগুলো বড় শুকিয়ে গেছে···খেয়ে আর পেট ভরে না! [সুরে]

এমনি করে একলা আমি কাটাই বারোমাস···
বোবা হয়ে রই সারাদিন চিবুই মরা ঘাস!
সঙ্গী বেড়ায় দেশ বিদেশে···
সময় আমার কাটবে কিসে?
গোমরা মুখে কে ফুটাবে একটুখানি হাস?
চিবুই মরা ঘাস!
কাটাই বারোমাস!
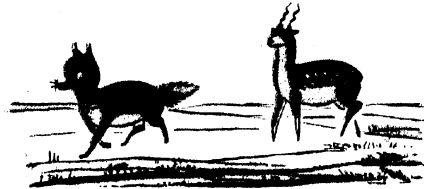
শেয়াল। [দূর থেকে] হুক্কা-হুয়া! বাঃ, চমৎকার হরিণটি ত! ওর চোখ দুটো ঠুকরে খেতে ভারী মজা! ভাব জমাতে হবে। [সুরে]

হুক্কা-হুয়া ডাকছি আমি বনের কিনারে—
মন যে আমার কাঁদছে একা সঙ্গী বিনা রে!
হুক্কা-হুয়া তাইত ডাকি—
একটি কেবল বন্ধু লাগি
সত্যি করে বল না, কথা কইবি কিনা রে!

হরিণ। তুমি বিদেশী বুঝি? তোমায় ত এ বনের ধারে কখনো দেখিনি!

শেয়াল। বিদেশী হব কেন ভাই? বনের ঐ ধারে আমি থাকি। আমার নাম শেয়াল পণ্ডিত। তুমি আমার সঙ্গে মিতালি করবে ভাই হরিণ?

হরিণ। মিতালি? মিতালি রয়েছে আমার কালো মাণিকের সঙ্গে। এই গাছের ডালে থাকে।

শেয়াল। কালো-মাণিক? সেই বিচ্ছিরি কালো কাকটা বুঝি? হুক্কা-হুয়া হুক্কা-হুয়া। [হাসতে লাগলো]

হরিণ। তুমি হাসছ যে শেয়াল পণ্ডিত?

শেয়াল। কাক কখনো ভাল লোক হয়? যেমনি গায়ের রঙ তেমনি মনের রঙ! দেখছো না, তোমায় একা ফেলে কোথায় নিজের খাবার জোটাতে গেছে! এই বুঝি মিতালির নমুনা?

হরিণ। ঠিক বলেছ ভাই! সারাদিন আমার বড়ো একা কাটে!

শেয়াল। সেই জন্যেই ত আমি এলাম। আমি সমস্ত দিন তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবো; কিন্তু এ কী! তোমার চেহারা একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে! কচি ঘাস এখানে পাও না বুঝি?

হরিণ। এই গাছের তলায় শুধু শুকনো ঘাস! কালো-মাণিক দূরে যেতে বারণ করে যে!

শেয়াল। রেখে দাও তোমার কালো-মাণিক! এই বনের দক্ষিণ দিকে কচি কচি ঘাস বাতাসে হেলছে দুলছে·· তোমায় আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। সেই ঘাস দু'দিন পেটে গেলে তোমার সোনার বরণ হবে দেখো।

হরিণ। সত্যি বলছ ভাই শেয়াল পণ্ডিত?

শেয়াল। সত্যি নয় ত কী! চল না দেখবে। [আপন মনে] সেখানে ব্যাধেরা ফাঁদ পেতে রেখেছে···একবার গেলে হয়! ধরা পড়লে চোখ দুটো কিন্তু আগে খেয়ে নেবো।

হরিণ। আপন মনে কি বিড় বিড় করছ শেয়াল পণ্ডিত?

শেয়াল। বলছিলুম কি কাকটার কি দুষ্টু বুদ্ধি! সেই কচি ঘাস তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছে!

হরিণ। ঠিক বলেছ! চল, তোমার সঙ্গে গিয়ে পেটপুরে খেয়ে আসি।

শেয়াল। [উৎসাহে] চল ভাই, তাই চল—

[উভয়ের প্রস্থান]

[কাকের প্রবেশ]

কাক। কা—কা—কা! মনের-হরিণ গাছতলায় আছ? মনের-হরিণ শুনছ? কা—কা—কা! একি কোথায়ও নেই ত! তবে কি বন্ধু আমার বিপদে পড়ল?

[একটি বাদুড় গান গাইতে গাইতে ঢুকল]

এই যে বাদুড় ভায়া, ফল খেতে চলেছ? আমার বন্ধু মনের-হরিণকে দেখলে?

বাদুড়। দেখলাম বৈ কি কাক ভায়া! তাকে দেখলাম দক্ষিণ বনের দিকে যেতে···শেয়াল পণ্ডিতের সঙ্গে।

কাক। শেয়াল পণ্ডিতের সঙ্গে? কি সর্বনাশ! খুঁজে দেখতে হল —কা—কা—কা—

[দ্রুতবেগে চলে গেল]
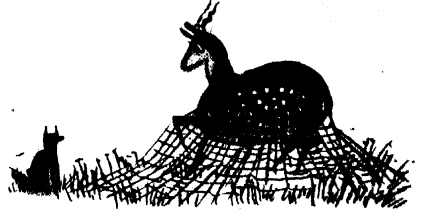
[দ্বিতীয় দৃশ্য—দক্ষিণ বন]

হরিণ। কি চমৎকার! সত্যি ভাই শেয়াল পণ্ডিত! এমন মিষ্টি কচি ঘাস জীবনে আমি খাইনি! রোজ এমনি করে তোমার সঙ্গে পালিয়ে আসবো, কেমন?

শেয়াল। আসবে বৈ কি! রোজ আসবে—ভয় কি? আমি তোমার পাশে পাশে থাকবো।

হরিণ। ভাই শেয়াল পণ্ডিত! আনন্দে আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে!

শেয়াল। তা গাও না! আমিও সঙ্গে সঙ্গে গাইব—

[হরিণ ও শেয়ালের গান]

হরিণ। পাগল করেছে মোরে
কচি ঘাসের গন্ধ···

শেয়াল। তাইত জাগে তোর চরণে
আনন্দেরি ছন্দ (হুক্কা-হুয়া)

হরিণ। ডাকছ তুমি হুক্কা-হুয়া—
ঘাস ছাড়া মোর সকল ভুয়া—

শেয়াল। তোর হবে ভাই সোনার বরণ,
নাইকো কোন সন্দ। (হুক্কা-হুয়া)

হরিণ। একি শেয়াল পণ্ডিত! লাফাতে লাফাতে আমি যে জালে আটকা পড়ে গেলাম!···আমায় এইবার বাঁচাও ভাই—

শেয়াল। [আপন মনে] হুঁ বাবা! আমি যা চেয়েছিলাম ঠিক তাই ঘটেছে! এইবার একটু সবুর করলেই ব্যাধের দল এসে হাজির হবে।

হরিণ। একি শেয়াল পণ্ডিত! তুমি কথা কইচ না যে! তোমার ধারাল দাঁত দিয়ে জালটা কেটে দাও···আমি পালিয়ে যাই···

শেয়াল। কি জানো ভাই, আজ রবিবার! চামড়ার তৈরী জালটা কি করে আজকের দিনে দাঁতে কাটি! কাল সকালে এসে নিশ্চয়ই তোমায় ছাড়িয়ে দোবো। [আপন মনে] এইবার একটু আড়ালে গা-ঢাকা দি। আশেপাশেই থাকবো। সময় মতো এলেই হবে।

[প্রস্থান]

হরিণ। হায়—হায়—হায়! কালো-মাণিকের কথা না শুনেই আমার এই বিপদ! কি করে সে জানবে যে আমি জালে আটকা পড়েছি?

[সুরে হরিণের গান]

কালো-মাণিক, কালো-মাণিক
মনের মিতা মোর—
বিপদ থেকে বাঁচাও রে ভাই,
ছিঁড়ে বাঁধন ডোর!

তোমায় ছেড়ে এলাম বিপথ্
তাইত আমার এমন বিপদ্
তোর বিহনে আজকে কেবল
ঝরছে আঁখি-লোর।
[হঠাৎ কাকের প্রবেশ]

কাক। কা-কা-কা! ভাই মনের-হরিণ, আমি এসে পড়েছি। একি! তোকে এমন করে জালে বাঁধলে কে?

হরিণ। ভাই কালো-মাণিক! তোর কথা না শুনে শেয়াল পণ্ডিতের সঙ্গে এসে আমার এই দুর্দশা! আমায় বাঁচাও ভাই।

কাক। হুঁ, বুঝেছি। দুষ্টু বুদ্ধি শেয়াল পণ্ডিতের ফন্দী। এক্ষুণি জালে কি পড়েছে দেখতে ব্যাধের দল এসে হাজির হবে।

হরিণ। তা হ'লে আমার উপায় কি হবে কালো-মাণিক?

কাক। দাঁড়াও ভাই! [সুরে]
কা—কা—কা
মাথায় বুদ্ধি এসে যা!
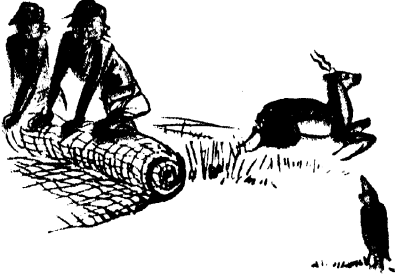
ঠিক! ঠিক! পেয়েছি বুদ্ধি! শোনো ভাই মনের-হরিণ! তুমি মড়ার মতো হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকো; ব্যাধেরা যখন জাল ছাড়িয়ে নেবে···ঠিক সেই সময় আমি কা-কা করে উঠব। আর সঙ্গে সঙ্গে তুমি ছুটে পালাবে, বুঝলে? ঐ যে বনের পাশে ওদের কথা শোনা যাচ্ছে। শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো, আমিও একটু আড়ালে লুকিয়ে থাকি।
[ব্যাধদের প্রবেশ]

ব্যাধ। আরে! আজ যে জালে একটা হরিণ পড়ে আছে, কি মজা! খাওয়াটা আজ তা হ'লে ভগবান মেপেছেন ভালো!

[সুরে]
হরিণ কেটে খাবো ভাই,
জবর ভোজনটা—
এক দিনেতেই বেড়ে যাবে
দেহের ওজনটা—

চোখ দিয়ে ভাই চাটনী খাবো,
মেটে খেয়ে খুব লাফাবো—
রোজ যদি ভাই পেতাম হরিণ এমনি ভজনটা
হত জবর ভোজনটা!
[আনন্দে সকলের নৃত্য-গীত]

শেয়াল। [উঁকি দিয়ে] আরে আমি শেয়াল পণ্ডিত! আমায় ফাঁকি দিয়ে ব্যাধ ব্যাটারা হরিণটাকে বাড়ী নিয়ে যাবে? সেটি হতে দিচ্ছি না—একটু এগিয়ে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকি—

ব্যাধ। হরিণটা আপনা থেকেই মরে পড়ে আছে যে! দাঁড়াও, আগে চটপট জালটা ছাড়িয়ে নি। ভোজনের কথাটা পরে ভাবা যাবে।

শেয়াল। এইবার জালটা ছাড়িয়ে নিলে। হরিণটা সত্যি মরে গেল নাকি? আরও একটু এগিয়ে ব্যাপারটা দেখতে হল—!

কাক। কা—কা—কা—
[সঙ্গে সঙ্গে হরিণের পলায়ন]

ব্যাধ। আরে! আরে! হরিণটা ছুটে পালাচ্ছে যে! আমার সঙ্গে চালাকি! মারবো ছুঁড়ে এই লাঠি—
[লাঠি ছুঁড়লো]

শেয়াল। উঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ! হুক্কা হুয়া—হুক্কা-হুয়া—লাঠিটা শেষে আমার মাথায়ই এসে পড়ল? আমি গেছি···আমার মাথা গেছে···আমি আর নেই···

ব্যাধ। না, হরিণটাকে খুঁজে দেখতে হল—
[প্রস্থান]
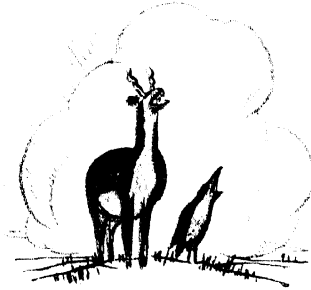
[কাকের গান]
কা—কা—কা—কা
দুষ্টু শেয়াল জব্দ হল,
খেয়ে লাঠির ঘা।
[হরিণের প্রবেশ]
এবার মোরা দুইটি মিতা
ঘরের পানে চলব সিধা—

কাক। যেমন কর্ম্ম, তেমনি যে ফল,—
হা—হা—হা—হা!
কা—কা—কা—কা!!

—যবনিকা—
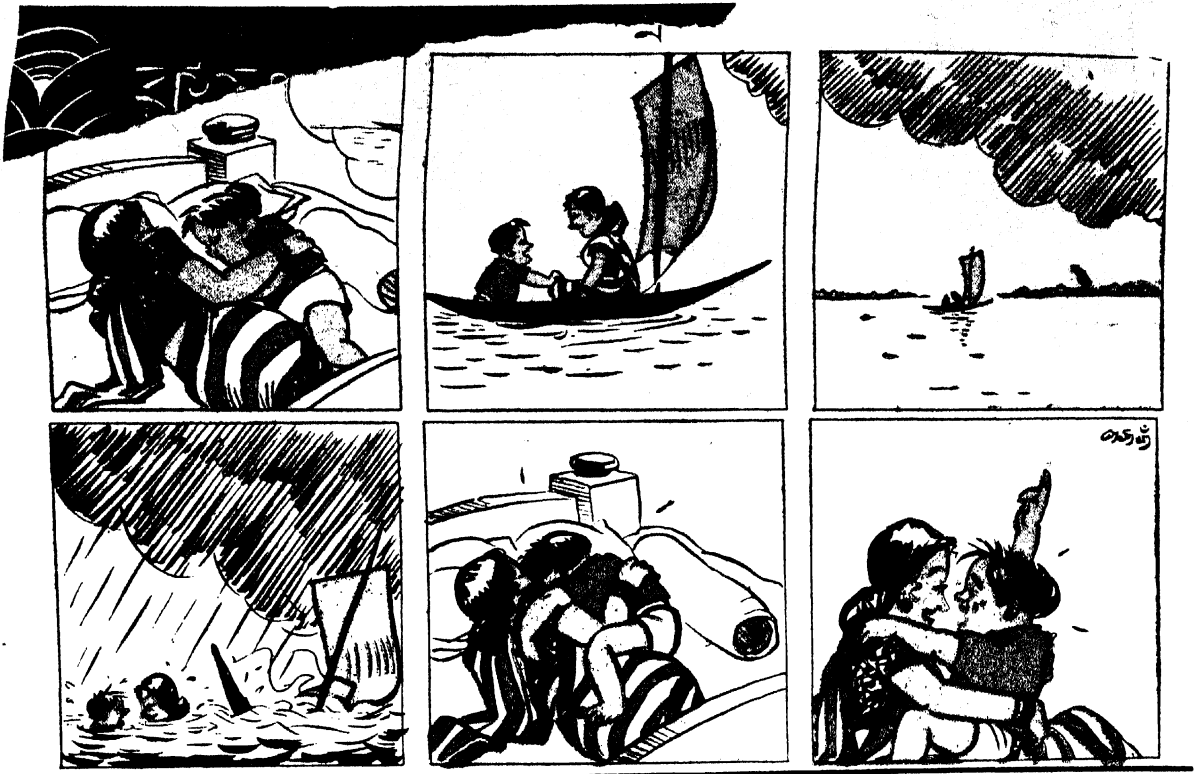
"কালু" আর "লালু"

লালু কালু যেতে যেতে পথে গেল থামি
কালু বলে আমি বড় লালু বলে আমি।
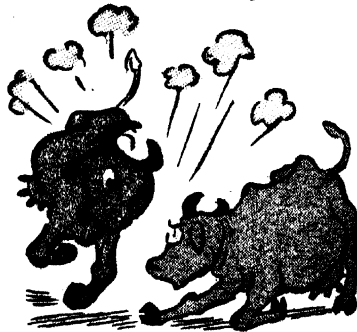
"কাল রং বড় যেরে ওরে হাঁদা বোকা!"
লালু বলে 'লাল বড়' কথা চোখা চোখা।

লুটোপুটি গুঁতোগুঁতি ধূসরিত বেশে
বিচার করাতে রাজি হ'ল তারা শেষে।

দূরে ঐ দেখে সাদা হাঁস মহাশয়
আরামেতে বসে বসে চোখ মুদে রয়।

দু'জনেই বলে তারে 'সুবিচার চাই'
'কোন্ রং বড় প্রভু বলে দিন তাই।'

"কালু তুমি দুধ দাও তা ও নয় কালো
তুই দাও সাদা দুধ, সাদা রংই ভালো।"

শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী মাতার প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত—

কুণ্ডেশ্বরী কবচ

পুরশ্চরণ সিদ্ধ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মন্ত্রশক্তি ও দ্রব্যগুণের অপূর্ব্ব সম্মিলন। ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে মন্ত্রঃপূতঃ কবচ ধারণে মোকর্দ্দমায় জয়লাভ, চাকরীপ্রাপ্তি, কার্য্যোন্নতি, দুরারোগ্য ব্যাধির শান্তি, সৌভাগ্যলাভ, ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি, শত্রুদিগকে বশীভূত করা ও পরাভূত করা, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, কালাজ্বর প্রভৃতি মহামারীর হাত হইতে আত্মরক্ষা ও অকালমৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি লাভ অনায়াসে করা যায়। বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়, ভূত, প্রেত, পিশাচ, উন্মাদ, চোর ও অগ্নিভয় হইতে রক্ষা করিবার ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ, ইহা ধারণে কুপিত গ্রহ সুপ্রসন্ন হয় এবং অতি দরিদ্রও ধনবান হইয়া থাকেন। পত্র লিখিলেই ধারণের নিয়মাবলী পাঠান হয়।

পুরুষকার—ও দৈবীশক্তির অধীন বলিয়া সকলেরই ইহা ধারণ করা কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী মাতার মন্দির—বৈদ্যনাথ ধাম, কুণ্ডা পোঃ (এস, পি)।

জীবন বীমাপত্র

বর্ত্তমান যুদ্ধসঙ্কট ও আর্থিক বিপর্যয়ের দিনে ভবিষ্যতের জন্য সাধ্যমত সঞ্চয় করা সকলেরই কর্ত্তব্য। একটি জীবন বীমাপত্র দ্বারা এই সঞ্চয় করা যেমন সুবিধাজনক আর তেমনই লাভজনক। 'ক্যালকাটা ইন্সি-ওরেন্স'কে আপনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে দিয়া আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন।

মিঃ জে সি দাশ,
বি, এস্‌সি (ইউ, এস, এ), আর এ,
চেয়ারম্যান

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স
লিমিটেড

হেড অফিস: ১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ব্যাঙ্কই একান্ত বন্ধুভাবে আপনাকে সততার সহিত সাহায্য করিবে—যদি সুসময়ে আপনি কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখেন। ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকায় শুধু আপনার উৎসবের প্রয়োজন ও ভবিষ্যতকে নিশ্চিন্ত করিবে তাহা নহে পরোক্ষে দেশীয় বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান-গুলিকেও সাহায্য করিয়া জাতীয় কর্ত্তব্য পালন করিবে।

ফোন: পি-কে—২৬৮১
গ্রাম: রেনবো, কলি.

একটী অর্থসঙ্গতিসম্পন্ন সুপ্রতিষ্ঠিত সুপরিচালিত ব্যাঙ্ক

মিঃ বি, মুখার্জ্জী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড
কলিকাতা

জীবজন্তুর পূর্ব্বরাগ

শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাস

সমগ্র জীব-জগতে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে দুটি উদ্দেশ্য,—সন্তান-প্রজনন এবং বংশ-বৃদ্ধি। কেবল প্রাণী নয়, উদ্ভিদদের মধ্যেও এ দু'টি উদ্দেশ্য বর্ত্তমান। যে সমস্ত জীব বা উদ্ভিদ এ দু'টি উদ্দেশ্য সফল করতে পারে নি, তাদেরই বংশ লোপ পেয়েছে। সৃষ্টি রক্ষার জন্যে এ দু'টি ধর্ম্মই একান্ত প্রয়োজন। সমগ্র প্রকৃতিতে স্ত্রী ও পুরুষের মিলনের যে বিরাট আকাঙ্ক্ষা পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে তার একমাত্র উদ্দেশ্যই হলো সন্তান-প্রজনন ও বংশ-বৃদ্ধি। এ উদ্দেশ্য পালনের জন্যেই ফুলের বুকে সঞ্চিত হয়ে থাকে মধু, তার এত সৌরভ, এত বর্ণের সমারোহ! অনেক-ক্ষেত্রেই ফুলের রেণু (পুং-প্রজনক কোষ) স্ত্রী-প্রজনক কোষের সঙ্গে সহজেই মিলতে পারে, কিন্তু যেখানে তা সম্ভব হয় না, সেখানে তাদের অপরের সাহায্য নিতে হয়; প্রজাপতি, ভ্রমর প্রভৃতি ফুলের মধু, সৌরভ কিম্বা বর্ণের ছটায় আকৃষ্ট হয়ে ছুটে আসে; ফুল হতে ফুলে তারা মধু আহরণ করে ফেরে, আর তাদের পায়ে, গায়ে পুং-পুষ্পের রেণু জড়িয়ে যায়, তারপর স্ত্রী-পুষ্পের ষ্টিগমার (Stigma ওপর পড়ে "ওভিউল" (ovule) বা ডিম "ফারটিলাইজ" (fertilise) করে। এখানে উচ্চস্তরের জীবের মত আকাঙ্ক্ষা, মিলন-লিপ্সা কিছুমাত্র না থাকলেও, তরু-লতার মধ্যে একটি স্ত্রী এবং একটি পুরুষ কোষের সঙ্গমের জন্য এত আয়োজন। এ না হলে বীজ হবে না, ভ্রূণের উদ্ভব হবে না, নতুন গাছের সৃষ্টি হবে না,—বংশ লোপ পাবে।

বৈজ্ঞানিক জুলিয়ান হাক্সলি (Julian Huxley) বলেছেন—"Courtship may be defined to include all forms of activities executed by one sex to stimulate members of the other sex to sexual activity." অর্থাৎ—এক লিঙ্গের জীব অপর লিঙ্গের (স্বজাতিভুক্ত) জীবকে যৌন ব্যাপারে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে যা কিছু ছলা কলা প্রদর্শন করে তাকেই কোর্টসিপ আখ্যা দেওয়া হয়। উজ্জ্বল বর্ণ, নানারকম সাজসজ্জা, যথা—মাথার রঙিন চূড়া পেখম, ডানার রং, বিশেষ কোন অঙ্গের স্পর্শ, যেমন পুং পাখীর লাঙ্গুলের নীচের অংশ, বক্ষদেশ, প্রজাপতি, গুটিপোকা ও পিঁপড়ের শুঁড়, বিচিত্র গতি-ভঙ্গিমা যেমন পায়রা, ঘুঘু প্রভৃতির গলা ফুলিয়ে ও মাথা তুলে নামিয়ে বক-বকম্ শব্দ করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে চলা, অদ্ভুত অঙ্গ-ভঙ্গী ও নৃত্য—যেমন মাকড়সাদের অনুসরণ, পশ্চাদ্ধাবন ও গীত, যেমন পাখী, শিল প্রভৃতির বিশেষ শব্দ, যন্ত্রের শব্দ যেমন কয়েক জাতের মাছ কয়েক জাতের ভেক, ঝিঁঝিঁ পোকা, গঙ্গা ফড়িং, সিকেড (cicad) প্রভৃতির। আবার অনেক জীব বাহ্যিক কোন বস্তু থেকে শব্দ বার করে—কাঠ-ঠোকরা (wood pecker) বাঁশের গায় হাতুড়ীর মত করে চঞ্চুর আঘাতে এক অদ্ভুত ফাঁপা ফাঁপা-শব্দ বার করে। কয়েক জাতের জলচর পাখী—শামুক নুড়ি পাথরের উপর ঠুকে অদ্ভুত শব্দ করে। কয়েক জাতের কীট শিকার ধরে এনে স্ত্রী-কীটকে উপহার দেয়। এক জাতের গ্রীবও (grebe) এমনি শৈবাল ও জলজ গাছ উপহার দেয়। 'বাওয়ার' পাখী (Bower bird) স্ত্রী পক্ষীকে রঙিন শাঁখ, ফল মূল প্রভৃতি উপহার দেয়। পেঙ্গুইন নুড়ি বা উপল মুখে করে এনে উপহার দেয়। রবিন ও অন্যান্য কয়েক জাতের পাখী স্ত্রী পক্ষীকে বাসা বাঁধবার উপকরণ উপহার দেয়। বন্য কপোত, হাঁস, দাঁড়কাক, বকড়ী চঞ্চুতে চঞ্চু দিয়ে খাদ্য উদ্গীরণ করে দেয়। একেবারে নিম্নস্তরের জীব হতে আরম্ভ করে একেবারে উচ্চস্তরের জীবদের কোর্টসিপের রীতি পর্য্যালোচনা করে দেখলে দেখা যায়—সর্ব্বত্রই প্রায় পুরুষ কোন বিশেষ স্ত্রী-জীবের কাছে একদিকে সর্ব্বতোভাবে প্রচার করতে চেষ্টা করে যে সে তার (বিশেষ স্ত্রী-জীবের) প্রতি একান্ত অনুরক্ত, তার ভক্ত, সাধক, পৃষ্ঠ-পোষক, অপর দিকে নিজেকে অতি রূপবান, কমনীয়, অতি শৌর্য্যবীর্য্যশালী ও তার সঙ্গী হবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা আছে এই প্রমাণ করে সেই বিশেষ স্ত্রী-জীবের মন জয় করতে চেষ্টা করে। কোর্টসিপটা আগাগোড়াই আত্মপ্রচার বা self-advertisement ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই আত্মপ্রচারে জীব যে সমস্ত ছলাকলার সাহায্য নেয়, মানুষের সমাজে তার নাম হলো "flirting"।

নিম্নতম স্তরের জীব—এককোষ (unicellular protozoa) বিশিষ্ট প্রোটোজোয়াদের মধ্যে সঙ্গম থাকলেও কোর্টসিপ নেই; স্পোঞ্জ প্রবাল প্রভৃতির মধ্যে এটা নেই; জীবজগতে কোর্টসিপের প্রবৃত্তি বিকশিত হয়ে উঠেছে স্নায়ুমণ্ডলীর (nervous system) ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। "No organism without a nervous system and sense organs can be expected to show courtship—" (Julian Huxley) জুলিয়ান হাকস্লি এককোষ বিশিষ্ট প্রোটোজোয়া, নিম্ন-স্তরের উদ্ভিদ যথা স্পাইরোগাইরার সঙ্গমের কারণ নির্দ্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, "perhaps it is a simple reflex action.' কিন্তু এদের স্নায়ুর বিকাশ সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

অমেরুদণ্ডী জীবদের পূর্ব্বরাগ

জীব-জগতে প্রথম কোর্টসিপের উদাহরণ মেলে নেরিস (Neries) নামক কণ্টকবিশিষ্ট কেঁচোর জাতিভুক্ত একটি জীবে। শাবক-উৎপাদন ঋতুতে (Breeding season) অনেক পুং-নেরিস বালুকাময় বেলাভূমির ওপর এসে জড়ো হয়; তারা দেহ সঙ্কুচিত করে অদ্ভুত অঙ্গ-ভঙ্গী করে, একটি স্ত্রী-নেরিস উহাদের মধ্যের বিশেষ একটির কাছে এগিয়ে আসে। তারপর, স্পর্শ কিম্বা গন্ধের উত্তেজনায় (জুলিয়ান হাকসলী সে বিষয় সঠিকভাবে জানতে পারেননি)—স্ত্রী-নেরিস ডিম্ব প্রসব
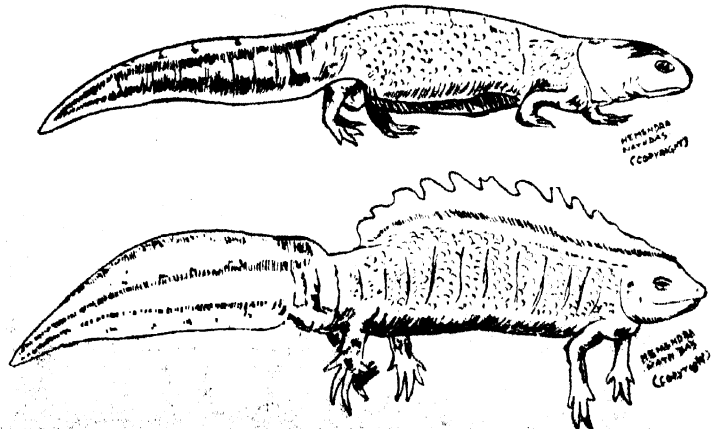
নিউট—স্ত্রী (উপরের ছবি)। চূড়াশোভিত বিস্তৃত ল্যাজবিশিষ্ট পুরুষ (নীচের ছবি)।

(বিচিত্র ভঙ্গীতে প্রেমালাপরত পেঙ্গুইন দম্পতী।)

করে ; পুরুষ-নেরিস এ ডিম্বের ওপর স্পারম (Sperm) ছেড়ে দেয়। কোঁদরাই নামক ক্রীড়া শুঁড়ে শুঁড় দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রেমালাপ করে, তারপর একটি জীব অপরটির দেহের ওপর আরোহণ করে।

কয়েক জাতের শম্বুকের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী কোর্টসিপের পরিচয় পাওয়া গেছে। শম্বুকরা উভলিঙ্গ (Hermaphrodite) হলেও ওদের বিশেষ একটি যন্ত্র আছে যার নাম "ডার্ট" (dart)। তীরের মত বেগে এক শম্বুক এই রস অপর শম্বুকের দেহে প্রয়োগ করে। ঐ রস ঐ শম্বুকের দেহে (খোলার বাইরে যে অংশ থাকে) প্রবেশ করে ওকে যৌন প্রবৃত্তি উত্তেজিত করে ; শম্বুক তখন ধীরে ধীরে রস নিক্ষেপকারী শম্বুকের কাছে এগিয়ে আসে। উভয়ের মধ্যে শুঁড়ে শুঁড় দিয়ে প্রেমালাপ চলে, তারপর, একটি অপরটির দেহের উন্নত অংশ আলিঙ্গন করে, এই অবস্থায় তারা বহুক্ষণ থাকে। শম্বুক জাতির মধ্যে সামুদ্রিক শম্বুক "সি ক্যালোপডদের (Cephaloped) স্নায়ু, চক্ষু ও অপরাপর ইন্দ্রিয় উচ্চস্তরের জীবের মত। এদের মধ্যে উচ্চস্তরের কোর্টসিপ থাকা সম্ভব। এখনও এবিষয়ে গবেষণা হয়নি।

(ওয়ার্বলার পাখী দুপাশে ডানা ছড়িয়ে ল্যাজ পাখার মতো মেলে একটি পাতা মুখে ক'রে এনে স্ত্রী পাখীকে পুরস্কার দিচ্ছে।)

কাঁকড়াদের কয়েক জাতির মধ্যে কোর্টসিপ দেখা যায়। এদের ইন্দ্রিয় ও স্নায়ুমণ্ডলী বেশ উন্নত স্তরের। দাঁড়া দিয়ে এদের প্রেমালাপ চলে। "ফিডলার ক্র্যাবের" বা বেহালা বাদক কাঁকড়ার একটি দাঁড়া অত্যন্ত বড়। একটি দাঁড়া ছোট অপরটি অতিকায় হওয়ার জন্যে এদের ভারি বিসদৃশ দেখায়, এরা স্ত্রী-কাঁকড়ার সামনে এসে বিচিত্র ভঙ্গী করে এই অতিকায় দাঁড়াটি পালোয়ানের মুগুর ভাঁজার মত করে ঘোরায়। বৈজ্ঞানিক পিয়ার্স (Pearse) দাঁড়া ঘোরানো দেখে বলেছেন, "The males appear to be proclaiming their maleness."

কাঁকড়াবিছেরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দাঁড়ায় দাঁড়া বাঁধিয়ে বহুক্ষণ এক স্থানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে প্রেমালাপ চালায়।

মাকড়সাদের মধ্যে, বিশেষ করে যাযাবর মাকড়সাদের মধ্যে প্রেমালাপ অতি বিচিত্র ও রহস্যজনক। মাকড়সাদের মধ্যে যারা জাল বুনে শিকার ধরে তাদের অপর ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হলেও দৃষ্টিশক্তি তেমন তীক্ষ্ণ নয় ; কাজেই, জাল বোনা মাকড়সাদের পুরুষ মাকড়সারা জালের তন্তুতে সামনের পা দিয়ে আঘাত করে ; তন্তুর স্পন্দনে স্ত্রী-মাকড়সা সেখানে ছুটে যায়। এ জাতীয় মাকড়সাদের মধ্যে অঙ্গ-ভঙ্গী প্রদর্শনের তেমন কিছু দেখা যায় না। যাযাবর বা শিকারী মাকড়সাদের কোর্টসিপ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য পোকক (Peacock), পিকার্ড ব্রিস্টাও (Bristow) প্রভৃতি বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা অভিযানে বেরিয়ে অনেক সময় অতিবাহিত করেছেন।

(ম্যান্‌টিস্ নামক ফড়িং জাতীয় জীব। নীচের স্ত্রী কীটটি উপরের পুরুষ কীটের মুণ্ডটি গ্রাস ক'রে ফেলেছে।)

সাধারণতঃ বসন্তকালেই মাকড়সাদের কোর্টসিপ চলে। এই সময় পুং-মাকড়সারা স্ত্রী-মাকড়সাদের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় ; ঘুরতে ঘুরতে সহসা কোন স্ত্রী-মাকড়সা দেখতে পেলে, কোন পাতালতা বা অপর কোন জিনিষের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে ফেলে, তারপর গাছপালার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে ধীরে ধীরে স্ত্রী-মাকড়সাটির দিকে এগিয়ে যায় ; খুব কাছাকাছি এসে কোন শুষ্ক পাতা বা গাছের বাকলের নীচে লুকিয়ে বসে স্ত্রী মাকড়সাটির আচরণ লক্ষ্য করে, যখন স্ত্রী-মাকড়সাটিকে বেশ উৎফুল্ল বলে মনে হয়, তখন সে বেরিয়ে এক রকম অদ্ভুত ভঙ্গিমা করে স্ত্রী-মাকড়সাটির দিকে এগিয়ে যায়, খানিকটা এইভাবে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় ; তারপর বিচিত্র ভঙ্গি করে, সামনের পা দু'খানি তুলে নামিয়ে, অপর পা গুলি বিস্তৃত করে অতি অদ্ভুতভাবে নৃত্য শুরু করে দেয়। এ নাচের গতি ও পাদক্ষেপ অত্যন্ত

(এইভাবে 'Bird of Paradise' পালক মেলে, ডানা ছড়িয়ে দিয়ে স্ত্রী পাখীর কাছে নিজের পালকের বর্ণচ্ছটা দেখায়। চিত্রে কেবল পিছন দিকটি দেখা যাচ্ছে।)

দ্রুত। অনেক সময় দেখা যায় একটি স্ত্রী-মাকড়সাকে কেন্দ্র করে আট দশটি পুরুষ মাকড়সা এই রকম নৃত্য করছে। এই অবস্থায় স্ত্রী-মাকড়সাটি পেছনের পায়ের ওপর ভিং মেরে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে চক্রাকারে আধ ডজন ব্যাটারীর চোখ দিয়ে প্রেমিকদের প্রত্যেকটি নৃত্যকলা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করছে। তারপর দলটির মধ্যে যেটির নৃত্যকলা, গায়ের বর্ণ এবং অঙ্গভঙ্গী সব চেয়ে ভাল লাগে সেইটিকে সে পতিত্বে বরণ করে নেয়, বাকীগুলি যদি নিতান্ত ভাগ্যবান হয় তাহলে শুধুই প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফেরে, নচেৎ নবপরিণীতা নায়িকা তাদের সকলকে হত্যা করে। অনেক সময় নির্বাচিত ভাগ্যবান নায়ককেও তারা সঙ্গমের পরই হত্যা করে, তার দেহ রস শোষণ করতে সুরু করে দেয়। সাধারণতঃ অনেক জাতের মাকড়সারই স্ত্রীদের আকার পুরুষ অপেক্ষা অনেক বড়। কীট পতঙ্গদের মধ্যেও এরূপ আকারের পার্থক্য অনেক দেখা যায়। পুং-মাকড়সাগুলি আকারে এত ছোট হওয়ার জন্যেই স্ত্রী

(প্রেমালাপরত গ্রীবস্। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরস্পর পরস্পরকে শৈবাল উপহার দিচ্ছে

(১৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জীবজন্তুর পূর্বরাগ

(১৯৪ পৃষ্ঠার পর)

মাকড়সার পক্ষে তাদেরকে হত্যা করা এত সহজ হয় এবং এই কারণেই কোর্টসিপের সময় নায়িকার মন বুঝে তাদের ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে তার কার্য্যে এগোতে হয়। কোর্টসিপে পুরুষ মাকড়সার বর্ণ একটি অতি প্রয়োজনীয় গুণ।

এবার কীট-পতঙ্গের মধ্যে কোর্টসিপের রীতি একটু পর্য্যালোচনা করে দেখা যাক। "ড্রসোফিলা" (Drosophila) বা উনকি মাছিদের মধ্যে চোখের রং, ডানার আকার প্রভৃতিতে যথেষ্ট পার্থক্য আছে; সেগুলি কোর্টসিপে কতদূর কাজে লাগে তা ঠিক বলা যায় না। পুরুষ উনকি মাছি স্ত্রী মাছির সামনে ডানা কাঁপিয়ে অনুরাগ জানায়। সাধারণ মাছিও ডানা কাঁপায় এবং তার সঙ্গে পেছনের পা দু'খানি বাইরে বের করে পরস্পরের সঙ্গে ঘসে।

মেরুদণ্ডী জীবই (Vertebrates) শব্দ করতে পারে। অমেরুদণ্ডী জীবদের মধ্যে একমাত্র কীট পতঙ্গেরাই এ শক্তি পেয়েছে। এদের কেবল পুরুষেরাই শব্দ করতে পারে— সাথী সংগ্রহের কাজেই শব্দ এদের সাহায্য

(কোগু পাখী মাথার ঝুঁটি ফুলিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রেমালাপ করছে।)

করে। ঝিঁঝিঁপোকা বা উইচিংড়ে (cricket) এবং ক্যাটিডিডদের (Katydids) সামনের ডানায় এক রকম কাঁকড়িকাটা শব্দযন্ত্র থাকে; ঐ অংশের ভেতরটা বাদ্য-যন্ত্রের মত ফাঁপা। ঐ যন্ত্র দু'টি পরস্পরের সঙ্গে ঘর্ষণ করে এরা তীক্ষ্ণ ঝিল্লী রব করে—এর উদ্দেশ্য হলো দূরের স্ত্রী-কীটকে আমন্ত্রণ করে কাছে ডেকে আনা কিম্বা কাছের নায়িকাকে গান শুনিয়ে মুগ্ধ করা। ফড়িং (grass hoppers)রাও এই রকম শব্দ করতে পারে; এদের পেছনের বড় পা দু'খানিতে করাতের দাঁতের মত দাঁত কাটা থাকে আর ডানার ধারে কতকগুলি কাঁকড়ি থাকে। পায়ের করাত ডানার কাঁকড়ির উপর ঘসে এরা শব্দ করে স্ত্রী-ফড়িংকে কাছে ডেকে আনে। সিকেডা (Cicadas) নামক কীটের শব্দ এত জোর যে, এক মাইল দূর থেকে তা শোনা যায়। এদের পেটের তলায় এক জোড়া ছোট ঢাকের (Drum) মত বাদ্যযন্ত্র থাকে। ঐ যন্ত্রের উপরের চামড়া অতি দ্রুত
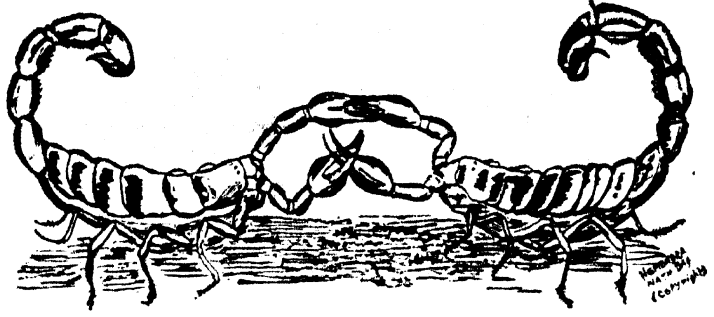
(কাঁকড়া বিছার প্রেমালাপ।)

সংকোচন (Contraction) ও প্রসারণ (relaxation) করে এরা শব্দ বার করে। গেছো-উইচিংড়েদের পেছনে একরকম গ্রন্থি (Gland) থাকে। কোর্টসিপের সময় ঐ গ্রন্থি থেকে একরকম মিষ্টি রস বার হয়। এরা শব্দ, মিষ্টরস ও ডানার বিচিত্র কম্পন দ্বারা স্ত্রী-কীটকে আকৃষ্ট করে। গুটিপোকা ও প্রজাপতিদের দেহ থেকে নানারূপ গন্ধ বাহির হয়; তাতে এক লিঙ্গ অপর লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শুঁড় বা য়্যান্‌টেন এদের প্রধান প্রেমোদ্দীপক যন্ত্র।

ভেকদের মধ্যে গায়ের রং দেখান, নৃত্য প্রভৃতি কিছুই নেই; তবে বর্ষাকালে পুরুষ ব্যাঙরা "ভোকাল স্যাক" (vocal sac) হতে শব্দ করে স্ত্রী ব্যাঙদের উত্তেজিত করে। তারপর আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় এরা বহুক্ষণ থাকে, তাই বলে ঠিক সঙ্গম বলে কিছু নেই। ডিমের আধান (fertilisation) হয় দেহের বাইরে।

এইবার পাখীদের কোর্টসিপের কথা বলে আমরা এ প্রবন্ধ শেষ করব। এদের মত এত ভাব-প্রবণ জীব (কীট-পতঙ্গ ব্যতীত) সৃষ্টিতে আর নেই। এদের কোর্টসিপও অত্যন্ত উঁচু দরের, পূর্ব্বেই তার কিছু কিছু আভাস দিয়েছি।

জুলিয়ান হাক্সলির মতে,—"যে সকল পাখীর মধ্যে যত বেশী "বহু বিবাহ"
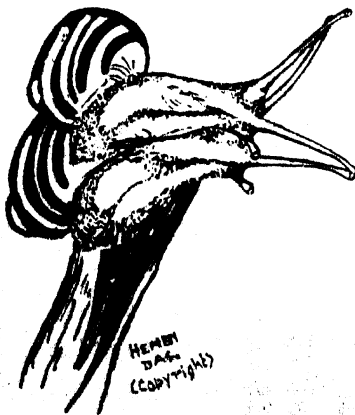
(শামুকের প্রেমালাপ।)

(Polygamy) দেখা যায়,—তাদের মধ্যে তত রকম কোর্টসিপ দেখা যায়।" এ ক্ষেত্রে পুরুষ পাখীরা "ফুলবাবু"-দের মত,— প্রেমালাপের পরেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা সরে পড়ে; কিন্তু দলের মধ্যে "এক বিবাহের" (Monogamy) রীতি আছে এবং পুরুষ স্ত্রী-পাখীর মত ডিমে তা দেয় এবং শাবক পালন করে; (যেমন দাঁড়কাক-দের মধ্যে), তাদের মধ্যে কোর্টসিপের প্রবৃত্তি তত তীব্র হয়। এদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে রংয়ের পার্থক্যও তত বেশী নেই।
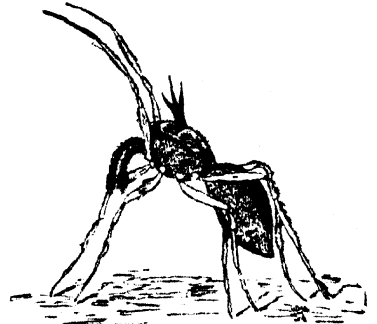
(স্ত্রী মাকড়সার সামনে পুরুষ মাকড়সার নৃত্য।)

এদের মধ্যে দুই লিঙ্গের পক্ষীই সমান অঙ্গভঙ্গী করে প্রেমালাপ করে। অনেক পাখীর পুরুষরা নিজের নিজের সীমানা করে রাখে; প্রেমালাপের সময় ঐ সীমানার মধ্যে উত্তেজিতভাবে পুরুষ পাখী গান গেয়ে শিস দিয়ে ও অঙ্গভঙ্গী করে ঘোরে। তার অঙ্গভঙ্গী, বর্ণ ও গানে মুগ্ধ হয়ে কোন তরুণী পাখী ঐ সীমানার মধ্যে উড়তে উড়তে এসে নামলেই, সে বর্ণের ঘটা ও ছল-কলার চাতুর্য্যে তাকে মুগ্ধ করে আপন করে নেয়।

এক পাখীর সীমানায় অপর পাখীর প্রবেশাধিকার নেই, প্রবেশের চেষ্টা করলে নব-বিবাহিত দম্পতীর পুরুষটি কিম্বা উভয়েই তাকে মেরে সীমানার ভেতর থেকে বার করে দেয়। নবদম্পতী নিজ সীমানার মধ্যে বাসা বাঁধে। ময়ূর ও অপর কয়েকটি পাখীর কেবল পুরুষের বিস্তৃত পেখম ও অতি উজ্জ্বল রংয়ের ডানার পালক আছে, ডানা ফুলিয়ে পেখম মেলে বিচিত্র ভঙ্গিমায় ময়ূর ময়ূরীর চারপাশ ঘিরে ঘোরে।

(২১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আশ্বিন ১৩৫১

গোপাল ভৌমিক

ক্ষুধাশীর্ণ কঙ্কালের সার
রাজপথে নেই আজ—
শূন্য আজ ঘরের দুয়ার :
নির্বিকার নাগরিক জীবন-যাত্রায়—
ঢেউ তুলে এসেছিল যারা—
তারা আজ বুদ্বুদের মতন মিলায়
সমুদ্রের জলে—
আমাদেরই দয়া আর দাক্ষিণ্যের ফলে।
তবু কেন স্বস্তি নেই—
কেন তবু ভীতি-পূর্ণ মন ?
কোথায় লুকালো আজ আশ্বিনের সোনালী স্বপন !

এখনও রক্তাক্ত দিন—
মেঘ-লিপ্ত উদার আকাশ :
কটু-গন্ধ বারুদের চাপে
পৃথিবীর ঘন নাভিশ্বাস—
দূর থেকে শুনি শুধু—
অসহায় বন্দীর মতন ;
ব্যর্থ হতে চলেছে কি
আমাদের মেধা ও মনন ?

আগামী পৃথিবী তবু
কথা কয় অস্ফুট ভাষণে :
আমাদের নিরাসক্ত মনে—
সুদূরের সুর বাজে বাধাবন্ধহীন—
চোখের সম্মুখে ভাসে—
আশ্বিনের রক্ত-ঝরা দিন !

যন্ত্রযুগের স্বপ্ন-হারানো পথে
হে কালপুরুষ, দৃষ্টি সজাগ রাখো ;
দুর্গত আসে দুঃখ-জয়ের রথে—
হে কালপুরুষ, নতুন স্বপ্ন আঁকো !
দুঃসহ বাধা, দুর্যোগ অবহেলে
দুর্মর আশা রক্তে ওদের নাচে ;
বিরাট ত্যাগের বিস্মিত দীপ জেলে
ধ্বংসের বুকে সৃষ্টির সুধা যাচে !
গগন প্রান্তে আর্ত-আঁধার দোলে :
দুর্গম পথে—দুর্গত হয় পার !—
লাঞ্ছিতা ধরা, বহু মৃত্যুর কোলে
নবজন্মের শঙ্খ বাজালো কারে ?

* * *

ইস্পাতের কাঁপে শক্তি মুখর হয়ে,
ঈপ্সিত বুঝি লক্ষ্য উঠেছে ভেসে ;
বলিষ্ঠ প্রাণ কঠিন সাধনা লয়ে
ওই যে দাঁড়ালো দৃষ্টি সীমায় এসে !
কুটিল স্বার্থ, প্রবঞ্চনার ত্রুটি'
সহজ সত্য—সবল চিত্তে হাসে ;
দৃষ্টি তোমার কতদূরে ওঠে ফুটি—
হে কালপুরুষ, কী তুমি লক্ষ্য করো ?

* * *

ক্লান্ত রজনী অস্তে নামিতে চায় ;
লুণ্ঠিত দিন—পূর্ব তোরণ-পারে—
মহামুক্তির আসন্ন সীমানায়,
রক্ত নিশান উদয় ঊষার দ্বারে !!

আকাশে জেগেছে রোদ সাতদিন বাদে,
আজ পৃথিবী করিছে চকচক
জলে-ভেজা নটেগুলো তাজা হয়ে হাসে,
আহা লাউডগা পেয়েছে জীবন
ভাদরের জলে ধুয়ে তকতকে হয়ে গেছে
আমাদের দালান ও রক
ছাখো, ছাখো, আহা ছাখো, রকে শুয়ে সোনা-রোদ
আরামে করিছে গনগন।

আকাশে জেগেছে রোদ,
আমাদের ভাঙা ছাত শুখায়ে হয়েছে খটখট
ন্যাকড়া ও কাঁথাগুলো শুখাতে তো দেয়া যায়,
বৌদি তো এখুনি পারে দিতে
বড়িগুলো ছাদে দিতে খুড়িমাকে বলি,
কই, খুড়িমা কর না চটপট,
বড়িগুলো বড় ভালো, ভালো বিউলির বড়ি,
বড়ি তুমি ভালোবাসো খিতে ?

আকাশে জেগেছে রোদ, খাটে বড় ছারপোকা,
রাতে ভালো হয় নাক ঘুম
একটু গরম জল বঁচিরে করিতে বলি।
— মণি কোথা, মণি ওরে মণি
বঁচি কোথা, আন ডেকে' ;
একাকী বাগানে ঢুকে' গাছের লাগালি কেন ধুম,
বইগুলো রয়ে কাটে, রোদে সব মেলে দেনা।
বই-এর রুইরা সব শনি।

এমন সোনার দিন কোথা শুধু বসে' বসে'
কেন মিছে কর বকবক,
চটপট ওঠো। চলো। আকাশে জেগেছে রোদ।
পৃথিবী করিছে চকচক।

গোয়েন্কা এণ্ড কোং

কারসিয়াং (দারজিলিং)

আধুনিকতম প্রণালীতে পরিচালিত
উত্তর বঙ্গের বৃহত্তম ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান

ম্যানেজিং এজেন্টস্ :—

দারজিলিং রোপওয়ে কোং লিঃ

যাতায়ত ব্যবস্থা { আকাশ পথে : দারজিলিং — বিজনবাড়ী
মোটরে : শিলিগুড়ি — দারজিলিং }

দারজিলিং প্রপারটীজ. লিঃ

কারসিয়াং হাইড্রো-ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ

গোয়েন্কা এণ্ড কোং (সেলস্) লিঃ

অটল টী কোং (১৯৪৩) লিঃ

সংশ্লিষ্ট কোম্পানীসমূহ :—

গলগলিয়া রাইস এ্যাণ্ড অয়েল মিলস্

এন্, সি, রাইস মিলস্, ইসলামপুর

গোয়েন্কা কমারশিয়াল ব্যাঙ্ক

এজেনটস্ :—

বারমা শেল : হুগলী ফ্লাওয়ার মিলস্ : ডানলপ রাবার :
রোহটাস্ সিমেণ্ট : হ্যাডফিল্ডস্ পেইণ্ট : ইত্যাদি, ইত্যাদি।

দারজিলিং, ঘুম, কারসিয়াং, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, বাগডোগরা,
ময়নাগুড়ি, কিষেণগঞ্জ এবং ৩০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম :—"গোয়েন্কা"

টেলিফোন :—৩৩

সুখেও নয়, সখেও নয় একান্তই চাকুরির দায়ে অনেক ধাক্কা সহিয়া কোন রকমে ট্রামের পা দানীতে পা দেওয়া গেল। কণ্ডাক্টর হাঁকিলেন, দেখবেন বাবুরা চাকুরির মায়ায় প্রাণ হারাবেন না। ঘণ্টার দড়িটা টং টং করিয়া দু-বার টানিয়া সে আপন মনেই বিড় বিড় করিতে লাগিল, বাবুদের যে কি! সাড়ে ন'টা বাজলে আর দিগ্‌বিদিগ জ্ঞান থাকে না, প্রাণের চেয়ে চাকুরির মূল্যটা যেন অনেক বেশী। এক এক সময় আমাদেরই ভয়ে প্রাণ কাঁপে অথচ তাঁরা নির্ব্বিকার। পায়ের সঙ্গে প্রাণটা ফস্‌কালে কি আর চাকুরি থাকবে? তবু সাবধানও হবে না, দু'মিনিট আগেও বেরুবে না।

কথাটা কানে গেল অনেকেরই, কিন্তু কারোই কোন উত্তর দিবার উৎসাহ ছিল না। প্রাণ বড়, না চাকুরি বড়,—বাঙ্গালী হইয়াও কণ্ডাক্টর তা জানে না! ছোঁড়াটা নূতন ঢুকিয়াছে বোধ হয়। যাহারা ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উপরের রড ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহারা তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল, যাহারা পান চিবাইতে চিবাইতে আত্ম তৃপ্তিতে মসগুল হইয়া চলিতেছিল, তাহারা চোয়ালের হাড় ফুলাইয়া চর্ব্বণসুখেই নিমগ্ন রহিল হাতঘড়িটার চামড়ার মধ্য দিয়া টিকেট প্রবেশ করাইয়া একজন যাত্রী কণ্ডাক্টর ও ইনস্পেক্টরের উভয় মেলিয়া আছে। আর একজন টিকেটের অগ্রভাগ দাঁতের ফাঁকে ঢুকাইয়া সুপারির কুঁচি বাহির করিতে ব্যস্ত। লেডীস সীটের ছাত্রীটির বইএর পাতা হইতে আধখানি দেহ বাহির করিয়া ট্রামের টিকেটখানি আত্মপ্রচার করিতেছে। দূরে প্রথম বেঞ্চে উপবিষ্ট লোকটা শ্বশুরের দেওয়া হাতঘড়িটার দিকে ঘন ঘন তাকাইতেছে, কখনও বা কানের কাছে আনিয়া শব্দ পরীক্ষা করিতেছে। কোট প্যাণ্ট পরা পিছনের ভদ্রলোকটি অটল গাম্ভীর্য্যে বসিয়া আছেন, দশজনের সঙ্গে একত্রে চলার অপমান তাঁহার সহ্য হয় না। কিন্তু উপায় কি? পেট্রল বন্ধ না হইলে কি তাঁহাকে কেহ ট্রামে বসাইতে পারিত? অটল গাম্ভীর্য্যই এখন তাঁহার আভিজাত্যের একমাত্র রক্ষাকবচ। পিছনের বেঞ্চের উকীল ভদ্রলোকটি মাঝে মাঝে বাঁধা নথির কোণ ফাঁক করিয়া কি দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন; আর তাঁহারই পার্শ্বোপবিষ্ট বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বাহির হইতে পকেট থাবড়াইয়া ব্যাঙ্কের পাশ বইখানা ঠিক আছে কিনা অনুভব করিয়া লইতেছেন।

"দেখি আপনার নস্যিটা।" লম্বা বেঞ্চির মাঝখানের ভদ্রলোকটি সবে এক টিপ নস্য হাতে ঢালিয়া নাকে দিতে যাইবে, এমন সময় কোণের লোকটার হস্ত প্রসারিত হইয়া আসিল। ভদ্রলোক নস্যের কৌটাটি অনিচ্ছার সহিত তাহার হাতে আগাইয়া দিলেন।

পা-দানী হইতে এক ফাঁকে কাৎ হইয়া কোনমতে উপরে উঠিয়াছিলাম, এবারে দাঁড়াইবার জন্য পিছনের দিকে পা বাড়াইতেই ঊর্দ্ধবাহু দাঁড়ানো ভদ্রলোকটি রুখিয়া উঠিলেন, কোথায় যাচ্ছেন, এখানে কি জায়গা আছে?

থতমত খাইয়া জড়সড়ভাবে সেইখানেই থামিয়া গেলাম। ভদ্রলোক থামিলেন না। তিনি রীতিমত বক্তৃতা সুরু করিয়া দিলেন। যত সব হা-ঘরে, পিছনে কত ট্রাম আসছে তবু একটু সবুর সইবে না; আগের গাড়ীতে ওঠাই চাই। এবারেও তাহার কথায় কোন সাড়া পাওয়া গেল না। গাড়ীশুদ্ধ সব লোক চুপ; কেবল একজন লোক মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—থামুন! থামুন। অকস্মাৎ এক ভদ্রলোকের চোখের ইসারা আমাকে আহ্বান জানাইল, 'এখানে জায়গা আছে।'

হেঁচকার চোটে দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতেই ট্রাম আবার ষ্টার্ট দিল।

'বাঁধকে, বাঁধকে!' 'রোখো! রোখো'। ভিতর বাহিরের সমবেত কোলাহলে সকলকে সচকিত করিয়া তুলিল।

প্রায় সাত আটজন মহিলা ধাক্কাধাক্কি করিয়া গাড়ীতে উঠিবার চেষ্টা করিয়াও উঠিতে পারেন নাই। ড্রাইভার তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে। সকলের সমবেত চীৎকারে গাড়ী আবার থামিল। মহিলাগণ এবং কয়েকজন পুরুষ হুড়মুড় করিয়া উঠিলেন। গাড়ীর মধ্যে আসন ছাড়িয়া দিবার একটা অস্বস্তি-জনিত ব্যস্ততা লাগিয়া গেল। এই অসময়ে বিশেষতঃ অফিসের এই ভীড়ের মধ্যে এমন দলবেঁধে বিল বিল করে কি না বেরোলেই নয়? লেডিস সিটের ভদ্র-লোকেরা উঠিয়া শশব্যস্তে স্থান করিয়া দিলেন। অপর লোকদের কেহ কেহ নিজ আসন ছাড়িয়া দিয়া দুই সিটের মধ্যবর্ত্তী সরুপথে গিয়া দাঁড়াইলেন। কেহ বা উঠি উঠি করিয়াও উঠিলেন না। যেখানে ছিলেন সেইখানেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

পিছনের যে লোকটি দুই মিনিট আগে আমাকে মুখ খিচাইয়াছিলেন, তিনিই মুরুব্বিয়ানা সুরে বলিলেন, আপনারা সিট-গুলো একটু ছেড়ে দিন, দেখছেন না লেডিস! দেখিতে অবশ্য কাহারো বাকী ছিল না। উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে যুবক বৃদ্ধ সকলেই একবার দৃষ্টি-ভোগ সারিয়া লইয়াছেন। অন্ততঃ এক মিনিটের জন্যও সামনে, পিছনে, ডানে, বামে, আড়ালে আবডালে যিনি যেখানে ছিলেন, সকলের সম্মিলিত ও কেন্দ্রীভূত দৃষ্টি এই মহিলাবাহিনীকে অভিনন্দিত করিয়াছে।

গায়ে পড়া লোকটি অসহিষ্ণু হইয়া উঠি-লেন, দেখছেন না, মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছেন।'

প্রথম বেঞ্চির যুবকটি আপন মনে মৃদুকণ্ঠে গুঞ্জন করিতে লাগিলেন, 'দাঁড়িয়ে আছেন ত মাথা কিনে নিয়েছেন। আমরাও অমন ঢের দাঁড়িয়ে থাকি।'

পাশের যুবকটি তাহার দিকে ঘাড়টা ঈষৎ বাঁকাইয়া আস্তে উত্তর করিলেন, 'তা বল্‌লে কি হয়? মেয়েদের একটা মর্য্যাদা আছে ত!'

নিশ্চয়ই আছে। বাঙ্গলার যুবক নারীর মর্য্যাদা জানে না—এমন অপবাদ তার শত্রুর মুখেও শোভা পায় না। এই ত দেখলে চোখের সামনে যুবতী দেখে কত লোক লাফিয়ে উঠে জায়গা ছেড়ে দিলে।

(২০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শিকারী জীবন

কুমার
শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়

শিকারের সাফল্য সম্বন্ধে অনেকে অনেক কিছু গালগল্প করিয়া থাকেন। আমি এখানে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে কয়েকটি ব্যর্থতার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিব।

একবার এক গ্রামে ভয়ানক বাঘের অত্যাচার হইয়াছিল। জনরব হইল, সেখানকার মিত্তিরদের বাগানে বাঘের আড্ডা। সে বাগানটা নিবিড় জঙ্গল। উঁচু মাচান বাঁধিয়া সেখানে গিয়া রোজ বসিয়া থাকিতাম; বন্দুকের মাছির উপর চূণের একটু গোটা দেওয়া হইয়াছিল, সন্ধ্যার পর মশার কামড়ে সেখানে তিষ্ঠান দায় হইত। তিন চারিদিন মশার কামড় সহ্য করিয়াও দুইটা তিনটা পর্য্যন্ত জাগিয়া বসিয়া থাকিলাম। একদিন রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহরে মনে হইল কি একটা যেন ছাগলের কাছে আসিতেছে। বন্দুক তুলিয়া লইয়া ধাঁ করিয়া গুলী ছুঁড়িলাম। গুলীটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল না। টর্চ্চের আলোতে জানোয়ারটাকে ভাল করিয়া দেখিলাম,—সে একটা কুকুর। "বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া।" সেই হইতে বিরক্তি ধরিয়া গেল। আর মাচানে বসি নাই।

(২)

আর একবার খবর পাইলাম, লালগোলা হইতে ক্রোশ দুই দূরে একটা বাঘ গরু মারিয়া জঙ্গলে টানিয়া ফেলিয়াছে। বাঘ মারিবার মতলবে মোটরযোগে সেখানে গিয়া পৌঁছিলাম। সুবিধামত এক গাছ দেখিয়া আমার দলবল ঠেলিয়া ঠুলিয়া কোনমতে আমাকে সেই গাছে চড়াইয়া দিল। দেহখানা এমন নয় যে, নিজের চেষ্টায় চড়িয়া বসিতে পারি। তাই পরের সাহায্যেই একটু শক্ত হইয়া বসিবার চেষ্টা করিলাম। যদিও ইহা সঠিক জানি যে, সত্যসত্যই এখনি পালে বাঘ পড়িলে ইহারাই পাঁইপাঁই চম্পট দিতে কসুর করিবে না—তবুও রহস্যচ্ছলে বলিলাম "দেখ, যেন তোমরা গাছে তুলিয়ে মই কেড়ে নিও না।" তাহারা প্রত্যুত্তর দিল না—শুধু একবার বক্ষ স্ফীত করিয়া আমার দিকে সগর্ব্বে চাহিল, তাহার অর্থ—"আমরা সে জাতের লোক নই।" সঙ্গে একটি মুসলমান শিকারী ছিল, সে আর একটি গাছে উঠিল। সৌভাগ্যবশতঃ দু'জনেই বেশ ভালো জায়গা পাইয়াছিলাম। বাঘ গরু ধরিয়াছিল দুপুর বেলায়, আর আমরা যখন সেখানে পৌঁছিলাম তখন ঘড়ি'র কাঁটা পাঁচের উপর। বেলা আছে। শুনিয়াছিলাম, বাঘেরা নাকি যেখানে শিকার ফেলিয়া যায়, সেখান হইতে একটু সরাইলেই অমনি তাহা বুঝিতে পারে। যাহা হউক, গাছে চড়িয়া আমরা বাঘের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। চাঁদের আলো পান করিয়া পৃথিবীর মুখে হাসি ফুটিয়াছে। বনের ঘন নিবিড় ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার শুভ্র রেণু ঝরিয়া পড়িতেছে। পাতায় পাতায় তাহার কোমল আভা লাগিয়া বনভূমিকে অপূর্ব্ব মায়াময় করিয়া তুলিয়াছে। "পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম" এরূপ মনের ভাব লইয়া একটা ডালে হেলান দিয়া বেশ করিয়া বসিয়া আছি। কিছুক্ষণ পরে বন্দুকের নলে গুলী পুরিব বলিয়া কোলের কাছে বন্দুক রাখিয়া চারিদিকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছি, আর বনের পাখীর পাখার শব্দে চমকাইয়া উঠিয়া সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছি; এমনিভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। এমন সময়ে একটা খস্‌-খস্‌ শব্দ কানে আসিল। চাহিয়া দেখি, "Sir" আমাদের "Right Royal style"এ আসিয়া পড়িয়াছেন আর গর্ব্বিত কটাক্ষে চতুর্দ্দিক দেখিয়া লইতেছেন। "এইবার একটা রফা হইয়া যাক্" মনে করিয়া বন্দুক তুলিয়া লক্ষ্য স্থির করিয়া ট্রিগার টিপিলাম। খট্ খট্ শব্দ হইল। হায়! পূর্ব্ব হইতে যে গুলী পুরিব মনে করিয়া বসিয়াছিলাম, তাহা আর পোরা হয় নাই। মুসলমান শিকারী বন্ধুটি আমা হইতে অনেকটা দূরে ছিলেন। তিনিও গুড়ুম গুড়ুম করিয়া শব্দ করিলেন। প্রতিধ্বনি ব্যঙ্গ করিয়া ফিরিয়া আসিল "গুড়ুম গুড়ুম।" কা কস্য পরিবেদনা! ব্যাঘ্রটি একটি বিরাট লম্ফ দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য নিজেকে শতবার ধিক্কার দিলাম। মুসলমান শিকারীটি বোধ হয় মনে মনে একটু হাসিয়াছিলেন। খানিকক্ষণ পরেই গাহিয়া উঠিলেন, 'পেয়ে মাণিক হারালাম মা, এমনি আমি লক্ষ্মীছাড়া'। আমি বলিলাম, তুমিত ভারী বেরসিক হে, এমন সময়ও তোমার গান আসে? আমার মন ব্যর্থতার অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে, কেবল ভাবিতেছি একটু অপ্রস্তুত হওয়ার জন্য শিকারটা ফসকাইল! কেন এ ভুল করিলাম? মুসলমানটি উত্তর করিলেন, "গান গাহিবার এমন সময় আর পাব না। অবশ্য যদি আপনি কিছু মনে করেন তবে এই চুপ করলাম।"

আমি বলিলাম, "চল ঢের হয়েছে। দু'জনেই বেশ বুদ্ধিমান। এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই। ঘরে ফিরিলাম—কিন্তু অনেক সাধ্য সাধনাতেও নিদ্রাদেবীর সাক্ষাৎ পাইলাম না। সেদিনের অবিমৃষ্যকারিতার কথা কোনদিন ভুলিতে পারিব না। শিকারীর হাতের কাছ হইতে সুযোগ হাতছাড়া হইলে যে কি কষ্ট তাহা শুধু ভুক্তভোগীই বুঝিতে পারিবেন।

(৩)

বহুদিন পরে কলিকাতা হইতে সেই দিনই বাড়ী ফিরিয়াছি। প্রিয়জনের মুখে হাসি ফুটিয়াছে। মাঝে মাঝে আমার রাসভকণ্ঠে গানও হইতেছিল, 'দীর্ঘ বরষ পরে যদি ফিরে এলে ঘরে'—। আবার সেদিন কেবল একটা কথাই মনের আনাচে কানাচে ঘুরিতেছিল যে পল্লী দেয় মাধুর্য্য, আর নগরী দেয় মত্ততা। এমন সময় একটি লোক আসিয়া খবর দিল যে, একটি বড় চিতা বাঘ জঙ্গলে শুইয়া আছে। সে গাছ কাটিতে গিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া পলাইয়া আসিয়াছে।

শুনিয়াই মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। কোথায় গেল পথের ক্লান্তি, কোথায় গেল ঔদাসীন্য। কোথায় গেল রাসভকণ্ঠের গান। তখনই সাজিয়া গুজিয়া বাহির হইবার ধুম পড়িয়া গেল। হাতীতে গেলে দেরী হইবে বলিয়া মোটরে করিয়া চলিলাম। সঙ্গে একটি সাহসী ভৃত্য—সেও দু'একটা শূকর শিকার করিয়াছে, আর চলিল আমার একটি পিসতুত ভাই, সে যদিও কখনও বনের ব্যাঘ্র দেখে নাই, পাখীও দু'একটির বেশী মারে নাই, কিন্তু উৎসাহের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। মোটর দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল, মন আরো দ্রুতবেগে উড়িয়া চলিল। শিকারস্থলে পৌঁছিয়া দেখি, বনের চারিদিকে সড়কি, কাস্তে প্রভৃতি অস্ত্রহাতে করিয়া বীরপুরুষগণ দাঁড়াইয়া আছে। আমি তাহাদের গোলমাল করিতে নিষেধ করিলাম। যে লোকটি বাঘ দেখিয়াছিল তাহাকে বলিলাম "তুমি খুব সন্তর্পণে দেখে এসো সেখানে বাঘ আছে কিনা।" সে আসিয়া জানাইল "না, সেখান থেকে সরে গেছে।" আমি তখন তাহাদের বলিলাম, "তোমরা বিপরীত দিক থেকে চীৎকার করতে করতে আমার দিকে এসো।" শিকার দর্শনেচ্ছু উৎসুক ভ্রাতাটি আমার একদিকে বন্দুক লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সাহসী ভৃত্য বন্দুক হস্তে জঙ্গলের মধ্যে এক গাছে উঠিল। আর, আমি যেদিক হইতে প্রভুর আগমন আশঙ্কা সেই দিকটা বাছিয়া লইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। শিকার কোনপথে আসিবার সম্ভাবনা শিকারীরা তাহা বুঝিতে পারেন। আমি একটা জঙ্গলে-ঘেরা খাঁড়ির ধারে গাছে হেলান দিয়া দাঁড়াইলাম। আত্মীয়টিকে একটু দূরে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানেই রাখা হইয়াছিল, আর তার সঙ্গে দু'জন তীরধারী সাঁওতাল রাখিয়া দিয়াছিলাম। আমার পাশে আমার ড্রাইভার এক রিভলভার হস্তে দণ্ডায়মান। এমনি তাহার ভাব যেন বাঘ আসিলেই তাকে এক গুলীতে শেষ করিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি কোনদিন রিভলভার ছোঁড়েন নাই। একদিন মাত্র জোর করিয়া তাঁহাকে দিয়া রিভলভারে একটা ফাঁকা আওয়াজ করাইয়াছিলাম, এই তাঁহার শিকার নৈপুণ্যের ইতিহাস। অথচ তাঁহার দাঁড়াইবার ভঙ্গীটি দেখিলে কে অবিশ্বাস করিবে যে, তিনি আমাকেই রক্ষা করিবার জন্য বীরপুরুষের ন্যায় সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া আছেন?

জঙ্গল পিটানোর শব্দে বাঘটি আসিয়া

(২০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শিকারী জীবন

(২০২ পৃষ্ঠার পর)

আমার ভৃত্য যে গাছের উপর বসিয়াছিল তাহারই নীচে আট দশ হাত দূরে দাঁড়াইল। বাঘটি অবশ্য তাহাকে দেখিতে পায় নাই। প্রায় আধ মিনিট নিশানা করিবার পর ভৃত্যটি বন্দুকের আওয়াজ করিল। কতবার তাহাকে বলিলাম, "অত দেরী করো না, অত দেরী করো না।"—কিন্তু কে শোনে? ভালো করিয়া নিশানা করা চাই তো? —গুলীর শব্দে এক লম্ফে ব্যাঘ্র আমার সম্মুখে পড়িয়াই অদৃশ্য হইল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও গুলী করিলাম, কিন্তু বাঘ শুধুমাত্র মুখ ফিরাইয়া সগর্জ্জনে বলিয়া দিয়া গেল,—"বেশী বাড়াবাড়ি ভালো নয়। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।" ইতিমধ্যে আমার সাহসী শোফারের হাত হইতে রিভলভার কখন খসিয়া গিয়াছে আর কাঁপিতে কাঁপিতে সে আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। তাহার বস্ত্র পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়াছিল, ইহা না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে!

আমি আমার বহু পুরাতন ভৃত্যকে খুব করিয়া ধমকাইয়া দিলাম; বলিলাম:—"তোমার লম্বা লম্বা কথায় বিশ্বাস ক'রে তোমায় নিয়ে এলাম, আর হাতের কাছ থেকে আজ এমনি শিকার তুমি জীবিত ছেড়ে দিলে! একটা পাঁচ বছরের ছেলে অক্লেশে যে শিকার মেরে ফেল্‌তে পার্‌ত—নিজেকে শিকারী বলে পরিচয় দিতে তোমার লজ্জা হয় না!" সে লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল। আমার আত্মীয়টি আসিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিল, হায়, জীবনে প্রথম বাঘ দেখিব বলিয়া কত আশা করিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু সে আশা আজও পূর্ণ হইল না। আমি দার্শনিকের গাম্ভীর্য্য নিয়া বলিলাম, "মানুষের সব আশাই যদি পূর্ণ হ'ত, তা' হলে তো পৃথিবী স্বর্গ হয়ে যেতো।"

Beaterরা আসিয়া কতজনে কত কিই না বলিতে লাগিল। একজন বলিল, "হুজুর, এত সুবিধে ক'রে দিলাম, তবু মারতে পারলেন না?" আর একজন বলিল, "ওঃ! বাঘটা এমন কাছ দিয়ে চলে গেল হুজুর যে, আমার হাতে বন্দুক থাকলে আর ওকে এক পা-ও নড়তে হ'তো না। আমিই ওকে ঘায়েল করতাম।" আমার এসব ভাল লাগিতেছিল না। শিকার ছুটিয়া যাওয়ায় সারামন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিরক্তি স্বরে বলিলাম, "নাও, সবাই যে খুব বাহাদুর তা টের পাওয়া গেছে! এবার থামো!"

আমার শিকারী জীবনে এই শ্রেণীর অনেক লোককে আমি ভাল করিয়া চিনিয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছি। ইহারা আগে খুব বাহাদুরী দেখাইয়া চারিদিকে ঘিরিয়া বলিতে থাকে, "হুজুরের জন্য আমি জান দিব। আগে আমাদের শেষ ক'রে তবে বাঘ হুজুরকে ছুঁতে পারবে।" আমিও তাহাদের সাহসিক উক্তি শুনিয়া তাহাদের হাতে অস্ত্র দিয়া দেখিয়াছি যে, সত্যসত্যই যখন বাঘ সামনে আসিয়া পড়িত, তখনই সেই বীরপুরুষের দল আগে-ভাগে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিত। বাঘ মারার পর তাহাদের ডাকিয়া যদি বলিয়াছি—"কৈ হে,—প্রাণ দিতে এলে না তোমরা?" তখনই করজোড়ে তাহারা জবাব দিয়াছে—"হুজুর বড্ড ডর খেয়ে ফেলেছিনু!" তাহাদের প্রশংসনীয় সরলতায় মুগ্ধ হইয়া কিঞ্চিৎ বখশিস্ দিয়া আসিতাম।

যাহা হউক, ক্লান্ত অবসন্ন হৃদয়ে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া বাড়ী ফিরিলাম। এক নিকটআত্মীয় বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "কই হে, ক'দিন হাঁটাহাঁটি ক'রে সেদিন তবু একটা কুকুর মেরে এনেছিলে,—আজ তাও আন্‌তে পারলে না!" একটা তীব্র উত্তর কণ্ঠ পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, কিন্তু চাপিয়া গেলাম। বিরক্ত দৃষ্টিতে তাহার পানে একবার চাহিয়া আরাম-কেদারায় শুইয়া পড়িলাম।

শিভালির শরশয্যা

(২০১ পৃষ্ঠার পর)

গাড়ী ভর্ত্তি সব পুরুষ দাঁড়িয়ে থাকবে, আর তাদের উঠিয়ে দিয়ে তাদের জায়গায় সব মেয়ে বসে থাকবে, এটা মেয়েদের পক্ষেও মর্য্যাদার বিষয় নয়। আসলে এটা নারী মর্য্যাদার উৎপাত পুরুষ কত সহিতে পারে তারই একটা পরীক্ষা।

যাহাদের উঠিবার তাঁহারা উঠিয়া জায়গা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, যাঁহারা উঠিবেন না সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাঁহারা বসিয়া থাকিয়া তাঁহাদের পণরক্ষা করিলেন।

শুধু একজন মহিলা ছাড়া আর সকলেই তাঁহাদের জায়গা করিয়া লইয়াছিলেন।

মহিলাটি কোন কথা না কহিয়া, বসিবার কোন চেষ্টা না করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া একটি যুবক উঠিয়া তাহার আসনের দিকে দুই হাত বাড়াইয়া আহ্বান করিলেন, 'আসুন না।'

মহিলাটি সলজ্জ হাস্যে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, থাক্! থাক্! এই বেশ আছি।

কিন্তু সত্যই বেশ থাকিবার কথা নয়। চলন্ত ট্রামের মধ্যে মাঝে মাঝে হঠাৎ ধাক্কা খাইয়া দাঁড়াইয়া থাকা পুরুষের পক্ষেই দুঃসাধ্য, মহিলা ত মহিলা!

গাড়ীটা জোরেই চলিয়াছে।

ভদ্রবেশধারী যে লোকটি তাঁহার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সম্ভ্রান্ত মনে হইলেও তাঁহার আচরণটা যেন ভদ্রতা রক্ষা করিয়া চলিতেছে না। গাড়ীটা একটু ধাক্কা খাইতেই তিনি যেভাবে মহিলাটির গায়ে গিয়া পড়িতেছেন, সেটা যেমন অস্বাভাবিক তেমনি দৃষ্টিকটু। ব্যাপারটা অনেকেই লক্ষ্য করিতেছে। পাশের যাত্রী সংক্ষেপে বলিলেন, 'এদিকে একটু সরে আসুন।'

ভদ্রলোক উত্তরও দিলেন না; নড়িলেনও না। বরং! আবার সেই অস্বাভাবিক ঝুঁকি এবং অঙ্গস্পর্শের আকুলতা।

অনেকেই উগ্র হইয়া উঠিতেছিলেন; কিন্তু কেহ কোন কথা উচ্চারণ করিলেন না। সকলের দৃষ্টি ভদ্রলোকের প্রতি নিবদ্ধ।

লোকটি মহিলাটির আরও গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

কোথাকার বেহায়া? মহিলাটিই বা কেমন? একটু টুঁ শব্দ পর্য্যন্ত করিতেছেন না।

রুদ্ধ রোষে চাপা গলায় জনৈক যাত্রী ভদ্রলোকটির দিকে চাহিয়া বলিলেন,—'সরে দাঁড়ান'; কিন্তু ওপক্ষে ভ্রূক্ষেপের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। গাড়ীর মধ্যে একটা চাঞ্চল্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সকলেই একটা কিছু করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, কিন্তু কি করা যায় ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। এত যাত্রীর ভীড়ে এই মহিলাদলের সম্মুখে বেহায়াকে কি করিয়া শিক্ষা দেওয়া যায় সেই চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠিল।

ওয়েলিংটনের মোড় ঘুরিবার সময় আবার ভদ্রলোকের বুকটা গিয়া ভদ্রমহিলার পিঠে লাগিল। এবারে যাত্রীদের অসহিষ্ণুতার গুঞ্জন আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। একজন আর একজনকে শুনাইয়া বলিলেন, 'যত অসভ্য, অভদ্রতার কি আর জায়গা নেই?' আর একজন মুখ ফিরাইয়া বলিলেন এসব লোক ট্রামে ওঠেইত এই জন্য।' আর একজন ফোড়ন দিলেন, 'লজ্জা বলেও কি কোন পদার্থ নেই?'

ভদ্রলোক কিন্তু নির্ব্বিকার। জনৈক যাত্রী আগুন হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। 'সরে দাঁড়ান মশাই। ভদ্রমহিলা আপনার সামনে দাঁড়িয়ে, তা কি দেখতে পাচ্ছেন না?

এবারে ভদ্রলোক মুখ ফিরাইলেন। রুষ্ট লোকটির দিকে চাহিয়া সম্মুখবর্ত্তী মহিলাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'কে? ইনি? ইনি আমার স্ত্রী। সহধর্ম্মিণী।'

ট্রামশুদ্ধ সব যাত্রী স্তব্ধ হইয়া গেল। এসপ্লেনেড পর্য্যন্ত গাড়ী পৌঁছা পর্য্যন্ত আর কাহারো মুখে একটি শব্দও শোনা গেল না।

সাধনার বেদনা

শ্রীহরেন্দ্রনাথ সিংহ, কবিভূষণ

জন্ম জন্মান্তর ধরি নয়নে নয়নে
হবে কি নীরবে নিত্য নব পরিচয়,
কত যে অব্যক্ত ভাষা আঁখি দু'টি কয়,
চিরদিন মুগ্ধ হ'য়ে সবার গোপনে
তবু মিটিল না সাধ মানব জীবনে,
ব্যথায় গুমরি মরে অজানা হৃদয়,
কতদিন দিবে দুখ হে বন্ধু নির্দ্দয়
জীবন ফুরায় ব্যর্থ আশার স্বপনে।
ধরা যদি নাহি দিবে নশ্বর সংসারে,
দেখাও নিয়ত কেন প্রেমের চাতুরি?
প্রেমের গৌরবে মুগ্ধ অন্তর মাঝারে,
প্রসাদ লভিনু বুঝি স্মৃতির মাধুরি।
জীবন ফুরায় যদি প্রেম সাধনায়,
কেমনে মানব তবে লভিবে তোমায়!

সুবর্ণ রেখা

কমলরাণী মিত্র

অয়ি গিরি-কন্যকা তম্বী
শীর্ণা ক্ষীণাঙ্গী ক্ষিপ্রা
বন্ধন-ভয়-হারা ধন্যি
রূপসী লো রূপ-বিচিত্রা।
বালু-বেলা বন্ধুর-পন্থা
'বন-রাজি-নীলা' ঘন-রঙ্গে,
চঞ্চলা নৃত্য-সানন্দা
লাস্য-নটিনী বিভঙ্গে।
বর্ষণ-পরশনে যৌবন-বন্যা
দেহ ভরে' নেমে এলো শাঙনের রাত্রে;
তাপসিনী অভিসারী গৈরিক-বর্ণা—
প্রেম-মদ উচ্ছল জীবনের পাত্রে॥
কলকল ছলছল—কতো নানা ভঙ্গী;—
তটে তটে ফোটে ফুল বনানী আনম্রা;
শ্যাম-মেঘ হ'লো বুঝি সঙ্গের সঙ্গী,
হৃদয়-গভীরে জাগে স্বপনের তন্দ্রা!
শিলাময় শত শত বাধা আজি চূর্ণা,
দূরে দূরে ডাকে কেকা মিলন-আনন্দে,
বলো কোন্ গৌরবে অয়ি পরিপূর্ণা
অঙ্গে নেমেছে চল উতরোল ছন্দে!!

নোঙর

সুধীর কুমার গুপ্ত

চোখে আজো আলো, বুকে আজো তবু সাহস পাই
হাসি ও আলোতে ছুঁয়ে যাবো গোটা পৃথিবীটাই,
মিলিত শপথে দিকে দিকে তাই ডাক পাঠাই।

ফেরারী স্বপ্ন ছিল যত আজ যাকনা পুড়ে,
মিছে আজো তারা তাদের সে পথ দাঁড়ায় জুড়ে
তাজা বনিয়াদ এ মাটিতে যারা ওঠাবে খুঁড়ে।

আমাদের গড়া মঞ্চ যাদের খেয়ালে কাঁপে
রক্তের স্রোতে নিজ এলাকার সীমানা মাপে,
ভেঙে গুড়ো হোক তাদের শাসন পেশীর চাপে।

কঠিন আশার ভাইতো শরণ নিয়েছি আজ
আগামীর ডাকে হাতে এসে জমে অনেক কাজ,
মন পেতে চায় আর এক রঙের নতুন সাজ।

যাদের হৃদয় এতদিন পুড়ে হয়েছে খাক
তারা এইবার সকল জমিতে নোঙর পাক,
নতুন ফসল যার যত খুসী ছড়িয়ে যাক।

চোখে আজো আলো, বুকে আজো তবু সাহস পাই
হাসি ও আলোতে ছুঁয়ে যাবো গোটা পৃথিবীটাই,
মিলিত শপথে দিকে দিকে তাই ডাক পাঠাই।

আগামী কালের

শ্রীবিশ্বেশ্বর দাশ

আগামী কালের পৃথিবীর গানে গানে
আগামী কালের মানুষের কোলাহলে
তা'দের কথা কি বাজিবে কাহারো প্রাণে
যা'রা চলে যায় দলে দলে যায় চলে:
যা'রা চলে যায় দুর্মদ অভিযানে
তা'দের কথা কি বাজিবে কাহারো গানে?

বিপুলা পৃথ্বী পায়ে পায়ে থরথর:
পায়ে পায়ে লোটে কান্তার লোকালয়:
খর বেয়নেটে ঝল্‌সে দিগন্তর:
ভীরু মেষপাল তৃণমুখে চেয়ে রয়:
অনুগামী ভৃগু পর্ব্বত প্রান্তর:
পৃথ্বী বিপুলা পায়ে পায়ে থরথর:

ঢেউ ভেঙে ভেঙে বেড়ায় ঘুরিয়া কা'রা:
ডুবে ডুবে কা'রা কনভয় মরে খুঁজি:
বুড়ো নেপচুন আকুল পাগল পারা—
রাজ্যশাসন এবার ফুরাল বুঝি:
শিকারী হাঙর ভাবিয়া ভাবিয়া সারা
ডাকাতের বেশে বেড়ায় ঘুরিয়া কা'রা:

নিথর শূন্যে হানাহানি বিগ্রহ:
হেথা প্যারাস্যুট হোথা ওড়ে বম্বার:
মানুষের হাতে মানুষের নিগ্রহ—
ঘুচে জনপদ, জ্বলে গৃহ-সংসার:
দিকে দিকে জ্বালা ক্রন্দন দুঃসহ:
চলে অহরহ হানাহানি বিগ্রহ:

আগামী কালের বর্ষামুখর রাতে
তা'দের কথা কি পড়িবে কাহারো মনে:
কেহ রহিবে কি পথ চেয়ে মালা হাতে
ফাগুনের মধু সন্ধ্যায় বাতায়নে:
অশ্রুশিশির ঝরিবে কি পরিখাতে:
স্মরিবে কেহ কি তাদেরে বর্ষারাতে?

আবার চলিবে মানুষের আনাগোনা
হয়ত আগামী কালের পৃথিবী মাঝে:
ঊষর মরুতে ফসল হবে গো বোনা:
তরুণ-তরুণী সাজিবে নূতন সাজে:
ইউক্রাইনে হয়ত ফলিবে সোনা:
র'বে না কেবল তাহাদের আনাগোনা।

শারদীয় উৎসবে
রূপ সাধনার
প্রধান অর্ঘ্য
!
J. SAHA

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

স্থাপিত ঃ ১৯১৪ ইং

হেড অফিস ঃ কুমিল্লা

কলিকাতা অফিস ঃঃ ৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট।

সারা ভারতে ও ভারতের বাহিরে যাবতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবসা করা হয়।

নিরাপদ সংস্থানার্থ এই ব্যাঙ্ক এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে

ক্রমোন্নতির পরিচয়

মূলধন এবং রিজার্ভ তহবিল

সন	বিক্রয়ীকৃত	আদায়ীকৃত	রিজার্ভ
১৯৪২	৩৯,৩৬,৬০০৲	২২,২০,০৫৫৲	৯,৪০,০০০৲
১৯৪৩	৫৫,৮৬,৪৬০৲	৩০,৪৭,৭২৯৲	১৪,০০,০০০৲
১৯৪৪ আগষ্ট পর্য্যন্ত	৭৮,০০,০০০৲	৩৮,০০,০০০৲	১৯,০০,০০০৲

আয় লাভ এবং গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি

সন	আয়	নীট লাভ	গভর্ণঃ সিকিউরিটি
১৯৪২	১১,৬২,২৮৯৲	২,১৭,৭৫৪৲	১০,৯৫,৩১,০০০৲
১৯৪৩	১৬,৪৭,৪৫৭৲	৩,৬১,২৩৬৲	২,০৯,০০,০০০৲
১৯৪৪ প্রথমার্দ্ধ	১০,৮৩,২২৮৲ জুন পর্য্যন্ত	৩,৭৯,২০৯৲ জুন পর্য্যন্ত	২,৮৫,০০,০০০৲ জুন পর্য্যন্ত

সমস্ত পৃথিবীতে এজেন্সী ও শাখা অফিস আছে।

লণ্ডন এজেণ্টস্—ওয়েষ্ট মিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিঃ

এমেরিকান এজেণ্টস্—ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক

অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্টস্—ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ মিঃ এন, সি, দত্ত, এম, এল, সি

আগে ও পরে

শোভা গুহ

সাদার্ণ এ্যাভিনিউয়ের একটি অতি সুদৃশ্য প্রাসাদোপম অট্টালিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অলকা দেবী বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। ভুল হইল নাকি? তিনি চশমাটি খুলিয়া বাড়ীর নম্বর এবং পিতলের ফলকে ঝকঝকে এস-কে-মিটার নামটি আর একবার দেখিয়া লইলেন। সামনে বিস্তৃত ফুল বাগিচার বুক চিরিয়া যে লাল সুরকির পথটি অট্টালিকা পর্য্যন্ত গিয়াছে, সেই দিক হইতে কয়েক মিনিট তাঁহার মুগ্ধ চোখ দুইটি ফিরাইতে পারিলেন না। ফটকের পার্শ্বেই টুলের উপর উপবিষ্ট হিন্দুস্থানী দারোয়ানটি অলকা দেবীর হাব-ভাব লক্ষ্য করিতেছিল, মৃদু হাসিয়া বলিল,—কিসকো মাংতে হেঁ? ইয়ে মিটার সাহাবকা কোঠী হায়। অলকা দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ মিটার সাহেব?—শিশির মিটার।

অলকা দেবী মনে মনে বলিলেন, বোধ হয় সেই শিশির মিত্তিরই হইবে। দেখাই যাক্ কোন্ শিশির। এতদূর আসিয়াছি যখন না দেখিয়া ফিরিব না।

একটি রুচিসম্পন্ন আধুনিক হলের সামনে দারোয়ান থামিল, অলকা দেবী চাহিয়া দেখিলেন, হলের ভিতর সারি সারি টেবিল এবং চেয়ার। প্রত্যেক টেবিলে একটি করিয়া চায়না ফ্লাওয়ার ভাস এবং তাহাতে টাটকা গোলাপের তোড়া। মাথার উপর সারি সারি পাখা, সার্সি দেওয়া বড় বড় জানালায় লেসের পর্দা ঝুলিতেছে। হঠাৎ আসিয়া অলকা অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। হলটির শেষের দিকে একটি ভোজের আয়োজন চলিতেছে—টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া মিসেস মিটার অর্থাৎ করুণা হাসিয়া হাসিয়া কাহাকে যেন কি বলিতেছিলেন। তাঁহার নজরই সর্ব্বাগ্রে দারোয়ানের পশ্চাতে অলকার উপর পড়িল। করুণা ক্ষিপ্রপদে অলকার নিকট আসিয়া হাত ধরিয়া বলিলেন—উঃ! ৭।৮ বছর পর দেখা, এসো ভাই এসো। করুণার সুশোভিত অঙ্গের দিকে চাহিয়া অলকা বলিলেন—চল।

করুণা অলকাকে ভিতরে আনিলেন। অলকা এক একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেছিলেন। করুণা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেখছ কি?—তোমায় বেশ লাগছে দেখতে।—তাই নাকি, ঠাট্টা করছ?—না না সত্যি বলছি।—বয়স তো চার-এর কোঠায় এসে গ্যাছে।—তাতে কি হয়েছে। যৌবনকে তোমরা বেঁধে রাখতে জান। তোমাদের এভারগ্রীণ বলা যায়।—তাই নাকি?

মিষ্টার এবং মিসেসের দল অলকার দিকে চাহিয়া ছিলেন। করুণা বলিলেন, তোমাকে এদের সঙ্গে ইন্‌ট্রোডিউস করিয়ে দিই, এস। তিনি আরম্ভ করিলেন—এ আমার বাল্যবন্ধু অলকা দেবী, খুলনা হাইস্কুলের হেড্ মিস্ট্রেস। অলকা হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন। আর এঁদের পরিচয় দিই বলিয়া করুণা বলিতে লাগিলেন—মিঃ আর মিসেস ঘোষ, মিঃ এবং মিসেস বর্ম্মণ, মিঃ এবং মিসেস তালুকদার, মিঃ এবং মিসেস শেঠ, মিঃ এবং মিসেস দাশ ইত্যাদি ইত্যাদি। মিষ্টার এবং মিসেসের দল অর্দ্ধবিকশিত দন্তে হাস্যপূর্ব্বক প্রতি নমস্কার করিলেন।

উর্দি পরিহিত বয় নানারকম দেশী এবং বিদেশী খাবারের প্লেট লইয়া ছুটাছুটি করিতেছিল। অলকা অত্যন্ত আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি আজ? এসে পড়ে আমার বড্ড লজ্জা হচ্ছে। করুণা জবাব দিলেন—এসে পড়ে তোমার লজ্জা হচ্ছে, কিন্তু আমার খুব ভাল লাগছে। আজই তো আসবার দিন। আমরা একটা ক্লাব করেছি—নাম বিশ্রাম-বীথি। আজ তারই বার্ষিক সম্মিলনী। মিঃ ভাদুড়ীর কানে কথাটা আসিল, তিনি আরম্ভ করিলেন—হোল উইক্-এ আমাদের ট্রিমেন্‌ডাস্ খাটতে হয়, রবিবার এখানে এসে একটু বিশ্রাম করা হয় আর কি। একটু গল্প গুজব, একটু আমোদ প্রমোদ না করলে চলে না। রিক্রিয়েশনের জন্যে এটা আমাদের জীবনে অত্যন্ত দরকার। মিঃ বর্ম্মণ ভাদুড়ীকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, জানেন অলকা দেবী, কপাল গুণে এমন একটি হোস্‌টেস্ পেয়েছি, যাঁর আতিথ্যে আমরা পরম সুখে আছি। মিসেস মিটারকে হোস্‌টেস্‌রূপে না পেলে আমাদের এ বিশ্রাম-বীথি গড়েই উঠত কিনা সন্দেহ। মিঃ রায় বলিলেন, মিসেস মিটার অশেষ গুণবতী, উইথ আর অল চারমড উইথ হার কোয়ালিটিজ অব্ হেড এণ্ড হার্ট। মিঃ দাশ চক্ষু মুদিয়া মুগ্ধ স্বরে বলিলেন, স্পেলনডিড্।

করুণা রঞ্জিত অধরে স্মিত হাস্য ফুটাইয়া মিষ্টারের দলকে থামাইবার জন্য ডান হাত তুলিলেন। এনাফ অব ইট্। দয়া করে থামুন, বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে। মিসেসের দল কষ্ট হাসি হাসিয়া বলিলেন, বাড়াবাড়ি নয়, ওঁরা ঠিকই বলেছেন। ইউ ফুললি ডিজার্ভ দি প্রেজ। করুণা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উত্তর দিলেন,—আবার আপনারাও যোগ দিচ্ছেন? বয়, বয়, ইধার চা লে আও। অলকা বলিলেন, কেবল চা-ই খাব আর কিছু নয় কিন্তু। করুণা তাঁহার পারিহিত ধুতির দিকে চোখ রাখিয়া বলিলেন, জানি ভাই, শুধু চা-ই খাও।

ইতিমধ্যে মিঃ মিটার আসিয়া বলিলেন, নমস্কার অলকা দেবী। অলকা প্রতি নমস্কার করিয়া বলিলেন, কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?—একটু ভিতরে ছিলাম ব্যবস্থা করতে, আপনার বান্ধবী তো কিছুই করবেন না।—তাই নাকি? হ্যাঁ, এক্সকিউজ মি, একটা কথা বলতে এসেছি বলিয়া করুণার দিকে চাহিয়া বলিলেন, রাত হয়ে গেল, নাচের ব্যবস্থা করে দাও।—দিচ্ছি।—মিঃ মিটার জুতা মস্ মস্ করিতে করিতে অন্য দিকে চলিয়া গেলেন। অলকা জিজ্ঞাসা করিলেন—নাচ হবে নাকি?—হ্যাঁ মেম্বারদের ছেলে মেয়েরা মিলেই নাচবে। তুমি বসো, আমি আসছি ভাই এখুনি।

করুণা চলিয়া গেলেন। অলকার চা খাইতে খাইতে আট বৎসর পূর্ব্বের একটি ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। স্কুলের একটি কাজে সে কলিকাতায় আসিয়াছিল। চার পাঁচদিন পর কাজটি শেষ হইলে তাহার মনে হইল, একবার করুণার সহিত দেখা করিলে মন্দ হয় না। অ আ হইতে তাহারা দুইজনে ফোর্থ ক্লাস পর্য্যন্ত এক সঙ্গে পড়িয়াছে। তারপর করুণার বিবাহ হইয়া গেল, আর সে পড়িতে লাগিল। সেই হইতে দু'জনের ছাড়াছাড়ি। পরে অবশ্য তাহার নিজের বিবাহের সময় করুণার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। করুণা তখন তাল-তলায় একটি অন্ধকার গলির বস্তিতে থাকিত। প্রথম দুইটি কন্যার মৃত্যুর পর তখন তাহার দুইটি পুত্র। সকালে চা খাইয়া সে করুণার খোঁজে বাহির হইল। [illegible] একখানি ঘর এবং এক ফালি বারান্দা তাহার সংসার। বারান্দাটিতেই চট [illegible] ঘিরিয়া রান্নার ব্যবস্থা হইয়াছে। ১০।১২টি ভাড়াটে এইভাবে সেই বস্তিতে [illegible]। বস্তির ভাড়াটেরা সকলেই ভদ্র এবং [illegible] গরীব কেরাণীর দল। উঠানের [illegible] একটি কল, ১০।১২টি পরিবারের [illegible] সরবরাহ ঐ একটি কল হইতেই হয়। [illegible] গিয়া দেখিল, একটি ছোট এলুমিনিয়মের হাঁড়ীতে ডাল ফুটিতেছে—করুণা সেইখানে বসিয়া কুচো চিংড়ি বাছিতেছে। [illegible] গরীব তাহা অলকা জানিত, কিন্তু এতখানি তাহা জানিত না।—করুণা, করুণা!—কে? করুণা মুখ তুলিয়া তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া বলিল, ওঃ তুমি ভাই এসেছ, এসো ভাই এসো, কোথায় বা বসবে? যা আমার অবস্থা। সে উত্তর দিল—তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না, বসছি আমি।

সেদিন সে করুণার ওখানে বিকাল পর্য্যন্ত ছিল। করুণা কত দুঃখ করিল, তাহার কাঁদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল—পাশের ভাড়াটে গিন্নির সহিত জল লইবার সময় ঝগড়া হইয়াছে। তাহার জল ধরিতে একটু দেরী হইয়াছে, এই অপরাধ।

(২১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইচু মণ্ডলের আজ বেজায় সর্দি হয়েচে। ভাদ্র মাসের বর্ষণমুখর শীতল প্রভাত। তালি দেওয়া কাঁথা ওর বৌ, তার নাম নিমি, শেষ রাত্রে গায়ে দিয়ে দিয়েছিল। এমন সর্দি হয়েচে যেন মনে হচ্চে সমস্ত শরীর ভারি। ইচু শুয়েই পা দিয়ে চালের হাঁড়িটা নেড়ে নেড়ে দেখলে, সেটা ওর পায়ের তলার দিকেই থাকে, হাঁড়িটাতে সামান্য কিছু চাল আছে মনে হোল তার।

ইচু বল্লে—আজ আর জনে যাব না। একটু পানি দে দিকি,—।

ওর বৌ বল্লে—জনে যাবা না তবে চলবে কিসি?

—কেন চাল তো রয়েচে তোর হাঁড়িতি সজনে শাক-মাক সেদ্দ কর্ আর ভাত। নুন আছে?

—এট্টু অমনি পড়ে আছে মালাটার তলায়।

—তবে আর কি? পানি দে—নামাজ করি।

ইচু জল দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ওজু শেষ করে ফজরের নমাজে বসে গেল। এটি তার জীবনের অতি প্রিয় কাজ বালাকাল থেকেই। মজুরি করতে না যেতে পারে সে, কিন্তু নমাজ না করে সে দিনের কাজ কখনো আরম্ভ করে নি।

নিমি বল্লে—উঠচো যখন, তখন জনে যাও। আজকাল যুদ্ধের বাজারে দশ আনা করে জন অন্য সময় তিন আনা হোত যে। হাঁড়িতে যদি চাল থাকতি দেখলে, তবে আর তুমি জনে যাবা না। ও ভালো না।

ইচু বল্লে—নামাজের সময় খ্যান খ্যান করিসনে বাপু একটু চুপ কর।

নমাজ শেষ করে ইচু দা হাতে বেরিয়ে যেতে গিয়ে একটু থেমে বল্লে—খিদে পেয়েচে—কি আছে রে?

—কিছু নেই।

—দেখ না হাঁড়িটা—বড্ড খিদে পেয়েছিল।

—দু-টো ক'টা পানি দেওয়া ভাত পড়ে আছে—আর কিছু নেই।

—তাই দে—বেনবেলা না খেয়ে গেলি দুপুর বেলা এমন খিদে পায়, দা ধরতি হাত কাঁপে। কাজ করতি পারি নে।

শাইলিপাড়া গ্রামের পাশ দিয়েই রেল-লাইন চলে গিয়েচে।

রেললাইন পার হয়ে ফাঁকা মাঠ এক-দিকে, মাঠের মধ্যে বিল, ভরা ভাদ্রের বর্ষায় থৈ থৈ করচে তার জল, ধারে ধারে কাশ বনে সবে ফুল ফুটতে সুরু হয়েচে, জলে কলমীলতা জালের মত বিস্তৃত হয়ে আছে। বন খেজুর গাছের মাথায় তেলাকুচো লতার চুমুনি, টুকটুকে লাল তেলাকুচো ফল সবুজ পাতার আড়াল থেকে উঁকি মারচে, ফিঙে পাখী ঝুলচে রেলের তারে।

রামা গোয়ালা জন-মজুর নিয়ে ধান কাটচে তার নিজের জমিতে। ইচুকে দেখে বল্লে—যাবা কোথায়?

—সনেকপুরের বিলি ধান কাটতি।

—কত করে জন দেচ্চ?

—সাত সিকে করে বিঘে। তামাকের আগুন দেবা?

—নিয়ে যাও ওই বেনা ঝোপের ধারে মালসা আছে।

—ভাত খেয়েই হাঁপ জিরুতে পারিনি। তামাক না খেলি কাজে মন বসে?

মালসা থেকে আগুন নিয়ে তামাক খেতে খেতে চললো ইচু।

ইচুর গ্রাম থেকে ত'মাইল দূরে সনেকপুরের বিলে দেড়শো দু'শো বিঘে জমিতে ভাদুই ধান পেকে গাছ শুয়ে পড়েচে। যেমন বর্ষা নেমেচে, দু'পাঁচদিনে বিলের জল বেড়ে পাকা ধান ডুবিয়ে দেবে, তাই এবার মজুরির রেট এদিকে খুব বেশি। তার ওপর আছে একবেলা খোরাকী মজুরদের।

ইচুর বড় ভাল লাগে আল্লার কথা শুনতে। পায়রাগাছির ফকির এ অঞ্চলের মধ্যে নামজাদা সাধু। একবার ইচু তাঁকে দেখেছিল। বাল্যকাল থেকে ইচুর ঈশ্বরের দিকে কেমন এক টান। পায়রাগাছির ফকির সে টান আরও বাড়িয়ে দেন ওর। ইচু যেন কেমন হয়ে গিয়েচে তারপর থেকে। সংসারে মন দেয় না, মজুরি করে পয়সা রোজগারের দিকে বা খাওয়া দাওয়ার দিকেও মন নেই। কাস্তে হাতে জমির ধান কাটতে কাটতে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। অনেকে ওকে তা নিয়ে খেপায়। বলে—ও ইচু শেষকালে ফকির হবা নাকি গা? ইচু মুখে কিছু বলে না, চুপ করে থাকে। সে নিতান্ত ভাল মানুষ, কারো কোনো কথার প্রতিবাদ সে করতে পারে না।

মজুরির রেট নিয়ে দরাদরি করতে পারে না বলে অনেকে ওকে ঠকিয়ে কাজ আদায় করে। বিনি মজুরিতে অনেক সময় খাটিয়েও নেয়।

—ও ইচু আমার বাড়ির চালকুমড়োর মাচাটা তুমি থাকতে নষ্ট হয়ে যাবে?

—কেন কি হয়েচে চাচা?

—খুঁটিগুলো সব পড়ে গিয়েচে।

—ওবেলা এসে করে দেবানি, চাচা?

ইচু কথা ঠিক রাখতো নিজের। যাকে যা বলবে, তা সে রাখবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করবে, এটা সকলেই জানে। মহাজনে দু'তিন বিশ ধান মুখের কথায় ওকে দিয়ে দিত, এপর্য্যন্ত সে কারো টাকা বা ধান মেরে দেয় নি।

একবার পাশের গ্রামের মুখুয্যেদের জমির ধান সে ভুল করে কেটে ফেলেছিল—বেশি নয়, কাঠাখানেক জমির পাকা ধান। মুখুয্যেদের জমির পাশে তখন ওর নিজের ওটবন্দি জমি ছিল দু'বিঘে। মুখুয্যে মশায় যখন জানতে পারলেন তাঁর জমির ধান কে কেটে নিয়েচে—তখন খুব হৈ চৈ জুড়ে দিলেন। কে ধান কেটেচে সন্ধান করতে পারলেন না, কারণ সবারই তখন ধান কাটবার সময়, সকলেরই বাড়িতে ধান—কার ধান তিনি গিয়ে ধরবেন? দিন দুই পরে ইচু গিয়ে সন্ধ্যাবেলা তাঁর বাড়ি হাজির হোল।

মুখুয্যে মশায় বল্লেন—কিরে ইচু, কি মনে করে?

ইচু বল্লে—সালাম বাবু। এটা বড্ড ভুল করে ফেলিচি।

—কি রে?

—আপনার জমির ধানডা কাঠাখানেক কেটে ফেলে ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলেলাম। তা বাবু, দেড়া সুদ দিয়ে সেই ধানটা আপনারে ফেরত দিতি চাই।

—ওঃ, তোর কাজ ইচু? আমি আকাশ পাতাল হাতড়াচ্চি। আজ্ঞে হাঁ বাবু। সেদিন বড্ড বর্ষা, জমির আল ঠিক করতি পারলাম না। তারপর পরস্পর শোনলাম আপনার জমির ধান কে চুরি করেচে বলে আপনি খোঁজ করচেন। তখন ভাবলাম বাবুরে বলে আসি। ক্ষেতি লোকসান যখন অজ্ঞাতে করে ফেলেচি, তখন দেড়া বাড়ি সুদ দেব আপনারে।

মুখুয্যে মশায় বিশ্বাস করলেন ওর কথা। ইচুকে অন্ততঃ চোর বলে কেউ সন্দেহ করতো না। ইচু জন খেটে খায় বটে, কিন্তু আশ পাশে চার পাঁচগ্রামের লোকে ওকে মনে মনে শ্রদ্ধা করে। মুখুয্যে মশায় বল্লেন—তোর সুদ দিতে হবে না ইচু, আমার ধান কেটেচিস ও আর ফিরিয়েও দিতে হবে না। ও তোকে দিলাম। ভুলে করে ফেলেচিস তা আর এখন কি হবে।

ইচু হাতজোড় করে বল্লে—তা হবে না মুখুয্যে মশায়, ও ধান নিতি পারব না, মাপ করবেন। ও ধান আমার গলা দিয়ে নামবে না। আল্লা যা আমায় হাতে তুলে দেবেন, তাই খেয়ে পরাণ বেঁচিয়ে রাখবো—যা না দেবেন সে আমার হারাম।

মুখুয্যে মশায় জানতেন ইচুকে। খুসি হয়ে বল্লেন—যাক্, দুটো চিঁড়ে নিয়ে যা, বাড়ির মধ্যে গিয়ে তোর বৌ-মার কাছ থেকে চেয়ে নে।

সনেকপুরের বিলে পৌঁছে ইচু দেখলে, জন-মজুর এখনও কেউ এসে পৌঁছোয় নি। এটা পছন্দ করে না সে, বেশি রেটে মজুরি নেবো অথচ কাজে আসব অনেক দেরি করে, মালিকের কাজে ফাঁকি দেবো, এ তার ভাল লাগে না। ও ধান কাটে ঘড়ির কাঁটার মত। এ কাজে তার ফাঁকি নেই।

পথ চলতি লোকে জিগ্যেস করে—কি ধান এটা গো?

(২১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হারাধনের কয়টি ছেলে—
—১—
হারাধনের কয়টি ছেলে
কাজ কি আমার গুণে ?
সব ক'টি যে নেইক বেঁচে
তাই রেখেছি শুনে !
—২—
কিন্তু যদি থাকৃত বেঁচে
(আর) জন্মাত এই যুগে !
(আর) হারাধনই বিদায় নিত
ম্যালেরিয়ায় ভুগে !
—৩—
অনাথ হ'লেও ছেলে ক'টির
অভাব থাকৃত কি,
হারাধনের থাকৃত যদি
"হাওড়া-পলিসি" ?
হাওড়া ইনস্যুরেন্স কোং লিঃ
৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা ঃ ফোন ঃ কলি ঃ ৭৫৭
চেয়ারম্যান ঃ কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ।
অপরূপ সৃষ্টি...
নিখুঁত বয়নচাতুর্য্যে, ডিজাইনের ও বর্ণের বিচিত্র নব নব সম্ভারে আমাদের প্রস্তুত শাড়ীগুলি রূপ-সজ্জার সত্যই অপরূপ আভরণ।
এই অভিনব শাড়ীগুলি শুধু নয়—আমাদের ব্লাউজ পিস্, বেড কভার, দরজা জানালার পর্দ্দা—সবই সৌন্দর্য্য ও সুরুচির বৈশিষ্ট্যে আপনাকে মুগ্ধ করিবে ; অথচ তুলনায় মূল্য অনেক কম।
A.A.S.
বিষ্টুরাম বড়ুয়া কটন এণ্ড উলেন মিলস্ লিঃ
পি ৬, মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা
ফোন ক্যাল ৩২৭২ ... মিলস্ - পলতা (বি এণ্ড এ, আর)

ফকির

(২১১ পৃষ্ঠার পর)

—বেনাঝুপি।

—এবার ফলন কেমন?

আড়াই বিশ থেকে তিন বিশ পড়তা হতি পারে।

—বিঘেয়?

—বিঘেয় না কি কাঠায়?

ইচু হা হা করে হাসে পথিকের অজ্ঞতায়। পথিকের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলে—কাঠায় আড়াই বিশ ধান ফলন হোল কি আমরা জন খেটে খাতাম গো কর্ত্তা? হা—হা—হা—

—বাড়ি কোথায় তোমার?

—শাইলেপাড়া।

—নাম?

—ইচু মণ্ডল।

বেলা আড়াইটের গাড়ী দূরের রেল লাইন দিয়ে গড় গড় করে চলে গেল। জন-মজুরদের জন্যে জমির মালিক খাবার পাঠিয়েছে, একজন লোকে বাঁকে ঝুলিয়ে আধক্রোশ দূরবর্ত্তী সনেকপুর গ্রাম থেকে কাঁসার জামবাটিতে সাজিয়ে এনেচে গরম ভাত, কুমড়োর ঘণ্ট ও কুচো চিংড়ি ভাজা। এ সময় ভাল খেতে দিয়ে জন-মজুরের মন খুসি করা মানে বেশি কাজ আদায় করা ওদের কাছ থেকে। জমির মালিকেরা তা জানে। আখের মণ্ডল খেতে খেতে বলে—আজ এট্টু সকাল সকাল যাবো। মোর ঘরে নুন নেই—বাজার থেকে নুন না নিয়ে গেলি বাচকাচ খেতি পাবে না।

—নুন ক'নে পাবা? বাজারে কালও খোঁজ করিচি নুন মেলে না।

—ওমা, আলুনি খেয়ে খেয়ে মুখি তো পোকা পড়ে গেল।

—আর অন্ধকারে খেয়ে খেয়ে চকি চ্যালা বেরুলো। কেরাচিনি তেলের মুখ দেখিনি কতকাল।

—কুমড়োর ঝালডা করেচে বেশ। সনেকপুরের এরা খেতি খায় ভালো। পেট্‌টা ভরি খেতি খায়—কেরাচিনি পাবা কোথায়?

খাওয়া দাওয়া শেষ করে আখের মণ্ডল দা-কাটা তামাক সাজলে কলকেতে। বেশ করে আগুন ধরিয়ে প্রবীণ রমজান মণ্ডলের হাতে দিয়ে বল্লে—হাদে ধরো চাচা।

ইচু বল্লে—চাচা তোমার বয়স হোল ক'কুড়ি?

—তা যেবার জোড়া বন্নে হয়েল, সেবার আমি গরু চরাতে পারি। তিরিশ কি চল্লিশ হোল পেরায়—

কেউ বিশেষ কিছু বুঝতে পারলে না। জোড়া বন্যা কত বৎসর পূর্ব্বে কোন্ সালে হয়েছিল কেউ জানে না। রমজানের বয়স কম হলেও সত্তর ছাড়িয়েছে। যখন সে গরু চরায় তখন এরা কেউ জন্মায় নি। সংখ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান এদের নিতান্তই সীমাবদ্ধ।

বেলা যায় যায়। পাঁচটার গাড়ী গড় গড় করে মাদলার বিলের পুলের ওপর দিয়ে চলে গেল। ঝিঙের ক্ষেতে ফুল ফুটেচে সনেকপুরের মাঠে। নোয়ালি সর্দ্দার জাতে ধুনো, সনেকপুরের মধ্যে অবস্থাপন্ন। গরুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্চে গ্রামাপথ ধরে। ইচু সন্ধ্যার নমাজ শেষ করে উঠতেই বেড়ার ধার থেকে নোয়ালি সর্দ্দার বল্লে—ও ইচু, কাল আমায় জন দিতি পারবা?

—না গো।

—কেন?

—সনেকপুরওয়ালাদের বিলির ধান কাটা হচ্চে।

—চলো আমার বাড়ি, তামুক খেয়ে যাবা।

রমজান মণ্ডলকে ইচু ডাক দিলে।—ও চাচা, সর্দ্দারের বাড়ি তামুক খাবা চলো।

নোয়ালি সর্দ্দারের তামাক খাওয়ানোর আসল উদ্দেশ্য মজুরির রেট সম্বন্ধে দরদস্তুর করা। ইচু রমজানের পুত্রের বয়সী—সুতরাং দরদস্তুর সম্বন্ধে রমজান নেতা হয়ে কথাবার্ত্তা চালালে।

—সাত সিকের কম পারবো নী গো, এতে তুমি রাগ কোরো না সর্দ্দার।

—রোমজান চাচা তার চেয়ে আমার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেল না কেন?

—অন্যেয্য তো কিছু বলচিনে

—অনেয্য নয় চাচা? যা ছেল চোদ্দ আনা তাই সাত সিকে? এটা ভেবে চিন্তে কথা বলো। পাঁচ সিকে করো আর চাল ডাল মাছ পেঁটিয়ে দেবানি তোমরা রান্না করে খেও। মোদের রান্না তো তোমরা খাবা না। আমার পুকুরি এবার এই এত বড় চ্যাং মাছ—

নোয়ালি সর্দ্দার হাত দিয়ে কাল্পনিক মৎস্যের দৈর্ঘ্য নির্দ্দেশ করলে, যদি লোভ দেখিয়ে এদের কাজে টানা যায়।

রমজান ঘাড় নেড়ে বল্লে—ও হবে না সর্দ্দার। সাত সিকের কম করলি—

—আর এক কলকে ধরাও চাচা। হাদে, গাছের জালি শশা গোটাকতক নিয়ে যাও। দুজনে খেও।

—শশা পুতিছিলে? মাচার শশা না মেঠো?

—মেঠো কোথায় পাবো চাচা এই উঠোনটাতে মাচা করে দিয়েলাম, ছিম, বরবটি, শশা—কিনে খাবার তো ক্ষামতা নেই মোদের, তরিতরকারির আগুন দাম।

—সে কথা আর বোলো না। হাটে বাগুন কিনতাম পয়সায় দু'সের তিন সের—তাই এখন বলে আট আনা সের। খাদ্য খাদক উঠে গেল। ঝিঙে আছে?

—তা তোমার বাপ মায়ের আশিব্বাদে—দু'টো ক'টা দেবানি তুলে। খেও।

—থাক গে, পাঁচ সিকেও দিও সর্দ্দার। কারো কাছে পেরকাশ কোরো না যেন এ কথা।

ইচু ও রমজান তামাক খেয়ে ঝিঙে ও শশা নিয়ে উঠে চলে এল। নোয়ালি সর্দ্দারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, সে জানে রমজান জন-মজুরের নেতা, ওর কথায় দরদস্তুর ঠিক হয়। ওকে খুসি রাখলেই হোল।

ইচুর বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গেল। নিমিকে বল্লে—ভাত রেঁধিচিস?

—এ বেলা শরীরডে খারাপ। পানি দেওয়া আছে, খাও।

—তরকারি?

—কিছু নেই।

—এই ঝিঙে কটা রেঁধে দে।

—রাঁধবো কি দিয়ে, তেল ক'নে? পাঁচ পলা ধার করে এনেলাম আছিরন বিবির কাছ থে। এখনো শোধ দিতে পারিনি—আবার কি ধার করতি ছোটপো?

—পোড়া।

নিমি খিল খিল করে হেসে উঠে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বল্লে—ও মা, মুই ক'নে যাবো গো? ঝিঙে পোড়া কেউ কখনো শুনিনি। খেতে পারবা না?

—পারবো পারবো। দে তুই।

খাওয়া দাওয়া শেষ হোল পাকাটির আলো জ্বেলে। তেল নেই। অন্ধকার ঘর-দোর। কে আসে, কে যায়, কিছু বোঝা যায় না। কচুঝাড়ে কেঁয়ো ঝাঁকার ঝোঁপে জোনাকি জ্বলচে, উঁচু নিচু, উঁচু নিচু। দেবতা ঝিলিক মারচে, রাত্রে বৃষ্টি হবে বোধ হয়। ছাদের গুমট গরম। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পরে ইচু যেমন মাদুর পেতে শুয়ে পড়েচে অমনি রাজ্যের ঘুম এসেচে ওর চোখে। আর জ্ঞান নেই।

কতক্ষণ পরে সে জানে না লোকজনের গোলমালে ইচু সেখের ঘুম ভাঙলো।

অনেক লোকের গলা বাইরে। ওরই বাড়ির উঠোনে।

—ব্যাপারখানা কি?

পাড়ার মোড়ল হাফেজ বুড়োর গলা—ও ইচু, ইচু বাড়ি আছ?

বছিরদি সেখ ডাকচে—ও ইচু, বলি ওঠো—শোনো ইদিকি।

ভোর সবে হয়েচে। কাক পক্ষী ডাকতে সুরু করেচে। ইচু ধড়মড় করে চোখ মুছলে। ফজরের নমাজের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায় যায়। কিন্তু এত লোক ওর উঠোনে কেন? তাকে ডাকাডাকিই বা কিসের এত সকালে? বাইরে এসে ঘুমচোখে উঠোনের দিকে চেয়ে ও অবাক হয়ে গেল। পাড়াশুদ্ধ মানুষ সব ওর উঠোনে। সে বিস্মিত সুরে বল্লে—কি হয়েচে গা মোড়লের পো?

বুড়ো হাফেজ মণ্ডল বল্লে—ইদিকি এসো।

—আগে নামাজটা করে নিই—দেরি হয়ে গিয়েচে উঠতি।

ইচু ঘরের পেছনের দাওয়ায় নমাজ সেরে নিয়ে আবার সামনে এল। সবাই ওর দিকে একসঙ্গে এগিয়ে এল। সবাই মিলে যেন একসঙ্গে ওকে কি বলতে চায়। ইচু ক্রমেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠচে, ওর বুকের ভেতর ঢিপ ঢিপ করচে। ভয়ও হয়েচে ওর। নিমি এ সময়ে কোথায় গেল? হয়েচে কি?

(২১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

Miracle-check
অভিজাত সম্প্রদায়ের অধুনাতম ফ্যাসান ঃ
টেনিস্ সার্ট
স্পোর্ট সার্ট
ব্লাউজ
HINDUSTHAN
HOSIERY MILLS
HINDUSTHAN HOSIERY MILLS

ফকির

(২১৩ পৃষ্ঠার পর)

অন্য সবাইকে থামিয়ে দিয়ে হাফেজ বল্লে—এসো মোর সঙ্গে—

ইচু সেখ ওদের পেছনে পেছনে কলের পুতুলের মত চললো। রেললাইনের দিকে সকলেই যাচ্ছে। নাবাল ক্ষেতের এক হাঁটু জল পার হয়ে সবাই রেললাইনে উঠলো। একটা খেজুর ঝোপের আড়াকে রেল লাইনের উপর উঠে সবাই দাঁড়ালো থমকে। হাফেজ ডেকে বল্লে—এখানে এসো।

কি ব্যাপার? ইচু এগিয়ে গিয়ে যা দেখলে তাতে তার মাথা ঘুরে গেল, সে নিজেকে পড়তে পড়তে সামলে নিলে। রেললাইনের ওপরে একটা রক্তাক্ত মৃতদেহ—গলা সামনের দিকে গভীরভাবে কাটা, দেহের সঙ্গে একটা অস্বাভাবিক কোণের সৃষ্টি করে চিৎ হয়ে পড়ে আছে।

মৃতদেহ নিমির।

তারপর তার ভাল কিছু মনে পড়ে না। গ্রামের লোকে মিলে তাকে কত কিছু প্রশ্ন করতে লাগলো। সে কোথায় ছিল, নিমি কতক্ষণ ঘরে ছিল, নানা প্রশ্ন। নিমি রেলে গলা দিয়ে মরেনি। তাকে নাকি খুন করে টেনে এনে রেলে শুইয়ে রাখা হয়েচে। তার চিহ্ন পাওয়া গিয়েচে। ইচু বুঝতে পারলে, তার ওপর অনেক সন্দেহ এসে পড়চে। পাশের গাঁয়ে দফাদারদের সংবাদ দিতে লোক যাবে এখুনি। তার আগে ইচুকে একবার জিগেস করা দরকার, সে কোথায় তা জানা দরকার, সেজন্যেই গ্রামের লোক তার বাড়িতে গিয়ে ডাকাডাকি করছিল।

ইচু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে বল্লে—মুই কিছু বলতি পারিনে চাচা, আল্লা জানে। মুই মড়ার মত ঘুমুতি নেগেলাম:

—বউটির কিছু বলেলে? ঝগড়া হয়েল?

—কিছু না চাচা।

—বউ ঘরে শুয়েল?

ইচুর মনে একটা ভয়ানক সন্দেহ উঁকি মারলে। এ প্রশ্ন করে কেন লোকে? বছিরদ্দি সেখ এগিয়ে এসে ওকে উঠিয়ে বল্লে—মোর কথা সবাই শোনো। ইচু সেরকম লোক নয়। চলো, এখুনি বনগাঁয়ে ওকে নিয়ে মোক্তার বাবুদের কাছে। বিহিত কথা তাঁরা বলবে, তাঁদের পরামর্শটা লেওয়া দরকার। এখানে থাকলি এখুনি দফাদার এসে ওকে বাঁধবে। তার আগে চলো মোরা ছ' সাত জন ওরে নিয়ে বনগাঁয়ে যাই। পরামর্শ নিয়ে ফেলি। পুলিশি গ্রেপ্তার করবার আগেই। কে কে যাবা?

দেখা গেল প্রায় সকলেই যেতে চায়।

ইচু ভয়স্বরে বল্লে—কিন্তু উকীল মোক্তার বাবুদের ট্যাকা মুই কম থে দেবো? মোর হাতে একটা ট্যাকা আছে কালকার জনের মজুরী। তাতে হবে?

হাফেজ বল্লে—ট্যাকার জন্যি তোমার ভাবনা হচ্ছে কেন? তোমার জান যদি বাঁচে কত ট্যাকা হবে। সে ভাবনা মোদের। তুমি চলো দিনি। কি বল বছিরদ্দি?

বছিরদ্দি বল্লে—তা নিশ্চয়। ট্যাকার জন্যি তুমি ভেবো না। সে মোরা ভাববো।

হাফেজ বল্লে—রেললাইন ধরে চলো যাওয়া যাক। সোজা রাস্তা দিয়ে গেলি পুলিশি ধরবে।

বেলা থাকতে [illegible] মধ্যেই ওরা বনগ্রামের বড় মোক্তার রামলাল চাটুয্যে মশায়ের বাসায় পৌঁছে গেল। রামলালবাবু বেশিক্ষণ ওঠেন নি, সেরেস্তায় বসেই চা খাচ্ছেন এবং মুহুরী দুলাল চক্রবর্ত্তীকে বিলম্ব করে আসার জন্যে তিরস্কার করচেন—কাল ছুটে গেলে কাছারী থেকেই বাড়ি, জামিননামা দুটো সই করাতে হবে, তোমার সে খেয়ালও থাকে না। এখন এলে আটটার সময়—এমন করলে কি করে আমি কাজ চালাই? ওদের দরখাস্তের নকল নেওয়া হয়েচে?

—আজ্ঞে, নকলের জন্যে দরখাস্ত করা হয়েচে। কাল বিনয় বাবু সকাল সকাল চলে গিয়েছিল, দেখা পাইনি।

—সকালে কাছারীতে গিয়ে আজ নকল দু'খানা বার করে ফেল আগে—নইলে জেরাই হবে না। কে? কোত্থেকে আসা হচ্চে?

হাফেজ মণ্ডল এগিয়ে এসে নিচু হয়ে ডান হাত তুলে কপালে ঠেকিয়ে বল্লে—সালাম, বাবু।

—কি ব্যাপার? বাড়ি কোথায়?

হাফেজ মণ্ডল বল্লে—বিপদে পড়ে এ্যালাম বাবুর কাছে। বড্ড বিপদে পড়ে গিয়েচি। খুনের ফ্যাসাদ।

রামলাল বাবু প্রবীণ মোক্তার। মোক্তারী ব্যবসায় চুল পাকিয়েচেন—শক্ত কেসে লোক যখন পড়ে, তখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পয়সা খরচ করে, ধীরভাবে সে পয়সা আদায় করতে হয়। সুতরাং একটা সিগারেট ধরিয়ে (প্রবীণ হোলেও রামলালবাবু তামাক খান না, সিগারেটখোর) আরাম করে টান দিয়ে গম্ভীরভাবে বল্লেন—খুন? কি রকম খুন?

হাফেজ ইচুর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লে—এই লোকের বৌ গলা কাটা অবস্থায় কাল রাতে রেল লাইনে পাওয়া গিয়েচে।

—ওর নাম কি?

—ইচু মণ্ডল।

—ও রাত্রে কোথায় ছিল?

—বাড়িতেই শুয়েছিল বাবু।

—বৌয়ের স্বভাবচরিত্র কেমন?

হাফেজ চুপ করে রইল। সে প্রবীণ লোক, গ্রামের মোড়ল—তার মুখ দিয়ে আর ও কথা বার হয় কেন? বছিরদ্দি সেখ পাশ থেকে ঈষৎ গলা খাঁকার দিয়ে নিয়ে বল্লে—বাবু, ভাল না।

ইচু অবাক হয়ে বছিরদ্দির মুখের দিকে চেয়ে রইল। নিমির স্বভাবচরিত্র ভাল ছিল না? কই, একদিনও তো সে কিছু জানে না। সে নিমির স্বামী, সে ই কেবল জানে না আর সবাই জানে।

হাফেজ চুপ করেই রইল। বছিরদ্দি বলে যেতে লাগলো—বাবু, এ লোক বড্ড ভাল মানুষ—নিরীহ ভাল মানুষ। ও কিছু জানে না এসব কথা। খুনও ও করেনি।

রামলাল মোক্তার বাধা দিয়ে ধমকের সুরে বল্লেন—তুমি কি করে জানলে? তোমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে লোকে খুন করবে নাকি? যা তুমি জানো তাই বলো, যা জানো না তা নিয়ে জ্যাঠামি কোরো না। যাও বোসো ওখানে।

পরে হাফেজের দিকে চেয়ে বল্লেন—তুমি কি জানো বল মোড়ল?

বছিরদ্দির অবস্থা বিপর্যয়ে হাফেজ একটু ভয় খেয়ে গেল। সমীহ করে সংযত হয়ে বল্লে—আজ্ঞে বাবু যা বলচেন, অতি ন্যায্য কথা। তবে ইচু আমাদের লোক ভাল। সবাই এ কথা জানে। আপনি সব লোককে জিগেস করো, সবাই একথা বলবে।

রামলালবাবু সিগারেটে টান দিয়ে বল্লেন—ঘটনা বল।

হাফেজ ঘটনা বর্ণনা করলে। ইচু মণ্ডলের মুখে যা সে শুনেচে। জন খেটে এসে অঘোরে ঘুমুচ্ছিল, সবাই গিয়ে ডেকে ওর ঘুম ভাঙায়। ও বলেছিল, রাত্রে ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল কি হয়েচে না হয়েচে কিছু জানে না। শোবার আগে ওর স্ত্রী ওকে ভাত খেতে দিয়েছিল। ঝগড়া বিবাদ হয় নি।

—আত্মহত্যা নয়?

—না বাবু। গলায় অস্তরের দাগ, দেখলিই বোঝা যায়। গলা কেটে রেললাইনি ফেলে রেখেছিল।

রামলালবাবু বল্লেন—অন্তত: তাই প্রিজাম্‌শন হবে। পুলিশেও তাই বলবে। লাস দেখে কে আগে?

—বাবু, মোর ভাই আর নবি সেখ সকালে রেললাইনির ধারে নালায় মাছ ধরতি যাচ্ছিল, তারাই দেখতে পায়। পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে আমারে খবর দেয়। মুই তখুনি দৌড়োলাম লাইনির ধারে।

আচ্ছা আচ্ছা বুঝেচি থাক। সুরতহাল আগে হয়ে যাক, তারপরে দেখা যাবে। গ্রামের দফাদারকে খবর দিয়ে এসেচ তো? বেশ করেচ। বড্ড শক্ত কেস। সন্দেহ গিয়ে ইচু মণ্ডলের ওপরই পড়বে। বৌয়ের স্বভাবচরিত্র খারাপ ছিল। ভালমানুষ লোক হঠাৎ রেগে উঠলে এসব ক্ষেত্রে ভয়ানক হয়ে ওঠে কিনা? তোমরা লুকিয়ে চলে এসেচ?

—হ্যাঁ বাবু।

—একটা কথা শিখিয়ে দিই। ইচু?

ইচু এগিয়ে গিয়ে সেলাম করে দাঁড়ালো। তার পা দুটো ঈষৎ কাঁপচে।

—বলি শোনো। তুমি খুন করেচ কি না করেচ তা আমি তোমায় জিগেস করবো না। আমাদের তা কাজ নয়। আমরা ধরে নেবো তুমি খুন করনি। কিন্তু পুলিশে তা শুনবে না। তোমাকে আজ সম্ভব রাস্তায় যেতে যেতেই গ্রেপ্তার করবে। তোমায় স্বীকার করাবার জন্যে নানারকম চেষ্টা হবে। কিন্তু কিছুতেই তুমি বলোনা যে তুমি খুন করেচ। স্বীকার কিছুতেই করবে না। করেই থাকো বা না-ই করে থাকো। বুঝলে? যাও সাবধানে যাও।

হাফেজ বল্লে—বাবু পুলিশি ধরলে রাখবে ক'নে ওরে?

রাখবে হাজতে। যতদিন না বিচার শেষ হয়। তবে এখানে শেষ বিচার হবে না—দোষী প্রমাণ হোলে দায়রায় চালান হবে যশোরে। সেখানে জজসায়েব বিচার করবেন। বাড়ি গিয়ে পয়সা কড়ি জোগাড় ক'র গিয়ে—বড্ড ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েচ—অনেক টাকার খেলা।

হাফেজ ও বছিরদ্দি সব শুনে যেন মাটির মধ্যে বসে গেল। বনগাঁর মোক্তারবাবুর টাকাই যোগাড় হয় না, আবার যশোর জেলা কোর্টের উকীলবাবুদের টাকা গরীব গ্রামের লোকের চাঁদায় কি জোগাড় হয়ে উঠবে? ইচুকে বাঁচানো মুস্কিল হয়ে উঠলো।

এতক্ষণ পরে ইচু কথা বল্লে। এতক্ষণ সে একটি কথাও বলেনি। এইবার সে হাত জোড় করে বল্লে—বাপু মোর একটি কথা বলবার আছে।

ওর মুখের দিকে সবাই চাইলে। মোক্তারবাবুও চাইলেন। এইবার বোধহয় সব প্রকাশ করতে চাইচে লোকটা ... এই

(২১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দি
ক্যালকাটা মার্কেণ্টাইল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৭-এ, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

হ্যারিসন রোড ব্রাঞ্চ—৭৮-১নং হ্যারিসন রোড।
ভবানীপুর ব্রাঞ্চ—৩১নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড।
শ্যামবাজার ব্রাঞ্চ—৬নং আর, জি, কর রোড।

——অন্যান্য শাখা——

কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর (নদীয়া), বেলডাঙ্গা (মুর্শিদাবাদ), কালনা (বর্দ্ধমান), বেলদা (মেদিনীপুর), মেদিনীপুর।

কাঁথি, হাওড়া, শেওড়াফুলী, এলাহাবাদ ও বেনারস শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড ডিপজিট

মাসিক ৫৲ টাকা করিয়া জমা দিলে ১২ বৎসর পর ১০৬০৲ টাকা পাওয়া যাইবে।

গুদামজাত মাল, গভর্ণমেণ্ট পেপার ও অনুমোদিত সিকিউরিটী রাখিয়া অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়া হয়।

ফোন: কলিকাতা ৫০৫৪
গ্রাম: টাকাকড়ি, কলিকাতা

ইউ আর, ঘোষ,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

আপনার আজকের
"সঞ্চয়ই"
আপনার বার্দ্ধক্যের এবং
পরিজনবর্গের
ভবিষ্যতের সহায়

প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন এসিওরেন্স লিঃ

হেড অফিস
দিল্লী
সেন্ট্রাল অফিস
৩নং ম্যাঙ্গো লেন,
কলিকাতা
ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা প্রেমিসেস্

পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা।

কলিকাতা অফিস
১২-২, ক্লাইভ রো,
২৮১, আপার চিৎপুর রোড (জোড়াবাগান),
৮৫, রাসবিহারী এভেনিউ (বালীগঞ্জ),
২১৮-এ, ক্রস ষ্ট্রীট (বড়বাজার)।

অন্যান্য অফিস
নিউ দিল্লী, বেনারস, ঢাকা, চট্টগ্রাম, শিলং, বর্দ্ধমান, জামসেদপুর, সিলেট, গিরিধি, জোড়হাট, গৌহাটী, শিলচর, বোলপুর, বগুড়া, সিউড়ী, নওগাঁও, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ।

গত ২০ বৎসরের অধিককাল এই ব্যাঙ্ক ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য প্রচেষ্টায় সাহায্য করিয়া বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে।

——:(*):——

কার্য্যকরী মূলধন
১,৭৫,০০,০০০৲
পৌনে দুই কোটী টাকারও অধিক

যাবতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবসা করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত, এম-এল-এ,
ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট, ভারতীয় লেজিস্লেটিভ এসেম্ব্লী।

ফকির

(২১৫ পৃষ্ঠার পর)

রকম ভাবেই বলে, তিনি জানেন। হাফেজ ও বছিরদ্দি মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। কি জানি ওর পেটে কি আছে। মানুষকে সব সময়ে বাইরে থেকে চেনা যায় না।

রামলাল মোক্তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলেন। ভাবটা এই রকম, বলে ফেল বাপু যা আছে পেটে। অমন অনেক ঘুঘুই আমরা দেখলাম তুমি এখন বাকি আছ।

ইচু রামলাল বাবুর পা দুটো জড়িয়ে ধরে বল্লে—বাবু, মোর এ্যাকটা দরবার আছে। যাতে হয় আপনি তো দেখবেন—মুই গরীব লোক, জন খেটে খাই, আপনার পয়সা হয়তো মুই দিতি পারবে না, গরীব বলে দয়া করে এ্যাকটা আবদার রাখবেন মোর—আল্লা, দিনদুনিয়ার মালিক, আপনার ভালো করবে।

—আহা, হা, পা ছুঁয়ো না—কি—কি বলো—

—বাবু, যেখানে মোরে রাখে, যা করে ক্ষেতি নেই। কিন্তু বাবু আপনি এইটে তাদের বলে দেবেন ব্যবস্থা করে, যেন পাঁচ ওক্ত নামাজ আমি সেখানে পড়্‌তি পারি—আর কিছু আমার বলবার নেই বাবু।

রামলালবাবুর সেরেস্তায় সহসা বজ্রপাত হলেও লোকে অতটা চকিত হোত না (সেকালের নভেলের বর্ণনা অনুযায়ী)। হাফেজ ও বছিরদ্দি আবার পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। ঘুঘু মোক্তার রামলাল চাটুয্যে পর্য্যন্ত হাঁ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। এ রকম কথা এ সময় তিনি সামান্য একজন গ্রাম্য লোকের মুখ থেকে আশা করেন নি, যে খুনের দায়ে আজ পথেই হয়তো পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হবে, আজ বাদে কাল যাকে দায়রায় চালান দেওয়া হবে। শত অসুবিধা, অর্থনাশ, নির্য্যাতন যার সামনে, আইনের খাঁড়া যার মাথার ওপর ঝুলছে নিষ্ঠুর নিয়তির হৃদয়হীন, রক্তাক্ত ইঙ্গিতের মত।

রামলালবাবুই সেদিন বার লাইব্রেরীতে গিয়ে গল্প করেছিলেন—সত্যি অবাক হয়ে গেলাম ভায়া, যখন লোকটা ও কথা বল্লে। আজ যাকে পথেই এ্যারেষ্ট করবে পুলিশে, কাল পুরবে হাজতে, যার সব যেতে বসেচে, সে যে ওই ধরণের রিকোয়েষ্ট করতে পারে তা আমার মাথায় আসে নি। আমি আগে ভেবেছিলাম বুঝি কনফেস্‌ করবে। সামান্য একজন লোক—আমার চোখে জল এসে পড়লো ভায়া।

ওরা সব চলে গেল। ইচু সেখকে ওরা বাজার থেকে পেটভরে তেলেভাজা সিঙেড়া কচুরি আর মুড়ি খাওয়ালে। হাফেজ বল্লে—ওরে চাঙ্কি হোটেলের ভাত খাইয়ে নিলি হোত। পুলিশি ধরলে কোথায় নিয়ে যাবে, আজ খাওয়া হবে কি না ঠিক তো নেই।

কিন্তু অত সকালে হোটেলে ভাত পাওয়া গেল না।

রাস্তা চলতে লাগলো সবাই। দুপুরের কিছু দেরি আছে, ইচু পথের পাশে এক বটতলার ছায়ায় নমাজ পড়তে বসলো। আর কোন কথা ওর মনে থাকে না। ঝিরঝিরে হাওয়ায় আজ পথের ধারের গাছতলায় অপূর্ব্ব আনন্দ ও শান্তি নেমে আসে প্রাণে নমাজের সময়। সে সব ভুলে যায়। চোখে যেন জল আসে। নিমি কত ভাত রেঁধে দিয়েছে—কত আদর যত্ন করেচে। তার চরিত্র খারাপ ছিল? সে কিছু জানে না। নিমির জন্যে বুকের মধ্যে একটা বেদনা। নিমিকে সে খুন করবে? কাউকে কখনো খুন করার কথা তার মনে আসে নি। আল্লা সাক্ষী আছেন সব কাজের। ভয় কি? মালিক যা করবেন তাই হবে।

রাস্তায় ওকে পুলিশে ধরলে না। বেলা দুটোর সময় বাড়ি ফিরে ওরা দেখলে পুলিশ দফাদার অপেক্ষা করচে ওদের পাড়ার বড় মোড়লের বাড়ী। লোক গিজগিজ করচে। ডাকহাঁক সাক্ষীর জবানবন্দি হোতে বিকেল হয়ে গেল। শাইলিপাড়া গ্রামের সবাই একবাক্যে দারোগার সামনে বল্লে ইচুর দ্বারা এ খুন হয়েচে তারা কেউ বিশ্বাস করে না। জবানবন্দিতে আরও প্রকাশ পেল ইচুর স্ত্রী নিমি প্রায়ই রাত্রে স্বামীকে ঘুম পাড়িয়েই বাড়ি থেকে বেরুতো। গ্রামের মধ্যে তার প্রেমিকের অভাব ছিল না। প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও চলতো। দারোগা ইচুকে সামনে ডাকিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করলেন। শেষে বল্লেন—তুমি কিছু জানতে না যে, তোমার স্ত্রীর চরিত্র খারাপ?

—না, দারোগাবাবু। কিছু জানিনে মুই।

—জানো এতে চালান দিলে তোমার ফাঁসি হতে পারে?

—আল্লার যদি তাই মর্জ্জি হয়, মোর মনে এতটুকু খেদ থাকবে না দারোগাবাবু—তেনার যা মর্জ্জি তাই তিনি করুক। মুই খুসি ছাড়া অখুসি হবো না।

বুড়ো হাফেজ মণ্ডল এগিয়েএসে দৃঢ়কণ্ঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বল্লে—কাকে কি বলচেন বাবু? আল্লার কথা উঠলি ওর চোখ দিয়ে পানি পড়ে। অমন লোক এ দিগরে নেই।

দারোগাবাবু বল্লেন—তুমি কাল রাত্রে কোথায় ছিলে?

—ঘরেই শুয়ে ছেলাম। মড়ার মত ঘুম এসেচে চকি, সনেকপুরের বিলি জন খেটেলাম সারাদিন। ওনারা ডাকলে সকালবেলা, তখন মুই ঘুম ভেঙে উঠি।

দারোগাবাবু অভিজ্ঞ লোক, পুলিশের চাকুরী অনেকদিন করচেন। কে সাধু কে বদমাইস চেনেন। ইচুর দ্বারা এ কাজ হয়নি ওর মুখের দিকে চেয়ে তখুনি বিদ্যুতের লেখা বাণীর মত তাঁর মনের মধ্যে এ সত্য উদয় হোল। সেই সন্ধ্যায় ইচু নমাজ সেরে ভাঙা, খালি ঘরে ঢুকতেই ওর প্রাণটা হা হা করে উঠলো।

—নিমি ও নিমি, মোরে ভাত এনে দে।

সে আপন মনেই ডাকলো নিমিকে সে ভালবাসতো, যে যা বলে ওসব সে বিশ্বাস করে না। বিচার করবার সে কেউ নয়। নিমিকে সে ক্ষমা করেচে।

—নিমি, ও নিমি, মোরে ভাত এনে দিলিনে?

পরদিন গ্রামের লোক সকালে উঠে ইচুকে আর তার ঘরে দেখতে পেলে না। সে একবস্ত্রে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে গিয়েচে কখন। গৃহস্থালীর কলসী, হাঁড়িকুড়ি, নারকোলের মালা, দু'একখানা পিতলের ঘটিবাটি সব ফেলে রেখে গিয়েচে।

খলসেখালি গ্রামের প্রান্তে নদীতীরে তেঁতুলগাছের তলায় পর্ণকুটিরে একজন ফকির কোথাথেকে এসেচে। সন্ধ্যায় আকাশের নীলপটে মেঘের রচনার সঙ্গে সঙ্গে সে খেজুরচটা বিছিয়ে নদীর ধারে যখন সে নমাজ পড়ে, তখন লোকে সবিস্ময়ে তার মুখে দেখেচে এক অদ্ভুত আলো, প্রভাতী তারার মৃদু জ্যোৎস্নার মত। এক সন্ধ্যা ভিক্ষাই তার উপজীবিকা। সবাই ওকে মানে, ভক্তি করে। নাম ওর ইচু ফকির।

জীবজন্তুর পূর্বরাগ

(১৯৭ পৃষ্ঠার পর)

প্রেমালাপের সময় গ্রিবস (Grebes) ডাইভারদের (Diver)-স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই শৈবাল, জলজ গাছ প্রভৃতি উভয়ে উভয়কে অনুরাগের নিদর্শনস্বরূপ উপহার দেয়। তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যখন গলা তুলে নামিয়ে চঞ্চুতে চঞ্চুতে উপহার ধরে প্রেমালাপ করে তখন ভারি চমৎকার দেখায়। বহুক্ষণ এইরকম করার পর উপহার বিনিময় হয়। বকেরা গাছের ডাল, ওয়ারবলাররা (Warbler) গাছের পাতা প্রভৃতি বাসা বাঁধবার উপকরণ উপহার দেয়। পেঙ্গুইনরা পরস্পর পরস্পরকে ছোট উপল, নুড়ি প্রভৃতি উপহার দেয়।

এইবার একজন বৈজ্ঞানিকের উক্তি উদ্ধৃত করে আমরা পূর্ব্ব-রাগের পালা এইখানেই শেষ করি। "Almost as a matter of fact the mode of life is reflected in courtship." জীবজগতে সর্ব্বত্রই দেখি পুরুষ তার নায়িকার মনোরঞ্জন করে চলতে চায়।*

---

* নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি হতে এই প্রবন্ধের উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে।

(1) Thompson — Biology of Birds. (2) Munro Fox—Personality of Animals. (3) James Fisher—Watching Birds. (4) Julian Sorrel Huxley—A Monograph on Courtship. (5) Charles Darwin—The Descent of Man. (6) F. Chapman—Camps and cruises of an Ornithologist. (7) W. P. Pycraft—The Courtship of Animals. (8) G. U. Levick—Antartic Penguins. (9) E. Selous—Realities of Bird Life.

আগে ও পরে

(২০৯ পৃষ্ঠার পর)

আরও কত কথা সেদিন সে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল। মা বাপ তাহার লেখা পড়া শিখান নাই যে, সে কিছু উপায় করিয়া সংসারে সাহায্য করিতে পারে। প্রথম দুই কন্যা মারা যাওয়াতে খুবই তাহার দুঃখ হইয়াছিল বটে, কিন্তু এখন সে ভাবে ভালই হইয়াছে। বাঁচিলে তো ১০ বছরের উপর বয়স হইত, আর কয় বৎসর পর বিবাহ দিতে হইত, আরও কত কি মনের দুঃখে করুণা বলিয়াছিল। অলকা সেদিন সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিল, করুণা চিরদিন কখন দুঃখে যাবে না। শিশিরবাবু শিক্ষিত, চিরদিনই কি ৪০৲ টাকার কেরাণী থাকবেন। অবস্থা একদিন তোমার ফিরবেই। সে হতাশার সুরে বলিয়াছিল, কি যে বল অলকা, আর অবস্থা ফিরবে? চিরদিন এই বস্তিতেই এমনি অবস্থায় দিন কাটাতে হবে। তাহারও সেই দিন মনে হইয়াছিল বোধ হয় তাই, কারণ বিবাহের পর ১০ বছর কাটিয়া গেল, আর কবে অবস্থা ফিরিবে?

করুণার ভাল দিন সত্যিই আসিয়াছে, এত ভাল যাহার কল্পনা সে কোনদিনই করিতে পারে নাই। সহসা পিয়ানো বাজিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি কিশোর কিশোরী ঘুরিয়া ফিরিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। অলকাও অতীত জীবনের স্মৃতি হইতে বর্ত্তমানে ফিরিয়া আসিলেন। রাত্রি প্রায় ১২টায় নাচ থামিল, তাহার পর মিষ্টার এবং মিসেসকে বহু ধন্যবাদ দিয়া এবং শুভরাত্রি জানাইয়া বিশ্রাম বীথির মেম্বারগণ বিদায় লইলেন।

সেদিন বাধ্য হইয়াই অলকাকে থাকিয়া যাইতে হইল। রাত্রিতে শয়নগৃহে করুণা বলিলেন,—অলকা, তোমার দুর্ভাগ্যের খবর ভাই শুনেছিলাম। কিন্তু কি করে যে এতবড় বিপদ হোল, তা আমি জানি না। অলকা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত বলিলেন,—গত মেদিনীপুরের ফ্লাডে উনি কাঁথিতে রিলিফ ওয়ার্কে গিয়েছিলেন। অসময়ে স্নান, অসময়ে খাওয়া দাওয়া করে ওঁর রিলিফ ক্যাম্পেই কলেরা হয়। আমার কাছে তার এল, আমি গেলামও কিন্তু দেখতে পেলাম না। করুণা দুঃখিত স্বরে বলিলেন,—দেখতে পাওনি? —না ভাই, এ দুঃখ আমার মরণ পর্য্যন্ত থাকবে। কয়েক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া আবার করুণা জিজ্ঞাসা করিলেন,—আর তোমার ছেলে?—অশ্রুসজল নয়নে অলকা বলিলেন,—তার বেলাতেও ঐ একই ব্যাপার। দামোদরে ফ্লাডের সময় ও এখানেই এম এ পড়ত, গেল বর্দ্ধমানে রিলিফ ওয়ার্কে, দিন রাত জলকাদা ঘেঁটে জ্বর, বুকে ব্যথা নিয়ে ফিরল খুলনায়। একমাসের উপর নিউমোনিয়ায় ভুগে মারা গেল, সংসারে এখন আমি একা।

করুণা ব্যথিত দৃষ্টিতে বান্ধবীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ পর স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তিনি বলিলেন,—অলকা, তুমি কি করে খুলনায় অত বড় বাড়ীতে থাক ভাই? থাকতেই হয়, পেট যখন আছে, তখন খেতেই হবে।—তবে ভুল ছেড়ে দিয়েছি। কোন কাজ মন দিয়ে করতে পারি না। টিকতেও পারি না এক জায়গায়। একবার মাসীমার কাছে, একবার জেঠীমার, একবার মামীমার বাড়ী—এই করে বেড়াই। যাক আমার দুঃখের কথা। তোমার সুখ ঐশ্বর্য্য দেখে সত্যিই আমি খুশী হলাম। তোমার কত কষ্ট ছিল টাকার জন্যে, এখন সব কষ্ট ঘুচেছে—শিশির বাবু কি করেন এখন?—উনি মিলিটারীতে মাছ সাপ্লাই করেন। যুদ্ধ লাগতে আমিই আমার দু-একখানা গয়না দিয়ে আর এখান ওখান থেকে কিছু টাকা ধার করে এনে এই কাজটি ধরিয়েছিলাম।—বেশ করেছ নিজে দুঃখ পেয়ে, আর বন্যায় ঝড়ে দুর্ভিক্ষে মানুষের দুঃখ দেখে আমার কেমন একটা বিভীষিকা হয়ে গেছল; যেখানে যাই কেবল একই দুঃখের কথা। ভুলেই গিয়েছিলাম। এখনও মানুষ হাসতে, নাচতে এবং গাইতে পারে। খুব আনন্দ হোল তোমায় দেখে।

বাংলার মৎস্য-চাষ

(৭৪ পৃষ্ঠার পর)

আবার ভরিয়া দেওয়া হইতেছিল। কারণ টায়ারের মুখ প্রায় খোলা ছিল। ইহাতে অনবরত বাতাস জলের মধ্যে বুদবুদ কাটিতে-ছিল। জলের ph. H লইয়া দেখা গেল তাহা ৭ হইতে যথেষ্ট কম, প্রায় ৬। ইহা বেশ অম্লাত্মক। এই অম্লাত্মক জলকে শীঘ্র ৭য়ে পৌছাইতে হইলে কিছু ক্ষার জাতীয় জিনিষ দেওয়া আবশ্যক। সস্তা ও সর্ব্বস্থলে পাওয়া যায় এমন ক্ষার বাঙ্গলা দেশে একমাত্র কলা গাছ। কলা গাছের থোর দুইজনে খুব শক্তির সহিত মোচড় দিয়া উহা হইতে রস বাহির করিয়া জলে দিতে দিতে প্রায় ১২টা গাছের রস দেওয়া হইলে জলের ph. H আবার ৭য়ের নিকট উঠিয়া গেল। ইতিমধ্যে মাছেরাও খাবী খাওয়া ভাব ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃই জলের নীচে সচল অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রায় সকল মাছই জলের নীচে চলিয়া গেল, কেবল ২টি মাছকে আর বাঁচাইতে পারা গেল না। তাহাদের দেহই জলে ভাসিতে থাকিল। আমরা সেই মৃত মাছগুলিকে জল হইতে উঠাইয়া লইয়া আরও কিছুক্ষণ হাওয়া দিতে বলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

অম্লাত্মক অবস্থায় জলে ব্যাকটিরিয়া বৃদ্ধি পায় এবং সেই ব্যাকটিরিয়া ক্ষারাত্মক অবস্থায় মারা পড়ে। মাছেরা ৬'৮, হইতে ৭'৬, পর্য্যন্ত বেশ ভাল অবস্থায় থাকে। ইহা হইতে বেশী বা কম অর্থাৎ বেশী ক্ষারাত্মক বা বেশী অম্লাত্মক অবস্থা মাছের পক্ষে মারাত্মক হইয়া পড়ে।

কম জলে অর্থাৎ ছোট কাচের জার বা চৌবাচ্চার জলকে ক্ষারাত্মক করিতে হইলে Bicarbonate of soda গুলিয়া করিতে পারা যায়। অম্লাত্মক করিতে হইলে Acid sodium phosphate monobasic মিশাইয়া করা চলে।

পুষ্করিণীর জলে এ সব চলিতে পারে না, কারণ খরচ অত্যন্ত বেশী হয়। জলের তাপের উপরও মাছের জীবন অনেকটা নির্ভর করে। তাপ অত্যন্ত বেশী হইলে মাছ মরিয়া যায়। সাধারণতঃ পুষ্করিণীতে এই তাপের মাত্রা গ্রীষ্মকালে প্রবল হয়। তখন জলও অনেক কমিয়া যায়। ইহা ছাড়া অনেক সময় জলে নানাপ্রকার গরম জল বা কোন factory হইতে গরম জল পড়িতে দিলে এই বিপদ ঘটিতে পারে। জলের তাপ অত্যন্ত কম হইলেও মাছেরা আর নীচে থাকিতে চায় না। সূর্য্যতাপের জন্য তাহারা প্রায়ই জলের উপরিভাগে আসে। সে কারণ শীতকালে মৎস্যাহরণ অত্যন্ত সুবিধাজনক কাজেই এই কালে সাধারণতঃ মাছ সস্তা হয়। এই সস্তা হইবার আর এক কারণ হইল এই যে, শীতকালে মাছ সহজে পচে না এবং তাহার জন্য বহুদূর হইতে মাছ চালান দেওয়া সম্ভব হয়। বাজারে চাহিদা হইতে বেশী মাছ আসাতে দর কমিয়া সস্তা হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মাছেরা জলের তাপের জন্য নড়াচড়া করে এবং তাহা শুধু খাদ্যের উপরই নির্ভর করে না, জলের উপর ও নীচেও অর্থাৎ বিভিন্ন স্তরেও চলিতে পারে।

হারা দিয়া পুকুরের গ্যাস বাহির করা

বাংলাদেশে হারা দিয়া পুকুরের পাঁকের মধ্যে দূষিত গ্যাস জমিলে তাহা বাহির করিবার ব্যবস্থা আছে। ইহাতে কয়েকটি লম্বা বাঁশ ও ছোট ছোট টুকরা বাঁশ খোঁচা খোঁচাভাবে লম্বা বাঁশের গায় বাঁধিয়া দিয়া লম্বা বাঁশগুলিকে বান্ডিল বাঁধা হয়। এই বান্ডিলের মধ্যে ভারী করিবার জন্য পাথরের ঢেলা পুরিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। এখন এই পাথর সমেত বান্ডিলটি পুকুরে ডুবাইয়া দিয়া বান্ডিলের দুই প্রান্তে মোটা কাছি বাঁধিয়া দুইজন লোক পুকুর পাড় দিয়া হড় হড় করিয়া টানিয়া লইয়া যায়, তাহাতে বাঁশের ছোট টুকরা মাটি বা পাঁকের মধ্যে আঁকড়াইয়া গ্যাস থাকিলে বাহির করিয়া দেয়।

এখন কথা হইতেছে পুরাতন পুকুরেই বেশী পাঁক পড়ে। বেশী পাঁক পড়িলেই গ্যাস জন্মাইবার সম্ভাবনা। গ্যাস হারা দিয়া বাহির করিতে গিয়া এই পাঁক একেবারে জলে গোলাইয়া যায় যে মাছেদের শ্বাসকার্য্যে ব্যাঘাত ঘটে। ফলে হিতে বিপরীত ঘটে। সেজন্য এই হারার ব্যবহার বাংলায় লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। জল ঘোলাইয়া শ্বাসকার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইয়া একপ্রকার মাছ ধরিবার প্রথাও বাংলাদেশে কোথাও কোথাও দেখা যায়। পূর্ব্ববর্ণিত পাম্পে এ সকল কোন বালাই নাই। সামান্য স্থানের পাঁক জলে ঘোলা হইয়া যাইতে পারে তাহাতে মাছেরা আঘাতও পায় না বা শ্বাসকার্য্যের ব্যাঘাতও হয় না।

বায়ু পরিবর্ত্তনের উপকারিতা এখন আর নূতন নয়। মাছেদের এভাবে এক পুকুর হইতে অন্য পুকুরে ফেলিলে খাদ্যের দিক হইতে লাভবান হওয়া যায় এই পরিবর্ত্তিত পুকুর ভালই হউক বা খারাপই হউক। এই প্রকার জল পরিবর্ত্তনে জননেরও অনেক সাহায্য হয়। জল পরিবর্ত্তনে জনন ক্রিয়ায় বিশেষ উদ্দীপনা আসে।

উপসংহার

যুদ্ধের জন্য আমাদের দেশে মাছের চাহিদা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। এই চাহিদা আরও মারাত্মক হইয়াছে রেল বা নৌকা প্রভৃতি যানবাহনের অভাবে। এখন কথা হইতেছে নিশ্চেষ্ট হইয়া অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলে কোনই লাভ হইবে না। গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ সকলে মিলিয়া চেষ্টা ও যত্ন করিলে আশু ফল লাভ করা যাইতে পারে। সকলে মিলিতভাবে মাছের জনন পালন ও অতি সত্বর বৃদ্ধির চেষ্টা করিলে আমরা নিশ্চয়ই সফলকাম হইতে পারিব।

নারী

দেহের লাবণ্যের তরল মহিমায় উচ্ছল আবেগ আনে দয়ারামের শাড়ী। বর্ণ ও ডিজাইনের প্রাচুর্য্যে দয়ারাম আনে আধুনিক রুচির নূতন সৌন্দর্য্য সুষমা।

দয়ারামের শাড়ী

দয়ারাম এণ্ড কোং
নিউ মার্কেট, কলিকাতা

স্থাপিত   ১৯২১

ব্যাঙ্কগুলি জাতীয় ঐশ্বর্য্যের একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়—এতেই প্রতি মুহূর্ত্তে গড়ে উঠছে জাতির প্রকৃত সম্পদের ইতিহাস। ব্যক্তি বিশেষের অর্থ ব্যাঙ্কের নিরাপদ আশ্রয়ে প্রতিদিন নির্ভয়ে বাড়তে থাকে, আর ব্যাঙ্কই নিয়ত পুঁজি জুগিয়ে তিলে তিলে গড়ে তোলে জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ শিল্প বাণিজ্য। জাতীয় ব্যাঙ্কে আপনার বিত্ত গচ্ছিত রেখে জাতীয় শিল্পের বিজয়যাত্রা জয়যুক্ত করুন।

দি
ইষ্ট বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
হেড আফিস: ময়মনসিংহ

●

ম্যাঃ ডিঃ - এ বি, গুহ এম-এ বি-এল
ডি. এম. লাহিড়ী এম-এ, বি-এল
ম্যানেজার, কলিকাতা শাখা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

(১৭২ পৃষ্ঠার পর)

justify the means, for the simple and obvious reason that the means employed determine the nature of the ends produced. এইজন্যই হাক্সলি জীবনের কোন ক্ষেত্রেই জোরজুলুমের পক্ষপাতী নন। তাঁর মতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সমস্ত সম্পর্ককে অহিংসার উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে সংসারে কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে না। সব রকম লড়ায়ের গোড়ার কথা মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদ। অন্য মানুষকে নিজের থেকে স্বতন্ত্র ভাবি ব'লেই তাকে হত্যা করতে পারি। কিন্তু চরম সত্য হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐক্য। যে পথ মানুষ থেকে মানুষকে তফাৎ ক'রে দেয়, সে পথে মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐক্য সম্ভব নয়। যারা জগৎ থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করতে চায়, তারা এমন পথ নিতে পারে না যা হিংসাত্মক। যে রকম উপায় আমরা অবলম্বন করি, তারই রঙে আমাদের লক্ষ্য রাঙিয়ে যায়। গত মহাযুদ্ধের সময়ে অনেকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলো ন্যায় এবং স্বাধীনতার ভিত্তিতে জগৎ গড়বার জন্য। কিন্তু ন্যায়ও এলো না, স্বাধীনতাও এলো না, এলো ভার্সাই সন্ধি এবং আরও হাজার রকমের অনাচার।

হাক্সলি বলছেন, রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মুক্তি পেতে গেলে হাজার হাজার নরনারীর পক্ষে নন্‌-ভায়োলেন্সের পন্থা অবলম্বন ছাড়া কোন গতি নেই। সংগঠন শক্তি, বিজ্ঞানের শক্তি ইত্যাদিকে আশ্রয় ক'রে প্রত্যেক রাষ্ট্রই পুলিশের কার্য্যক্ষমতাকে বহুল পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছে। গুপ্তচর সমস্ত দেশকে ছেয়ে আছে। টেলিফোন, বেতার, দ্রুতগামী গাড়ী—এ সবের সাহায্যে প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টই গুপ্তচর বিভাগকে অত্যন্ত দক্ষ ক'রে তুলেছে। সমস্ত দেশেই পুলিশ অসম্ভব নিপুণতার সঙ্গে এখন কাজ করতে পারে। পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন করা এখন অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তাছাড়া প্রত্যেক রাষ্ট্রই এখন এমন সব বৈজ্ঞানিক অস্ত্রে সুরক্ষিত যা' সাধারণ মানুষের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তবে স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রকে পরিবর্ত্তিত করবার উপায় কি? হাক্সলি বলছেন: The only methods by which a people can protect itself against the tyranny of rulers possessing a modern police force are the non-violent methods of massive non-co-operation and civil disobedience. অতএব হাক্সলি বলছেন, For this reason it is enormously important that the principles of non-violence should be propagated rapidly and over the widest possible area. নন ভায়োলেন্সের আদর্শকে খুব তাড়াতাড়ি সর্ব্বত্র প্রচার করবার দরকার আছে—কারণ অস্ত্রের দিক দিয়ে যারা ক্ষমতাশালী, তাদের কাবু করবার আর কোন উপায় নেই।

সবচেয়ে মুস্কিল হচ্ছে স্বাধীনতার অনুকূলে জনমতকে গড়ে তোলা। অত্যন্ত নির্দয় শাসনযন্ত্রও জনমতের সমর্থনের প্রয়োজন অনুভব করে। তাই জনমতকে শাসকদের অনুকূলে গড়বার জন্য প্রায় প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টই বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের সুযোগ গ্রহণ করছে। সংবাদপত্র এবং রেডিয়োর উপরে গবর্ণমেণ্টের পূর্ণ কর্তৃত্ব তো আছেই। হাক্সলি বলছেন, কয়েক বছরের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট জনমতকে নিয়ন্ত্রিত করবার কাজে 'টেলিভিসন্'ও (Television) ব্যবহার করবে। Gregg'ও তাঁর The Power of Non-violence-এ হাক্সলির অনুরূপ কথাই ব্যক্ত করেছেন। গ্রেগ বলছেন, পুলিশ, সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী, সংবাদপত্র, যানবাহন ইত্যাদির উপরে পুঁজিপতিদের আধিপত্য শীঘ্রই প্রমাণিত করবে—হিংসার খেলায় তারা শ্রমিকদের চেয়ে অনেক বেশী প্রতাপশালী। তবে উপায়? Gregg বলছেন: The only weapon for the poor is non-violent resistance.

Richard. B. Gregg এর The Power of Non violence এবং Aldous Huxley'র Ends and Means পড়ে ধারণা হয়েছে, পশ্চিমের অনেক চিন্তাশীল মনীষী পাশ্চাত্যের রাজনীতির উপরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন। সত্যাশ্রয়ী, অহিংস, অনাসক্ত মানুষ ছাড়া যে নূতনতর মানব সমাজকে গড়ে তোলা সম্ভব নয়—একথা যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা ভালো করেই বুঝেছেন। আমাদের দেশেও সত্য এবং অহিংসাকে ভিত্তি করে স্বাধীনতার আন্দোলন চলেছে। পাশ্চাত্যে এবং প্রাচ্যে চিন্তাধারার এই ঐক্যের মধ্যে ভাববার কথা অনেক আছে। গ্রেগের এবং হাক্সলির বই দু'খানা পড়বার প্রয়োজন আছে। পশ্চিমের চিন্তাধারা প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক। উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য সেখানে অল্পই। নন-ভায়োলেন্সের পক্ষে বৈজ্ঞানিক যুক্তি কি আছে জানা ভালো। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ উক্ত বই দু'খানির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার একটা ভূমিকা মাত্র।

গান

পূরবী-দাদরা

কথা—সুনীল দত্ত : সুর ও স্বরলিপি—সতীশ পাত্র

সাঁঝের আকাশে উঠিল প্রথম তারা
কুসুম ফোটার বেলা গেল সাথী হারা।
পথ বায়ু ঐ হোয়ে এ'ল ধীর
আঁধারে ভরিল স্বপনের তীর
বহিল নয়নে বেদন অশ্রু ধারা ॥

সারাটি দিনের ভাবনা বহিল বুকে
কি দিয়ে আমার সন্ধ্যা ভরিব সুখে;
এখন আমি ভাবি ব'সে তাই
আকাশের পানে আর কেন চাই,
ফাগুনের গান এই তো হোয়েছে সারা ॥

+			০														
ন্ঋা	গা	।	ঋগা	গা	পা	জ্ঞা	ধা		জ্ঞ	গজ্ঞগা	ঋগা	ঋা	সা	।	।	।	।
সা	ঝে	র	আ	কা	শে	উ	ঠি	ল		থ	ম	তা	রা	•	•	•	•
সা	দা	দা	দা	দা	(প) দা	পদা	র্সা	না	দা	পা	পা	পজ্ঞা	দা	।	।	(পজ্ঞ) গা	গা
কু	সু	ম	ফো	টা	র	বে	লা	গে	ল	সা	থী	হা	রা	•	•	•	•
পা	পা	পা	জ্ঞগা	জ্ঞধা	(জ্ঞ) ধা	র্সা	র্সা	সনা	ঋা	র্সা	র্সা	নঋা	র্গা	(ঋ) র্গা	ঋা	র্সা	র্সা
প	থ	বা	য়ু	ঐ	•	হো	য়ে	এ	ল	ধী	র	আঁ	ধা	রে	ভ	রি	ল

ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের

সেবায় নিযুক্ত ...

এ-যুদ্ধের ফলে ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের যেমন প্রসার হয়েছে তেমনি আমা'র এ-দেশের শিল্প-পতিরা বুঝতেও শিখেছেন যে তাঁদের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি এপর্যন্ত আমদানী করা মালের উপর কতখানি নির্ভর করে এসেছে। আজ নানা প্রতিবন্ধকতায় বিদেশী বহু মূল-উপাদানের আমদানি এক রকম বন্ধ, অথচ চাহিদা বেড়ে গিয়েছে বহুগুণ।

সোয়াইকার বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে বহুবিধ মূল-উপকরণ তৈরি হয়। বিশেষ করে ওলিইক এবং ক্রিসলিক এ্যাসিড জাতীয় কেমিক্যালগুলি তৈরি করার ব্যাপারে এঁরাই এদেশে পথ প্রদর্শক। তা'ছাড়া ভারতের বিভিন্ন বিশিষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে উদ্ভিজ্জ তৈল, রাসায়নিক ও খনিজ পদার্থ সোয়াইকাই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে যোগাচ্ছেন; এবং ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল লুব্রিক্যান্ট ও কোল-টার বাইপ্রডাক্টের প্রস্তুতকারক হিসাবেও সোয়াইকা বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন।

সোয়াইকা অয়েল মিল্‌স্—'কুকুর' মার্কা বিবিধ উদ্ভিজ্জ তৈল ও ভিনিসফেক্ট্যান্টের জন্য খ্যাত।

সোয়াইকা কেমিক্যাল অ্যাণ্ড মিনারেল কোং লিমিটেড—খনির মালিক, রাসায়নিক প্রস্তুতকারক ও বিবিধ খনিজ পদার্থ এবং রাসায়নিকের পাইকারী বিক্রেতা ও সরবরাহকারী।

সোয়াইকা ফার্টিলাইজার লিমিটেড—নানাপ্রকার খৈল ও সবুজ সারের বীজ সরবরাহকারী।

সোয়াইকা স্ট্যাণ্ড অয়েল অ্যাণ্ড ভার্নিস কোং লিমিটেড—স্ট্যাণ্ড অয়েল ও বার্নিশ প্রস্তুতকারক।

সোয়াইকা এক্সপোর্ট অ্যাণ্ড ইম্পোর্ট লিমিটেড—মাল আমদানি ও রপ্তানিকারক।

সোয়াইকা অয়েল অ্যাণ্ড প্রোডাক্টস্ কোং লিমিটেড—গ্রীজ, লুব্রিক্যান্ট প্রভৃতি প্রস্তুতকারক।

সোয়াইকা মিনারেল ক্রাসিং মিল্‌স্ অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড—খনিজ পদার্থ চূর্ণও সরবরাহকারী।

সোয়াইকা সাপ্লাই করপোরেশন লিমিটেড—মিল ও কারখানার মাল সরবরাহকারী।

সো[illegible] ব্রিক ওয়ার্ক্‌স্—ইট প্রস্তুতকারক [illegible]র মালমশলা সরবরাহকারী।

সোয়াইকা প্রতিষ্ঠান সমূহ

হেড অফিস: "পোলক হাউস" ২৮এ, পোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিগ্রাম: "প্যাডলক"—কলিকাতা। ফোন: কলি:—৬১৭১-৭২।
কারখানা: লিলুয়া ও বারাণসী। শাখা সমূহ:— বোম্বাই, বারাণসী, কাবউই, এবং জব্বলপুর।

SWK 10